CENTRAL LIBRARY

অমৃত

সম্পাদক

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

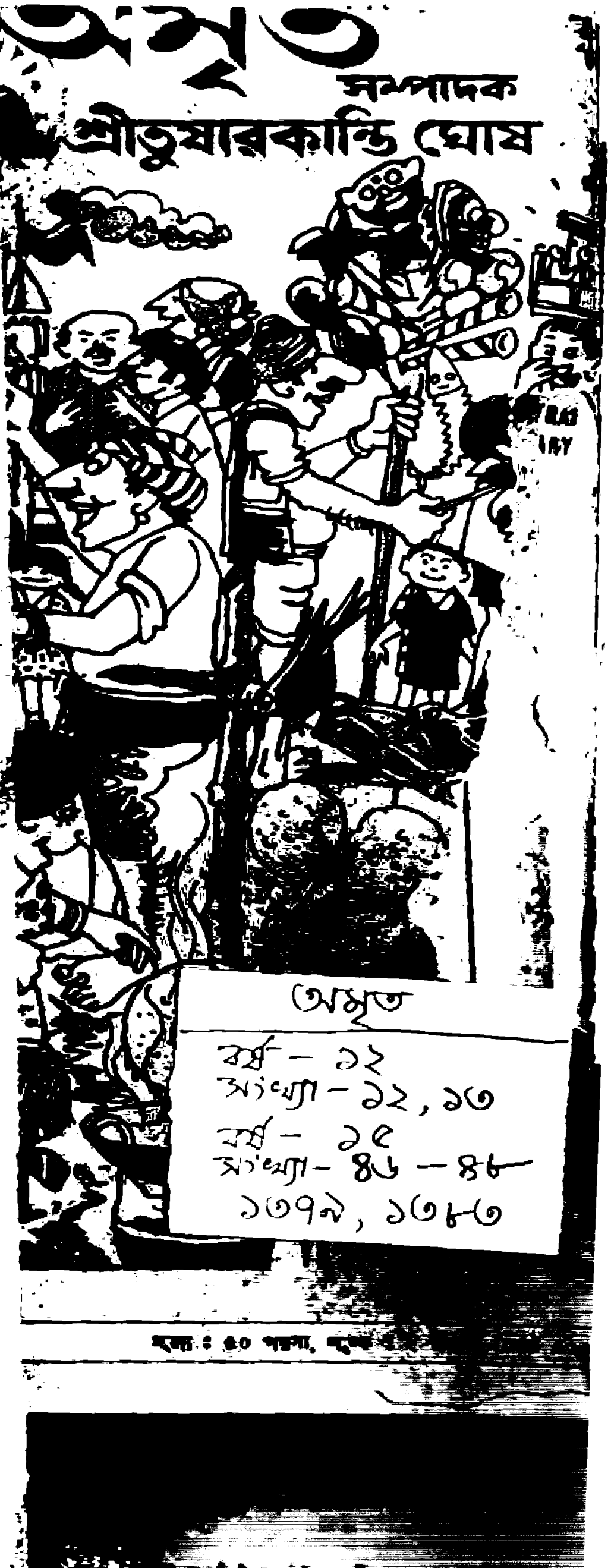

অমৃত

বর্ষ – ১২
সংখ্যা – ১২, ১৩
বর্ষ – ১৫
সংখ্যা – ৪৬ – ৪৮
১৩৭৯, ১৩৮৩

অনুপম আয়ুর্বেদীয় কেশ তৈল

সাধনা আমলা

অতুলনীয় গুণাবলীর জন্য যুগ যুগ ধরে সুবিদিত

আমলকিই ইহার প্রধান উপকরণ

কেশ পতন, অকালপক্কতা ও কেশের রুক্ষতা রোধ করে এবং প্রচুর সজীব, সুন্দর, ঘনকৃষ্ণ কেশোদ্গমে সহায়তা করে।
মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ ও কর্মক্ষম রাখে।

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা
কলিকাতা-৫

শ্রেষ্ঠ লেখক ॥ শ্রেষ্ঠ রচনা

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

অনশ্বর ৫৲

একটি মেয়েটি পিতামাতৃহীন এই বইয়ের অর্ধেক লিখে পরলোক গমন করেন। ২২ বছর পরে সেই বই শেষ করলেন তাঁর পুত্র

তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

জ্যোতির্বিদ্যার সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ

জ্যোতিষাচার্য ভৃগুভাস্করের

...জর ভাগ্য নিজে দেখুন ২৲

৫০০০ কপি বিক্রয়ের পর নতুন মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধে আরো একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হলো।

মুকুলচন্দ্র চক্রবর্তীর

ঘাটশিলায় বিভূতিভূষণ ৪৲

এই গ্রন্থটি বিভূতিভূষণের জীবনী ও সাহিত্যের মূল্যায়নে ডকুমেন্টারীর কাজ করবে।

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

তারাশঙ্কর রচনাবলী

...খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। ২০টি খণ্ড হবে। প্রধান ভূমিকা আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের। ১ম খণ্ডে ভূমিকা প্রমথনাথ বিশী। ২য় খণ্ডে অধ্যাপক ক্ষিতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর। প্রতি খণ্ড ১৫৲ টাকা গ্রাহকগণ সত্বর বই সংগ্রহ করুন। ডাক খরচ আলাদা।

॥ কয়েকটি পুনর্মুদ্রণ গ্রন্থ ॥

...মাসের ... তিতিক্ষা — সৈয়দ মুজতবা আলীর

রূপসংকট ৩৲ ৫৲ ট্রু নিমেষ ১০৲ কলকাতার কাছেই ৯৲ বাহ্নবন্যা ১১৲

...মী — বিভূতিভূষণের — শংকর-এর

...চালী ৮৲ আরণ্যক ৭॥ দেবযান ৭॥ সীমাবদ্ধ ৬৲ স্থানীয় সংবাদ ৬৲

যে গ্রন্থগুলি চলচ্চিত্রে আশু মুক্তিপ্রতীক্ষায় ছবি দেখার আগে মূল বইটি পড়ুন

...ম্ভু মহারাজের — ভরাসন্ধর — নীহাররঞ্জন গুপ্তর

...ত-করুণা জাহ্নবী-যমুনা ৯৲ ছায়াতীর ৫৲ ছিন্নপত্র ৫৲ রাতের রজনীগন্ধা ৫৲ কাজললতা ৬৲

...স্তর — বিভূতিভূষণের

অশনি সংকেত ৫৲ আরণ্যক ৭॥ অথৈজলে ৫॥

...ষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট : কলকাতা-১২ ফোন : ৩৪০৪৮২ ॥ ৩৪৮৭১১

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য প্রেরিত লেখা প্রবন্ধ প্রকাশ বিভাগে পাঠাবেন। লেখাটি ফেরত পাবার জন্য ডাক-টিকিট দেওয়া খাম পাঠানো প্রয়োজন। অন্যথায় লেখা ফেরতের দায়িত্ব কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করবেন না।

২। প্রেরিত লেখা কাগজের এক পৃষ্ঠায় লাইনের মাঝে ফাঁক রেখে লিখতে হবে। কালি ও পেন্সিলে লেখা লেখা গ্রহণ করা হয় না।

৩। লেখার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সির নিয়মাবলী এবং নমুনা সংখ্যা বাবদ ডাকমাশুল জমা পাঠানো প্রয়োজন।

গ্রাহকদের প্রতি

১। ঠিকানা পরিবর্তনের জন্য অন্তত ১৫ দিন আগে আমাদের সংবাদ দেওয়া প্রয়োজন।

২। ভি-পিতে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের নাম রেজিস্টিভুক্ত হলে পত্রিকাদি পাঠানো হয়।

চাঁদার হার

	ভারতবর্ষ	বহির্ভারত
অগ্রিম	টাকা ১৪.০০	টাকা ০০.০০
ষাণ্মাসিক	টাকা ১২.৪০	১৪.৪০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৬.২৫	৮.০০

ভি-পি-তে পত্রিকা পাঠানোর হার (প্রতি খণ্ডের জন্য প্রযোজ্য)

বার্ষিক	টাকা	১.০৫
ষাণ্মাসিক	টাকা	০.৫২
ত্রৈমাসিক	টাকা	০.২৬

'ভারত' কার্যালয়

১১/১ বাসন্তী মুখার্জি রোড,
বালিগঞ্জ—৩
ফোন : ৪৫-৩৭০১ (১৪ লাইন)

বিশ্বভারতীর নতুন বই

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
পূর্ব-বাংলার গল্প

বৌঠান কাদম্বরীর ভাগ্যবানের ভার নিয়ে বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলে ঘুরে বেড়াবার সময় রবীন্দ্রনাথের যে পরিচয় তা এই সঞ্চয়ন গ্রন্থে ধরা পড়েছে। সেই সময় অজানা গল্পের সংকলন। মূল্য ৭-০০ টাকা

প্রমথ চৌধুরী
সনেট-পঞ্চাশৎ ও অন্যান্য কবিতা

সনেট-পঞ্চাশৎ, রবীন্দ্রনাথ-প্রমুখ নয়জন প্রধানদের [illegible] পড়িবে। ও লেখকের কবিতার ধারা থেকে সংগৃহীত [illegible] কবিতাবলী গ্রন্থপরিচয়ে প্রমথ চৌধুরীর [illegible] প্রমথনাথ বিশী ও সরোজনাথ লোহের [illegible] সেন-সম্পাদিত। মূল্য ৮-০০, শোভন ১০-০০ টাকা

রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহি[illegible]
শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

এই গ্রন্থে বিশ্বভারতীর একটি নতুন [illegible] ও বহির্ভারত। বিশ্বভারতীর সূচনা [illegible] তৎকালীন সাময়িক পত্রপত্রিকা [illegible] অজ্ঞাত সূচীলিপির পাঠোদ্ধারের কাহিনী। রঙিন চিত্র ও সূচনা [illegible] মূল্য ১২-০০, শোভন ১০-০০ টাকা

শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ
শ্রীরানী চন্দ

অবনীন্দ্রনাথের শিল্পসৃষ্টির চিত্রবহুল কাহিনী এবং তাঁর অবনীন্দ্রনাথ [illegible] পড়িবে। অবনীন্দ্র-জন্মশতবর্ষে [illegible] বিদ্যাত রঙিন চিত্র কালো [illegible] মূল্য ১০.০০, শোভন ১২-০০ [illegible]

চার্লস ফ্রিয়ার এণ্ড্রুজ
শ্রীমলিনা রায়

দীনবন্ধু এণ্ড্রুজের জন্মশতবর্ষে বিশ্বভারতীর [illegible]

ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের একনিষ্ঠ সেবক, [illegible] রবীন্দ্রনাথের একান্ত সহকারী বন্ধু, [illegible] চার্লস ফ্রিয়ার এণ্ড্রুজের বহুবিচিত্র জীবনের [illegible] বহুরঙিন চিত্র, পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি এবং সূচনা [illegible] ১০-০০ টাকা

নতুন সংস্করণ
বিচিত্রা

বিশ্বভারতী পত্রিকা [illegible] এই সংখ্যা প্রকাশিত বিশেষ উপযোগী। উপহার [illegible] রাখার মতো। পত্রিকা কলা [illegible] ও সুচিন্তিত [illegible] পাণ্ডুলিপি-চিত্র সংযোজিত। মূল্য ১৮-০০ টাকা, বাঁধাই ২০-০০

বিশ্বভারতী

[illegible] নতুন ঠিকানা : ১০ [illegible] ষ্ট্রীট : [illegible]
ফোন : ৩৪-১৭৬৮-১

CENTRAL LIBRARY

১২শ বর্ষ
১৯ সংখ্যা

অমৃত

১১ সংখ্যা
মূল্য—৩০ পয়সা
ডাক— ২ পয়সা
মোট ৩২ পয়সা

Friday 21st July, 1972 শুক্রবার, ৪ শ্রাবণ, ১৩৭৯ .52 Paise

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
১৭২	তাঁর কিছু শেষ নতুন সন্ধান		
১৭৩	সম্পাদকীয়		
১৭৬	পাইকারি		শ্রীসরকার
১৭৬	দেশে-বিদেশে		শ্রীসুন্দরম
১৭৮	বার্ণার্ডশ		শ্রীঅমল
১৭৯	আমার জীবন—রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ গদ্য রচনা		শ্রীকালীপদ চট্টোপাধ্যায়
১৮১	জীবনের আরেক নাম	(গল্প)	শ্রী মোহন আচার্য
১৮৩	কবিতা ও সংস্কৃতি		শ্রীঅরুণকুমার
১৮৯	পূর্বপুরুষ	(উপন্যাস)	শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী
১১৩	রাজধানী থেকে চলচ্চিত্র		শ্রীতারাপদ সেন
১১৯	রঙ্গশালা ও চিত্রজগৎ		শ্রীসুকুমার বসু ও শ্রীসুধাংশুশেখর রায়
১১১	বন্যের মধ্যে বাঘা	(উপন্যাস)	শ্রীসৌমিত্রশঙ্কর সরকার
১১৩	বিজ্ঞানের কথা		শ্রীঅরুণকুমার
১১৩	কীটপতঙ্গের প্রেম		অনুবাদ—অমিতাভ মুখোপাধ্যায়
১১৩	অমৃতপুত্রের ডায়ারী	(উপন্যাস)	শ্রীসুকান্ত ভট্টাচার্য
১১১৭	উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রবীন্দ্রানুরাগী মহিলা কবি		শ্রীশঙ্খ ঘোষ
১১২২	গান্ধারী	(গল্প)	শ্রীসমীর চট্টোপাধ্যায়
১১২৭	সবারে আমি নমি	(ফটোফীচার)	শ্রীকমল দত্ত
১১২১	বর্ষীয়ান রাজেন		শ্রীঅজয় বসু
১১২২	জন্মদা		শ্রীসুতপা
১১২৬	একজনের		শ্রীসুনীলকুমার
১১২৪	জিনারের ওপরে জিনার	(কৌতুক)	শ্রীশঙ্করপ্রসাদ রায়
১১২৫	বৃদ্ধাশ্রমের চিঠি	(কবিতা)	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র
১১২৫	ছেলে দেবে তোমায় ঘর	(কবিতা)	শ্রীশঙ্খ ঘোষ
১১২৬	বন্ধুর ঘর থেকে	(গল্প)	শ্রীসমরেশ বসু
১১৪০	প্রেক্ষাগৃহ		শ্রীনান্দীকর
১১৪৭	খেলাধুলো		শ্রীক্রীড়ক

প্রচ্ছদ : শ্রীসুবোধ দাস

সোহাগ প্রেমাংশুর অনাস্বাদিত রচনা

: বনবালার :

মকর

৭৲

একটি মেয়ে মানুষের ভিতর কিভাবে প্রেম ... ছোটাছুটি করে চলে। কখন ও কিভাবে কিশোরের একাকীত্ব। মধুমাসী নদীর কূলে কূলে অনুরাগের বহ্নি ছড়িয়ে দিয়ে বাস্তু যখন মিলিয়ে গিয়েছিল তিমিরে তখন এরপর আবার কবে আসবে ? মানুষ উত্তর নিরোধিল মানুষ সোজা বাংলায় ১২৫ পৃষ্ঠা এবং আরও সোনে যখন ... সম্পূর্ণ করার ঝোঁকে সমস্যা হয়েই রয়ে গেল সমস্যা। মকর বেঁধেছে বাসা এক বন্ধু সন্ন্যাসীর সাথে এঁদের ভালবাসা। অনেকদিনই যে এই সম্পর্কটা পুরনো হয়েছে—পড়লে বুঝবেন।

আরেক খানের : ঐতিহাসিক উপন্যাস

বেলোয়ারী বিলাস

১০৲

দ্বিতীয়খানের : ঐতিহাসিক উপন্যাস

রক্তাক্ত গৌড় ১০৲

রক্তস্নাতা মধুমতী

১০৲

শ্রীনবকুমারের : ঐতিহাসিক

মণিহারা চিতোর

১০৲

অন্যতম খানের : আধুনিক উপন্যাস

তিতিক্ষা ১০৲

দ্বিতীয়খানের : আধুনিক উপন্যাস

মীনাক্ষী মন ৭৲

তৃতীয়খানা : রোমাঞ্চ-উপন্যাস

মায়াবী মোহিনী

৫৲

শ্রীসুবোধ : ঐতিহাসিক

নটীর নাম শবনম

৫৲

অঞ্জলি প্রকাশনী

২: নবীন কুণ্ডু লেন, কলিঃ-৯

দশম সংস্করণ বাহির হইল !

জেনারেল প্রিন্টার্স ব্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ প্রকাশিত

COMMON WORDS

॥ অসংখ্য ছবির সাহায্যে শব্দজ্ঞানের সঙ্গে বাক্যগঠনের ব্যবস্থাসহ ছোটদের জন্য অভিনব সচিত্র ইংরেজি-বাংলা অভিধান ॥

মূল্য : বত্রিশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা

॥ জেনারেল বুকস ॥ ৫-১১ রমেশ দত্ত স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

কবি বিষ্ণু দে'র নতুন সম্মান

● ● ●

অনন্য রাত ॥ বিষ্ণু দে

হিমগিরি ছেড়ে সে কেন আসবে বঙ্গোপে?
মানসহ্রদের হিমানীস্বচ্ছ কন্যা!
খচিত হয়তো তুষারের ঝড়ে, কখনও স্বরের প্রদীপে
আঁধার ঘনায়, নীলিমায় তোলে বন্যা।

দেহাতীত সে যে, নাকি বলা যাবে তাপ তার
জড়িয়ে গিয়েছে উষ্ণ স্মৃতির পাতকে?
অরোহী শিখরে সমতলে আদি পাপ কার?
বেঁধেছে সীমানা আপন মোল জাতকে?

বাস করি চরে চড়ায় বালিতে বন্যায়,
ভেসে যাই কত মন্দাকিনীর অতলে।
হিমানীতে নয়, দিন কাটে জলে পাতালে,
তবু অনন্য রাত চায় ঐ বন্যায়!

রবীন্দ্র পরবর্তী যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি বিষ্ণু দে এবছর জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পেয়েছেন। ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ কবিতার বইটির জন্য পুরস্কৃত হয়েছেন তিনি। এর আগে ১৯৬৫ সালে এই বইটির জন্যই তাঁকে সাহিত্য আকাদেমী পুরস্কারও দেওয়া হয়েছিল। তাঁর এই নতুন সম্মানে আমরা সকলেই খুবই গৌরবান্বিত।

আধুনিক বাংলা কবিতা যে কয়জন কবির সাধনায় নতুন চাবির অঙ্কন করেছে, বিষ্ণু দে তাঁদের অন্যতম। তাঁর রচনায় একই সঙ্গে ঐতিহ্যবোধ এবং সমকালীন জীবনচেতনা নতুন কাব্যরূপ লাভ করেছে। কাব্যভাষা আর দৃষ্টিভঙ্গী দুদিক থেকেই তিনি বিশিষ্ট। কবিজীবনের সূচনাতেই এই অনন্যতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মধ্যবিত্ত নীরক্ত বিবর্ণতা ও ক্লান্তিমন্থর উপর তিনি তীর্যক ভঙ্গিতে সমালোচনার আলো ফেলেন, এবং আমাদের জীবনের তুচ্ছতা ও ক্ষুদ্রতার বিষয়ে সচেতন করে তোলেন। অন্যদিকে, নিজে নাগরিক কবি হওয়া সত্ত্বেও তাঁর সহানুভূতিকে তিনি গ্রাম-বাংলার সাধারণ মানুষের দিকে প্রসারিত করেন। এরই ফলে তাঁর কবিতায় একটি মন্থর সুর ধ্বনিত হয়েছে। তাই, কবি-জীবনের শুরুতে তিনি দুর্বোধ্য কবি হিসাবে পরিচিত হলেও, জনজীবনের সঙ্গে এই সহমর্মিতার ফলে ক্রমে ক্রমে তিনি জনস্বীকৃতি লাভ করেন। তিনি তাঁর সাহিত্যকৃতির দ্বারা আমাদের চেতনার দিগন্ত সুদূরে-প্রসারিত করেছেন। আধুনিক জীবনের বহুমুখী জটিলতা এবং চিন্তাভাবনার বিষয়েও সচেতন করে তুলেছেন তিনি। সেজন্যে কবিতা রচনার সঙ্গে সঙ্গে অনুবাদ এবং প্রবন্ধ রচনাতেও সমান আগ্রহ দেখা যায় তাঁর। আমাদের দেশের পাঠক-সাধারণকে বর্তমান কালের অগ্রবর্তী চিন্তাচেতনার বিষয়ে সচেতন করে তোলার জন্যে তাঁর এই আগ্রহের জন্যে কৃতজ্ঞ বোধ করি আমরা।

আর এ-ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথই যে তাঁর পূর্বসূরী সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। পুরস্কার পাওয়ার পর এক সাক্ষাৎকারে বিষ্ণু দে নিজেও তা স্বীকার করেছেন। রবীন্দ্রনাথের মতোই একই সঙ্গে তিনি শ্রেষ্ঠ ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে আন্তর্জাতিক চিন্তাভাবনার শ্রেষ্ঠ অবদানকে মেলাতে চেয়েছেন। এবং তাতে যে তিনি সার্থক হয়েছেন, স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যতের অনেক কবিতা এবং 'পদধ্বনি', 'জন্মাষ্টমী', 'অন্বিষ্ট', 'এলিসিনোর', 'পুরুরবা' ইত্যাদি কবিতাতে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে।

বিষ্ণু দে-র জন্ম হয় ১৯০৯ সালে, কলকাতায়। তাঁর প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ৪০ খানা, তার মধ্যে কবিতার বই ১৬ খানা।

কর্মজীবনে তিনি সরকারী কলেজে ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপনা করতেন। সম্প্রতি বছর-তিনেক হল তিনি অবসর নিয়েছেন।

তাঁর প্রথম কবিতার বই 'উর্বশী ও আর্টেমিস' প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পাঠকমহলে তিনি সচেতনের একজন নতুন কবি হিসাবে পরিচিত হন। এবং সে নতুনত্বের দীপ্তি আজো সমান উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। আমরা এই সঙ্গে 'অমৃতে' প্রকাশিত তাঁর একটি কবিতা তুলে দিলাম। আরো দীর্ঘকাল তিনি বাংলা কবিতাকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করুন।

সম্পাদকীয়

স্থায়ী শান্তির সন্ধানে

ভারত-পাকিস্তান-বাংলাদেশ নিয়ে আমাদের যে উপমহাদেশ গঠিত তার মাটিতে স্থায়ী শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্য নিয়েই সিমলাতে শীর্ষ বৈঠক ও শীর্ষ চুক্তি অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। দীর্ঘকালের বৈরিতা ও ভুল বোঝাবুঝির পর পাকিস্থানের সঙ্গে যে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে বহু বিষয়ে মীমাংসার পথ সুগম করা হল, এটা কম কথা নয়। রাজনীতিকদের হাতে আলাদীনের প্রদীপ নেই। রাতারাতি উভয় দেশের মধ্যে শান্তি ও মৈত্রী স্থাপিত হয়ে যাবার দুরাশাও আমরা করি না। কিন্তু নিরাশাবাদীদের মতো এ কথাও আমরা বলব না যে, এর দ্বারা কিছুই হবে না। পাকিস্তানেই জিতে গেল।

হারজিতের প্রশ্ন শান্তি আলোচনায় অবান্তর। শান্তি আলোচনার অর্থই হল উভয়পক্ষে আদান-প্রদান, ভুল বোঝাবুঝির অবসান এবং নতুন পথে যাত্রা শুরু। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টকে যে শান্তি আলোচনার জন্য আসতে হয়েছিল তা থেকেই প্রমাণ হয় যে, আগেকার স্টাইলে রাজনীতি করা তাঁর পক্ষেও আর সম্ভব নয়। তবে একটিমাত্র বৈঠকে এতদিনকার পুঞ্জীভূত সমস্যা সমাধান করা সম্ভব নয়। পরে আবার বৈঠক বসবে। উভয়পক্ষের সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে আলোচনার পর তার সমাধানের চেষ্টা হবে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী গত সপ্তাহে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সিমলা বৈঠকের তাৎপর্য খানিকটা ব্যাখ্যা করেছেন সুস্পষ্ট ভাষায়। এই চুক্তি নিয়ে এদেশে এবং ওদেশে একশ্রেণীর কট্টর রক্ষণশীল লোক নানারকম অপব্যাখ্যা করছে। এতে আমাদের বিচলিত হবার কোনো কারণ নেই। কারণ, ভারতের বৃহৎ জনসমষ্টি সিমলা চুক্তির তাৎপর্য সম্পর্কে সচেতন এবং তাঁরা এই চুক্তিকে কার্যকর করার সুযোগ দিতে প্রস্তুত। ছোটোখাটো বাধা বা অসুবিধা সব চুক্তিতেই থাকে, রাজনৈতিক দূরদর্শিতা এবং বাস্তববুদ্ধি থাকলে বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে তা দূর করা অসম্ভব নয়। এই চুক্তির বড় কথা হল, উভয় দেশের মধ্যে যে সমস্ত বিষয় নিয়ে বিরোধ আছে তা দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করবে। একটা শুধু ব্যতিক্রম, তা হল কাশ্মীর। কাশ্মীর সমস্যাও দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় নিষ্পত্তির কথা উল্লেখ আছে। তবে তা যদি না হয় তাহলে উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে তৃতীয়পক্ষের সাহায্য চাওয়া যেতে পারে। চুক্তির এই ধারা নিয়ে পাকিস্তানের আইনমন্ত্রী জাতীয় পরিষদে যে কথা উল্লেখ করেছেন তার সঙ্গে ভারতের বক্তব্যের মিল নেই। তিনি বলেছেন যে, কাশ্মীর প্রশ্ন রাষ্ট্রসংঘ থেকে তুলে নেওয়া হবে না। পাকিস্তানী আইনমন্ত্রীর এই ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই ভারত মেনে নেবে না। তবে এর ওপর অযথা অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করে দুই দেশের বৃহত্তর স্বার্থ এই মুহূর্তে ক্ষুণ্ণ হতে দেওয়া যায় না। কারণ, পাকিস্তানের রাজনীতিকরা এতকাল যে-ধরনের আশ্বাস দিয়ে জনসাধারণকে বুঝিয়ে এসেছেন হঠাৎ তার উল্টোটা বলা তাঁদের পক্ষে খুব সহজ নয়। কিন্তু যখন বাস্তব অবস্থার মুখোমুখি তাঁরা হবেন তখনই বুঝতে পারবেন যে, কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে রাষ্ট্রসংঘের দরবারে ধর্ণা দিয়ে পড়ে থাকার চেয়ে দুই দেশের নেতাদের মধ্যে আলোচনাই বেশি ফলপ্রদ হবে। আরেকটি বড় প্রশ্ন, পাকিস্তানীদের কাছে, হল যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি। পাকিস্তান এই বন্দীদের ঘরে ফিরিয়ে নেবার জন্য খুবই ব্যাকুল। প্রধানমন্ত্রী সোজা ভাষায় বলেছেন যে, এই উপমহাদেশে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ সুগম না হবার আগে যুদ্ধবন্দীদের ফিরিয়ে দেওয়া হবে না। এই যুদ্ধবন্দীরা হল পাকিস্তানের জঙ্গীবাহিনীর একটা উল্লেখযোগ্য অংশ। এদের পরিবার-পরিজন স্বভাবতই পাকিস্তান সরকারের ওপর খুব চাপ দিচ্ছে। ভারত যদি এখনই ওদের ছেড়ে দেয় তাহলে পাকিস্তানকে কাশ্মীর ব্যাপারে দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় রাজী করানো মুস্কিল হবে। এবং কাশ্মীর ব্যাপারে কোনো সমাধানের সূত্র আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত এই উপমহাদেশে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার আশা সুদূরপরাহত। সুতরাং পাকিস্তানকে চিন্তা করে দেখতে হবে কাশ্মীর সমস্যার জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের কাছেই ধর্ণা দিয়ে পড়ে থাকবে, না দিল্লী ও ইসলামাবাদ হট লাইনেই এই সমস্যার সমাধানের পথ খুলে দেবে। কাশ্মীর ও স্থায়ী শান্তির সম্পর্ক আজ ঘনিষ্ঠ।

পটভূমি

আপাতদৃষ্টিতে ব্যাপারটা হয়ত খুব কম গুরুত্বের এক ধরনের কাঁচা মালের সমস্যা, কিন্তু তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে যে, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে পশ্চিম বাংলার প্রতি নায়বিচারের প্রশ্ন। কাপড়ের কলের তুলো প্রয়োজনীয় তুলোর দাম নিয়ে রাজ্য সরকার বিল্লীতে যে বীভৎসতো দরবার করেছেন তার সাফল্য বা অসাফল্যের মধ্যে দিয়ে এই রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের মনোভাবটাও নতুন করে যাচাই হয়ে যাবে। এ-পর্যন্ত বৈদেশিক বাণিজ্য দপ্তরের মন্ত্রী ললিতনারায়ণ মিশ্র এই প্রশ্ন বিবেচনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এটা প্রধানতঃ তাঁরই দপ্তরের ব্যাপার। শ্রীমিশ্র হয়ত তাঁর কথা রাখার চেষ্টা করবেন। পাটের দাম নিয়ে যার সঙ্গে পশ্চিম বাংলা বিশেষভাবে জড়িত, করণ সেলের শতকরা ৫৫ জন পাটচাষীই এই রাজ্যের অধিবাসী। সম্প্রতি তিনি ইস্পাতের যে মনোভাব দেখিয়েছেন সেটা আশাব্যঞ্জক, কারণ পাটচাষীদের কথা এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কেউই তেমন ভাবেন নি। তবে শ্রীমিশ্র একা চেষ্টা করলেই তুলোর দাম সম্পর্কে সন্তুষ্ট হবে, এটা আশা করা হয়ত ঠিক হবে না। তা হবে না, সেকথায় পরে আসছি।

তার আগে দেখা যাক পশ্চিম বাংলা সরকার কী চাইছেন। তাঁরা চাইছেন, সারা দেশে সব কাপড়ের কল যেন সমান দরে তুলো কিনতে পায়। এই ধরনের দাবির কারণ? কারণ এই যে, সব কাপড়ের কল যদি সমান দরে তুলো কিনতে পায় তবে তারা সমান দামে পাল্লা দিতে পারবে। পশ্চিম বাংলায় মোট কাপড়ের কলের সংখ্যা গোটা চল্লিশ। তাদের চাহিদা মেটাতে হলে যতোটা তুলো দরকার সেই পরিমাণ তুলো রাজ্যের মধ্যে উৎপন্ন হয় না। সুতরাং বলতে গেলে রাজ্যের বাইরে থেকে তুলো আমদানি করে। তুলো উৎপাদনের প্রধান জায়গা আবার সেই সুদূর মহারাষ্ট্র ও গুজরাটে। সেখান থেকে তুলো আনতে গিয়ে রেলের মাশুল লাগে অনেক। তাই পড়তা পড়ে যায় অনেক বেশি। ওদিকে মহারাষ্ট্র ও গুজরাটে যে-সব কাপড়ের কল রয়েছে তাদের কতো সুবিধে দেখুন। ঘরের কাছেই তারা তুলো পাচ্ছে। রেলের বাড়তি মাশুল লাগছে না। তাই কাপড় তৈরির খরচও কমে যাচ্ছে। একেই তো মহারাষ্ট্র-গুজরাটের (এবং তামিলনাড়ুরও) অধিকাংশ কাপড়ের কলের যন্ত্রপাতি হল আধুনিক ধরনের। তার ওপর এই সস্তায় তুলো পাওয়ায় তাদের সঙ্গে পাল্লায় পশ্চিম বাংলার কলগুলো এঁটে উঠতে পারছে না। এখন কেন্দ্রীয় সরকার যদি সারা দেশে এক দরে তুলো পাওয়ার ব্যবস্থা করেন তবে এই রাজ্যের কাপড়ের কলের মালিকেরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন।

মনে হতে পারে, এটা পশ্চিম বাংলার একটা অন্যায় আবদার। কেন্দ্রীয় সরকারের কেন্দ্রীয়রা বলতে পারেন যে, তোমাদের রাজ্যে তোমরা যেহেতু তুলো ফলাতে পারো না তার জন্যে আমরা কী করব? তুলোর মূল্য বাড়িয়ে এই কাম্মীরা মিটিয়ে ফেলাই কি ভালো নয়? কিন্তু সোজাসুজি এমন কথা বলবেন, কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে তার পথ বন্ধ। কারণ ইস্পাত ও কয়লা সম্পর্কে তাঁরা যে নীতি চালু করেছেন তার কথা মনে রাখলে পশ্চিম বাংলার দাবির মধ্যে অন্যায় কিছুই নেই।

তুলো যেমন সব রাজ্যে সমান হারে ফলে না, ইস্পাতও তেমনিই দেশের সর্বত্র তৈরি হয় না কয়লাও সর্বত্র পাওয়া যায় না। ভৌগোলিক কারণেই কয়লা উৎপাদন ও ইস্পাত তৈরির প্রধান কেন্দ্র পূর্ব-ভারতে। সুতরাং তুলোর ব্যাপারে মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের যে সুবিধে রয়েছে ইস্পাত বা কয়লার ব্যাপারে পশ্চিম বাংলার (এবং বিহার বা ওড়িশার) সেই সুবিধে রয়েছে। কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার পর কয়েক পঞ্চম পরে দাবি ওঠে কয়লা ও ইস্পাত কল-কারখানার পক্ষে খুবই দরকারি, সুতরাং পূর্ব-ভারতে ঐ দুটি জিনিস সুবিধে দরে পাওয়া যায় বলে পশ্চিম বাংলায় (ও বিহারে) অনেক কল-কারখানা গড়ে উঠতে পেরেছে সহজেই। কিন্তু দেশের সর্বত্র যদি কল-কারখানার প্রসার ঘটাতে হয় তবে সব জায়গাতেই যাতে সমান দরে ইস্পাত ও কয়লা পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা হওয়া দরকার।

এই দাবি ওঠায় তৎকালীন অর্থমন্ত্রী টি টি কৃষ্ণমাচারির মন গলে গেল। তিনি এই ব্যবস্থা করে দিলেন। কথায় বলে কারো পৌষ মাস কারো সর্বনাশ। এই ব্যবস্থার ফলে পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের কল-কারখানার সুবিধে হলো ঠিকই, কিন্তু সেই সঙ্গে পশ্চিম বাংলায় শিল্পপ্রসারের পথে বিরাট একটা বাধা খাড়া করে দেওয়া হলো। কারণ এতদিন পর্যন্ত এই রাজ্যে কল-কারখানা স্থাপনের যে স্বাভাবিক সুবিধে ছিল সেটা চলে গেল। ঘরে বসেই যদি পশ্চিম বাংলার মতো একই দরে ইস্পাতের মতো স্বল্পদামি কাঁচা মাল এবং কয়লার মতো জ্বালানি পাওয়া যায় তবে আর শিল্পপতিরা কেন কষ্ট করে 'খোলা মুলুকে' আসতে যাবেন? এই রাজ্যে শিল্পপ্রসারের স্তব্ধতার অনেক কারণ আছে, কিন্তু কৃষ্ণমাচারিজীর এই 'ঐতিহাসিক পদক্ষেপ' যে একটা বড় কারণ সে-বিষয়ে আর সন্দেহ কী?

*

কিন্তু কৃষ্ণমাচারিজীর কল্যাণে শুধু যে পশ্চিম বাংলার স্বাভাবিক সুবিধেটাই চলে গেল তা নয়, বাড়তি বোঝা এসে চাপলো এই রাজ্যের ঘাড়ে। সেই বোঝাটা চাপানো হলো রেলভাড়ার। কী ভাবে এই বোঝা চাপানো হলো তা দেখা যাক। জামশেদপুর থেকে কলকাতায় এক টন ইস্পাত আনতে রেলের মাশুল গোটা তিরিশ টাকার মতো লাগার কথা। কিন্তু কৃষ্ণমাচারির নব্যবস্থার ফলে লাগে ৭৫, টাকার মতো। কেন এই বাড়তি মাশুল দিতে হচ্ছে পশ্চিম বাংলাকে? দিতে হচ্ছে তার কারণ, পশ্চিম বাংলার ক্রেতারা এই বাড়তি মাশুল না-দিলে দেশের অন্যান্য প্রান্তের ক্রেতারা এক দরে ইস্পাত পাবেন না। জামশেদপুর থেকে বোম্বাইয়ে এক টন ইস্পাত পাঠাতে গেলে মাশুল লাগার কথা ১২৫, টাকার মতো। কিন্তু বোম্বাইয়ের ক্রেতাকে আসলে ৭৫ টাকার বেশি দিতে হয় না। এই যে রেলের প্রতি টনে ৫০ টাকার মতো ক্ষতি হচ্ছে সেটা তো রেল দপ্তর নিজের পকেট থেকে দেয় না। তাই সেই ক্ষতিটা পূরণ করতে হচ্ছে পশ্চিম বাংলার ঘাড়ে বাড়তি বোঝা চাপিয়ে। এইভাবেই ইস্পাতের দর সারা দেশে সমান করা হয়েছে।

কয়লার ক্ষেত্রেও একই ধরনের ব্যাপার ঘটেছে, অর্থাৎ যতোটা মাশুল লাগা উচিত তার চেয়ে কম মাশুলে রেল দপ্তর পূর্ব-ভারত থেকে দূর দূরান্তে কয়লা পাঠাবার ব্যবস্থা করেছে। যেমন ধরুন, রাণীগঞ্জ থেকে সেই পাঞ্জাবের লুধিয়ানায় এক টন কয়লা পাঠাতে রেল মাশুল লাগছে পঞ্চাশ টাকার মতো। আসলে তার বেশি লাগাই উচিত। কিন্তু তা লাগছে না। অথচ ঐ একই ওয়াগনে যখন পাঞ্জাব থেকে কলকাতায় তৈল-বীজ আসছে তখন প্রতি টনে মাশুল দিতে

হচ্ছে ১০ টাকার বেশি। আর তুলোর জন্যে রেল মাশুল পড়ছে প্রতি টনে ১৮৫ টাকা।

পশ্চিম বাংলার রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পদপ্তরের মন্ত্রী ডঃ জয়নাল আবেদিন তুলোর দামের প্রসঙ্গে অনেক তথ্যাদি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পেশ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, সুরাটে যে তুলো উৎপন্ন হয় সেই তুলোর প্রতি ক্যান্ডির দাম পড়ে ২৪ টাকা। কলকাতায় ঐ তুলো কিনতে হয় ৭০ টাকা দরে। আমেদাবাদ থেকে যে তুলো আসে বোম্বাইয়ে তার দর ৩৮ টাকা, অথচ কল-কাতায় ৮২ টাকা। প্রতি কুইন্টাল তুলোর জন্যে কলকাতার কাপড়ের কলের মালিকদের বোম্বাই ও আমেদাবাদের তুলনায় বাড়তি রেল মাশুল দিতে হয় যথাক্রমে সাতের টাকা ও সাড়ে আঠারো টাকার মতো। এই রাজ্যের কাপড়ের কলগুলিতে বছরে প্রায় সাড়ে পাঁচ লাখ কুইন্টালের মতো তুলো লাগে। এর বেশির ভাগটাই রাজ্যের বাইরে থেকে আমদানি-করা। সুতরাং বাড়তি রেল মাশুল বাবদ যে কতো টাকা খরচ হয় সেটা অনুমান করা দুঃসাধ্য ব্যাপার নয়।

পশ্চিম বাংলার কাপড়ের কলগুলি নানা সমস্যায় পীড়িত। তার অধিকাংশেরই যন্ত্র-পাতি ন্যাশনাল আমলের। মিহি কাপড় অথবা চটকদার পোষাকের কাপড় তৈরির ক্ষমতা তাদের নেই। তাই মোটা কাপড় তৈরির ওপরই ভরসা। তাদের মোটা কাপড়ের দাম সরকার কর্তৃক নির্ন্ত্রিত। তাই দাম বাড়িয়ে পড়তা পোষাবার পথও বন্ধ। বেশ কয়েকটি কাপড়ের কল যে পঙ্গু হয়ে পড়েছে তার এইসব কারণ তো আছেই, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তুলোর চড়া দাম।

এই অবস্থায় সিদ্ধার্থশংকর রায় ও ডঃ জয়নাল আবেদিন যদি তুলোর দামের প্রশ্নটি কেন্দ্রীয় সরকারের নজরে এনে থাকেন তবে অন্যায় কিছুই করেন নি। তবে কেন্দ্রীয় সরকার এই দাবি মানবেন কিনা সেটাই হলো প্রশ্ন। ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে একটা উদ্ভট যুক্তি খাড়া করা হয়েছে বলে শোনা যাচ্ছে। সেটা হলো, মহারাষ্ট্র ও গুজরাট থেকে পশ্চিম বাংলাকে চড়া দরে তুলো কিনতে হচ্ছে বটে, তবে ঐ দুটি রাজ্য থেকে তৈরি কাপড় অপেক্ষাকৃত সুবিধে দরে পশ্চিম বাংলায় চালান করা হচ্ছে তো, সুতরাং পশ্চিম বাংলার খুশি থাকা উচিত। এই যুক্তি মেনে নিলে তো এই রাজ্যে কাপড় তৈরি বন্ধ করে দিলেই হয়, কারণ তা হলে বোম্বাই ও আমেদাবাদের কাপড়ের কলের মালিকরা অনায়াসেই পশ্চিম বাংলার কাপড়ের বাজারটা পুরোপুরি দখল করতে পারবে। দ্বিতীয় কথা হলো তুলোর ক্ষেত্রে যদি এই যুক্তি মানতে হয় তবে তো ইস্পাত অথবা কয়লার ক্ষেত্রেও এই যুক্তি খাটা উচিত। অর্থাৎ শুধু পূর্বাঞ্চলে কল-কারখানা থাকলে তারাই তো অন্যান্য রাজ্যের চাহিদাও মেটাতে পারত। কিন্তু তখন সেই যুক্তি না-দেখিয়ে বরং বলা হয়েছিল গোটা দেশেই কল-কারখানার প্রসার দরকার।

কেন্দ্রীয় সরকারের অনেক মহলে এই ধরনের মনোভাব আছে বলেই পশ্চিম বাংলার ন্যায্য দাবির স্থান শেষ পর্যন্ত কী হবে বলা মুস্কিল। সারা দেশে তুলোর দাম সমান করার প্রশ্নে সবচেয়ে বড় বাধা আসবে মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের কাছ থেকে এবং অংশতঃ পাঞ্জাব ও হরিয়ানার কাছ থেকে। কারণ এই ব্যবস্থা চালু হলে, হলে ঐসব রাজ্যে তুলোর দর বেড়ে যাবে, ফলে সেখানে কাপড়ের কলগুলি বাড়তি খরচের মুখে গিয়ে পড়বে। মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের স্বার্থ দেখার মতো প্রভাবশালী লোক দিল্লীতে যথেষ্টই আছে, যেমন আছে পাঞ্জাব-হরিয়ানার গমচাষীদের স্বার্থ দেখার লোক। সরকার চাষীদের কাছ থেকে যে-দামে গম কেনেন সেটা সামান্য কমাবার যখন কথা হলো তখন 'গেল গেল' রব উঠলো। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় এই প্রস্তাব যখন এলো তখন পাঞ্জাবের মুখপাত্র এমনই বেঁকে বসলেন যে, দাম কমানো গেল না। গমের দাম কমাবার নাকসলাত করণ ছিল, তবু কমানো গেল না। তুলোর দর সম্পর্কে পশ্চিম বাংলার নালিশ যখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে উঠবে তখন এই রাজ্যের হয়ে কথা বলবার কেউ থাকবে না, অথচ মহারাষ্ট্র ও গুজ-রাটের মুখপাত্রের অভাব নেই।

কিন্তু তবু দিল্লীর উচিত পশ্চিম বাংলার এই দাবিকে নিরপেক্ষভাবে বিচার করে একটা সিদ্ধান্তে আসা। কারণ তা না হলে দিল্লীর বিরুদ্ধে বৈষম্যের অভিযোগ উঠবে। তা ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারও এখন বুঝতে সুরু করেছেন যে, এতদিন তাঁরা যে-ধরনের মূল্য নীতি অনুসরণ করে এসেছেন তাতে পূর্ব ভারতের ক্ষতি হয়েছে। ১৯৭১-৭২ সালের বৈদেশিক সমীক্ষায় সে-কথা স্বীকারও করা হয়েছে। সুতরাং এখন সেই ভুল সংশোধনের একটা সুযোগ দিল্লীর সামনে এসেছে।

১৬।৭।৭২ —দেবব্রত

নারায়ণ সান্যালের সার্থক সৃষ্টি

আবার যদি ইচ্ছা কর

'Prisoner of Zenda' -কে ভারতের ঝিন্দ্ রাজে স্থানান্তরিত করেছিলেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। এই লেখক তাঁর এই সুবৃহৎ উপন্যাসে স্থান-কাল-পাত্রের রূপান্তর ঘটিয়েছেন কোন কাল্পনিক চরিত্রের নয়, বিশ্ববিশ্রুত শিল্পী ভিসেণ্ট ভান গখ্ ও পল গোগ্যাঁর। আকণ্ঠ জীবনতৃষ্ণা নিয়ে মাত্র সাঁইত্রিশ বছর বয়েসে আত্মঘাতী হয়েছিলেন ভান গখ্ ১৮৯০ সালের ২৯শে জুলাই। ঐ তারিখেই এ-কাহিনীর নায়কের জন্ম এই কলকাতায়। প্যারীতে যে অনাদর আর উপেক্ষা জুটেছিল ঐ দুই দিকপাল শিল্পীর অদৃষ্টে, কলকাতায় জন্মালে তা হ'ত না—কি বলেন! এ বই সম্বন্ধে শেষকথা, এ জাতীয় দুঃসাহসিক সচিত্র উপন্যাস বাংলাভাষায় এই-ই প্রথম।

দাম—বারো টাকা

এই লেখকের অন্যান্য বই

অন্তলীনা ৮, তাজের স্বপ্ন ৮, পাষণ্ড পণ্ডিত ৬,

রবীন্দ্র লাইব্রেরী : ১৫/২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ফোন : ৩৪-৮৩৫৬

দেশে বিদেশে

সিমলায় যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে তার কালি শুকোতে না শুকোতেই এই চুক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা সম্পর্কে মহলিক থেকে দু'রকম ব্যাখ্যা শোনা যাচ্ছে।

গত ১০ জুলাই পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অনুমোদনের জন্য এই চুক্তি পেশ করে পাকিস্তানের আইনমন্ত্রী মহম্মদ আলি কাসুরি যে বক্তৃতা দিয়েছেন তাতে তিনি বলেছেন, সিমলা চুক্তির পর পাকিস্তান যে কাশ্মীর প্রশ্নটি রাষ্ট্রসংঘ থেকে তুলে নিয়ে তা নয়।

কিন্তু সিমলা চুক্তির ধারা পর্যালোচনা করে একথাই মনে হয়ে যে, এই চুক্তি সম্পাদিত হয়ে যাওয়ার পর এখন ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বিরোধের কোন প্রশ্নটাই দ্বিপাক্ষিক আলোচনার বাইরে তৃতীয় কোন পক্ষের কাছে নেতে পারে না। চুক্তিতে তাই আছে। চুক্তির ধারায় এমন কোন কথাই নেই যা থেকে এই ব্যাখ্যায় আসা যেতে পারে যে কাশ্মীর প্রশ্নটি তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপের জন্য তুলে ধরা যাবে এবং সেই তৃতীয় পক্ষ বলতে রাষ্ট্রসংঘ বোঝাবে। এই চুক্তিতে পুরাপুরি জোর দেওয়া হয়েছে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার ওপর, যেটা বলতে গেলে এই চুক্তির একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। পাকিস্তানের সঙ্গে বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যাপারে ভারত বরাবরই এই দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করে এসেছে। সিমলা সম্মেলনের একটা বড় সার্থকতা এই যে, সেখানে ভারত তার প্রস্তাবে পাকিস্তানকে রাজি করাতে পেরেছে।

কিন্তু চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যেই পাকিস্তান এ ব্যাপারে ঘোরানো গাইতে আরম্ভ করে দিয়েছে। পাকিস্তান যদি এখনও কাশ্মীর প্রশ্নকে একটা সংশ্লিষ্ট পক্ষ হিসাবে গণ্য করতে চায় তাহলে কাশ্মীর প্রশ্নের মীমাংসার আশা খুবই ক্ষীণ। কেননা, রাষ্ট্রসংঘের হস্তক্ষেপ কাশ্মীর বিরোধের মধ্যে যে জটিলতা এনেছে একমাত্র তা থেকে বেরিয়ে গিয়েই এই বিরোধ মীমাংসার জন্য দুই দেশ নতুন করে চেষ্টা করতে পারে।

আমরা দেখতে পাচ্ছি, দুই কোরিয়ার মধ্যে সম্প্রতি যে যোগাযোগ হয়েছে তাতেও রাষ্ট্রসংঘের প্রস্তাবের আওতা থেকে বেরিয়ে গিয়ে উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়াকে ঐকবদ্ধ করার চেষ্টা হচ্ছে।

কাশ্মীর সম্পর্কে পাকিস্তান সিমলা চুক্তির যে ব্যাখ্যা করছে তার ভুল ধরিয়ে দিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী দেরি করেননি। ১২ জুলাই নয়াদিল্লীতে সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেছেন যে, পাকিস্তান যদি এখনও কাশ্মীর প্রশ্নটিকে রাষ্ট্রসংঘের আলোচ্য বিষয়-তালিকার মধ্যে রাখার জন্য পীড়াপীড়ি করে তাহলে তার সেই দাবির সঙ্গে সিমলা চুক্তির মর্মার্থের যথাযথ সঙ্গতি থাকবে না।

শ্রীমতী গান্ধীর ভাষা সংযত; কিন্তু তাঁর বক্তব্য পরিষ্কার। কাশ্মীর প্রশ্নে পাকিস্তান এখন আর রাষ্ট্রসংঘের দোহাই পাড়তে পারবে না। যদি সে তা করে তাহলে সেটা হবে সিমলা চুক্তির বিরোধী।

আরও একটা কথা, যা এতদিন উহ্য ছিল, সেকথাটা খোলসা করে বলে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী। বাংলাদেশে যে প্রায় ৯০ হাজার পাকিস্তানী সৈন্য আত্মসমর্পণ করেছে তাদের মুক্তিদানের অধিকার একমাত্র ভারতের নয়, বাংলাদেশেরও। তাছাড়া পশ্চিম রণাঙ্গনে আরও হাজার তিনেক পাকিস্তানী সৈন্য বন্দী হয়েছে। তারা অবশ্য ভারতেরই বন্দী, তাদের ব্যাপারে বাংলাদেশের কোন ভূমিকা নেই।

বন্দী মুক্তির ব্যাপারটা যদি শুধুমাত্র পাকিস্তান-বাংলাদেশ সমস্যা হত তাহলে পশ্চিম রণাঙ্গনে ধৃত পাকিস্তানী সৈনিকদের মুক্তির ব্যাপারে বিশেষ কোন জটিলতা থাকত না। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তাঁর সাংবাদিক সম্মেলনে পরিষ্কার করে বলেছেন যে, স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা না দেখা পর্যন্ত ভারত পাকিস্তানী যুদ্ধ-বন্দীদের মুক্তি দেবে না।

এর মানে এই যে, প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলি ভুট্টোর পক্ষে যুদ্ধবন্দীদের ঘাড়ে নিয়ে যাওয়া আদৌ সহজ হবে না। শ্রীমতী গান্ধী যা বলেছেন তার খোলাখুলি অর্থ হল, কাশ্মীর প্রশ্নের একটা মীমাংসার আসতে পাকিস্তানকে বাধ্য করার জন্য ভারত প্রয়োজনমত পাকিস্তানী যুদ্ধ-বন্দীদের আটকে রাখবে। এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, এই ব্যাপারে ভারত বাংলা-দেশের সহায়তা পাবে।

•

পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে সিমলা চুক্তি অনুমোদন করিয়ে নিতে ভুট্টো সাহেবের বিশেষ বেগ পেতে হবে বলে মনে হয় না। পাকিস্তানের প্রধান প্রধান প্রায় সব দলই এই চুক্তি সমর্থন করেছে। কিন্তু চুক্তির বিরুদ্ধে আপত্তিও তোলা হয়েছে কোন কোন মহল থেকে, এমন কি ভুট্টোর নিজের দলের ভিতর থেকেও। যেমন, বলা হয়েছে যে, পাকিস্তান যে হাজার পাঁচেক বর্গমাইল জমি ভারতের কাছ থেকে ফিরে পাবে সেটা ত মরুভূমি মাত্র, আর সে জায়গায় ভারতকে পাকিস্তান যে ৩০ বর্গ-মাইলের মত জমি ছিটমহল হিসেবে দেবে সেটা ভাল, তৈরি জমি। অর্থাৎ, চুক্তির বিরোধী-দের বক্তব্য, এই বিনিময়ে ভারতেরই লাভ।

সিমলা চুক্তির পিছনে পাকিস্তানের জনমতের ব্যাপক সমর্থন যেমন এখন প্রেসিডেন্ট ভুট্টোর রাজনৈতিক ভবিষ্যতের পক্ষে খুবই জরুরী। ঠিক এই সময়েই ভুট্টোর নিজের প্রদেশ সিন্ধুতে তাঁর সরকার বেকায়দায় পড়েছেন। সেখানকার প্রাদেশিক পরিষদে সিন্ধীকে একমাত্র প্রাদেশিক ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে আইন প্রণয়ন করার সঙ্গে সঙ্গেই ঐ অঞ্চলের উর্দুভাষীরা আন্দোলনমুখী হয়ে উঠেছেন। করাচী, হায়দরাবাদ, মিরপুরখাস প্রভৃতি শহরে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়েছে। এই সব দাঙ্গা-হাঙ্গামায় প্রায় ৬০ জন মারা গেছে।

পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে সিমলা চুক্তি অনুমোদনের প্রক্রিয়ায় এই হাঙ্গামা বাধিয়ে তোলার পিছনে ভুট্টো-বিরোধীদের হাত আছে কিনা সেটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না। তবে, এই ধরনের একটা নেপথ্য যোগা-যোগ থাকা আদৌ বিচিত্র নয়।

•

১৯৫৯ সালে কেরালের প্রথম কম্যুনিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে যে সমস্যাসঙ্কুল পরি-স্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল তার সঙ্গে ঐ রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতির কতগুলি সাদৃশ্য দেখা যাচ্ছে।

সেবার কম্যুনিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে যে 'বিমোচন সমর' চালান হয়েছিল তার পুরোভাগে ছিলেন নায়ার সার্ভিস সোসাইটি ও গির্জার নেতৃবৃন্দ। এবারও কেরালের নায়ার ও খৃস্টান সম্প্রদায়ের নেতারা বামপন্থী সরকারের সঙ্গে লড়াইয়ের জন্য তৈরি হচ্ছেন। গতবারও বিরোধের প্রধান ফ্যাক্টরিগুলি ছিল শিক্ষা নিয়ে। কেরালে যারা বেসরকারী কলেজ চালান (তাঁদের মধ্যে নায়ার ও খৃস্টান সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠানগুলিও আছে) তাঁরা সে সময়ে আশঙ্কা করেছিলেন যে, ঐ বিল তাঁদের স্বার্থের ক্ষতি করবে। এবারও বিরোধটা দানা বেঁধে উঠছে বেসরকারী কলেজগুলিকে কেন্দ্র করে।

কেরলে কলা ও বিজ্ঞান বিষয়ে মোট যে ১০৮টি কলেজ আছে তার মধ্যে ১১৬টিই বেসরকারী পরিচালনাধীন। শতকরা ৮৫ জন ছাত্রই এইসব বেসরকারী

কলেজে পড়েন। এই সব কলেজ যাঁরা চালান তাঁদের মধ্যে আছেন নায়ার সার্ভিস সোসাইটি, বিভিন্ন গির্জা, শ্রীগুরু নারায়ণ ধর্ম পরিপালন যোগম (ইঝুরা সম্প্রদায়ের সংস্থা), মুসলিম এডুকেশন সোসাইটি প্রভৃতি।

এই বেসরকারী কলেজগুলিতে পড়ার জন্য ছাত্রদের সরকারী কলেজের তুলনায় বেশি বেতন দিতে হয়। যেমন, আন্ডার-গ্র্যাজুয়েট ক্লাসে সরকারী কলেজগুলিতে ফি-এর হার যেখানে বছরে ১৪৪ টাকা সে-জায়গায় বেসরকারী কলেজগুলির ফি-এর হার ১৪০ টাকা। ছাত্ররা কিছুকাল যাবৎ বেসরকারী কলেজগুলির ফি-এর হার কমাবার জন্য আন্দোলন করছিল। তাছাড়া ঐ সব কলেজের আয়-ব্যয় সম্পর্কেও ছাত্রদের অভিযোগ ছিল।

ছাত্রদের দাবী বিবেচনা করার জন্য কেরল সরকার ১৯৭০ সালে একটি কমিশন গঠন করেন। পদ্মকুমার কমিশন নামে পরিচিত এই সমীক্ষা গোষ্ঠী বিষয়টি সম্পর্কে অনুসন্ধান করে সুপারিশ করেন যে, সরকারী কলেজগুলির ফি-এর হার কিছুটা বাড়িয়ে এবং বেসরকারী কলেজগুলির ফি-এর হার কিছুটা কমিয়ে মাঝামাঝি এক জায়গায় এই দুটি ফি-এর হার এক করে দেওয়া হোক। কমিশন এইসব বেসরকারী কলেজ সম্পর্কে অভিযোগেরও যথার্থতা দেখতে পেয়েছিলেন। যেমন, তাঁরা অনুসন্ধানে জানতে পেরেছিলেন যে, এই কলেজগুলিতে ভর্তি করার জন্য প্রতি ছাত্র পিছু এককালীন ১০০ টাকা থেকে ৫০০০ টাকা পর্যন্ত 'ক্যাপিটেশন ফি' আদায় করা হয়ে থাকে এবং ঐসব কলেজে অধ্যাপকের চাকরি পাওয়ার জন্য প্রত্যেককে ৩০০০ টাকা থেকে ১২০০০ টাকা পর্যন্ত 'দান' করতে হয়।

ইতিমধ্যে বেসরকারী কলেজগুলির অধ্যাপকরা দাবী জানাতে থাকেন যে, সরাসরি সরকার তাঁদের বেতন দিন। রাজ্য সরকারের তরফ থেকে বলা হয়, বেসরকারী কলেজের অধ্যাপকদের সরাসরি বেতন দেওয়ার দায়িত্ব সরকারকে নিতে হলে ঐসব কলেজে ছাত্র ভর্তি ও অধ্যাপক নিয়োগের ব্যাপারেও সরকারের হাত থাকতে হবে। রাজ্য সরকার প্রস্তাব দেন যে, অধ্যাপক নিয়োগের জন্য পরিচালকদের একজন প্রতিনিধি, একজন বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে উপাচার্য কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি এবং রাজ্য সরকারের একজন প্রতিনিধিকে নিয়ে গঠিত কমিটির উপর অধ্যাপক পদের জন্য প্রার্থী বাছাইয়ের ভার দেওয়া হোক। এই কমিটি পর্যায়ক্রমে শূন্য পদের জন্য দুটি করে নাম সুপারিশ করবেন। কলেজ কর্তৃপক্ষ ঐ দুজনের মধ্যে একজনকে নিয়োগ করবেন। ছাত্র ভর্তি সম্পর্কে রাজ্য সরকার প্রস্তাব দেন যে, শতকরা ৮০ জন ছাত্রকে ভর্তি করা হবে ফলাফলের ভিত্তিতে, বাকি শতকরা ২০ জন ছাত্রকে কলেজ কর্তৃপক্ষ নিজেদের বিবেচনা অনুসারে ভর্তি করতে পারবেন।

বেসরকারী কলেজ পরিচালকরা সরকারের এই শর্ত মেনে নিতে রাজি হননি। তাঁরা যুক্তি দেন যে, বেসরকারী কলেজগুলিতে সরকার যে অর্থ সাহায্য দেন সেটার পরিমাণ প্রতি ছাত্রে মাথাপিছু গড়ে মাত্র ২১৩ টাকায় দাঁড়ায়। আর সরকারী কলেজগুলিতে ছাত্র পিছু ব্যয় করা হয় ৬০৭ টাকা। একথাও বলা হয় যে, বেসরকারী কলেজগুলির ব্যাপারে সরকারী হস্তক্ষেপের এই প্রস্তাব সরকারের আসল অভিপ্রায়ের গৌরচন্দ্রিকা। ঐ আসল অভিপ্রায় হচ্ছে সংখ্যালঘুদের নিজস্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার যে অধিকার সংবিধানের দ্বারা স্বীকৃত হয়েছে সেই অধিকার বাতিল করা।

কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠন কেরল ছাত্র ইউনিয়নের একটি সিদ্ধান্তের ফলে বেসরকারী কলেজগুলির পরিচালক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সরকারের সংঘর্ষ তীব্রতর হয়ে ওঠে। পদ্মকুমার কমিশনের সুপারিশের বিরোধিতা করে কেরল ছাত্র ইউনিয়ন বলল, সরকারী কলেজগুলির ছাত্র বেতন বাড়ান চলবে না, বেসরকারী কলেজগুলির ছাত্র বেতন কমিয়ে সরকারী কলেজগুলির সমান স্তরে নিয়ে যেতে হবে। ছাত্র সংগঠন ও যুব কংগ্রেসের চাপে কেরলের কংগ্রেস একই সিদ্ধান্ত করল। আর কংগ্রেসের চাপে কেরলের যুক্তফ্রন্টের সংযোগ কমিটিও স্থির করল যে, বেসরকারী কলেজগুলির ছাত্র বেতনের হার কমিয়ে সরকারী কলেজগুলি বেতনের হারের সমান করতে হবে। বেসরকারী কলেজগুলির পরিচালকরা দাবী করলেন, তাঁদের বেতনের হার কমাতে হলে সরকারকে সেই বাবদ খেসারত দিতে হবে। কেরল ছাত্র ইউনিয়ন, কংগ্রেস ও যুক্তফ্রন্টের সংযোগ কমিটি এই খেসারতের দাবীও প্রত্যাখ্যান করল।

যুক্তফ্রন্টের সংযোগ কমিটির সুপারিশ অনুসারে কেরল সরকার গত ২৬ জুন একটি অর্ডিনান্স জারি করে নির্দেশ দিলেন যে, বেসরকারী কলেজগুলির ছাত্র বেতনের হার কমিয়ে সরকারী কলেজগুলির সমান করতে হবে। বেসরকারী কলেজগুলির পরিচালকরা ঘোষণা করলেন, সরকারী নির্দেশের প্রতিবাদে তাঁরা কৈশিয়ম ছুটির পর কলেজ খুলবেন না। কেরল বিশ্ববিদ্যালয় গ্রীষ্মের ছুটির পর কলেজ খোলার তারিখ কয়েকবার পিছিয়ে দিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশক্রমে কলেজ না খুলেও অনুমোদন কেড়ে নেওয়ার হুমকিও দেওয়া হল।

ইতিমধ্যে বেসরকারী কলেজগুলির পরিচালকদের ঐক্যে ফাটল কিছুটা ধরেছে। কংগ্রেসের নেতা শ্রীআর শঙ্কর এস এন ডি পি যোগম-এর একজন প্রধান। কংগ্রেসের চাপেই হোক, অথবা অন্য যে কোন কারণেই হোক, যোগমের পরিচালনাধীন ১৬টি কলেজ সরকারী নির্দেশ মান্য করে ক্লাস আরম্ভ করেছে। মুসলিম এডুকেশন সোসাইটির কলেজগুলিও খুলেছে। কিন্তু নায়ার সার্ভিস সোসাইটি ও গির্জার কর্তৃপক্ষ রুখে বসেছে। তাঁরা সরকারী শর্তে কিছুতেই কলেজ খুলবেন না। বিশ্ববিদ্যালয় যে শেষ তারিখ নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন তার পরও কেরলের ৮৫টি বেসরকারী কলেজ খোলেনি। কংগ্রেস দাবী করেছে, সরকার হলে সংবিধান সংশোধন করেও অবাধ্য কলেজগুলির পরিচালনাভার সরকারের নিজের হাতে তুলে নিতে হবে। এদিকে নায়ার সার্ভিস সোসাইটি ও গির্জার প্রধানরা বেসরকারী কলেজগুলির প্রশ্নে সরকারের সঙ্গে সম্মুখ সমরে নামার জন্য তৈরি হচ্ছেন। তাঁরা বিরোধী দল কেরল কংগ্রেসের সমর্থন পাচ্ছেন। যুক্তফ্রন্ট সরকারের অন্যতম শরিক মুসলিম লীগও বেসরকারী কলেজগুলিতে সরকারী হস্তক্ষেপের ব্যাপারে উৎসাহী নয়।

নায়ার সার্ভিস সোসাইটি ইতিমধ্যে ১৯৫৯ সালের মত 'বিমোচন সমরম'-এর আহ্বান জানিয়েছে। সরকারী আক্রমণ থেকে বেসরকারী কলেজগুলিকে রক্ষা করার জন্য প্রাইভেট কলেজ ম্যানেজমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তুলছেন। অর্থাৎ ১৯৫৯ সালের রাজনৈতিক আবহাওয়া যেন ফিরে আসছে। বড় তফাৎ এই যে, সেদিন বেসব শক্তির সাহায্য নিয়ে কংগ্রেস কম্যুনিস্ট সরকারকে উৎখাত করেছিল সেইসব শক্তির একাংশ এবার কংগ্রেসের বিরুদ্ধে গেছে এবং কংগ্রেস ও কম্যুনিস্ট পার্টি এবার একই নৌকার যাত্রী।

•

সাত বছরের অধিকাল জাপানের প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত থেকে সাইসাকু সাতো পদত্যাগ করেছেন। ইদানীংকালে আর কেউ তাঁর মত এত দীর্ঘকাল জাপানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন না। তিনি কথা দিয়েছিলেন, তিনি 'হাসাশিচি' (কুসুমোদ্যানীয় পথের) উপর দিয়ে বিদায় নেবেন। তাঁর সেই কথা তিনি পুরোপুরি রাখতে পারেননি। বিদায় নেওয়ার আগে

তিনি অবশ্যই কিছু কৃতিত্বের নিজের ঝোলে গেছেন যেগুলির জন্য দেশের মানুষ তাঁকে স্মরণ করবে। যেমন, তাঁর আমলে জাপান বৈষয়িক সমৃদ্ধির চূড়ায় উঠেছে, তাঁর আমলে ওকিনাওয়া দ্বীপপুঞ্জে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিকার থেকে জাপানের অধিকারে ফিরে এসেছে, তাঁর আমলে জাপানের সঙ্গে পশ্চিম জার্মানির কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু বিদায় নেওয়ার আগে তাঁকে এমন কি তাঁর স্বদলের কাছ থেকেও এই অভিযোগ শুনতে হয়েছে যে, তিনি জাপানকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পদানত করে দিয়ে গিয়েছেন। তাঁর আমলে চীনের সঙ্গে জাপানের স্বাভাবিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য কিছুই করা হয়নি বা করা যায়নি, এটাও সাতো সরকারের একটা বড় ব্যর্থতা।

সাতো চেয়েছিলেন তাঁর স্বদেশবাসীর হবেন তিনি তিনি আমেরিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখার নীতি অনুসরণ করে যাবেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর মাঁগ্রসভার অন্যতম সদস্য পররাষ্ট্র মন্ত্রী ফুকুদাকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছিলেন।

কিন্তু লিবারেল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি নেতার সেই ইচ্ছার প্রতি সম্মান না দেখিয়ে আন্তর্জাতিক বামপন্থী কাজুই তানাকাকে প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসিয়েছে। তানাকা যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এসেছেন সেগুলির মধ্যে একটি হল, চীনের সঙ্গে জাপানের সম্পর্কের উন্নতি করার জন্য তিনি উদ্যোগী হবেন। ইতিমধ্যেই তানাকা এবিষয়ে অগ্রসর হয়েছেন বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে।

১০।৭।৭২ —পুণ্ডরীক

ভবানী সেন পরলোকে

প্রথম সারির কমিউনিস্ট নেতা শ্রীভবানী সেন বুলগেরিয়ায় গিয়েছিলেন ডিমিট্রভের ৯০তম জন্মবার্ষিকীতে যোগদান করতে। ফেরার পথে মস্কোয় জানেন: এবং গত ১০ জুলাই তিনি সেখানেই মারা গেছেন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে।

ভারতে, বিশেষ করে বাংলাদেশে, কৃষক আন্দোলনের তিনি ছিলেন অন্যতম পরিচালক ও নেতা। দীর্ঘকাল কিষাণ সভার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ১৯৪৬ সালে যে তেভাগা আন্দোলন, তাও হয়েছিল তাঁরই নেতৃত্বে। ১৯৭০ সালে তিনি সারা ভারত কিষাণ সভার সভাপতি নির্বাচিত হন।

১৯০৯ সালে তাঁর জন্ম হয়, অবিভক্ত বাংলার যশোরে। কিশোর বয়সেই তিনি বৈপ্লবিক আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হন। যৌবনে তিনি দীর্ঘকাল কাটিয়েছেন ডেটিনিউ হিসেবে। সেই সময়েই কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন।

এর জন্যে তাঁকে অনেক ঝুঁকি নিতে হয়েছিল। দু'দুবার তিনি আত্মগোপন করে পার্টির নেতৃত্ব দিয়েছেন। প্রথমবার ১৯৪০ থেকে ১৯৪২ সালে। দ্বিতীয়বার ১৯৪৮ থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত—এই তিন বছর।

চীন-ভারত যুদ্ধের সময়, কমিউনিস্ট পার্টি বিভক্ত হয়ে গেলে, ভবানী সেন সি পি আইয়ের রাজ্য শাখার সম্পাদক নির্বাচিত হন। অবশ্য, তার আগেই তিনি পলিট ব্যুরোর সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন ১৯৪৮ সালে।

ভারতবর্ষে কমিউনিজমের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও তিনি ছিলেন অন্যতম তাত্ত্বিক ও ব্যাখ্যাতা। মার্কসীয় দর্শনে তাঁর পাণ্ডিত্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করেছে। ভারতে কৃষিসংস্কার বিষয়ে শ্রীসেনের নির্দেশিত পথ, মার্কসীয় তত্ত্বনির্ভর। এই অনুন্নত দেশে তার প্রয়োগ হবে সুফলপ্রসূ।

গত ১০ জুলাই তাঁর মরদেহ মস্কো থেকে দিল্লী হয়ে কলকাতায় আনা হয় বিমানযোগে। সঙ্গে ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান এস এ ডাঙ্গে। ১৪ জুলাই তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর।

CENTRAL LIBRARY

আমার জীবন
নবীনচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ গদ্য রচনা

শান্তি চট্টোপাধ্যায়

নবীনচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ তাঁর আত্মজীবনী 'আমার জীবন'। নবীনচন্দ্র সেন মহাকাব্যধারায় মধুসূদনের অনুবর্তী একজন কবিরূপেই সাহিত্যপাঠক ও সমালোচক মহলে পরিচিত। একথা হয়ত অনেকেরই জানা নেই যে, নবীনচন্দ্র ছিলেন একজন তুলনা গদ্যশিল্পী। নবীনচন্দ্রের কাব্যালোচনা প্রসঙ্গে বহু আধুনিক সমালোচক তাঁর আবেগ উচ্ছ্বাসের প্রাধান্য ও প্রাবল্য, শিল্পচাতুর্যের অভাব ইত্যাদি ত্রুটি প্রদর্শন করে থাকেন। তাঁর গদ্য রচনায় এ জাতীয় ত্রুটিবিচ্যুতি হ্রাস পেয়েছে মাত্রই নয়, গদ্য লিখতে নবীনচন্দ্র যখনই কলম ধরেছেন তখনই দেখি, একদিকে তিনি হয়ে উঠলেন বঙ্কিমচন্দ্রের যথার্থ উত্তরসাধক ও রবীন্দ্রনাথের যোগ্য পূর্বসূরী। তাঁর 'প্রবাসের পত্র' বইটির তুলনা একমাত্র রবীন্দ্রসাহিত্যেই মেলে। অথচ নবীন সমালোচকেরা অনেকেই হেম-নবীনের কাব্য-কলার ছিদ্রান্বেষণে সমস্ত মনোযোগ নিবিষ্ট করে একপ্রকার ঔদাসিন্যতায় আক্রান্ত হয়েই তাঁদের সমগ্র সাহিত্যকৃতির যথাযথ মূল্যায়ন করছি না। তাই আজও বাংলা-সাহিত্যের কয়েকজন মাত্র পাঠক, সমালোচকই ওয়াকিফহাল আছেন যে, নবীনচন্দ্র ছিলেন ঊনবিংশ শতকের একজন বিজ্ঞ; নিপুণ, রসিক গদ্যসাহিত্যিক—যাঁর সঙ্গে সে যুগে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথেরই তুলনা হতে পারতো। নবীনচন্দ্রের অন্যতম গদ্যগ্রন্থ 'আমার জীবন' প্রসঙ্গে সমালোচক ও অধ্যাপক শ্রীপ্রমথ বিশীর মন্তব্য উল্লেখ-যোগ্য,—

> নবীন সেনের সবচেয়ে সুখপাঠ্য গ্রন্থ কাব্য নয়, পঞ্চখণ্ডে সমাপ্ত 'আমার জীবন'.....শ্রেষ্ঠ গ্রন্থসমূহ একাধারে চিত্তাকর্ষক ও চিন্তাকর্ষক। 'আমার জীবন' চিত্তাকর্ষক তাহা শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের খসড়া। এইসব কারণে তাহা বাংলা সাহিত্যের একখানি স্মরণীয় গ্রন্থ এবং নবীন সেনের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলিয়া আমার ধারণা।
>
> —চিত্র চরিত্র, পৃঃ ১৬।

যথার্থই নবীনচন্দ্রের 'আমার জীবন' একটি চিত্তাকর্ষক, তথ্যসমৃদ্ধ, সাহিত্য গুণ-সম্পন্ন জীবনীগ্রন্থ। নবীনচন্দ্রের অন্যতম গ্রন্থ পত্রসাহিত্য 'প্রবাসের পত্র' সম্পর্কেও এ মত সমভাবে প্রযোজ্য।

নবীনচন্দ্রের সমগ্র গদ্যরচনাবলীর মধ্যে আছে 'ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও কবি নবীন-চন্দ্রের বহুলায়তন আত্মজীবনী পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত 'আমার জীবন,' 'প্রবাসের পত্র,' 'ভানুমতী'—গদ্যে পদ্যে লেখা উপন্যাস এবং শ্রীশ্রীমার্কণ্ডেয়চণ্ডীর বঙ্গানুবাদ, নবরচিত গদ্যে 'আভাষ' সংক্ষিপ্তসার। তার মধ্যে 'আমার জীবন' শ্রেষ্ঠ।

(২)

বাংলাসাহিত্যের আত্মজীবনী শাখায় নবীনচন্দ্রের 'আমার জীবন' একটি উল্লেখ-যোগ্য আত্মজীবনী। চর্যাপদের যুগ থেকেই বাংলাসাহিত্যে ভনিতা বা অন্য আকারে কবিরা আত্মপরিচয় দান করেছেন। আধুনিক যুগের সূত্রপাত থেকেই ক্ষুদ্র বৃহদায়তন আত্মজীবনচরিত রচনার অকৃত্র প্রয়াস লক্ষণীয়। রামমোহন,[১] দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী সেকালের বহু গুণীজ্ঞানী ব্যক্তি আত্মজীবনী রচনা করে গেছেন। নবীন পরবর্তী কবিদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' ও 'ছেলেবেলা' উৎকৃষ্ট সাহিত্যের পর্যায়ে পৌঁছেছে। এ সমস্ত আত্মজীবনী গ্রন্থের মধ্যে নবীনচন্দ্রের 'আমার জীবন' অনেক বিপুল ও পরিপূর্ণ রচনা।

নবীনচন্দ্র দীর্ঘকাল ধরে লিখেছেন এই পাঁচখণ্ড 'আমার জীবন,' আনুমানিক ১৮৯৩।৯৪ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থরচনা আরম্ভ হয়। তখন তাঁর মধ্য বয়স। ২।

আমরা অনুমান করি, রচনাকাল অন্তত রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কবিতা 'প্রকাশের পর। 'আমার জীবন' প্রথমভাগে 'নৌযাত্রা' অধ্যায়ে 'রবিবারে' 'সোনার তরী'র উল্লেখ আছে। দ্বিতীয়ভাগের পাণ্ডুলিপিতে তারিখ আছে—৩রা মার্চ ১৯০০ খৃষ্টাব্দ। ১৯০১ থেকে ১৯০৫র মধ্যে রচিত হয় 'আমার জীবন' তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগ। কবি চতুর্থ ভাগ লেখা শেষ হবার পূর্বেই কবি সরকারী কর্ম থেকে অবসর নিয়েছেন।

> আমি আজ পেনসন লইয়া বঙ্গদেশের পূর্ব প্রান্ত হতে চট্টগ্রাম জেলার পূর্বপ্রান্তে একটি পল্লীগ্রামের শান্তিছায়ায় একটি মনোরম কুটীরে বসিয়া এই মাদ্রোজিয়া মহাকাব্য ও কলিকাতা বঙ্গদর্শন রচনা করিতেছি।
>
> নবীনচন্দ্র রচনাবলী—৩।১৬০
> (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সং)

১৯০৪ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে কর্ম থেকে অবসর গ্রহণের কয়েকমাস পরেই পুত্রের কর্মস্থলে রেঙ্গুনে যান। অতএব উপরোক্ত ১৯০৪ খৃষ্টাব্দেই চতুর্থ ভাগ গ্রন্থ রচনা শেষ হয়। পঞ্চম ভাগের পাণ্ডুলিপির তারিখ '১৮ই আগষ্ট ১৯০৫'। 'রৈবতক-কুরুক্ষেত্র প্রভাস' এই মহাকাব্য ত্রয়ী রচনার কাল হয়েছিল—'চতুর্দশ বৎসর।' সেদিক থেকে যে মহা-কাব্যকল্প আত্মজীবনী লেখা হল তার জন্যও সময় লেগেছে দীর্ঘ বারো তের বৎসর।

'আমার জীবনের প্রকাশকাল প্রথম ভাগ ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে কবির জীবদ্দশায়, অবশিষ্ট ভাগগুলি তাঁর দেহাবসানের পর ৩ যথাক্রমে ১৯০৯, ১৯১০, ১৯১২, ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে।

(৩)

নবীনচন্দ্রের 'আমার জীবন' বাংলা সাহিত্যের আত্মজীবনী শাখায় একক উদাহরণ হয়ে আছে। গ্রন্থটি আকারে বৃহৎ ও তথ্য-সম্ভারে সমৃদ্ধ; বিচিত্র মনোরম। কবির জন্ম-লগ্ন থেকে মৃত্যুর চার বৎসর পূর্বে ঘটনা-বলী এতে বর্ণিত। বিপুল প্রসর, এই আত্ম-

---

১। রামমোহনের আত্মজীবনী তাঁর দ্বারাই রচিত কিনা এসম্পর্কে অনেকে সন্দেহ পোষণ করেন।

২। শ্রীসজনীকান্ত দাস—নবীনচন্দ্র রচনা-বলীর প্রথমভাগের ভূমিকায় এ মত প্রকাশ করেছেন।

৩। কবি ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে মহকুমাশাসক ত্যাগ করেন।

জীবনীর পটভূমি এক সম্পূর্ণ যুগ, এক পূর্ণাঙ্গ সমাজ। বঙ্গ ইতিহাসের এক স্বর্ণ-যুগ—নবজাগরণের যুগে এর কালসীমার পরিধি বিস্তৃত। আত্মকাহিনী রচনার সঙ্গে সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে নবীনচন্দ্র সেই সন্ধি-শীল যুগকে, নবজাগ্রত জাতির আদর্শগত দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়ের অভীপ্সাকে রূপ দিয়েছেন। তুলে ধরেছেন সে যুগের সামাজিক পরিবেশ, রাজনৈতিক অবস্থা ও ধর্মীয় আন্দোলনের ছবি। সমান আগ্রহে বর্ণিত হয়েছে সমুদ্র মেহলা, ভূ-প্রকৃতির চট্টলার নৈসর্গিক সৌন্দর্য ও সমসাময়িক ইংরেজ শাসনের দোষ ত্রুটি অনাচার অক্ষমতা। এ কারণেই বলা হয়ে থাকে—

—তৎকালীন সামাজিক দলিল হিসাবে ঐ গ্রন্থ স্মরণীয়।' ৪

স্বরূপত এটি মহাকাব্যের সঙ্গে তুলনীয়। গ্রন্থটির অন্তরঙ্গ চরিত্র ও বহিরঙ্গ রূপে বহুকা-বর্ণিত বিস্তারই এর বৈশিষ্ট্য। 'কালা বিড়ালের' ভূমিকায় প্রমথ বিশী লিখেছেন,—

> নবীনচন্দ্র যদি মধুসূদনকে অনুকরণ করিয়া কাব্য না লিখিয়া বঙ্কিমচন্দ্রকে অনুসরণ করিয়া উপন্যাস লিখিতেন হয়ত তাহার কীর্তি সময়ের বিচারে অনেক টেকসই হইত।

সবুজ পত্রের জনৈক লিখলেন,—

> এই বইখানি সেনমহাশয়ের জীবন চরিত হইলেও একখানি নভেল বিশেষ। আর সেন মহাশয় হচ্ছেন এ নভেলের একমাত্র নায়ক।

প্রাচীন যুগের মহাকাব্যের স্থান গ্রহণ করেছে উপন্যাস—

> The Novel is the Epic form of our modern bourgeois society — Ralph Fox

এর মতো আমরা সকলেই এই মত পোষণ করি। নবীনচন্দ্র নবাবঙ্গের মহাকাব্য রচয়িতা। বঙ্কিম-কথিত

> 'The Mahabharata of the nineteenth century'.

তাঁর 'কাব্য ত্রয়ী' না 'আমার জীবন?' 'আমার জীবনেই' নবীনচন্দ্র সাহিত্যরস পরিবেশন করলেন—স্বাদু স্বাদু পদে পদে।

উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের কলকাতা, কেশবচন্দ্রের প্রভাব প্রতিপত্তি, দালাদিহারী দে এবং কেশবচন্দ্রের মতবিরোধ, ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্বিরোধ, সনাতনী হিন্দু ধর্মান্দোলন, অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতিপত্তি ও প্রভাব, জাতীয় কংগ্রেসের বলাবলি, চট্টগ্রাম চা-বাগানের মোকদ্দমার সজীব বর্ণনা পাই 'আমার জীবনে'। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্যারীচরণ সরকার, কৃষ্ণদাস পাল, দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র সঞ্জীবচন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, হেমচন্দ্র, ভূদেব শিশিরকুমার ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ, হীরেন্দ্রনাথ, সার গুরুদাস ইত্যাদি সে যুগের খ্যাতনামা গুণী, স্বদেশহিতৈষী বহুব্যক্তি সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত অনুদ্ঘাটিত বহু মূল্যবান তথ্যের আকর এই বিপুলায়তন জীবনী গ্রন্থটি।

(৪)

'আমার জীবন' একটি মূল্যবান সামাজিক দলিল হলেও নীরস ও তথ্যকণ্টকিত জীবনী-গ্রন্থ নয়। বাস্তব জীবন ও চরিত্র যথাযথ ভাবে রূপায়িত হয়ে হাস্য ও লেখকের পরিহাসরস বাগ্‌ভঙ্গীর গুণে অনবদ্য। এখানে 'আমার জীবন' দ্বিতীয়ভাগ থেকে নড়াইলের জমিদার গৃহশিক্ষক নিয়োগের প্রহসনটি উদ্ধৃত হল,—

শেষে অনেক শিষ্টাচারবহির্ভূত দাপ-কিতারের পর একটা বেতন স্থির হইল তিনি বলিলেন, কিন্তু আমার পোলারে তিনটি কথা শিখাইতে পারিবে না। (১) আমাদের দেবদেবীগুলিন মাটি ও খড়ের পুতুল। (২) আমি মরিয়া গেলে মরা গরু ঘাস খায় না বলিয়া আমার শ্রাদ্ধ না করা। (৩) আর আমার পূর্ব পুরুষেরা বলিয়া গিয়াছে পৃথিবী তিনকুলে, তুমি গোল বলিয়া শিক্ষা দিয়া না। শিক্ষক তাহাই করিলেন। শিক্ষক যদিও ছাত্রকে নিয়মিতরূপে ভূগোল শিক্ষা দিতেছিলেন, কিন্তু তাহার পিতা উপরোক্ত তিন বিষয়ে প্রশ্ন করিলে কিরূপ সদুত্তর দিতে হইবে, তাহা তালিম দিয়া রাখিয়াছিলেন। জমিদার মহাশয় মধ্যে মধ্যে তাহার পরীক্ষা লইতেন।

প্র। কহ দিনি আমাদের দেবদেবীগুলিন কি?

উ। দেবদেবীগুলিন মাটি ও খড় নহে।

প্র। মরা গরু ঘাস খায় কিনা?

উ। খায়।

প্র। পৃথিবী কিরূপ?

উ। তিনকুলে।

—নবীনচন্দ্র রচনাবলী (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সং) ১।২৭১

কোথাও বিহারের দেহাতের স্নিগ্ধ সজীব জীবনছবি। লেখকের রসসৃষ্টির আলোকে উদ্ভাসিত—

> আম্রকাননে অর্দ্ধলুক্কায়িত গ্রাম, গ্রামে গৃহের উপর গৃহ, তাহার উপর গৃহ। গৃহাবলী মৃন্ময়, পরন্তু প্রাচীরের উপর খাপড়া ও খড়।.....গ্রামখানি একটি ক্ষুদ্র জগৎ। ইহাতে গ্রামবাসীর প্রয়োজনীয় সকলই আছে। সূত্রধর আছে, চর্মকার আছে, ধোপা, নাপিত কুমার কাচারিতে জল তুলিবার কাঁধু এবং ধাত্রী পর্যন্ত আছে। এমনকি প্রত্যেক গ্রামে এক একটি ডাকিনী পর্যন্ত আছে। কাহারও ছেলে মারা গেলে তাহারই নাম বলিয়া স্থিরীকৃত হয়, ও তখন তাহাকে সময় সময় বড়ই লাঞ্ছিত হইতে হয়। ন, র, ১।৩০৯

শান্তিপুরের রাস, ঘোষপাড়ার মেলা, সাহিত্য তীর্থ ফুলিয়া, হালিশহর, হরিদাসের পাট, কাঁচড়াপাড়ায় ঈশ্বর গুপ্তের পৈতৃক ভিটার বর্ণনা যুগপৎ উপভোগ্য ও মূল্যবান।

ইতিহাস ও তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব আলোচনায় নবীনচন্দ্রের আগ্রহ ছিল সহজাত। সঙ্গেই এসেছেন কোন ইতিহাস বা পুরাণ প্রসিদ্ধ স্থানে অত্যন্ত আন্তরিকভাবে জাতির যথার্থ ইতিহাসকে আবিষ্কার করতে চেয়েছেন। বিহার, বুদ্ধগয়া, নালন্দা, মথুরা, বৃন্দাবন প্রয়াগ তথ্যভারাক্রান্ত ভৌগোলিক বা ঐতিহাসিক বিবরণ মাত্রে পর্যবসিত হয়নি। কবির অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি অতীত ও বর্তমানকে এক করে উদ্ঘাটন করেছে এদের সম্পূর্ণ পরিচয়টিকে।

সুতরাং পাঁচখণ্ড 'আমার জীবন' পড়া শেষ হলে উপলব্ধি করি যে, এটি ব্যক্তি-বিশেষের ক্ষুদ্র অসম্পূর্ণ জীবনেতিহাস মাত্র নয়, এর মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে রচিত হয়েছে বিস্তৃত এক যুগ, এক বিশাল মানব গোষ্ঠীর আত্মবিকাশের, আত্মপ্রতিষ্ঠার ইতিহাস।

নবীনচন্দ্রের 'আমার জীবন' তাঁর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য কীর্তি। পূর্ণাঙ্গ একটি গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা করলেই তার পূর্ণ পরিচয় দেওয়া সম্ভব। ক্ষুদ্রায়তন প্রবন্ধে তার যথার্থ মূল্যায়ন হয় না। কিন্তু নবীনচন্দ্রের সমকালীন পাঠক,সমালোচকের কাছে গ্রন্থটি আদৌ সমাদৃত হয়নি। এর কারণ তিনটি। প্রথমতঃ 'পলাশীর যুদ্ধ', 'রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাসের' বহিরিতা কবির অসামান্য জনপ্রিয়তার পর হয়ত পরে লেখা এ গ্রন্থটি পাঠকদের পছন্দসই হয় নি। দ্বিতীয়তঃ, এখানে নবীনচন্দ্রের 'গ্রেট আমি'—ও তাঁর আত্মগরিমা প্রচার অনেকের কাছেই আপত্তিজনক ঠেকেছে। তৃতীয়তঃ তাঁর পরিচিত সে যুগের বহু গুণী জ্ঞানী ব্যক্তির ত্রুটি-পতনের ইতিহাস তুলে ধরেছেন নির্দ্বিধায়। অভিযুক্ত ব্যক্তি ও তাঁর ভক্তবৃন্দ কুপিত হয়ে অনায়াসে বিস্মৃত হয়েছেন নবীনচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যসৃষ্টিকে। 'মূল্যবান সামাজিক দলিলটি' কাল কবলিত হোক এই হয়ত ছিল তাঁদের অভিপ্রায়।

পরবর্তীকালের কিছু সমালোচকের অনুসন্ধানী দৃষ্টি বিস্মৃতির কবলীক স্তূপ থেকে আবিষ্কার করেছে 'আমার জীবন'কে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর মহাভারতের বেদব্যাসের সুরচিত যথার্থ মহাকাব্যটির সমগ্র পরিচয় এখনও অনুদ্ঘাটিত। আমরা অপেক্ষা করে থাকব সেই দিনটির জন্য যেদিন নবীন মহাকবি গবেষক সমালোচকের বিনিদ্র তৎপরতার দ্বারা তাঁর প্রাপ্য সম্মান লাভ করবেন।

৪। প্রমথ বিশী: চিত্র চরিত্র ৯২

আপিসে ফোন পাওয়ার পর থেকে সংবাদটা একটা মৃদু চেতনার মতো তাকে আচ্ছন্নপ্রায় জড়িয়ে রেখেছিল। প্রথমে বিষয়টাকে গুরুত্ব দেবার চেষ্টা করেছিল জীবন। তা নাহলে আশার কণ্ঠস্বর অমন আর্ত, ক্লান্ত, শূন্য শোনাত না। হ্যাঁ এমন একটা পরিণতি মোটেই অনিবার্য ছিল না। সাবধানে বনের মধ্যে চলতে গেলেও সাপের ল্যাজে পা দেবার সম্ভাবনাটুকু লোপ পেয়ে যায় না।

'হ্যালো, আশা, তুমি কী এ ব্যাপারে একেবারে নিঃসন্দেহ?'

'আমি কী ইয়ারকি করছি তোমার সঙ্গে?'

'না, মানে, ভুল তো হয়।'

'এ ব্যাপারে আমাদের অনুমানে ভুল হয় না।'

'তাহলে ব্যাপারটা ঠিক।'

বিশুদ্ধ নীরবতা।

'তুমি যে একেবারে চুপ করে গেলে...'

'ডাক্তার চৌধুরির কাছে যাবে? তোমার তো চেনা—'

'আমি?'

'আমার গেলে যদি চলত তাই যেতুম। দেখবেন তো তোমাকে, আঁ?'

'আমি পারব না।'

'তাহলে? আচ্ছা বিকেলে অপেক্ষা কোরো, আমি যাচ্ছি।'

'এসো কিন্তু।'

আশা যখন দৃঢ় গলায় জানাচ্ছে তখন ঘটনাটা নির্ভুল। মাথা চুলকোতে চুলকোতে ভাবল জীবন। পিতৃত্ব একটা দায়িত্বপূর্ণ অনুভূতি, আশ্চর্য জীবন কোনো দায়িত্ব নিতে রাজি হচ্ছে না। অনিয়ন্ত্রিত মিলনের সম্মিলিত ফলে এ জিনিস ঘটেছে। জীবন বা আশা কেউই পিতৃ-মাতৃত্বের গৌরবের কথা ভাবেনি। নিছক দেহ থেকে আনন্দ কুড়িয়ে নেয়া। আনন্দ? হ্যাঁ উত্তেজনা, স্পন্দন, সৌরভ এবং উষ্ণতা। বেঁচে-থাকার নানাতম শর্ত এগুলি। 'আশা, তোমার সৃষ্টির নাম রেখো আনন্দ।' আহা, কী ভাবছে জীবন। অন্যরকম হতে পারত, স্বীকার করতে হয় তা হয়নি। দৈহিক শরীরের উত্তাপ থেকে নতুন একটি শরীরের ক্ষুদ্র ঘোষণা। তাদের উভয়ের মনের মধ্যে এরকম কী একটা ইচ্ছের মুকুল ছিল? মনে হয় না। পিতৃত্ব-মাতৃত্ব একটা স্থির প্রত্যয়। সে প্রত্যয়টুকু কারুরই চেতনায় ছিল না। জীবন নিজেকে বাবা কিংবা আশাকে মা ভাবতে পারেনি। সুতরাং যথেষ্ট সাবধান ছিল। মুহূর্তের স্খলন হয়েছিল তৃতীয় মুখের জন্ম কোনো ঘণ্টা তারা হতে বসেনি। বসেনি যেহেতু দুজনে দায়িত্ববোধের অস্বীকার করবে

ছিল না। সম্মত মিলনের পরায় আর কারুর জায়গা ছিল না। এখনো জীবনের ধূলাপটে ছিঁড়ে যাবার মতো আশার প্রখর অনুভূতি আসছে। সেই করুণ জলভ চোখের ভাষা, সিক্ত ঠোঁট, আর বাউণ্ডারের সংগতে দীর্ঘনিশ্বাস। 'তুমি অমন কোরে চেয়ো না, আমার লজ্জা করে।' 'আশা, আমি তোমাকে ভালোবাসি।' 'আমাকে ক্লান্ত করে দিয়ে ঠিক এই সময়ে কথাটা বোলো না। মনে হয় বানিয়ে বলছ।' 'আশা, ভালোবাস কারে কয়?' 'তোমার এই স্বার্থপরতাগুলো।' 'স্বার্থ?' 'এই আবেগ, উত্তাপের বাইরে তোমার কোনো ভালোবাসা নেই। তোমার প্রভুত্ব যাবা পেলেই তুমি নিজেকে হারিয়ে ফেলো।' 'প্রভুত্ব? তবে এই প্রভুত্বকে মেনে নাও কেন?' 'না মানলে একা থাকতে হয়।'

জীবন আপিস থেকে নেমে এল।

পিতৃত্বের স্বাদটাকে জীবন পুনর্বার স্মরণ করতে চেষ্টা করল। আশা কী কখনো তাকে স্বামী বলে গ্রহণ করেছে? এবং আশা তার স্ত্রী? নাঃ কিছুই ভাবতে পারছে না জীবন। আশা তার আনন্দ, উত্তাপ, স্পন্দন। অথচ, আশ্চর্য, জীবন আশার অন্তঃসত্ত্বার কারণ। নিছক কারণ আর কিছু নয়। তাহলে ও তার কাছে কিসের দাবি করছে? পিতৃত্বের? নিছক একটা কারণকে আশা মিথ্যা একটা গৌরবে আচ্ছাদিত করতে চায়। যখন সে জানে জীবনের পিতৃত্বের কোনো বোধ নেই। আশাও কী নিজেকে মাতৃত্বের আবরণায় জড়িয়ে রাখতে চায় তাহলে! আশা, মিথ্যা হয়ো না। আরো দীর্ঘকাল বাঁচতে হবে। জীবন অবশ্যই তাকে পিতৃত্ববোধের একটি সর্টিফিকেট লিখে দিতে পারে। কিন্তু...? যে-দায়িত্ববোধ জীবনের চেতনায় সম্পূর্ণ অনুপস্থিত তাকে সম্মান দেয়া কী গৌরবের হবে! এটা একটা নির্দোষ আর্কসিডেন্ট, নয় কী? দুর্ঘটনার ব্যাপারে কারুর কোনো হাত নেই। বসন্তের টীকা নিলে তোমার কলেরা হবে না, কেউ বলতে পারে না। তাহলে? প্রকৃত বাস্তবের সম্মুখীন হও।

তারপর বেঞ্চে বসে সিগারেট ধরাতে ধরাতে দেখল জীবন সর্বাংগে শাড়িটাকে জড়িয়ে কেমন কুঁজো হয়ে পার্কের গেট পেরিয়ে আশা ধীরে ধীরে তার কাছে এগিয়ে এল। জীবন চোখ ফিরে ভাবল ওকে কেন এতো রোগা আর দরিদ্র দেখাচ্ছে। এবং ক্লান্তও।

আশা নিচু মুখে ওর পাশে বসল।

গির্জের মতো মৌন গাম্ভীর্য।

জীবন সিগারেটের ধোঁয়া গিলল। বেঞ্চে পিঠ ঠেসে দিয়ে পা লম্বা করে বসল।

'কিছু বলছ না যে?'

আশা বিষণ্ণ হাসল।

আশ্চর্য, ওর হাসিতে এখনো কিশোরের চোকাটে আঁকাটা জড়ানো। নিঃশব্দে সিগারেট টানল জীবন। তারপর সোজা হয়ে বসে চিন্তাগুলোকে গুছিয়ে নিল।

'আমরা কী চাইছি সেটা আগে জানা দরকার।'

আশা নিরুত্তর।

'এটা ঠিক ইচ্ছে করে আমরা কেউই এই পরিস্থিতিতে আসতে চাইনি। কাজেই একটা অনিচ্ছুক বস্তু আমাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে।'

আশা থুকথুক করে কাশল। আরো গুটিয়ে বসল।

'আশা করছি তুমি এ ব্যাপারে আমাকে দায়ী করছ না? আমার কোনো হাত ছিল না। তোমারও। এটা একটা নির্বোধ অ্যাকসিডেন্ট। তুমি কিছু বলছ না?'

আশা বলল : 'না।'

'বিষয়টাকে তুমি কীভাবে ভাবছ?'

'তুমি যা বলবে।'

'আমি! এখানেও কী সেই প্রভুত্বের প্রশ্ন? দ্যাখো আশা, এ ব্যাপারে তুমিও জানো আমিও জানি, আমরা কিছু করিনি, হয়েছে। তুমি কী এটা চেয়েছিলে?'

'না।'

'আমিও না। তাহলে? ব্যাপারটাকে আর্কসিডেন্ট বলে মেনে নেয়াই ভালো। জীবনে আর্কসিডেন্টে পড়লে তার হাত থেকে অব্যাহতির পথও খুঁজতে হবে। কারণ আমাদের এতদিনের সম্পর্কের ক্ষেত্রে আর্কসিডেন্টটা প্রতিকথক হয়ে দাঁড়াতে পারে না। পরস্পরের কাছে আমাদের চাওয়া ফুরিয়ে যায়নি। আমরা স্বপ্নদের আসন্নির দাম দিতে চাই।'

'তুমি যা বলবে।'

'আমি তো এইভাবেই ব্যাপারটা দেখি। ডাক্তার চৌধুরীর কাছে যাও। তিনি নিশ্চয় আমাদের এই অনিচ্ছাকে সমর্থন করবেন।'

'আমি পারব না।'

'কেন?'

'পারা যায় না।'

'মিথ্যার মূল্য কী?'

আশা চুপ।

'তুমি তো স্বীকার করছ আমরা কেউই এটা চাইনি।'

'করছি।'

'তবে? মিথ্যাকে বহন করা কী একটা বনাম নয়? বেঁচে থাকার অর্থই তাহলে নম্র হওয়া, খাঁটি হওয়া।'

'কেন একে মিথ্যা বলছ? আমার শরীরের রক্তে-মাংসে...'

'আশা, তুমি মা হতে চাওনি।'

'না।'

'বিবাহিত জীবনকে তুমি ভয় করো।'

'কার।'

'তাহলে? একে আশ্রয় দেবে কী করে?'

'আশ্রয় দিতে না চাইলেও তো অতিথি আসতে পারে। আসে। তাকে ফেলতে পারি না তো।'

'অতিথি দরজায় কড়া-নাড়া দিয়ে আসে।'

'কড়া-নাড়া দেয়নি সেই অপরাধে তাকে ফিরিয়ে দিতে পারিনে।'

জীবন উঠে দাঁড়িয়ে বেঞ্চের সামনে কয়েকবার পদচারণা করল। আবার একটা সিগারেট ধরাবে কীনা ভাবল। অন্যমনস্ক আশার নত মুখের দিকে চোখ রাখল। তারপর—

'সিদ্ধান্ত যখন নিজেই নিয়েছ তখন আমাকে আর ডাকা কেন?'

'তুমি কী এ-সিদ্ধান্ত পছন্দ করছ না?'

'না।'

'কেন?'

'তাহলে আমাদের এতদিনের জীবন-ধারণটাই মিথ্যে হয়। স্বামী-স্ত্রী কী মা-বাবা হওয়া তুমি-আমি কেউই ভেবে রাখিনি। প্রথম-যৌবনের আবেগে একদা তোমাকে আমিই বিয়ের প্রস্তাবটা দিয়েছিলুম। তোমার মনে পড়ে?'

'হুঁ—'

'তুমি রাজি হওনি।'

'সুধাকর টাইফয়েডে মারা গেল। আমি তাকে কথা দিয়েছিলাম'...

'মৃত লোকের কাছে কথা-দেয়ার দাম কী? সে তো আর দাবি জানাতে আসত না।'

'ওর বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজন আমাদের সম্পর্কটা জানত।'

'তুমি কী কথা রাখতে পেরেছ? তাহলে আমি কী করে এলাম তোমার জীবনে!'

'আমি তোমাকে সব বলেছিলাম। তুমি মেনে নিয়েছিলে। আর, তোমার এই মেনে নেয়ার জন্যে তুমি আমাকে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত করেছ। তোমার কাছে সহজ হয়েছি।'

জীবন আরো কয়েকবার পায়চারি করল।

'কিন্তু এরপর সুধাকরকে তুমি কোথায় রাখবে? তার মানসিক অস্তিত্বের জায়গায় যে অপদার্থ শরীরের ছায়া পড়েছে।'

'সুধাকরকে আমি কোনোদিন এই-ভাবে কল্পনা করিনি। না, ওই বয়েসে ও বা আমি কেউই শারীরিক কৌতূহল-গুলো উল্টে পাল্টে দেখবার তেমন আগ্রহ বোধ করিনি।'

'তার মানে তোমাদের প্রেম শুদ্ধ পবিত্র ছিল? আর, আমি, আমরা—কী ভেবে কী চিন্তা করে তুমি আমাকে তোমার অন্তরপাতার অন্ধকারে নিয়ে গিয়েছিলে?'

'একেকজনের চাওয়া একেক রকমের। প্রথম দিনই বেনারসের গঙ্গার নৌকোর মধ্যে তুমি আমাকে অপ্রস্তুত করে চুমু খেয়েছিলে।'

'আমি কী করে জানব তুমি প্রস্তুত ছিলে না?'

'রাগ কোরো না। আমি তোমাকে দোষ দিচ্ছিনে। আমি সেদিনই বুঝেছিলাম তুমি

এইরকমই। যা পেতে হবে তার জন্যে তোমার কাছে অপেক্ষার অর্থ নেই।'

'এটা তোমার প্রশংসা না অপ্রশংসা বুঝতে পারছিনে।'

'বোঝবার দরকারও নেই। সেদিন থেকে আমি তো সরে আসিনি। যখন যেমন চেয়েছ—'

'আচ্ছা? তুমি বলতে চাও সেসব মুহূর্তে তুমি নিশ্চিন্ত ছিলে?'

'কোন্ দুঃখে? আমি তো একা থাকতে পারিনে। কেন থাকব? আমাকে বাঁচতে হবে তো।'

'আমি সুধাকরকে অপেক্ষা করতে পারিনি।'

'কেন পারবে? আমার মুখ চেয়ে তুমি তো তা চাওনি। তোমার জায়গা অন্য-খানে।'

'নরকে?'

'স্বর্গ নরক জানিনে। তুমি জানো আমি তোমাকে ঠকাইনি।'

'কী করে বুঝব?'

'তুমি তাহলে আর আসতে না।'

জীবন এবার একটা সিগারেট ধরাল।

'আমি এখনো বুঝতে পারছিনে.....'

'কী?'

'তোমার বউ, বাবা-মা, ছোট্ট ভাই...'

'ওদের যদি বোঝাতে না পারি তাহলে একাই থাকতে হবে। তুমি তো রয়েছ, নিশ্চয়ই আমাকে ছেড়ে যাবে না।'

'ঠিক আছে। চলো কাল বিকেলে ডাক্তারের কাছে যাই।'

একটা সুপরামর্শ পেলে মন্দ হত না, জীবন রাস্তায় চলতে চলতে ভাবনার সূত্রটাকে তুলে নিল। এখন বুঝতে পারছে বহুৎ জীবনটা সম্পর্কে একেবারে নিলর্জ মতো ধারণা। মেয়ে মানুষ বলেই হয়, কিছুই জানে না। অবশ্য, জীবনের অনেক কিছু, না-জানলেও দিব্যি চলে-থাকা চলে। জীবন নিজেকেই যেন বগলে ফেলে বিচার করতে বসল। এই তুমি, একটি আর্টিস্ট সহরের যুবক, তুমি ফিজিক্স কেমিস্ট্রি, হায়ার ম্যাথামেটিক্স সায়েন্স, টেকনলজি, কিছুই জানো না। তোমার এই চাকরি, একটা অভ্যেস। আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাও অভ্যেস। একটা ছক-বাঁধা জীবন। সম্প্রতি এই দুর্ঘটনা সম্পর্কে তোমার চেতনার জগতটাও অস্বচ্ছ। হ্যাঁ তুমি মনে মনে বিরক্ত হচ্ছ। কারণ এই নতুন বিষয়টা সম্পর্কে তুমি একেবারেই আনাড়ী। অথচ—

সহকর্মী মৃদুলকে ডেকে কী পরামর্শ নেবে? না, মৃদুল বুঝবে না। জীবনের মনে হচ্ছে সমস্যাটা তার ব্যক্তিগত, বাইরের কেউ সমাধান করতে পারবে না। সোনা বউদি? দূরে। দাদা, সাইত ইনসিওরেন্সের অফিসটা কোথায়? জানিনে। জীবন চুপ করে পা বাড়াল। একটা অনিশ্চিত বিষয়কে বিনা দ্বিধায় সমর্থন করে বসল আলো? অবিশ্বাস নয়, সন্দেহ নয়, অপ্রীতি নয়। অথচ বিষয়টাকে সহজেই ফেড়ে ফেলে দেয়া যেত। আজকাল এসব সহজ হয়ে গেছে। জীবন প্রথমার্ধটা ভেবে রেখেছিল আলো এই জাতীয় প্রস্তাব দেবে। এবং জীবনও মোটামুটি খরচের কথাটাও ভেবে রেখেছিল। আলোর শুভ মুখ দেখে কিছুই বলা গেল না। কী যেন আর্তাধর কথা বলল ও? এত মনের জোর ও কোথা থেকে পেল? মনে হল না যে এ-ব্যাপারে ও তাকে পরে বিশ্বাসভাজন মনে করবে! যেন একটা সম্পদ পেয়ে গেছে সেটা হজম করার দায়িত্ব তার একার। জীবনের কোনো দায়ই নেই তার কাছে। তাহলে তাকে ডাকা কেন? ডাকার অর্থ এই নয় কী যে জীবনকে সে এই ঘটনার কারণ মনে করে? অবশ্যই কারণ সম্পর্কে জীবনের বিন্দুমাত্র সংশয় নেই। জীবন তা অস্বীকারও করেনি। তাহলে এবিষয়ে তারও কিছু বক্তব্য ছিল। ছিল! আহা, জীবন কী করত? জীবন নিজের উপরেই রাগ করল। তার মুগ্ধ দৃষ্টির সামনে আলোকে নোংরা লোভী এবং মূর্খ মনে হল।

কেন? ও নোংরা কেন, লোভী কেন? শব্দগুলো মনে মনে উচ্চারণ করেও যেন অর্থ বুঝতে পারল না জীবন। নাকি ওকে ফাঁসাতে ফেলেছে বলেই ও নোংরা লোভী ইত্যাদি? আহা, জীবন, তুমি কিসের আকর্ষণে পুরনো অপরাধীর মতো একই বৃত্তে বারবার ফিরে আসো? অপরাধ! শব্দগুলোতে সমকালো জীবন। সংসারের নিত্য প্রবাহিত স্রোত-রেখা থেকে তুমি নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে তুমি একটি জলাশয় বানিয়ে তুলেছ। একান্ত গোপন, ভীরু। বাস্তবের সূর্যালোকে তুমি একান্ত দুর্বল। না না, জীবন চীৎকার করে প্রতিবাদ করতে চাইল। অন্ধকারের পোকা! না-না। স্বরূপ-হীন সরীসৃপ। না-না, একটা ঠুনকো বেলোয়ারি জীবন। দর্শন অউড়াবার চেষ্টা কোরো না জীবন। সৃষ্টির পুরস্কার চেয়ে পুরস্কৃত হয়েছ তারা তোমার আর কোনো অহংকার নেই। কী বলছ? আলো তোমাকে সহ্য করছে কেন? ব্যাপারটা অত্যন্ত সহজ, আলো তোমার চরিত্রের সীমা ধরে ফেলেছে, তোমাকে বুঝতে আর ওর এতটুকুও কষ্ট হয় না। আলো স্ট্রেঞ্জার নিয়ে যে বাঁচতে পারে না! তোমার এই ঠকবাজ প্রকৃতিটা আচরণ মুহূর্তে আলোর কাছে। অসম্পৃক্তদের সঙ্গে মেয়েরা ঘরবাস করতে পারে না। আলো তোমার কাছে অসম্পৃক্ত। ভয়াবহ বাইরের পৃথিবীর রোদ-বৃষ্টির থেকে তুমি তার আচ্ছাদন।

জীবন মুখ বিকৃত করে নিজেকেই ভাঙাতে চাইল।

ডাক্তার চৌধুরীর ভারি পরদার আড়ালে আলোর শারীরিক অবস্থাটা সরেজমিনে তদন্ত করতে নিযুক্ত থাকলে জীবন পাথর হয়ে বসে রইল। এসব ব্যাপারে কতক্ষণ সময় লাগে ধারণা নেই জীবনের। ডাক্তারকে বিধাতাপুরুষের মতো নির্দয় মনে হল।

জীবনের অবসন্ন চোখের ওপর পরদাটা নড়ে উঠল। প্রথমে ডাক্তার কিছু, পরে আলো। বাতির আলোকে ওকে ফ্যাকাসে দেখাচ্ছিল।

ডাক্তার চৌধুরী টেবিলে বসে খসখস করে কী লিখলেন। তারপর কাগজটা এগিয়ে দিয়ে বললেন: যদিও আমার এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই তবু যখন আপনি করে বলছেন আপনারা যথেষ্ট সাবধান ছিলেন, তখন এই টাবলেটটা খান। প্রেগনান্সি না হলে ব্যাপারটা ইভিল হয়ে যাবে।'

'না হলে?' বোকার মতো প্রশ্ন রাখল জীবন।

'ইটস এ সোর্টলেড থাই...' ডাক্তার বিধাতাপুরুষের মতো হাসলেন।

'কিন্তু আমি—আমরা যথেষ্ট সাবধান ছিলাম?'

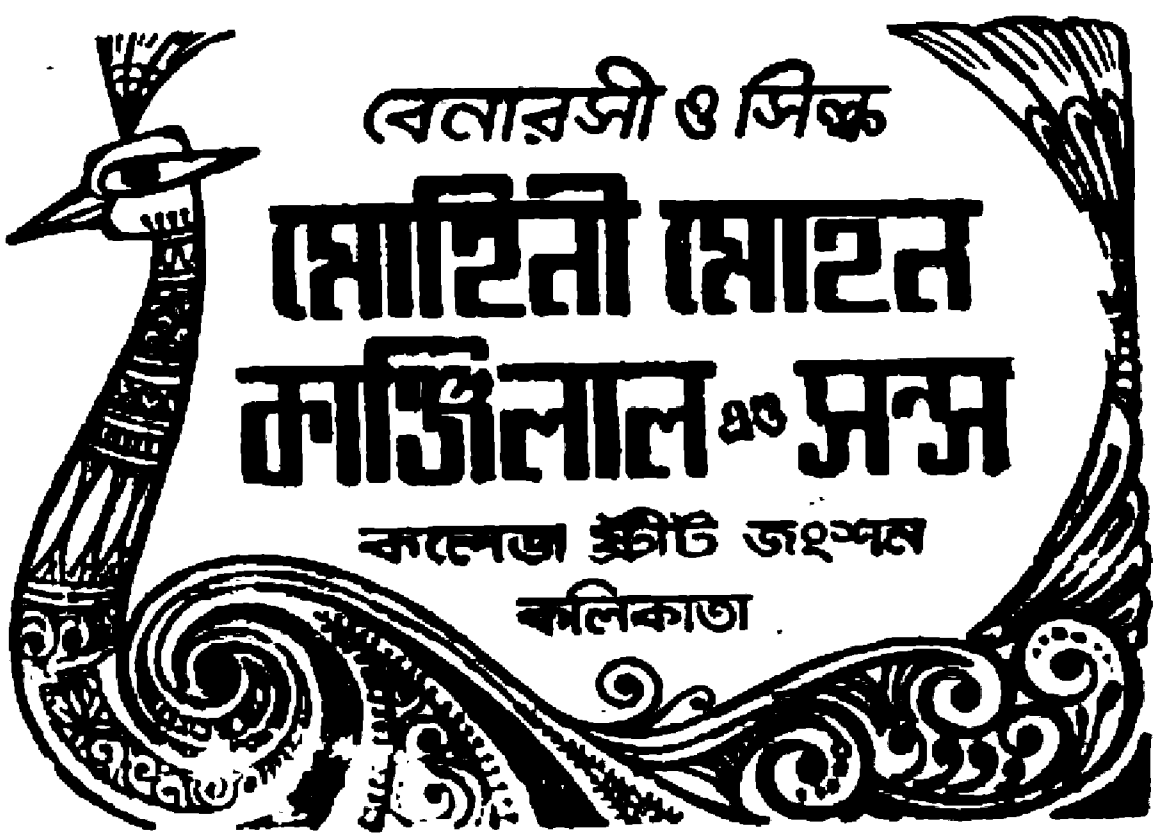

ডাক্তার চৌধুরী বললেন : প্রথমবারে সব দম্পতিই এরকম একটা ব্যাপারে অকারণ আপসেট হয়ে পড়েন। অবশ্যই মাতৃত্ব-পিতৃত্ব বোধটা অচেতন ভাবেই আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া হয়। সন্তানে কেউই মা-বাবা হয় না।'

জীবন লজ্জা হয়ে বলল : 'আপনাকে আগেই বলা উচিত ছিল। আমরা স্বামী-স্ত্রী নই।'

ডাক্তার বললেন : 'সেটা বোঝার বয়েস কী আমার হয়নি ভেবেছেন?'

'তবে?'

'বিয়ে করে ফেলুন।'

'আর ইউ সিরিয়াস ডক্টর? এই ঘটনা-টুকুই বিয়ে করার পক্ষে যথেষ্ট কারণ?'

'কেন? আপনি ম্যারেজ লাইক চান না?'

'আমি এখনো সেসব ভাবিনি।'

'এখন ভাবুন। না-কি কোনো বাস্তব অসুবিধে রয়েছে?'

'না, আমি বিবাহিত নই।'

'তাহলে ভাবনার কী আছে? আপনি একজন হেলদি ইয়ংম্যান। শারীরিক মানসিক যথেষ্ট সাউন্ড। জব?'

জীবন বলল : 'আমি এর জন্যে প্রস্তুত নই।'

'ইন্টারেস্টিং। আপনি কী চান তাহলে?'

'আমি জানিনে।'

আশার দিকে ফিরে চিন্তিত ডাক্তার বললেন : 'মাই ইয়ং লেডি এ-ব্যাপারে তোমার কী মত?'

সলজ্জ আশা নিচু গলায় বলল : দেখুন, ওকে আমি কোনোদিনও স্বামী হিসেবে ভাবতে চাইনি। আজও...'

'বাহ, তাহলে তোমাদের সম্পর্কটা কী?'

'ও আমার ফ্রিয়াসে'।'

ডাক্তার হাসলেন। 'তোমরা বড্ড আগে-আগে জন্মে গেছ।'

'আপনি ঠাট্টা করছেন।'

ডাক্তার চৌধুরী পাইপে অগ্নিসংযোগ করলেন। তারপর গম্ভীর হয়ে বললেন : তোমাদের ফিলসফি অব লাইফ সমর্থন না করি অস্বীকার করতে আমার আপত্তি নেই। আমি কেবল আগন্তুক শিশুটির জন্যে উদ্বিগ্ন। তোমাদের দর্শন ওর পক্ষে গ্রহনীয় নাও হতে পারে।'

রেডিয়েন্ট ওয়াচ সার্ভিস
সকল সময়ের জন্য

'আপনি কী বোঝাতে চাইছেন?

'সমাজের চোখে তার এই অবৈধ অস্তিত্ব আকাঙ্ক্ষিত হবে না।'

'সমাজ!' নিজেকে বিদ্রোহী বোঝাতে চাইল জীবন।

ডাক্তার বললেন : 'সমাজের থেকে সামাজিক সব সুবিধেগুলো নেবো আর তাকে অস্বীকার করব তা হয় না। জীবন বাসনের জন্যে এই সমাজ আপনাকে চাকরি দিচ্ছে, বাসস্থানের ব্যবস্থা করছে, কলেজে শিক্ষার ব্যবস্থা করেছে সব রকমের স্বাচ্ছন্দ্য আর নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। আপনি এর কোনোটাই অস্বীকার করেননি, তাহলে ম্যারেজ ইনস্টিটিউশনকে কেবল সুবিধে মতো অস্বীকার করতে পারেন না।'

রাস্তার আগে আগে চলছিল আশা।

জীবন অনেক পিছনে। একটু জোরে পা চালালেই ওর নাগাল পাওয়া যায়। কিন্তু জীবনের সামর্থ্য অফুরান নয়। সিগারেট হাতে নিয়ে ও দেশলাই খুঁজল। একটার পর একটা কাঠি নিবে যেতে লাগল। দাদা এই রাস্তাটা কোথায় গেছে?' 'ট্রাফিক পুলিশকে জিগ্যেস করুন।' জীবন অনেক কষ্টে সিগারেট ধরাল। ঘরে-ফেরার পথটুকু কী আলোচনা করতে-করতে যাওয়া যেত না? দশ হাত দূরে দূরে আশার আবার দরকার কী? জীবন কখনোই মনে করে না সে একা-একা মস্ত বীর পুরুষ। তবে কী জীবন ভয় পাচ্ছে? ভয়! না, তা নয়। কথাটা হচ্ছে : 'জীবন চাই' তুলল : সমস্যাটা দুজনের। অথবা তিনজনের...জবাব কী দেয়া যেত না? জীবন ডাক্তারের পিতামহ-সুলভ হাসিমুখ স্মরণ করল। অযাচিত সমাজতান্ত্রিক দাক্ষিণ্য! এই আমি, জীবন, নিজের দায়িত্বে পৃথিবীতে আসিনি। কে চেয়েছিল সমাজ-নামক অত্যাচারে নিষ্পিষ্ট হতে জন্মলাভ করতে! সাধ্য থাকলে আমি বাধা দিতাম। পিতামহ-ডাক্তার বলবেন, আমি কী মনুষ্য-জন্মের জন্যে দায়ী? কেন মানুষের মতো জবাব হল মনে করে বুদ্ধিমানের হাসি হাসল জীবন। আমার জন্মগ্রহণ ব্যাপারটা যখন ঘটে গেছে তখন আমার খাওয়া-থাকা সমূহ নিরাপত্তার ভার সমাজের। আমার রাইট-রাইট। হাসতে গিয়ে খুক-খুক করে কাশল জীবন। তাই বলে আমার বিবেক, আমার চৈতন্য, আমার স্বাধীনতাস্পৃহা...? জীবন 'বাপরে' বলে লাফিয়ে ফুটপাথে না উঠলে লরীটা তাকে মাড়িয়ে দিয়ে চলে যেত। সোজাইন, ইংরাজিতে গালি দিল জীবন : সান-অব-এ-বিচ্। আমার এই জীবনটার জন্যে কখনোই আমি সমাজের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাব না! নেহাত মাতা-পিতা সূত্রে প্রাপ্ত। সামাজিক আজ্ঞা এবং নিষেধগুলো আমার ওপর চাপিয়ে দেবার অর্থ নেই।

'এই কী হচ্ছে?' জবাব হাতে ধরে করে বসে পড়ে জানতে চাইল জীবন।

'বোসো। চা করি।' বাথরুমের দরজা বন্ধ করবার শব্দ। কলের জল-পড়ার শব্দ।

জীবন শয্যাশায়ী হল। বাতাসে গন্ধ, প্রজাপতির জামা-কাপড়ের গন্ধ। একটা গন্ধ-ময় চেতনা যেন এইমাত্র অবগাহন করল জীবন। গন্ধটা রোজকার। আশ্চর্য, এমন একটুখানি স্নিগ্ধ শিশির মাত্রা এর আগে থেকে ওকে আকর্ষণ করেনি। এটা যেন নাতিতাপ একটা ঘর-নাটক আশ্রয় হয়ে উঠছে। আশার ওই ফিরোজ রঙের জামাটা গতকাল পরেছিল আশা, তার ওই খাদা শিফনের শাড়িটা। ওকে রাজহাঁসের মতো দেখাচ্ছিল। গর্বিত, সম্রাজ্ঞীর মতো। জীবনের করতলে ওর মাথের তেল, কাঁপা পাঁপাড়ি, চোখের নক্ষত্রের ঝিকিমিকি, স্ফুরিত রসালো অধর...। আহ্, কী ভাবছে জীবন, সে কী পাগল হয়ে গেল। বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল আশা, চুলে ঝিঙে ফুলের বেখা, তেলাতেলে মুখে আলোর নীচে জামাটা ভেজা, কোমরে কোমরে জড়িয়ে-বাঁধা ভাতের শাড়িটা। আয়নার দাঁড়িয়ে পিঠের ওপর চুলের রাশ উলঙ্গ করে দিল আশা। দাঁতে ঠোঁট চেপে লম্বা লম্বা চিরুনি টানছে।

'চা নিয়ে আসি। চা খেয়ে চল করে নাও। অনেক বেলা হয়েছে। বাড়ি গিয়ে কাজ নেই।'

জীবন শয্যায় নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে পুনর্বার তার চোখের সামনে দেখল ঘরটা আশার ভিজে গন্ধে ভরে উঠেছে। শূন্য কলসীর ঢিল ছুঁড়ে দেবার মতো শব্দ-তরঙ্গটা কেঁপে-কেঁপে তার সমগ্র সত্তায় বিম ঝিম করে উঠল। জীবনের মনে হল তার গোটা অস্তিত্বটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে।

'নাও হে চা খাও।'

আশার গলার কাছে জামাটা ভিজে। কানের পাশে সাবানের গুঁড়ো। হলুদ-শাড়ির গন্ধ। এবং 'নাও হে চা খাও', ওর কণ্ঠস্বরটা এমন লজ্জা-দুঃখগৌরব আনন্দের মতো বাজল কেন।

জীবন ওর মণিবন্ধ খামচে ধরল।

'এই—'

আশা ওর কাঁধে হাত রাখল। 'কাজের সময় কী আটকে রাখা চলে? আগে রান্নাটা শেষ করে ফেলি। তারপর তোমার কথা শুনব।'

জীবন ফিসফিস করে বলল : 'তোমাকে একদণ্ড ছাড়তে পারছিনে।'

আশা ঘাড় পাকিয়ে বলল : 'তা আর পারবে কেন? তাহলে যে তোমার পুরুষের অহংকার খর্ব হয়?'

জীবন বিড়বিড় করে কী বলল বোঝা গেল না।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

ডাইনী শিকার—জুরীর বিচার

জিনসেন্ট হারটনেট-কে প্রতিবাদী করা হল কিন্তু সেই সঙ্গে লরেন্স এ জনসনকেও জড়ানো হল। হারটনেট 'এ্যাওয়ার' পত্রিকা মারফৎ অভিযোগ করতেন এবং জনসন সেটি কার্যকরী করতেন উদ্যোক্তা, বিজ্ঞাপনদাতা ইত্যাদি যাঁরা বেতার-শিল্প পরিচালনা করেন তাঁদের কাছে অর্থনৈতিক একঘরে করার ভীতি প্রদর্শন করে—সন্দেহভাজনদের ভাতে মারার ব্যবস্থা করতেন। জনসন পাকা চুল সত্তর বছরের বৃদ্ধ। তাঁর ধারণা কম্যুনিস্টরা বেতার-শিল্পকে গ্রাস করছে। রেডিও ও টি-ভি তাদের কুক্ষীগত। বেতার জগতে জনসনের নামকরণ করা হয়েছিল 'সিরাকুজের মুদী'। সিরাকুজে তিনি ছোট সুপারমার্কেটের মালিক। যে কোনো পণ্যসামগ্রীকে চল বা অচল করতে তিনি একাই যথেষ্ট। নিজের প্রভাব বাড়ানোর জন্য জনসন ভেটারনস এ্যাফেয়ার্স কমিটি অব সিরাকুজ সুপার মার্কেটস ও এ্যান্টি সাবভারসিভ কমিটিরও একজন কর্মকর্তা। 'এ্যাওয়ার' পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে জনসন বিভিন্ন বেতার ব্যবসায়ী কোম্পানী ও বিজ্ঞাপনদাতা কোম্পানীকে 'পরেজন-পেন-লেটার' বা বিষাক্ত কলমের চিঠি পাঠাতেন—লোকটিকে সমূলে উৎখাত করার জন্য। এমন কি নিজেই অনেক কোম্পানীর কর্মকর্তাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতেন। ফালককে তাঁর উকীল জিজ্ঞাসা করেছিলেন এই দুজনের মধ্যে তাঁর দুর্দশার জন্য কে বেশী দায়ী। তার উত্তরে ফালক বলেছিলেন —'কেউটে ও গোখরো দুয়ের মধ্যে কে বেশী ক্ষতিকর এ নিয়ে ত' তর্ক চলে না।'

লুইস নাইজার ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে মামলা দায়ের করলেন। তখনও ডক্টর সি বি এস—রেডিওতে ফালক কাজ করছেন, আর সব কাজ বন্ধ হয়েছে। এটা আছে চার্লস কলিন গডফ্রে অনুগ্রহে তিনি নাইয়র্ক এ এফ টি আর এ-এর প্রেসিডেন্ট।

আমেরিকার আইনবিধি অনুসারে বিবাদী-প্রতিবাদী একে অপরের অভিযোগের সত্যাসত্য বিবেচনা করতে পারতেন এবং বিবাদের বাহুল্য অংশ বর্জন করে সারাংশটুকু গ্রহণ করার সুযোগ দেওয়া হয়। এই প্রাথমিক আইনের লড়াই চলল দু বছর ধরে—এই দুবছরের মধ্যে কলাং গডফ তাঁর প্রেসিডেন্ট পদ থেকে বঞ্চিত হলেন, সি বি এস থেকে মরো-কে সরানো হল 'এ্যাওয়ার' পদের বিরামবিহীন অনুসন্ধানের ফলে। এর ফলে ফালক তাঁর শেষ কাজটুকুও খোয়ালেন।

ইতিমধ্যে ফালক কিছু কিছু কাজের অবসর পেয়েছিলেন তখন তা গ্রহণ করেন নি এমন সেইন্দ জায়গায় চেষ্টা করে দেখলেন এরের পর এক দরজা বন্ধ। সবাই 'এ্যাওয়ার' এবং জনসনের ভয়ে আতঙ্কিত। ফালক বিবাহিত। স্ত্রী এবং চারটি সন্তান নিয়ে তাঁর সংসার, এখন সামনে অন্ধকার, একদম কর্মহীন। কেউ নেবে না। বা-এক জায়গায় কাজ পেয়েছিলেন, সব ঠিক, চুক্তিপত্র সই হবে এমন সময় সব বাতিল হয়ে গেল অদৃশ্য হস্তের ইঙ্গিতে।

প্রাক-বিচারকালীন বৈঠক চলতে লাগল। শপথ নিয়ে প্রতিবাদীদের প্রশ্ন করার অধিকার বিবাদীর আছে। প্রকৃত বিচার শুরু হওয়ার পূর্বে সাক্ষ্যপ্রমাণ সম্পর্কে উভয়পক্ষের সুযোগ দাঁড় হয়। এই সূত্রে লুইস নাইজার সুযোগ পেলেন জিনসেন্ট হারটনেটকে দেখার। তিনি লিখছেন—

'অমন দুর্ধর্ষ মানুষটা কিন্তু দেখতে অতি ভীরু, দুর্বল, অথচ এই মানুষ অসংখ্য মানুষের অন্তরে আতঙ্ক সঞ্চার করেছে। লোকটি শীর্ণ, ভীতচকিত দৃষ্টি, বছর চল্লিশ বয়স—ওজন ১৩০ পাউন্ডের বেশী নয়। লোকটার চোখ দেখে মনে হয় সে ভীতিগ্রস্ত।'

নাইজার জেরা করতে লাগলেন, বেতার শিল্পীদের রাজনৈতিক রেকর্ডাদি তিনি কিভাবে সংগ্রহ করেছেন তার গভীরে প্রবেশ করার চেষ্টা করলেন। মাঝে মাঝে উত্তেজনার সৃষ্টি হত। তারপর একদিন এক চাঞ্চল্যকর ঘটনার উদ্ভব হল। 'এ্যাওয়ার বুলেটিনে' অভিযোগ করা হয়েছিল জ্যাক ফালক 'ক্লাব ৬৫'-এ একদিন অভিনয় করেছিলেন। 'ক্লাব ৬৫' একটি কম্যুনিস্ট প্রতিষ্ঠান। ফালক প্রকৃতপক্ষে এরকম কোনো প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কিনা তা হারটনেট ভালো করে পরীক্ষা করেন নি, 'জ্যাক' নামটি যে একজন নিগ্রো অভিনেতার তা তিনি জানতেন না। ঘটনাচক্রে এইদিনকার অভিনয় ছিল সম্পূর্ণভাবে নিগ্রোদের অভিনয়। পরে আরো জানা গেল এটা একটা কম্যুনিস্ট-বিরোধী প্রতিষ্ঠান এবং 'ক্লাব-৬৫' আদৌ কম্যুনিস্ট প্রতিষ্ঠান নয়।

এই সর্বপ্রথম হারটনেট স্বীকার করতে বাধ্য হলেন তার ভুল হতে পারে। তাঁর এই জবাবে একটা নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি হল। তাঁকে বলা হল এমন হতে পারে অনেকে ঠিক কোনোদিনে না গেলেও কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন যা পরে কম্যুনিস্ট প্রতিষ্ঠান বলে জানা গেছে। তাদেরও তিনি সমর্থক করেছেন। এর জবাবে তিনি বললেন—হতে পারে। আমি হয়ত একটু বেশী কঠোর হয়েছিলাম।

এই সূত্রে একবার হারটনেট স্বীকার করলেন আমাকে একবার এক কুড়ি মিথ্যা তথ্য বিক্রি করা হয়।

মজা হল তিনি নিজে তথ্যকর্তা ও গবেষক, অথচ তিনিই ত্রুটি স্বীকার করছেন। লোকটি এমনই মজাইসারে কথাগুলি বলেছিলেন যে তাঁর কথার ওপর আক্রমণ চালালে তিনি তখনই সতর্ক হয়ে পড়তেন। জেরা চলছিল। হঠাৎ তাঁকে প্রশ্ন করা হল, আজ যদি টেলিভিশনে ফালক কোনো কাজ পায় তাহলে আপনি কি তা সমর্থন করবেন? হারটনেট বলে ফেললেন—হ্যাঁ।'

তৎক্ষণাৎ মামলা মুলতুবী করা হল। হারটনেটের এটর্ণি এবং ফালকের তরফে নাইজার দুজনে একত্রে নাশ্ত খেতে গেলেন মামলার অবস্থা বিবেচনা করাটাই ছিল উদ্দেশ্য। ফালকের চাকরীপ্রাপ্তিতে আপত্তি নেই। আরো দুটি বিষয় নিয়ে মীমাংসা করার ছিল, (এক) সমস্ত অভিযোগ প্রত্যাহার ও মার্জনা প্রার্থনা, (দুই) ক্ষতি-পূরণের ব্যবস্থা। ওদের পক্ষের এটর্ণি বললেন—জনসন কিছু দেবেন না, ওদের টাকা কম—কোনো রকমে দশ হাজার ডলার পর্যন্ত খেসারত তোলা যাবে।

নাইজার ফালককে বললেন—জ্যাক তোমার সব অফার রইল। এবার তুমি যতটা টাকা

পাবে। ধার শোধ হবে। আমার ফি-র জন্য তুমি ভেবো না।'

ফালক বলল—দেখুন মামলা যদি আদালতের বাইরে মিটিয়ে নেওয়া যায় তাহলে ওদের ভাইনী শিকার প্রবৃত্তির অবসান হবে না। আদালতে ওদের মুখোশ খোলা না হলে 'এ্যাওয়ার' আর জনসনকে ঠেকা করা যাবে না। আমার যা যন্ত্রণার জন্য দুঃখ করব না ওদের যদি সায়েস্তা করা যায়।

নাইজার বলেছেন—ফালকের সিদ্ধান্তই যে সঠিক তা আমরা মেনে নিলাম।

এর পরবর্তী অধ্যায় নাটকীয়। হারটনেট বললেন—নাইজার আমার মক্কেল ধোলাই করেছেন। হারটনেট পক্ষের উকীল পরবর্তিতে হল। তারা তাঁকে উপদেশ দিলেন প্রাক-বিচারকালীন জেরায় কোনো কিছু ফসকে না করতে। এমনকি আদালত বসা না করলে হারটনেট কোনো অধিবেশনে আসেন না। প্রতিপক্ষে বাধা। জনসন সম্পর্কেও ঐ এক হাল। ফলে সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস এমনকি বছরও কেটে গেল। ইতিমধ্যে ফালক একেবারে পথের ভিখারী হলেন। কোনো-রকম কাজ পাওয়া গেল না। চাকরী দিয়েও তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হত জনসন হারটনেটের হুঁশিয়ারী আর হুমকির ভয়ে। এদিকে মামলা শম্বুকগতিতে চলতে থাকে।

মামলা রুজু হওয়ার সাত বছর পর অবশেষে ম্যানহাটনের আদালতে হাজির হওয়ার সমন পেলেন ফালক। মানহানির এই মামলা প্রতিবাদীর সমর্থনে করলেন টমাস এ বোলার আর তাঁর সহযোগী হলেন জন এফ ল্যাং—প্রাক্তন এফ বি আই। তাঁদের কাছে বসলেন নাইজার, তার পাশে তাঁর সহযোগী পল মার্টিনসন আর সঙ্গে রইলেন আমাদের নথীপত্রের তদারককারী জর্জ বার্কার। হারটনেটের ঠিক বিপরীত দিকে বসলেন ফালক।

জুরি নির্বাচন করতেই পুরো দেড়টি দিন লেগে গেল। দুপক্ষের উকীলরা উদ্বোধনী ভাষণ দিলেন। তারপর সাক্ষ্য গ্রহণের পালা। নাইজার আহ্বান জানালেন—'মিঃ জন হেনরী ফালক আপনি সাক্ষীর কাঠগড়ায় আসুন।'

ফালক এসে সাক্ষীর কাঠগড়ায় উঠলেন। তাঁর ডানদিকে জজ আঙারাথ এবং বাঁদিকে জুরীবৃন্দ, সামনে জনাকীর্ণ আদালত কক্ষ। সব দৃষ্টি ফালকের মুখের ওপর।

নাইজার প্রশ্ন করলেন ফালকের প্রথম দিকের জীবনের কথা, তাঁর শিক্ষা, সামরিক বৃত্তি এবং রাজনৈতিক মতামত প্রসঙ্গে। তারপর এল ব্রডকাস্টিং ও টেলিভিসন জগতে তার ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার ইতিহাস, তিনি সুপারস্টার হয়ে উঠলেন এমন সময় এই 'এ্যাওয়ার বুলেটিনে'র আক্রমণ।

জুরীদের সামনে অজস্র সাক্ষ্যপ্রমাণ জমতে লাগল। পাহাড়প্রমাণ এইসব কাগজ-পত্র দেন হারটনেটকে আড়াল করে একটা প্রাচীর রচনা করল। এর পর টীভি প্রডিউসার সর্ষসিনডকে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য ডাকা হল। সর্ষসিনড জানালেন যে রাজ-নৈতিক সন্দেহের বশে অন্তত ৫০০০ হাজার জনের নাম প্রতি বছর খারিজ করতে হয়। এদের খারিজ করার সময় হয় বলা হত—প্রয়োজনীয় মাপের নয়, লম্বায় একটু কম, কিংবা কেউ বেশী লম্বা—বা ঐ জাতীয় কোনো কিছু, তাদের জানতে দেওয়া হত না যে পিছনে রাজনৈতিক কারণ আছে। সর্ষসিনড সাক্ষ্য হিসাবে বললেন একটি ছোট্ট অভিনেত্রীকে কেন খারিজ করা হয় এবং কিভাবে,

> 'We required the services of a seven or eight-year-old-child actress. It was a back breaking assignment to find a child, who could act well enough, we finally found a child, eight-year old female. The child's name came back unacceptable, politically unreliable'.

এই কথায় আদালতে হাসির ঢেউ উঠল। জজ গেলার তৎক্ষণাৎ সবাইকে চুপ করিয়ে দিলেন। সর্ষসিনড জানালেন মেয়েটির বাবা 'ব্ল্যাকলিসটেড' হয়েছিল সন্দেহভাজন বাম বলে। তাই তার মেয়েও সন্দেহভাজন। একটি জন্য মেয়ে নিতে সর্ষসিনড বাধা হন।

১৯৪৪, ১৯৪৫, ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের কোনো কোনো সভা, সমিতিতে ফালক যোগ দিয়েছিলেন তার কোনোটি কম্যুনিস্ট প্রতিষ্ঠান কিনা এসব নিয়ে কথা উঠল। ফালক সে সব প্রশ্নের জবাব দিলেন তাতে সমস্ত অভিযোগ খণ্ডিত হল।

এ পর্যন্ত লরেন্স জনসন আদালতে আসেন নি একদিনও। তিনি আবেদন করেছিলেন অসুস্থতার দোহাই দিয়ে। ফালকের মামলায় জনসনের যোগাযোগ প্রমাণের জন্য যে সাক্ষ্যটুকুর প্রয়োজন ছিল তা পাওয়া গেল টমাস মরের সাক্ষ্য থেকে। তিনি একটি এ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সীর কাজ করতেন ও ফালকের ব্যাপারে তিনি যখন একটি কাজের চুক্তি স্থির করছিলেন তখন জনসন ফোন করে সতর্ক করে দেন, এবং আমেরিক্যান লিজিয়নকে দিয়ে হুমকি দিয়েছিলেন। জজ এই সাক্ষ্য থেকে জনসনের যোগাযোগ মেনে জুরিদেরও তা মেনে নিতে উপদেশ দিলেন।

হারটনেটকে অজস্র প্রশ্ন করে পেড়ে ফেলা হল। শেষকালে তাঁর নিজের মুখের উক্তি 'আমাকে এক ঝুড়ি মিথ্যা তথ্য বিক্রী করা হয়।'

এরপর আরো নাটকীয় কান্ড ঘটে আদালতকক্ষে। দেখা গেল হারটনেট পকেট থেকে একটা গোলাপী কাগজ বের করে কি সব নোট করছেন। প্রথমে ভাবা গিয়েছিল উকীলকে উপদেশ দেওয়ার জন্য এই নোট। পরে বোঝা গেল আদালতে যাঁরা প্রবেশ করছেন তাঁদের সম্পর্কে। তখন নাইজার প্রশ্ন করলেন, আপনি কি যাঁরা আদালতে আসছেন তাঁদের কারো কারো নাম টুকে রাখছেন।

হারটনেট জবাব দিলেন—হ্যাঁ। নাইজার তখন জুরীদের দিকে চাইলেন। এরপর হারটনেটের উকীল এই প্রসঙ্গ তুললেন—এবং কে কার পাশে বসেছিলেন তা বলে গেলেন। নাইজারের মনে হল কে কার পাশে বসেছেন এই সূত্রে এ্যাওয়ার পত্রিকায় কোনো এক ভবিষ্যৎ সংখ্যায় তাঁদের সর্বনাশ করা হবে।

নাইজার পরে যখন হারটনেটকে আর একবার প্রশ্ন করার সুযোগ পেলেন তখন বললেন—আপনি মিসেস ফালক কোনজন বলতে পারেন?

হারটনেট জবাবে বললেন—হ্যাঁ, ঐ যে—

নাইজার তৎক্ষণাৎ সেই মহিলাকে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর নাম বলতে বললেন, আর সেই মহিলা জানালেন তাঁর নাম সোফার। তিনি মিসেস ফালক নন।

আদালতে হাসির রোল উঠল। নাইজার তৎক্ষণাৎ বললেন—এই আপনার মানুষ চেনার পদ্ধতি? হারটনেট যে বেঠিক দায়িত্বহীন এবং অপরিণামদর্শী তা প্রকাশিত হল স্পষ্টভাবে।

উভয়পক্ষের উকীল সওয়াল করলেন। নাইজার যখন জনসনের কথা বলছেন এমন সময় সংবাদ এল জনসনকে মৃত অবস্থায় আবিষ্কার করা হয়েছে একটা 'মোটেলে'। জজের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ পরামর্শ করা হল। তিনি উপদেশ দিলেন জনসনের মৃত্যু উল্লেখ না করে যা বক্তব্য তা যেন বলা হয়। জজ অভিমত দিলেন যে জনসনের মৃত্যু হলেও তার বিরুদ্ধে মানহানির অভিযোগ চালু থাকবে। পরে জুরিদের সব কথা জানিয়ে বিকাল ৫-০৫ মিঃ হতে জজ গেলার বললেন—

'You may now retire and deliberate—'

বারোজন পুরুষ ও নারী জুরর একটি আলাদা ঘরে বসে ভাগ্য নির্ণয় করছেন। মাঝে মাঝে দু একটা কথা জানার জন্য জুররদের কাছ থেকে লোক এসেছে কিন্তু কোনো সংবাদ নেই। শেষে রাত ১১-৪০ মিঃ আবার আদালত বসল—জুরীরা ফালকের স্বপক্ষে অভিমত দিয়েছেন—

১১—১ ভোটে জুরীরা স্থির করেছেন এ্যাওয়ার, জনসন এবং হারটনেট সকলকে খেসারত দিতে হবে। তাঁদের রায় ফালকের স্বপক্ষে। তাঁরা হারটনেট ও জনসনদের তরফে ১,০০০,০০০ ডলার ক্ষতিপূরণ

ক্যাপিটাল পিউনিটিভ ডামেজেজ হিসাবে এডওয়ার্ডের হয়ে ১,২৫০,০০০ এবং ১,২৫০,০০০ হারউলোটের হয়ে দিতে হবে এই নির্দেশ দিলেন।

আদালত স্তব্ধ। নাইজার বলেছেন, আমরাও এতটা আশা করিনি। বোলান প্রতিবাদীদের তরফ থেকে আবেদন জানিয়েছিলেন এই রায়টা নাকচ করা হোক। জজ গেলার জুরিদের অভিমত সমর্থন করে বলেন—

It seems to the Court, that it was the Jury's purpose that this large award, even if it were not collectible, should stand as a warning to others against indulging in similar conduct.

চরিত্র-হননের প্রচেষ্টা বিফল হল এবং শঙ্কালালী ডাইনী-শিকারী চক্রের হাত থেকে একজন শেষ পর্যন্ত রেহাই পেলেন। জুরীর বিচার বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে রইল।

নাইজারের এই সুবৃহৎ গ্রন্থ একাধারে এক জলন্ত ডকুমেন্ট।

অভয়ঙ্কর

THE JURY RETURNS : By LOUIS NIZER : Published by Doubleday Publishers. 105, Bond Street, Toronto, Ontario. CANADA : Price : $ 7.95 cents.

সাহিত্যের খবর

পরলোকে শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় : সাহিত্যিক সাংবাদিক শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ১২ জুন বায়ান্ন বছর বয়সে মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণে মারা গেছেন। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য জীবন কবিতা লিখে শুরু হলেও, পরে গল্প উপন্যাস, প্রবন্ধ ও বিদেশী গল্পের অনুবাদ করে খ্যাতি অর্জন করেন। শান্তিরঞ্জনের লেখনভঙ্গী এবং রচনা কুশলতা ছিল স্বতন্ত্রমুখী। জীবন সম্পর্কে তাঁর উপলব্ধি ছিল বাস্তবাশ্রিত। 'আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য' তাঁর একটি বিশিষ্ট প্রবন্ধ গ্রন্থ। গল্প ও উপন্যাস গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : জীবন-যৌবন, রমা ও রহিম, শুভরাত্রি, অনিদ্রাক্ষর মুখোমুখি, এসো নীপবনে, মহুরাগিনী, প্রেম ভালবাসা ইত্যাদি, সন্ধ্যা-সকাল, নিরক্ষিতেরেষু, সুসমাচার, তিমিরাভিসার, নতুন নায়িকা, রাত্রির আকাশপথে। অনুবাদ গ্রন্থের মধ্যে আছে : অন্তরঙ্গিনী, দ্বিরাগমন, রাজসূয়, করুণা করো না সেতুবন্ধ যোদ্ধৃদের গান, আশ্চর্য রাত। কবিতা গ্রন্থের নাম চন্দ্রসূর্য।

বাংলাদেশের বগুড়ায় ১৯২০ খৃঃ শান্তিরঞ্জনের জন্ম। শিক্ষা জীবনের শেষে কিছুকাল সৈন্যবিভাগে কাজ করেন। সাংবাদিক জীবনের প্রারম্ভে সংগাত, স্বরাজ, পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা এবং সত্যযুগের সঙ্গে জড়িত হন। ১৯৫৪ খৃঃ আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হন এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত এই কাগজেই সহ-সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করে গেছেন।

শহীদুল্লাহ স্মরণ সভা : পরলোকগত মনীষী ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর ৮৬-তম জন্মদিবস গেছে গত ১০ জুলাই। জ্ঞানতাপস শহীদুল্লাহ ছিলেন মহাপণ্ডিত। ভাষা-বিজ্ঞানী শহীদুল্লাহ ইংরাজি, ফরাসী, জার্মান, সংস্কৃত পালি, প্রাকৃত, আরবী, ফারসী, উর্দু, বৈদিক, আফ্রেস্তান, হিব্রুতী, হিন্দী, সিংহলী, মৈথিলী, আসামী, উড়িয়া প্রভৃতি ভাষায় অসাধারণ জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। সারা জীবন অধ্যাপনা, অধ্যয়ন এবং লেখার মধ্যেই কাটিয়ে গেছেন। প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, অনুবাদ, গবেষণাপত্র, সম্পাদনা, ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় মণীষার স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

এই বিশিষ্ট মণীষার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়নি পূর্ণার বাংলার কোথাও। বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকায় যা সামান্য আলোচনা বেরিয়েছে মাত্র। ডক্টর শহীদুল্লাহের স্মৃতি-বার্ষিকী উপলক্ষে গত বুধবার ১২ জুলাই ঢাকার ছাত্র-শিক্ষক মিলনায়তনে একটি সভার আয়োজন করা হয়েছিল। উদ্যোক্তা ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় শহীদুল্লাহ হল ছাত্র-সংসদ। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন ডক্টর এনামুল হক, ডক্টর মহা-হারুল ইসলাম, ডক্টর নীলিমা ইব্রাহিম ও ডক্টর মনিরুজ্জমান। ডক্টর মনিরুজ্জমান বলেন যে ডঃ শহীদুল্লাহের বিপুল অপ্রকাশিত রচনা বাংলা আকাদেমি প্রকাশের ব্যবস্থা করা কর্তব্য। সভাপতিত্ব করেন ডঃ নীলিমা ইব্রাহিম। অন্যান্য আলোচক ছিলেন কবি জবেদুল কাদির, অধ্যাপক ইদ্রিস আলী, অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম এবং অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক।

অসমীয়া সাহিত্যিকের লোকান্তর : প্রখ্যাত অসমীয়া সাহিত্যিক এবং পণ্ডিত শ্রীদেবানন্দ ভাবহী গত ৭ জুলাই জোড়হাটে পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হোয়েছিল ৮৯ বছর।

সংস্কৃত ভাষাবিদ সম্মেলন : ইউনেস্কোর সহায়তায় এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সমাজ-কল্যাণ মন্ত্রকের উদ্যোগে পাঁচ শতাধিক ভারতীয় ও বিদেশী পণ্ডিতদের উপস্থিতিতে ২৬ মার্চ থেকে সপ্তাহকালব্যাপী সংস্কৃত ভাষাবিদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। দেশী-বিদেশী সংস্কৃত ভাষা বিশেষজ্ঞরা বহু প্রবন্ধ পাঠ করেন। নয়াদিল্লীর বিজ্ঞান-ভবনে প্রদর্শিত 'জার্মানীতে ভারততত্ত্ব' প্রদর্শনীটি যোগদানকারী প্রতিনিধিদের, অতীতের জর্মানী ভারততত্ত্বের চর্চা থেকে কি এক্ষন করতে পেরেছে এবং বর্তমানে তাদের গবেষণার ক্ষেত্র কি সে সম্পর্কে একটি সমাক ধারণা দেওয়া হয়

এই সম্মেলনে পঠিত নিবন্ধগুলির মধ্যে বুদাপেস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ লুই রিনে রচিত 'ভারততত্ত্ব পাশ্চাত্য অবদান' শীর্ষক লেখাটি উপস্থিত সুধী-বৃন্দের মনে বিশেষ রেখাপাত করে। এছাড়া তিনি আর্কিওলজিকাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়াতে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার জন্য সাহিত্যিক সাক্ষ্য প্রমাণ ও ভাষাতত্ত্বের বিশ্লেষণ সম্পর্কে বৈদিক সাহিত্যের মূল্যায়ন সম্পর্কে বলেন। মারবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ ডব্লু রাউ সংস্কৃত নির্মাণ বিন্যাস বৈদিক রচনা সম্পর্কে একটি লেখা পড়েন। কোলন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ কে এল জানেৎ প্রাচীনতম ভারতীয় পাণ্ডুলিপির অংশবিশেষে প্রত্নপ্রস্তরযুগীয় প্রভাব' সম্পর্কে আলোচনা করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ এইচ বেসার্ট মধ্য এশিয়ার সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি' এবং হাইডেলবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণ এশিয়া ইনস্টিটিউটের প্রতিনিধি ডঃ হিনবোথাইমার 'ধর্মশাস্ত্র এবং অর্থশাস্ত্র অধ্যয়নে জ্ঞান অবদান' সম্পর্কে মূল্যবান আলোচনা করেন।

ডঃ খিমে বলেছেন এই সম্মেলনে সংস্কৃত ভাষার মহিমান্বিত প্রতীকের পদপ্রান্তে আমরা আমাদের পুষ্পার্ঘ্য রাখতে পেরে নিজেদের সুখী ও ধন্য মনে করছি। সংস্কৃত ভাষা এবং বহু যুগের প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা—দেবী সরস্বতীর পদপ্রান্তে যাকে আমরা প্রত্যেকে নিজস্ব পদ্ধতিতে সাধনা করেছি, তাকে শুধু ফুল দিয়ে নয় বরং বিনম্র মহান উৎসর্গীকৃত সেবা নিবেদন করবো। সংস্কৃত ভাষার মহত্ত্ব ভারতেই নয় বরং সারা বিশ্বে কতখানি সেই চিন্তা করার জন্য আমরা এই সমসাময়িক পৃথিবীতে একত্রিত হয়েছি। আমাদের এই বিশ্ব দ্রুত পরিবর্তনশীল। প্রত্যেকটি বস্তুই যেন প্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে। গতকাল যা ছিল আজ তার চিহ্ন মাত্র নেই। তা সত্ত্বেও এই পরিবর্তনশীল বিশ্বে এখন কতকগুলি মূল্যবোধ আছে যা আমরা হাত ছাড়া হতে দেব না। অতীতের সম্পদ ও প্রাচীন ঐতিহ্যকে আমরা ধরে রাখবো।

নতুন বই

অন্যান্য গল্পের গল্প—অঞ্জনা ১৭।২।৩, সাহ সেন স্ট্রীট, কলকাতা ১২। মূল্য তিন টাকা বারো আনা।

মোট বত্রিশটি গল্প এই সংকলনে স্থান পেয়েছে। গল্পগুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। রাজনৈতিক গল্প এবং সাধারণ গল্প। সাধারণ গল্পগুলির মধ্যে একটির সুর স্পষ্ট শোনা যায়। লেখকের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ দৃষ্টি, ভাষার চমৎকার। সমগ্রভাবে লেখা স্বচ্ছ, পরিশীলিত। 'তরঙ্গ' গল্পটির মধ্যে 'থার্ড ডাইমেনসান' এর আভাষ স্পষ্ট। একটা 'ওল্ডম্যান এ্যাণ্ড দ সী'র (হেমিংওয়ে) প্রতিচ্ছবি ভেসে ওঠে।

রাজনৈতিক গল্পগুলি, যেমন—'প্রেমী-বন্ধু', 'আমি' 'ধোঁয়া' এগুলো লক্ষ্য প্রকৃতই বাস্তবধর্মী। ভাষা সুন্দর, সাবলীল। সিচুয়েশন তৈরীও প্রায় পুরোপুরি। সাম্প্রতিক-কালে পশ্চিমবঙ্গের ওপর দিয়ে যেসব নারকীয় ঘটনার ঝঞ্ঝা সমারোহ ঘটে গেছে, তার প্রতিচ্ছবি এই শ্রেণীর গল্পগুলির উপাদান। এই উপাদানের আহরণ বাংলা সাহিত্যে প্রায় অনুপস্থিত বললেই হয়। সেদিক থেকে গ্রীষ্মের নতুনত্ব অনস্বীকার্য। শুধু তাই নয়, এই উগ্র এবং বার্থ রাজনীতির মূল কেন্দ্রভূমিতে পৌঁছবার মত মানসিক শিক্ষা ও তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা তাঁর আছে। যন্ত্রণার উৎস ক্ষেত্রে তিনি সহজেই পৌঁছেছেন।

শুধু একটি অসম্পূর্ণতা এই শ্রেণীর গল্পগুলিকে কিছুটা পঙ্গু করে রেখেছে বলে মনে হয়েছে। এই গল্পগুলির সমাপ্তির মধ্যে গভীর মন্থনের অভিব্যক্তি তেমন ব্যঞ্জিত হয়নি, যা হয়তো লেখক হয়ত মনে মনে প্রত্যাশা করেছিলেন।

যেমন 'আমি' গল্পটি। উগ্রপন্থী রাজনৈতিক কর্মী অনি গুলীতে নিহত। তার পিতা, একদা যিনি উগ্রপন্থী রাজনীতি করতেন এবং যিনি হিংসাকেই সর্বহারা শ্রেণীর মুক্তির পথ বলে সারাজীবন স্বীকার করে এসেছিলেন, তিনি দাঁড়িয়ে নিহত ছেলের মৃতদেহ দেখছেন। এখানে পিতার মানসিক প্রতিক্রিয়া বর্ণনা, তাঁর কাছে বন্ধুদের অভিব্যক্তি (যা গল্পের এতখানি পথ হেঁটে আসার পর প্রথম ও শেষ ফসলের মত) অসম্পূর্ণ নয়, অস্বাভাবিক। নিজের ছেলেকে সামনে এলে মানুষের কি কোন বক্তব্য থাকে? থাকবে যেমন থাকে না তেমনি আমি যে কুরুক্ষেত্রে চাই বাংলার ঘাসে—এমন জীবনানন্দ-সুলভ মানসিকতাও তখন থাকে কি?

'শ্রেণী শত্রু, শ্রেণীর প্রশ্ন নয়'—রাজনৈতিক গল্প দুটিও তীব্রভূমির প্রান্তে এসে কিছুটা ব্যর্থ হয়েছে বলে আমাদের ধারণা। ছোট গল্পের সমাপ্তি সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। গল্পের ঝোলো দুধ সেখানে এসে ক্ষীরের মত ঘন হয়, তার রস নিবিড় হয়। এই নিবিড়তায় না এলে ছোট গল্প সংবাদপত্রের রিপোর্টের একটা উন্নত সংস্করণ হয় মাত্র, গল্প হয় না।

লেখককে এই সমাপ্তির দিকে আরো একটু গুরুত্ব দেবার জন্য আমরা অনুরোধ জানাবো।

শতাব্দী তোমার কপালে খোলো। কবিতা-সংকলন। ভুবন মুখোপাধ্যায়। নিলয়, ৩৯এ, বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা—৯। তিন টাকা।

'শতাব্দী তোমার কপালে খোলো' তরুণ কবি ভুবন মুখোপাধ্যায়ের সদ্যতম প্রথম কাব্যগ্রন্থ। কবির আলোর পিপাসা অসাধারণ। এ পিপাসা কবির অমৃত-ভাবনারই প্রতীক। কণিষ্কের অনন্ত শতাব্দীর প্রতীক-প্রতিমা সেকার হাত পেয়েছেন এই বলে—'তুমি যে আমার সূর্যের মুখ দেখতে দেবে না—'। এ আমি কেমন করে সহ্য করবো।' দুঃখের মূল্য দিয়ে এবং নিয়ে কবি অনন্তকাল যাত্রা করতে চান। তাই কবির অকপট স্বীকৃতি—'রজনীগন্ধার হাতে শিশিরের মত/আমি তোমার কাছে নিয়ে যাবো/শেষ বিদায়ের বাণী বাঙলা—/তোমার চোখের জলে আমার যাত্রা শুরু।' কবি কখনো গদ্যছন্দে, কখনো বা মাত্রাবৃত্তে অধিকাংশ কবিতা রচনা করেছেন। প্রেম, নারী, বাংলাদেশ, হো চি মিন এ সমস্ত বিষয়কেই কবি যে ছন্দ ও চিত্রল শব্দের আলোয় প্রকাশ করেছেন, তা কবির সূক্ষ্ম কবিত্বের পরিচায়ক।

রক্তমাংসে সমাচার (গল্প সংকলন)। জগত বন্দ্যোপাধ্যায়। দেবশ্রী সাহিত্য সম্মেলন, ৬৭-সি, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা—১২। দু' টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

'রক্তমাংসে সমাচার' গল্পগ্রন্থটি লেখক জগত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সদ্যতম প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। গ্রন্থটিতে তিনটি ছোট গল্প আছে—'রক্তমাংস সমাচার', 'কয়েদনগরের গল্প' ও 'চড়ুই'। জগতবাবু ছোট গল্পের প্রচলিত কোন রীতি মানেন নি। অর্থাৎ কাহিনী, ঘটনা, বাস্তব চরিত্র ও চরিত্র-নিহিত জটিল মনস্তত্ত্ব, তদনুরূপ পরিণতি তাঁর রচনায় মিলবে না। সুতরাং 'এ্যাভারেজ পাঠক' এ গ্রন্থ পাঠে নিশ্চয়ই হতাশ হবেন। কারণ গল্প তিনটির বিষয় ক্ষুদ্র, প্রকাশভঙ্গি চিত্রধর্মী ও কবিত্বপূর্ণ। কাহিনী, ঘটনা নয় নিয়ে যারা প্রতীকী ও নিরাসক্তীতির গল্প লিখতে অভ্যস্ত, জগতবাবু তাদের মধ্যে একজন সচেতন প্রতিভূতিতুল্যরূপ ও ক্ষমতাবান শিল্পী। গ্রন্থটির নাম গল্পের নামিকা চুয়া, চুয়ার স্বামী অতীন আর গল্পের শুরুর মত শাশুড়ীর সেই কথাটি 'বৌমা, ও বৌমা, কাঠটা' এবং শেষে চুয়ার

অন্যান্য গল্পের গল্প, কয়েদনগরের গল্প, চড়ুই, তরঙ্গ, রক্তমাংস সমাচার—সব মিলিয়ে গল্পের ভূমিতে জগত বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙলা একটি 'কয়েদনগরের গল্প' শীল হিথির মেয়েটির চিত্র, 'চড়ুই' গল্পে পাখির রূপকে খণ্ড, সদানন্দের চড়ুই ও আমা সংক্রান্ত ছায়াময় অনুষঙ্গগুলি সূক্ষ্ম চিত্র ও কবিত্বে অসাধারণ হয়ে উঠেছে। জগতবাবুর গদ্য ও প্রকাশভঙ্গি কাব্যধর্মী, চিত্রাত্মক। কিন্তু প্রত্যেকটি গল্পে পর পর এত চিত্রের সমাবেশ; যেখানে একটা শব্দ বা বাক্যাংশ অথবা সমগ্র বাক্যই সূক্ষ্ম চিত্রের ব্যঞ্জনা দেয়, নিরাসক্ত গল্পের স্বভাবই পাঠককে ক্লান্ত করবে না কি? পুনরুক্তি, গভীর প্রচ্ছন্নতা বিষয়-অনুসারী।

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

কণ্ঠস্বর সম্পাদক—শ্রীহরিপ্রসন্ন বিশ্বাস। ১১।২ টেমার লেন, কলিকাতা-৯। মূল্য ৫০ পয়সা।

প্রতি বছরের মত এবারও কণ্ঠস্বর রবীন্দ্র-জয়ন্তী সংখ্যা বের হয়েছে। আধুনিক কবিতার পরীক্ষা-নিরীক্ষার মুখপত্র এ পত্রিকাটির এবার পাঁচ বছর পূর্ণ হল। প্রধানতঃ তরুণদের দ্বারা, তরুণদের জন্য এ পত্রিকাটির প্রায় প্রতিটি সংখ্যাই বিশেষ সংখ্যা। রবীন্দ্র-জয়ন্তীতে প্রকাশিত অসংখ্য পত্র-পত্রিকার মধ্যে এ পত্রিকাটির একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকায় জানবেই এ সংখ্যাটি সংগ্রহ করে রাখবেন বলে বিশ্বাস। পরিচ্ছন্ন এ সংখ্যাটির প্রথম লাইন থেকে শেষ লাইন পর্যন্ত। রবীন্দ্রনাথকে নিবেদিত কবিতা, প্রবন্ধ, প্রবন্ধাংশ, সাহিত্যিকদের শ্রদ্ধাঞ্জলি ও রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রের দুটি চিঠি সংখ্যাটির আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছে। 'আমার সত্তায় রবীন্দ্রনাথ' এই পর্যায়ে লিখেছেন—নবেন্দু রায়, মৃণাল গঙ্গোপাধ্যায়, ইন্দ্রনীল, বিমল মুখোপাধ্যায়, কবিতা সিংহ প্রমুখ। লেখাগুলি একরকম চমৎকার। চিঠিপত্রের উপর অমিতাভ চৌধুরীর রচনাটি সংখ্যাটির আকর্ষণ বাড়িয়েছে। চিঠিপত্রে এবার রবীন্দ্র অনুষ্ঠানের এ পত্রিকাটি হাতিয়ার ছিল।

নিনাদ (একাদশ সংকলন)—সম্পাদক : নজরুল বারী। বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, ঢাকা মহাবিদ্যালয় শাখা কর্তৃক প্রকাশিত।

ছাত্র ইউনিয়নের মুখপত্র হলেও সংকলনটি সুনির্বাচিত রচনার আকর্ষণীয়। গাজসাল ইসলাম নিজামীর আঁকা একটি ছবি যেন যুদ্ধের ভয়াবহতা ও মুক্তিসংগ্রামের প্রতীক হয়ে উঠেছে আশ্চর্যরকম। এই সংকলনে লিখেছেন শামসুর রাহমান, মুনাওয়ারা আফসার, সাইফুর রহমান, সলিমুল্লাহ খান, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, তরুণ সান্যাল এবং আরো কয়েকজন। 'ভালো লাগার গোলাপ গোলাপ' সোহরাওয়ার্দী 'গোলাপের জন্য প্রতীক্ষা'। শামসুল হক 'ওয়েটিং ফর গোদো' অবলম্বনে লেখা একটি নতুন আঙ্গিকের রচনা।

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

প্রতিশ্রুতি

।। ২৭ ।।

ক্রমশই এই নিঃসঙ্গতা বোধ ও সংসার সম্বন্ধে বীতস্পৃহা বেড়ে যায় হেমন্তর। কেউ নেই তার। কিছুই নেই—মিছিমিছি কেন এই ঠাট? এই কথাই কেবল মনে হয়।

মণিকার আবার একটি মেয়ে হয়েছে, গোপালের দু বছর বয়সে ওদের দেখাশুনো, হেমন্ত নাম রেখেছে কমলা। ফুটফুটে মেয়ে, মায়ের মতোই দেখতে হত হয়ত—কিন্তু ফরসেপ ডেলিভারীর সময় শেষ পর্যন্ত বুঝি ডাক্তারের আঙুলের প্রবল চাপে মাথা দুটো অস্বাভাবিক চাপা হয়ে গেছে। হয়ত বড় হলে এতটা থাকবে না, এখন খুব খারাপ দেখায়, অত সুন্দর মুখের শ্রীটাই গেছে নষ্ট হয়ে।

দুটো ছেলেমেয়ে দেখার অসুবিধে বলে হেমন্ত আলাদা একটি ঝি রেখেছে—পুরোনো জানাশুনো—খরচের কোন হদিস করে না। ঝি খাওয়া লাগায় ভালো-পোশাকে ওষুধে ধনীর সন্তানের মতোই মানুষ হয় ওরা। এক-একবার মনে হয় আগেরদিন হলে বলতও—মণিকাকে শুনিয়ে বলে, পরের ষোড়শীবাবুর ছেলেমেয়ে কি এ ভাবে কোনদিন মানুষ হয়েছে? তার ঘরে পড়লি না বলে তো দুঃখে পরাণ ফাটে, সেখানে কি এই বাজার চালে থাকত ছেলে-মেয়ে? বুকে হাত দিয়ে সত্যি করে বল দিকি।' কিন্তু বলে না, অপ্রীতি বাড়াতে ইচ্ছে করে না। কিছুই বলতে ইচ্ছে করে না কাউকে প্রীতিকর অপ্রীতিকর কোন কথাই—নির্লিপ্ত উদাসীনভাবেই থাকতে চায়। যা কিছু কথা ওর এই বাচ্চা দুটোর সঙ্গেই। কমলা কথা বলতে পারে না, তবু তার সঙ্গেই এক তরফা বকে যায়—তাতেই খানিকটা শান্তি।

মণিকারও সে উত্তাপ সে জ্বালাটা কমেছে অনেকটা। নিমাইয়ের চেষ্টাতেই বোনের একটা বিয়ে হয়ে গেছে। ওরই অফিসের এক সহকর্মীর ভাই, আবাসের বাড়ি মাত্রিক পাশ করে কাজ করে—নিজেদের বাড়িঘর আছে। একমাত্র ভাই সম্বন্ধ ওদের পক্ষে। হেমন্ত বিয়ের সময় এক ভোড় বাসন ও নগদ দুশো টাকা মণিকার হাতে দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিল তাতেই নাকি কেন মতে সম্মান রক্ষা হয়েছে।

কৃতজ্ঞ হওয়াই কথা, স্বামী-শাশুড়ি দুজনের কাছেই। বিশেষ এরা ষোড়শী-বাবু, নতুন স্ত্রীর ভয়ে সম্ভবত একখানা হাওড়ার হাতের তাঁতের শাড়ি ছাড়া কিছু দিতে পারেননি। তবু মণিকার সে উৎসাহ ভাবটা যায় না। অবশ্য আগের জ্বালা আর নেই, কথায় কথায় নিমাইকে অপমান করা, অকথাকুকথা শোনানোটা বন্ধ হয়েছে, ভাগাকে অনেকটা মেনেই নিয়েছে—কে জানে কেন হেমন্ত সম্বন্ধে বিদ্বেষের ভাবটা যেন কিছুতেই যায় না। কেন, তা অনেক ভেবেও বুঝতে পারে না হেমন্ত, নিমাইও না। এক শাশুড়ি সম্বন্ধে বধূদের সহজাত বিদ্বেষ—শাশুড়ি হলেই তার ওপর আক্রোশ হবে—না অন্য কোন কারণ আছে?

তবু দিন-রাত ঘটাঘটি, কথা কাটা-কাটি বন্ধ করে কথার আদানপ্রদানটা করছে—এই একটা তবু শান্তি। এতেই অনেকটা খুশী হেমন্ত। আর কিছু না হোক নিজের মনটা উদার, নিজের মুখটা ছোট হওয়ার থেকে তো অব্যাহতি। নিজেকে নিয়ে, নিজের ভাগ্য নিয়ে একা চুপচাপ থাকতে পারে—এইটুকুই ভেবে।

হয়ত এইভাবেই চলত, অনন্তকাল না হোক, অনেকদিন। হয়ত এইভাবেই ছেলে-মেয়ে দুটো বড় হত, লেখাপড়া করত, পৈতে বিয়েথা হত—আরও ভাইবোন হয়ে যেত ওদের, তাদেরও মানুষ করত এই রকম করে—একটানা একঘেয়ে জীবন-যাত্রা বয়ে যেত যেমন আর পাঁচটা পরিবারে হয়। তবে ঘোলাটে নিজেই, মনে মনে অনেক বিষয়ে স্থির করে ফেলে-ছিল মণিকাও ভেবেছিল তাই—তবে সে অন্যরকম, কোনদিন নিজের মাতৃত্বের নিজস্ব সংসার সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠা হয় না—এইভাবেই বুড়ি হয়ে যাবে সে একদা। হয়ত কিছুদিন আগে হলে হেমন্তও তাই ভাবত, অবশ্য তাতে বিস্মিত হবার, ক্ষুব্ধ হবার—মনে কিছু, ভাবার কি পরি-বর্তন করবে কোন কারণ দেখত না।

কিন্তু ক্রমশ হেমন্তর মনে এই একঘেয়ে জীবন, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত—বাঁধার পরে বাঁধা আর খাওয়ার পরে বাঁধা ঘোড়ের এই গতানুগতিক একটা বিশেষ বাঁধা ছকে বাঁধা পথে আবর্তন এ যেন আর সহ্য হল না। অনেকদিন ধরেই হাঁপিয়ে উঠেছিল, হয়ত মনস্থির করে ফেলল—আর নয়। এখান এভাবে আর নয়। নিশ্চয়ই যদি থাকতে হয় কারও সঙ্গে দুটো প্রাণ খুলে কথাই না বলতে পারে, তাহলে এ সংসারে থেকে লাভ কি? নিজের সংসারে নিজে চোর হয়ে থাকা! এ সাধ তুলে দেওয়াই তো ভাল!...

কলকাতায় যারা পরিচিত ছিল, আপনার লোকের মতো তারা সকলেই চলে গেছে। পূর্ণবাবুর স্ত্রী এক পরিবার ছিল—তিনিও মারা গেছেন। এখানে আর কোন আকর্ষণ কোন বন্ধন নেই। এক যে পায়ের বেড়ি হতে পারত গোরা—তার ওপরই যা একটু অন্তরঙ্গতা পড়েছিল সে নিজে থেকেই বেড়ি ভেঙে অব্যাহতি নিয়ে গেছে। নিমাই কোনদিনই আপন হয়নি, হয়ত হেমন্তরই দোষ সেটা, আপন করতে চায়নি। যাই হোক, নিজের সংসার নিয়ে সাধী না হোক বান্ত পরিপূর্ণ সে বিধু হয়ে গেছে। আর কেন?

সম্পর্কে আপনার লোক কিছু আছে বৈকি। কিন্তু হেমন্ত তাদের আপন হতে বা আপন করতে পারেনি।

নিজের বোন বোনপোরা কে কোথায় ছড়িয়ে আছে, যোগাযোগ হয়নি। করারও ইচ্ছে নেই আর। অনেক তো করে দেখল; তার অদৃষ্টে কোন স্নেহের বন্ধন লেখেননি ভগবান। মিছিমিছি আরও আঘাত আরও অপমান বেচে নিতে গিয়ে লাভ কি? সবচেয়ে বড় কথা—যাকে অবলম্বন করতে পারলে শেষ জীবনে একটু শান্তি পেতে পারত, হয়ত, তাকে নিজেই সরিয়ে দিল—এই বাইরের ধক্কাল জড়িয়ে, ছেঁড়াচুলে খোঁপা পরতে গিয়ে।.. কে জানে, সুরেনেরই ক্ষতি করল কিনা।

সুরেন এখানের চাকরি ছেড়ে দিয়ে কুষ্টিয়ার এক কাপড়ের কলে কাজ নিয়ে চলে গেছে। অনেক ধরপাকড় করেই নাকি সে চাকরি জোগাড় করেছে, অথচ আর্থিক সুবিধা কিছু হয়নি। প্রায় একই রকম আয় থেকে গেছে, হয়ত চার-পাঁচ টাকা বেশী হতে পারে। এ যেন কলকাতা থেকে পালাবার জন্যেই চলে যাওয়া। এই মেয়েটা বুঝি সুরেনের জীবনেও অভিশাপের মতো এল। কেউ নয় সে নিমাইয়ের সঙ্গে তার কোন সম্পর্কও নেই, মাঝখান থেকে হেমন্তই তাকে জড়িয়ে এই অনিষ্টটি করল। নিজেরও, সুরেনেরও।

একবার ভাবে তখন যদি নিমাইকেই সরিয়ে দিত—তাহলে হয়ত সুরেনকে অবলম্বন করা অসম্ভব হত না। আবার ভাবে, তাতে আরও কুফলই হয়ত হত। তার জন্যে মণিকারা পর হয়ে গেল, পথে বসল—এ জেনে সে কিছুতেই ওর কাছে আসত না, কোনদিনই। সে প্রস্তাবেই হয়ত চাকরি ছেড়ে দেশান্তরী হয়ে যেত। অনিষ্ট যা হবার তা আগেই হয়ে গিয়েছে, এই বিদ্বেষে তাকে জড়াতে গিয়েই।

কিন্তু এসব চিন্তাও তো এখন অনর্থক। জীবন ভোর তো ভুলই করে গেল। কোনটা কতটুকু বেশী আর কোনটা কতটুকু কম, সে হিসেব এখন আর করে লাভ নেই।

হঠাৎই মন স্থির করে ফেলল একদিন।

নিমাইকে ডেকে বলল, 'তুই একটা ভাল মেসটেস দেখে নে নিমু, এখানকার পাট তুলে দোব এবার।'

বিনামেঘে বজ্রাঘাত কথাটা বহুবার শুনেছে নিমাই, এইবার জিনিসটা বুঝল। প্রথম তো ব্যাপারটা বুঝতেই পারল না ভাল করে, হতভম্ব হয়ে অবাক হয়ে চেয়ে বসে রইল, তারপর মানে বা আবছা আবছা, শব্দগুলো নিজের মনে মনে পুনরাবৃত্তি করে একটু বুঝতে পারল—সে শুধু তার শব্দগত অর্থই, মর্মার্থ তখনও মাথায় পৌঁছল না। গলা এমন আড়ষ্ট হয়ে গেল যে, কোন প্রশ্ন করা কি কথার উদ্দেশ্যটা বুঝতে চাওয়ারও শক্তি রইল না অনেকক্ষণ।

এতদিনে, সবে—এই বোধহয় প্রথমটা জন্মাবার পর অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত হয়ে আশার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল—এই সম্পত্তি তার না হোক তার ছেলেমেয়েদের কপালেই নাচছে এই রকম একটা ধারণা হতে শুরু করেছিল সেই সঙ্গে তার সংসারও এখানেই দৃঢ়মূল হল এই রকম একটা বিশ্বাস, এমন সময়ে এ আবার কী রকম কথাবার্তা?.....

অনেকক্ষণ, বোধহয় পাঁচ-ছ মিনিট পরে, বিস্তর চেষ্টায় গলায় স্বর ফুটল তার—'তার মানে?'

'কেন, মানে না বোঝার মতো কিছু বলেছি নাকি?' হেমন্ত ধমক দিয়ে ওঠে প্রায়, 'এখানকার সংসার তুলে দোব। এখানে থাকলে ছেলেমেয়ে দুটো মানুষ হবে না, সেই পোরার মতোই হাল হবে। কাশীতে বাড়ী কিনব, সেইখানেই থাকব গিয়ে। ওরা সেখানে পড়বে—ক্যান্টনমেন্টের ইস্কুলে।'

আবারও কিছুক্ষণ সময় লাগে—কথাগুলোর মধ্যে থেকে মানেটা ছেঁকে নিতে। প্রশ্ন করতে আরও খানিকটা। গলা যে আপনিই এমন শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায় মানুষের, কোন পরিশ্রম কি রোদে ঘোরাঘুরি না করেও—তা কে জানত! অবশেষে অনেক কষ্টে শুধু তিনটি শব্দ উচ্চারণ করে, 'তা ওদের গর্ভধারিণী?'

'আ মরণ তোমার! ওদের গর্ভধারিণী ওদের সঙ্গেই যাবে। সে আবার কোথায় থাকবে!...আবার শুদ্ধভাষা— গর্ভধারিণী! ...ঐ কচি শিশু দুটোকে নিয়ে যাচ্ছি কার ভরসায় তাহলে?...মা ছেড়ে কি থাকতে পারে এখন থেকে? ওদের সবাইকে নিয়ে চলে যাব একেবারে, এখানের বাড়ি ভাড়া দিয়ে। সেই জন্যেই তো তোকে মেস দেখতে বলছি একটা!'

আবারও কিছুক্ষণ কয়েকমুহূর্ত অখণ্ড নীরবতা একটা।

আবারও অতি কষ্টে, যেন আর কার ঠোঁট ও জিভ নড়ে তেমনি প্রশ্ন বেরিয়ে আসে, 'তা তারপর?'

'তারপর আর কি, তুই মেসে থাকবি, চার মাস ছ মাস অন্তর যেমন যেমন ছুটি পাবি গিয়ে দেখে আসবি। তোর তো সংসারের জন্যে এক পয়সা খরচ হচ্ছে না, শুধু মেসে থাকা খাওয়ার যেটুকু—সেই পয়সাটা রেল কোম্পানিকে দিবি, তাতেও ঢের বাঁচবে।...তোর আপিসে যে সব হিন্দুস্থানী মিস্ত্রী আছে, তারা কি করে খোঁজ করে দেখিস, কেউ এক বছর কেউ দেড় বছর অন্তর দেশে যায়। ঐ মাইনেতেই তাদের সংসার চালাতে হয় বলে ঘন ঘন যাওয়া হয় না, তোর তো সেসব দায়-দায়িত্ব রইল না।'

আর কোন কথা বলতে পারল না নিমাই। কী বলবে? এ প্রস্তাব যে কেউ করতে পারে, করা সম্ভব তাই তো ধারণায় আসে না। এতো মাথা খারাপের লক্ষণ। উন্মাদ-পাগল না হলে একথা কেউ বলত না, সেক্ষেত্রে সে কী জবাব দেবে, কাকে দেবে? এরকম কোন প্রস্তাবের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা মাথায় থাকলে তার উত্তর একটা ভাবার চেষ্টা করত। এখন তো তারই মাথা খারাপ হবার যোগাড়। এই আকস্মিক ধাক্কায়—কিছু ভাবা কি বোঝার মতোই তো অবস্থা নেই।...

তখনও কিছু বলতে পারল না, তারপরও অনেকক্ষণ নয়। গুম হয়ে বসে রইল অনেকক্ষণ সেইখানেই। হেমন্তর তখন বোমা ফেলা হয়ে গেছে—সে নিশ্চিন্ত হয়ে তার দুঃসাধপত্রের খাতা নিয়ে বসল, নিমাইয়ের দিকে ফিরেও তাকাল না বা এ প্রসঙ্গে অন্য কোন আলোচনা করারও চেষ্টা করল না।

সেই ভাবেই নিঃশব্দে বসে থাকার পর নিজের ঘরে এসে শুয়ে পড়ল নিমাই। উঠলও না, খেতেও গেল না।

হেমন্ত যে সে খবর না পেল তা নয়, তবে খাওয়ার জন্যে সাধাসাধি করার মানুষ নয় সে। জীবনের এসব স্তর অনেকদিন পেরিয়ে এসেছে। যাদের জন্য এতটা বাস্ত হওয়া চলত তারা কেউ নেই আর। উদ্বিগ্ন হওয়ারও কোন কারণ নেই। কেন যে খাচ্ছে না সে কারণ তো জানাই। এটুকু বিচলিত হবে বৈকি, আকস্মিক এত বড় একটা পরিবর্তন—বলতে গেলে একটা বিপর্যয়ের প্রস্তাবে।

সাধাসাধি মণিকাও করল না। ঠিকে লোক রান্না করে চলে গেছে। রাত্রের খাবার ওই পরিবেশন করে। হেমন্ত এখন রাত্রে শুধু দুধ আর ফল খায়—তার খাবার সাজিয়ে দিয়ে নিজে খেয়ে রান্নাঘর সেরে নিশ্চিন্ত সহজভাবেই শুতে এল।

দরজা কথ হতে প্রথম প্রশ্ন করল নিমাই, 'শুনলে কথাটা? সব শুনলে?'

'শুনলুম বৈকি।'

'এরপরেও মুখে ভাত উঠল, বেশ খেতে পারলে! ধন্য, ধন্য, তুমি!'

'ওমা, তা এর সঙ্গে না খাওয়ার কি আছে? খাওয়ার সঙ্গে এর সম্পর্ক কি? কর্তার ইচ্ছের কর্ম এখানেও তাঁর কাছে আছি সেখানেও তাঁর কাছে থাকব। এর মধ্যে এত আপোস-তাপোস করার কি আছে?'

'তার মানে? তা হলে তুমি চলে যাবে ওর সঙ্গে?'

'তুমি বড় বাজে কথা বল। আমি কি যাওয়া না-যাওয়ার মালিক? আমি কে যে, যাবো কি যাবো না ঠিক করব, ভাবতে বসব আমি হলুম হুকুমের বাঁদী, যা হুকুম করবে তাই করব। দাপুড়ি-দাপুড়ির ছেলে—সবাই তো আমার মালিক, আমার মাথা কিনে রেখেছে। আমার কিছু ভাবারও নেই, ঠিক করারও নেই। তোমরা তোমাদের মতো ঠিক করবে—আমি যেমন হুকুম পাবো তেমনি তেমনি সাজ করব। আমার অত ভাবনার দরকার কি?'

এই বলে সে যেন বেশ গুছিয়ে আরাম করে শোয়, পাশ বালিশটা টেনে নিয়ে।

প্রায় সেই সঙ্গেই উত্তেজিত হয়ে উঠে বসে নিমাই, 'উঃ! হুকুম! কিসের হুকুম। ওসব হুকুমটুকুম আমি মানি না। আমার পরিবার আমার ছেলেমেয়ে। তারা কোথায় থাকবে না থাকবে সে আমি বুঝব। ও'র সঙ্গে সবাইকে পাঠিয়ে দিয়ে ভ্যাগাবেন্ডের মতো ঘুরে বেড়াব নাকি?'

'তোমার পরিবার তোমার ছেলেমেয়ে পোষবার মতো ক্ষমতা আছে? ও থাকলে

হুকুম শুনবেই বা কেন? আর তা ছাড়া এ হুকুম দেওয়ারও সাহস হত না। জানে যে এক কড়ার মুরোদ নেই, তাই চোখ রাঙাতে সাহস করে।'

'আচ্ছা! মুরোদ আছে কি নেই সে বোঝা যাবে। আমি আমার মতো চলব। মাথার ওপর যে এলেকট্রার পাখা ঘোরাতে হবে কি বাধ্যনী বসুন রেখে বসে থেতে হবে তার কি মানে আছে? আমার সঙ্গে বাজ করে হরিণ বসাক, সাতটা প্রাণী ভার সংসারে, খাচ্ছে নাচ্ছে ওপোস করে আছে, নাকি?'

আর কথা কয় না গিন্নিমা। এইটেই বৌদের মাথায় বেশী বাজ ফেলেছে, শাশুড়ির প্রতি বিদ্বেষটা প্রবল করেই। বলার আগে যতটা ভাঁজায় বোঝা যায়নও। হরিণ বসাকের বৌয়ের মতো সংসার করবে—একমাত্র নিমাইয়ের ভরসায়—খুব উৎসাহ নেই তার। এত আকর্ষণ নেই স্বামীর ওপর, অত পরিশ্রম করারও সাধ নেই।

সারারাত ঘুমোয় না নিমাই। বলতে গেলে জীবন-মরণের প্রশ্ন তার সামনে। অনেক সহ্য করেছে সে এই বিষয়ের মুখে চেয়ে অনেক সহিষ্ণুতা ও ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছে। অমানুষিক অপমান ও লাঞ্ছনা সহ্য করেছে এতদিন। সেই বিষয়—এই বিপুল বিত্তের আশা এক কথায় ছেড়ে দেবে? এতদিনের এত দুঃখ এত কষ্ট সব ব্যর্থ হয়ে যাবে?

আবার অন্যদিকটাও ভাবে।

জাঠাইমের যে কথা সেই কাজ এতদিন ধরে দেখে এটুকু বেশ চিনেছে সে। মা যখন ধরেছে তখন ছাড়বে না। বাধা দিলে আরও বেঁকে দাঁড়াবে। মায়ের সিং বাঁকা হওয়ার বেলায় একা। এ মানুষকে নোয়ানো যাবে না। বিষয়ের আশা রাখতে গেলে, ছেলেদের ভবিষ্যৎ ভাবতে গেলে—ওরা ভালভাবেই মানুষ হয়ে হয়ত ওখানে গেলি—এই মত মা দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। তার মানে স্ত্রী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সম্পর্ক একরকম তুলে দেওয়া।

হয়ত তেমন সুদূর ভবিষ্যতে আবার নরম হতে পারে, তখন হয়ত ওকেই সেখানে নিয়ে যেতে পারে কিম্বা আবার কলকাতাতেই ফিরে আসতে পারে—তবে সে অনিশ্চিত, মায়ের মুখ চেয়ে থাকা।...এক যদি মরে যায়। বয়স হয়েছে, মরার বয়সই হয়েছে। কিন্তু এখনও যা শক্ত শরীর সহজে মরবে বলে মনে হয় না। তাছাড়া এ সংসারে যারা জন্মাতে এসেছে তারা চট করে মরে না।

সারারাত ভেবেও মন স্থির করতে পারল না। মণিকার কাছ থেকে কোন সাহায্য—যুক্তি-পরামর্শ পাবার উপায় নেই। সে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। সুতরাং সকাল-বেলাও দুশ্চিন্তা নিয়েই উঠল।

সেই ভাবেই বাটল ঘণ্টাখানেক।

হয়ত এই চিন্তা নিয়ে আপিস গিয়ে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে পরামর্শ করলে মধ্যা-চিন্তা কিছু বেরোত কিন্তু তার আগেই, হঠাৎ একটা ব্যাপার ঘটে গেল। বৃন্দা বিবেচনা ভবিষ্যতের চিন্তা গেল ভেসে।

হেমন্ত মেয়েটাকে নিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল, পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সে নিমাইয়ের দিকে ঝুঁকে পড়ে যেন কাঁপিয়ে কোলে চুমু এল; আর ঠিক সেই সময়ই মনে করে নিন্দুরের ফোঁটা পরে চিরুনি দিয়ে আঁচড়ানো চিকন চুলের বাঁশ পিঠে এলিয়ে তার ওপর দিয়ে আলতো মাথার কাপড় টেনে সামনে এসে দাঁড়াল মৃণিকা।

কিরকম কী একটা যেন ওলটপালট হয়ে গেল মাথার মধ্যে। নিমেষে আগুন জ্বলে উঠল। সব বিবেচনা সব হিসেব ভেসে চলে গেল কোথায়। দুম দুম করে পা ফেলে নিচে নেমে গিয়ে সিঁড়ির মুখটায় দাঁড়িয়ে উচ্চ-কণ্ঠে স্বগতোক্তি করে উঠল, একটা অদ্ভুত সুর করে বলে উঠল 'উঁ: হুকুম মানতেই হবে। পারবাদ প্রমাথ বন্ধ দিয়ে বসে রইলেন। কেন কিসের জন্য মনব আমি অন্যায় হুকুম' আমি কি এতটা বয়সে বে

করেছি আমার বৌ ঐ বুড়ির সেবা করবে বলে?...আর আমি এখেনে মেসে পড়ে পড়ে হাপুস নিলব! তারপর ঐসব ছাইভস্ম গরুগোবর খেয়ে আমার শরীরটি যখন যাবে তখন? একে আমরা হলুম গে ব্রহ্মপুত্তুর বংশ!...তাছাড়া বলি শরীলের ধম্মও তো আছে! শেষে কি ভাইপোটার মতো কুষ্ঠিত রোগ ধরিয়ে বসে থাকব!..না, এসব হবে টবে না, এই বলে দিলুম। বৌ ছেড়ে ছেলে-মেয়ে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না। তোমার শাশুড়িকে বলে দিও। হুঁ!

বক্তব্যের শেষেও একটা বিচিত্র সুরে বাধা করে গলা দিয়ে!.....

এক মুহূর্তের জন্যে কি চোখে আগুন জ্বলে উঠেছিল?

ভ্রূকুটিতে দেখা দিয়েছিল রক্তের আভাস?

কে জানে, মণিকার সাহস হয়নি সেদিকে চেয়ে দেখার।

তবে কথা যখন কইল হেমন্ত তখন কণ্ঠস্বরে কোন জ্বালার আভাসমাত্র নেই। বরং বড় বেশী শান্ত, বড় বেশী কোমল বলে মনে হল।

'তা অমন করে চোখের আড়ালে গিয়ে আর একজনকে উপলক্ষ করে বলছিস কেন? এ আর এমন কি দোষের কথা যে সামনা-সামনি বলা যায় না? আমিই বা রাগ করব কেন এতে? তোমার মাগছেলে নিয়ে তুমি তোমার মতো ঘর করবে সে ক্ষমতা হয়েছে তোমার—এতো অতি উত্তম কথা!...খুব ভাল কথা! সুমতি হয়েছে তোমার বুঝতে হবে। এত সহজে অব্যাহতি দেবে আমাকে তা ভাবিনি।...তা বেশ তাহলে সেই ব্যবস্থাই করো তাহলে।...এই কথা পাকা তো?

তবুও নিমাইয়ের সাহস হয় না ওপরে এসে মুখোমুখি কথা কইতে। সেখান থেকেই উত্তর দেয়, ব্যবস্থা করে, বললেই তো আর এখুনি করা যায় না। এখুনি বেইরে যাও বাড়ি থেকে বলবে আর অমনি বৌছেলে নে বেইরে যাবো সুড়সুড় করে তা হবে না। নোটিশ দিতে হবে। সময় চাই আমার। একটা ভাড়াটে তুলতে গেলেও এক মাসের নোটিশ লাগে।'

'সে তো লাগবেই। ভাড়াটে তো লক্ষ্মী, তারা টাকা দেয়, খাওয়ায়। তাদের সঙ্গে কি আর পথের শালকুকুরের তুলনা! তাদের তো দূরদূর করে তাড়িয়ে দেওয়াই উচিত, দ্যাখবার দ্যাখমার করে। তা তবে সেও অত ভয় পেতে হবে না। সময় দিচ্ছি, সময় নাও। এক মাসের নোটিশই দিলুম। বাড়ি বিক্রি করাও তো একদিনে হচ্ছে না, দালাল ধরাব, খদ্দের দেখবে, দরদস্তুর আছে, ঝামেলা, সার্চ, রেজেস্ট্রী—অনেক সময় লাগবে। তোমাদের অবিশ্যি অতদিন থাকতে হবে না। তোমরা তোমাদের সুবিধেমতো যখন খুশি চলে যেয়ো।'

তারপর একটু থেমে আস্তে আস্তে বলে, 'তোমার কিছুই ছিল না, এক বস্ত্রে এসেছিলে মনে আছে বোধহয়—শ্বশুরও ঐ একপ্রস্থ নামের বাসন ছাড়া কিছু দেয় নি। তবে যা যা দরকার, যা যা ভোগ করছ—বাসন বিছানা খাট—সব নিয়ে যেয়ো, স্বচ্ছন্দে। কুকুরে মুখ দেওয়া বাসন, বেয়াল শোওয়া বিছানা খাটে আমার দরকার নেই। ...একটু আগেই ঘর ঠিক করে যা নেবার নিয়ে যেয়ো, কেননা—এসবও তো রাখব না, খাট চেয়ার টেবিল বাসনকোসন—সব বেচে দোব। খদ্দের ঠিক হলে যা থাকবে সব নিয়ে চলে যাবে। তোমাদের যা নেবার তার আগেই আলাদা করে নিও, আমাকে দেখিয়ে।'

শান্ত অনুত্তেজিত কণ্ঠে, বিচারকের রায় দেবার মতো করেই বলে ঘরের মধ্যে চলে গেল হেমন্ত, সহজ ধীর গতিতে।

সেই সিঁড়ির কাছেই অনেকক্ষণ আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল নিমাই। তারপর কেমন একরকমের করুণ অসহায় কণ্ঠে বললে, 'এ—এসব আবার কি কথা? এ বাড়ি বিক্রিরি করে দেবে নাকি? তবে যে শুনে-ছিলুম ভাড়া নিয়ে চলে যাবে।

'সে তো তখন তোমরা একদিন বাস করবে—এই কথা ভেবেছিলুম। সে পাট যখন চুকেই গেল, তখন আর এসব কামেলা কার জন্যে রাখব? কে দেখবে কে মেরামত করবে? কে সময়ে টেক্সখাজনা দেবে?' ঘর থেকেই তেমনিভাবে উত্তর দেয় হেমন্ত।

আরও কিছুক্ষণ সময় লাগে নিমাইয়ের সাহস সঞ্চয় করতে, তারপর গোটা পাঁচছয় ধাপ উঠে এসে বলে, 'তা এজন্যগুলো কি আমি করব না বলেছি? এসব তো দেখাশুনো আমিই করতে পারি, যেমন করছি—'

'হ্যাঁ, অমনি ভাড়াটা আদায় করেও খেতে পারি! সে জানি। অত উপকার তোমাকে না করতে হয়, অত কষ্ট, সেই জন্যেই সব ঘুচিয়ে দিয়ে চলে যাবো। তুমি স্বাধীন জীবন বেছে নিয়েছ, নিজের ছেলে-মেয়ে নিজের বৌ নিয়ে নিজের বাড়িতে নিজস্ব সংসার পাতবে—তার মধ্যে আর এসব কাজ নিয়ে সময় নষ্ট করতে হবে না। মিথ্যে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। এসব পিছটান জঞ্জাল পারে না বাধানোই তো ভাল। আমিই বা অত কষ্ট দোব কেন? তুমি আমাকে মুক্তি দিয়েছ, আমাকেও সেটা দেখতে হবে বৈকি। পাল্টা মুক্তি দিতে হবে না?'

আরও খানিক পরে নিমাই কী একটা বলতে যাচ্ছিল, এবার প্রচন্ড ধমক দিয়ে উঠল হেমন্ত, 'চোপ!...আর একটা কথাও না শুনি। ফের যদি ঐ ক্যানক্যানানি গ্যাজোর গ্যাজোর শুনি—তাহলে এখুনি এই দণ্ডে তোর আর তোর বোয়ের পেছনে লাথি মেরে বার করে দোব—তোর কোন বাবা কোন শ্বশুরে রুখতে পারবে না বলে দিচ্ছি। হারামজাদা! ডাটও খাবো টামাকও খাবো—নিজের নিজের ছিসেব বোলকাউন বুঝে নেব, অথচ তোমারটাও ষোল আনা চাই—না? অত আহ্লাদ এখানে চলবে না। নিজের পথ বেছে নিয়েছ—দেখে বুঝে—ঐখানেই ইতি করো, আর এ সম্পর্ক নয়।'

সেদিন আর আপিস গেল না নিমাই। খেলও না কিছু। ঘুম মেরে বসে রইল শুধু। কথাটা যখন বলে তখন কোন জ্ঞান ছিল না তার। থাকলেও এ পরিণতি হবে তা স্বপ্নেও ভাবেনি। সত্যি সত্যিই সব বেচেকিনে দিয়ে চলে যাবে। হয়ত বা কোন মতে কি হাসপাতালেই দান করে দেবে—এ সম্ভাবনার কথা মাথাতেই যায়নি তার। কিন্তু এখন আর কথাটা তামাশা বলে মনে হচ্ছে না। এ বুড়ি সব পারে।.....এ কী হল তাহলে তার? এখন কি হবে? একটা মিনিটের ভুলে এতদিনের সব কষ্টে অন-র্থক হয়ে যাবে নাকি?.....

সারা দিন ভেবে বিকেলের দিকে শুষ্ক মুখে রুক্ষ চুলে হেমন্তের কাছে গিয়ে বসল। গলায় একটা কান্নার মতো আওয়াজ করে পায়ে হাত দেবার চেষ্টা করতে করতে বলল, উঁহুঁ, উঁহুঁ-হুঁ, আর কখনও এমন করব না, উঁহুঁ-হুঁ, এই বারটির মতো মাপ করো। মাথাটা খারাপ হয়ে গেছল তাই—উঁ হুঁ হুঁ—আরও ঐ মাগীর জন্যে, দিনরাত জ্বালায়, আমার জন্যে এমন করে সব্বত্যাগী হলে আমাকেও তাহলে আত্তঘাতী হতে হবে। হুঁ-হুঁ, বলে কুপুত্র যদ্যপি হয় কুমাতা কদাচ নয়—'

কথাটা শেষ করা গেল না। প্রচন্ড এক চড় এসে পড়ল গালে তার মধ্যেই, সে চড়ের বেগে কিছুক্ষণের জন্যে চোখের সামনে সব যেন অন্ধকার হয়ে গেল নিমাইয়ের, সঙ্গে সঙ্গে সেটা সামলাবার আগেই প্রচন্ডতর লাথি!

'হারামজাদা! আমার সঙ্গে ন্যাকাপনা করতে এসেছ! ঐ মায়াকান্নায় আমাকে ভোলাবে! মানুষ চেন নি এতদিনেও। ফের যদি আর একটা কথা শুনি, এখুনি এই-কাপড়ে বের করে দোব বাড়ি থেকে—মাগ-ছেলেমেয়ে সুদ্ধ! কাল সকালবেলাই যেখানে হোক ঘর খুঁজে নিয়ে চলে যাবি এই বলে দিলুম, যদি লাথি খেয়ে না বেরোতে চাস! আত্তঘাতা! আত্তঘাতা হবার হলে অনেকদিন আগেই হতিস—যদি লজ্জাঘেন্না কিছু থাকত! বেইমান, বজ্জাত, লাথ-খোর! লাথখোরের জাত!'

এরপর আর একটা কথাও বলার সাহস হল না নিমাইয়ের। আঘাতে অপমানে এবার সত্যিকার চোখের জল ফেলতে ফেলতেই উঠে আসতে হল।

(ক্রমশঃ)

তারকা হোটেল প্রসঙ্গে

অলোক সেন

মহান্ত অভিজাত-দর্শন প্রকাণ্ড প্রাসাদখানির সামনে দাঁড়িয়ে থাকি উজ্জ্বল-পোশাক প্রহরী। গাড়ীর সার লম্বা বারান্দার বাস্ত যাতায়াত। কোন লক্ষপতির প্রাসাদ? উঁহু, আরো একটু বেশী। এটি একই লক্ষপতির আশ্রয় — পঞ্চতারকা হোটেল একটি। চিত্রতারকার সঙ্গে তারকা-হোটেলের এক জায়গায় মিল—এর দর্শন-ধারী দুর্লভ প্রকৃতিতে। কিন্তু অন্তঃ-সারশূন্য নয়। বিলাসের চূড়ান্ত, প্রমোদের শেষ কথা এই তারকা হোটেলের সংখ্যা এদেশে হাতে গোনা যায়।

'তারকা' কথাটির অর্থ কি? ভারত সরকারের পর্যটন বিভাগের দপ্তরে বিলাস-হোটেলের যে তালিকা আছে, তাতে তারকা ব্যবহৃত হয় শ্রেণী-বৈষম্য নির্দেশ করতে। যেমন ধরুন পঞ্চ-তারকা, ফুলীনশ্রেষ্ঠ—সর্বোচ্চ শ্রেণীর। তারপর ক্রমশঃ চার, তিন, দুই, এক। শেষেরটি দৃষ্টিযোড় বড়লোক, পরিচ্ছন্ন আরামের ব্যবস্থা আছে, গ্লামারের কিন্তু অভাব।

পঞ্চাশের দশকের শেষের দিকে ভারতীয় হোটেল-ব্যবসায়ের নাড়ীনক্ষত্র সন্ধান করতে প্রথম কমিটি বসেছিল। তারপর আরো তিনটি অনুসন্ধান কমিটি এসেছে গেছে, শ্রেণী-বিভাগ কঠোর থেকে কঠোরতর হয়েছে। কিন্তু দরকার কি ছিল এত কাণ্ডের? দরকার একটা আছে, পর্যটন ব্যবসা বাড়ছে— ভারত-ভ্রমণে আসা বিদেশী পর্যটকের সাম্প্রতিকতম সংখ্যা জানা গিয়েছে ৩০০,০০০; পর্যটনখাতে আয় ৪০ কোটি টাকা (১৯৭১)—সুতরাং এদেশের হোটেলগুলিকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার সময় এসেছে। বিদেশে তো আমাদের বহু বদনাম আছেই, তারপর যদি একথাটা প্রচারিত হয় যে, ভারতে বেড়াতে চাইলেও সুযোগ জোটে না, তাহলে পর্যটন ব্যবসার সমূহ ক্ষতি। এদেশে ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্যের ছড়াছড়ি, দরকার আরো বেশী থাকবার জায়গা, আরো ভালো করে ঘুরিয়ে দেখাবার ব্যবস্থা। উৎফুল্ল পলের জন্যও চমকদার বিজ্ঞাপন প্রয়োজন হয়, জনানা দেশের তীব্র প্রতি-দ্বন্দ্বিতার মুখোমুখি প্রমোদের নূতনতম আয়োজন না করতে পারলে বিদেশীরা বিমুখ হবে, দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে ভাটা পড়বে। দ্বিতীয়তঃ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে হোটেলগুলি নিজেরাও উন্নতির সুযোগ পাচ্ছে। প্রতিটি হোটেলই তাদের মান বাড়াবার চেষ্টা করছে, যাতে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা মেলে।

বম্বের তাজমহল হোটেলে বসে হোটেল ও রেস্টুরেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের পশ্চিম ভারত শাখার সম্পাদক শ্রীকান্ত যোশীর সঙ্গে কথা বলছিলাম। শ্রীযোশী বয়স্ক লোক, অভিজ্ঞতাও প্রচুর। ভারী চেহারা নিয়ে আরামে বসেছিলেন। বললাম ভারত সরকারের তারকা নীতি সম্বন্ধে আপনার কি মত? সোজা উত্তর এল না। সরকারের সঙ্গে ওঁদের কোন বিরোধিতা নেই জানালেন। শ্রীযোশী বিলাস-হোটেল সম্বন্ধে গম্ভীরভাবে চিন্তা করেন। ওঁর দুঃখ, অনেক কিছু করার আছে, অথচ করা হচ্ছে না। অন্ততঃ প্রয়োজনের তুলনায় প্রচেষ্টা সামান্যই। একটা উদাহরণ দিলেন। পর্যটকদের মোট বায়ের চল্লিশ শতাংশ হোটেলের সরাসরি আয়। কিন্তু সরকারের কাছ থেকে দু' শতাংশের বেশী আদায় করা যায় না। মানের উন্নয়ন দূরে থাক, সুনাম বজায় রাখার জন্যও খরচ দিন দিন বাড়ছে। সরকার কি আরো একটু উদার হতে পারেন না?

হোটেলের শ্রেণী বিভাগের জন্য এখন দেশে চারটি আঞ্চলিক কমিটি আছে, একটি তাজে কেন্দ্রীয় কমিটি। হোটেলগুলি যোগা-যোগ করেন আঞ্চলিক কমিটির সঙ্গে। এক, দুই এবং তিন—তারকা হোটেলগুলির অধিকাংশই স্বত্বাধিকার (মালিকানা) বা অংশীদারত্ব ভিত্তিক। চতুর্থ-পঞ্চম শ্রেণীর হোটেলগুলি যৌথ প্রতিষ্ঠান—ভারত সরকারের অর্থনৈতিক দাক্ষিণ্য যা-কিছু, এদের কপালেই জোটে। তাছাড়াও আছে বৈদেশিক সহযোগিতার প্রশ্ন। বিদেশী হোটেলগুলি এদেশে যতভাবে যা কিছু করছে, সবই চতুর্থ বা পঞ্চম শ্রেণী-পর্যায়ে। এই কারণে শেষের শ্রেণীর তিনটি কিছু অবহেলিত, কিছু বা অবনত-মান।

১৯৬৭ সালে খান্না কমিটির উদ্যো-গেই সর্বশেষ শ্রেণী-বিভাগ সম্পন্ন হয়েছে। মাপকাঠি ১৯৬২তেই নির্দিষ্ট হয়েছিল। ৭১টি শহর থেকে মোট ২২৯টি হোটেল ও ১৪টি রেস্টুরেন্ট সাড়া দেয়। খান্না কমিটির তৎকালীন সুপারিশ : পঞ্চ-তারকার জন্য—১৩, চার—১৫, তিন—১৬, দুই—২১ এবং এক—৭। এতবড় দেশে মাত্র ১৩টি পঞ্চতারকা হোটেল প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্য। ১৯৭৩এ দ্বিতীয় খান্না-কমিটি নিযুক্ত হয়েছে—তাদের সুপারিশ অবশ্য এখনও প্রকাশিত হয়নি। শ্রেণী-নির্দেশ ও নিয়মিত পরিদর্শন করার জন্য একটি স্থায়ী কমিটির কথা বলা হচ্ছে। শুধুমাত্র 'তারকা' নির্দিষ্ট করে দিলেই দায়িত্ব শেষ হয় না। মান রক্ষা আরো কঠিন কাজ।

কোন্ ভিত্তিতে তারকা বিচার হয়? পাঁচ তারার জন্য এ পর্যন্ত হোটেলগুলিকে মোট ৫৫টি দাবী পরিপূরণ করতে হত এর মধ্যে আছে, অন্ততঃ ২৫টি শয়নকক্ষ অ্যাটাচড্ বাথ সহ। শীতাতপ-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা, গাড়ী পার্ক করবার জায়গা, লাউঞ্জ, ব্রোকরুম, লন থেকে শুরু করে সুইমিং পুল : টেনিস, গলফ বা ক্যোয়াশ খেলার কোর্ট পর্যন্ত। এই বিপুল খরচ সকলের সাধ্যের সীমানায় আসে না। সুতরাং তারকা-হোটেলের সীমিত সংখ্যায় আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

এবার প্রশ্ন আসছে, তাহলে এই শ্রেণী-ভিত্তীর পৃষ্ঠপোষকতা আসে কোথা থেকে? বাহ্যিক একক প্রচেষ্টা নিষ্ফল এক্ষেত্রে। এর প্রায় সবই শিল্পগোষ্ঠী, বৈদেশিক সংস্থা, সরকার এবং সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, ভূতপূর্ব রাজা-রাজরাদের মনতে বেঁচে আছে রাজকীয় প্রসঙ্গে পরে আসছি। শিল্প-বাণিজ্যের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই একচেটিয়া পুঁজির আধিপত্য। বর্তমান ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম দেখতে পাই না। কয়েকটি বড় বাণিজ্য সংস্থা এখন একের পর এক হোটেল শুরু করছেন বা চালু ব্যবসার দায়িত্ব নিচ্ছেন। ওবেরয় (ইস্ট ইণ্ডিয়া হোটেল) এদেশের (তিন মতে, এশিয়ারও) সর্ববৃহৎ বেসরকারী হোটেল-ব্যবসায়ী। ভারতে এ গোষ্ঠীর হোটেল আছে ১০টি—

দিল্লী, কলকাতা, বম্বে এবং অন্যান্য প্রধান প্রধান শহরে। এছাড়া সিঙ্গাপুরে, তেহেরান, সিংহল, নেপাল, ইন্দোনেশিয়ার বাজারেও এরা প্রবেশ করেছেন। কন্টিনেন্টাল 'গ্র্যান্ড হোটেল' এসেই। মৌলিক সাহায্য পাওয়ার ব্যাপারেও ওবেরয় ভাগ্যবান। ইউ-এস-এইড কর্তারা পেয়েছেন এ পর্যন্ত দুবার, অন্যান্যরা এ সুযোগ পাননি। তা ছাড়া আছে বৈদেশিক হোটেল-সংস্থার আর্থিক ও অন্যান্য সহযোগিতার যোগ। হেডেতে ৩৪-তলা এবং চারশ ঘর বিশিষ্ট 'ওবেরয় শেরাটন' তৈরী হলে শুধু-মাত্র এ দেশের সর্বোচ্চ প্রাসাদই নয়, সম্ভবতঃ সর্বশ্রেষ্ঠ হোটেলও হবে।

ওবেরয়ের কঠিনতম প্রতিদ্বন্দ্বী বম্বের ইণ্ডিয়ান হোটেল কোম্পানী। এদের তালিকাও বড় সামান্য নয়। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হোটেল তাজমহল (বম্বে) এদের। রাজস্থানের চারটি প্রাসাদ-হোটেলের—লেক প্যালেস, উদয়পুর ও রামবাগ প্যালেস, জয়পুর (কাশ্মীরের ঐতিহ্যের প্রাসাদ' হোটেলটি পেয়েছেন ওবেরয়)—দায়িত্ব বহন করা ছাড়াও এঁরা হায়দ্রাবাদের নিজামের পরিকল্পিত হোটেল ও মাদ্রাজের তাজ-করোমণ্ডলের ভার নেওয়ার কথা চিন্তা করছেন। নিজামের ফলকনুমা প্রাসাদের উপর অবশ্য দুটি দলেরই সমান আগ্রহ। দীর্ঘদিন ধরে এক তীব্রোক্তি যুদ্ধ চলছে। আমেরিকার হিলটন (টি ডব্লু এ), ইন্টার-কন্টিনেন্টাল (প্যান-আম), শেরাটন বা হলিডে-ইনের মত হোটেল সংস্থাও এদেশে আসতে ভীষণ আগ্রহী। আরবসাগরের তীরে ৫১ বছরের পুরনো তাজমহল হোটেলটির পাশে দীর্ঘায়তন ২২-তলা-বিশিষ্ট ইন্টার কন্টিনেন্টাল তৈরী হচ্ছে। বাঁদের ভারা ও ক্লান্ত শ্রমিকরা যখন বিদায় নেবে, তখন হোটেল তাজমহল ইন্টার-কন্টিনেন্টাল এক যুগের ও যুগের রূপ পাবে। ইন্টার-কন্টিনেন্টাল ও ইণ্ডিয়ান হোটেল কোম্পানীর যুগ্ম হোটেল হবে এটি।

সরকার এবং অন্যান্য সরকারী প্রতিষ্ঠানও রঙ্গভূমিতে নেমে পড়েছেন। ভারত সরকারের পক্ষে আই-টি-ডি-সি এ পর্যন্ত ৮টি হোটেল খুলেছেন, তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নতুন দিল্লীর 'অশোকা'। সবচেয়ে আশ্চর্য, সরকারী প্রচেষ্টা, তবুও লাভের গুড় সবটাই পিঁপড়েতে খাচ্ছে না। ১৯৭০-৭১ সালে 'অশোকা' ৩০ লাখ টাকার মুনাফা করেছিল। বাঙ্গালোরে আর একটি 'অশোকা' হোটেল খোলা হয়েছে—শুরুতেই খানিকটা আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল প্রচলিত কাবারে নাচের পরিবর্তে ভারতীয় নাচ-গান ও ভারতনাট্যম শুরু করাতে।

শোনা যাচ্ছে কলকাতার সমস্ত বিমানবন্দরে আই-টি-ডি-সি একটি চার তারকার হোটেল শুরু করবেন। বিমানবন্দরে হোটেল করছেন এবার ইণ্ডিয়াও। প্রীতীটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টি ডবলু এ বা প্যান-আমের দৃষ্টান্ত থেকে প্রেরণা পেয়েছেন কিনা জানি না; কিন্তু বিমান কোম্পানীর অর্থনৈতিক অস্বাচ্ছন্দ্য কাটিয়ে উঠতে শুরুতেই দুটি হোটেল খোলবার সংকল্প প্রকাশ করেছেন। এ উদ্দেশ্যে তারা 'হোটেল কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া' নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন, লাভ করেছেন এল আই সির আর্থিক দাক্ষিণ্য। একটি হোটেল হচ্ছে বম্বের সান্তাক্রুজ বিমানবন্দরে, অন্যটি জুহু বীচে। প্রায় সাড়ে সাত কোটি টাকা খরচ হচ্ছে।

সম্প্রতি রাজন্যভাতা বন্ধ হয়ে যাবার পর বহু পূর্বতন শাসকও এই লাভজনক ব্যবসাটির দিকে ঝুঁকেছেন। এঁদের এ ভূমিকার শুরু কিন্তু বহু আগেই। জয়পুর ও উদয়পুরের প্রাসাদ দুটি হোটেলে রূপান্তরিত হয় তৎকালীন মহারাজাদের আমন্ত্রণেই। ঈগলের প্রাসাদও একই পথ ধরেছিল। কিন্তু রাজকীয় কল্পনার সঙ্গে সুদক্ষ অর্থনীতি ও পরিচালনাক্ষমতার যোগ না থাকায় এগুলির ব্যবসায়িক সফলতার আশা অন্তর্হিত হয়। তিনটি হোটেলই এখন ভিন্ন পরিচালকের হাতে সমর্পিত। আরো বহু রাজকীয় প্রচেষ্টার পাশাপাশি নিজামের ফলকনুমা দুর্গ ও মহীশূরের রাজার 'লালবাগের প্রাসাদ'ও হোটেলের রূপ নেবে শোনা যাচ্ছে। নিজাম ভাঁমিললাদের উটিতেও একটি পান্থভারকা হোটেল খোলার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। বাঙ্গালোরে একটি কোতূহলোদ্দীপক ঘটনা ঘটেছে। মহীশূরের রাজা তাঁর প্রাসাদটিকে 'চামুণ্ডী হোটেলে' পরিণত করার অভিলাষ ঘোষণা করেছিলেন। নিজের ভরাবধানে দুটি কোম্পানী খুলেছিলেন ১১০ একর জমির উপর এই হোটেল-নগরীটি শুরু করার জন্য। নাইরোবির একটি হোটেলের অনুকরণে গাড়ীতে বসে দেখা যাবে এমন সিনেমা (ড্রাইভ-ইন সিনেমা : ৫০০ গাড়ীর ব্যবস্থা), ড্রাইভ-ইন রেস্টুরেন্ট, সুইমিং পুল, জিমনাসিয়াম, গল্ফ মাঠ এবং একটি স্নাতকশিক্ষা কেন্দ্রের পরিকল্পনা তৈরী ছিল। শেষোক্তটি সম্ভবতঃ হয় জনসন যুক্তরাষ্ট্রের ভরাবধানের উদ্দেশ্য করে। কিন্তু নিয়তি আকাশ থেকে অকস্মাৎ বজ্র নামল। এক প্রলয় ঝড়ে বাঙ্গালোর শহরের কর্পোরেশনের প্রতিষ্ঠা ঘোষিত হল, বাঙ্গালোর প্রাসাদকে হোটেলে পরিণত করার অনুমতি তাঁরা দিচ্ছেন না; এটিকে একটি ঐতিহাসিক স্মারক-স্তম্ভ করে রাখতে চান। মহারাজার তৎকালীন প্রতিক্রিয়া কি হয়েছিল, সুধী পাঠক, আমার জানা নেই।

কোকর বেড়াতে গিয়েছিলাম তাজমহলের 'ফাইভ পয়েন্টার' দৈনিক ব্যয় সাড়ে তিনশো টাকা। এ হিসাব ১৯৭০-এর আমেরিকান পদ্ধতিতে 'চার্জড এগেন্স' লক্ষ্য ন' টাকা। কিন্তু এতেই সন্তুষ্ট হবার দরকার নেই। কারণ সরকারী কমিটি হিসাব করে দেখিয়ে দিচ্ছেন ভারতীয় বিলাস হোটেলের খরচ নাম্বাই। একটি নামী সরকারী হোটেলের প্রায় ১৬ বছর আগের দৈনন্দিন খরচ তালিকা শুনুন : সিঙ্গলরুম (বাথরুম সহ)—৪০; (বাথরুম বাতীত)—৪০; ডিলাক্স সুইট—২০০; স্পেশাল ডিলাক্স সুইট—২৫০। এ ঘোষণা সরকারের। আর কমিটির বক্তব্য, হংকং, থাইল্যান্ড বা জাপানের তুলনায় আমাদের পঞ্চতারকা হোটেলের খরচ আহামরি কিছু বেশী নয়। পঞ্চতারকা হোটেল 'সিঙ্গল' ঘরের জন্য ব্যয় ৬৫ (কলকাতা, আগ্রা)—১৫ (দিল্লী); ডাবলের জন্য ১০০ (কলকাতা)—১৭২ (দিল্লী)। যে-হিসাবে এই তিনটি দেশের মিলিত তুলনায় সিঙ্গলঘরের ন্যূনতম দক্ষিণা ৫১, সর্বাধিক ১৭২-৫০ পয়সা (হংকংয়ের) ও ডাবল ঘরের সর্বনিম্ন দক্ষিণা ৭১·৮০ পয়সা (জাপান), সর্বাধিক ২১০ (হংকং, জাপান)। এসব হিসাবও কিছু পুরানো—এর মধ্যে গঙ্গা নদীতে কিছু জল কি আর প্রবাহিত হয়নি?

ভারতীয় হোটেল ব্যবসায় সম্বন্ধে মোটামুটি এই বক্তব্য। কিন্তু পরিশেষে কটি প্রশ্ন তুলব। (ক) সরকারী কমিটির কথা-মতই পাঁচ ও চার তারকা বাদ দিয়ে নীচের তিনটি শ্রেণীর হোটেলের স্থান জগদ্দলরূপ নয়। এদের আর্থিক সমস্যার কথা আগেই বলেছি। জিজ্ঞাসা, বিদেশী পর্যটকদের সকলেরই তো তাজমহল বা ওবেরয় হোটেলে থাকার ক্ষমতা নেই। তাহলে অপেক্ষাকৃত নিম্ন-বিত্ত পর্যটকদের জন্য যে তিন, দুই বা এক শ্রেণীর হোটেলগুলি রয়েছে, তাদের সংস্কারের দায়িত্ব কে নিচ্ছে?

(খ) হোটেল চালনার জন্য রীতিমত পেশাদারী দক্ষতা কই? পরামর্শ দেবার জন্য 'কনসালটেন্সী সার্ভিস' বা অন্যান্য উঁচুমাত্রার কাজের জন্য লোক পাওয়া যায় না। বম্বে, দিল্লী, মাদ্রাজ ও কলকাতা এই চারটি মাত্র হোটেল বিষয়ে শিক্ষাকেন্দ্র—যাদের দায়িত্ব আবার সরকারের শিক্ষা-বিভাগেরও নয়, খাদ্যমন্ত্রকের—স্থলে কিছু আরুলস্তুষ্টি লাভ নিশ্চয়ই হচ্ছে, কিন্তু কাজ পুরো হচ্ছে কি?

এবং (গ) সরকার পর্যটন বিভাগের মোট আয়ের থেকে আরো কিছু বাড়তি টাকা হোটেলগুলির উন্নয়নকাজে ব্যয় করতে পারেন না কি? আমরা জমাগত দেখছি পর্যটন ব্যবসায় সমৃদ্ধ এলে দেশের বৈদেশিক আয়-উপার্জন বাড়বে, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর সংকল্প ১৯৭০-এর মধ্যে পর্যটকের সংখ্যা ৬০০,০০০এ নিয়ে যাবেন। কথাটা ভাল। তাহলে আসুন না, সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ভারতীয় পর্যটন-বাণিজ্য তথা হোটেল-ব্যবসার ক্ষেত্রে একটা নিঃশব্দ বিপ্লব এনে দিই?

CENTRAL LIBRARY

মনস্পতি শ্রীঅরবিন্দ

সুকুমার বসু ও সুহৃদ গোপাল দত্ত

'ইহ আত্মানম অনুবিদ্য ব্রজন্তি
এতান্ চ স্তান্ কাময়ন্,
তেষাং সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি।'
—ছান্দোগ্য ৮।১।৬

১৯৫০ সালের ৬ই ডিসেম্বর। ওঙ্কারের প্রবাহে অশ্রম পলাবহ। বিজ্ঞানময় পুরুষ যে দেহ পরিত্যাগ করে গেছেন সেই দেহে তখনো ছড়িয়ে রয়েছে অতিমানসের জ্যোতি। ডাক্তার প্রভাত সান্যালের ভাষায়, বিজ্ঞানের কল্যাণে মৃত্যুর যে-সব লক্ষণ আয়ত্ত করেছিলাম, তার একটিও খুঁজে পেলাম না পুরুষোত্তমের অঙ্গে, বিন্দুমাত্র বিবর্ণ হয়নি কোথাও, সামান্যতম পচনের চিহ্নও চোখে পড়ল না। শ্রীমা চাপা গলায় বললেন,

> 'As long as the supramental Light does not pass away, the body will not show any sign of decomposition, and it may be a day or it may take many more days'.

আমিও অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কোথায় সেই আলো, মা,—যার কথা তুমি বলছ? আমার পক্ষে কি তা দর্শন করা সম্ভব?' শ্রীঅরবিন্দের শয্যার পাশেই শ্রীমায়ের চরণতলে নতজানু হয়ে বসেছিলাম, হেসে মা অনন্ত করুণার সঙ্গে তাঁর হাতখানি আমার মাথায় রাখলেন। আমার চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠল—নীলাভ সোনালী জ্যোতির্মণ্ডিত গুরুদেবের সর্বাঙ্গ।'

৭ই ডিসেম্বর এলো—তখনও সেই পরিত্যক্ত দেবদেহে বিকৃতির লেশমাত্র দেখা যায়নি। এই দিন আদ্যাশক্তিরূপিণী মায়ের মুখ থেকে ভক্ত-শিষ্যেরা শুনতে পেলে চিরকালের নির্দেশ : 'ভগবান, আজ প্রাতে তুমি আমায় বরাভয় দিয়েছ যে, যতদিন তোমার কাজ অপূর্ণ থাকবে ততদিন তুমি আমাদের সঙ্গে থাকবে—শুধু নিরন্তরী চেতনার আশ্রয়ে নয়—আমাদের সকল পার্থিব ছন্দে। তোমার বরাভয়ে অভ্রান্ত আশ্রয় পেয়েছি যে, পার্থিবী দিব্যভাবে রূপায়িত না হওয়া পর্যন্ত তুমি ভূমণ্ডলেই থাকবে আমাদের সঙ্গে। আশীর্বাদ কর, তোমার কৃপায় আমরা যেন তোমার এই অপরূপ ব্যাপ্তির উপযুক্ত ধারক ও বাহক হিসাবে জন্মজন্মান্তরে তোমার দিব্য-কর্ম উদ্‌যাপনে নিজেদের উৎসর্গ করতে পারি।' আরও একটা দিন কেটে গেল। ৮ই ডিসেম্বর সেই অধিকৃত দেবদেহের দর্শনের সুযোগ অনেকের মনেই প্রশ্ন জেগে উঠল পুরুষোত্তমের দেহত্যাগের মধ্যে নিবার্ণাত্তর কি লীলা প্রচ্ছন্ন রয়েছে? কেনই বা তিনি আত্মবিসর্জন নিলেন? এর উত্তর সেই দিনই দিয়েছিলেন—

> "The lack of receptivity of the earth and men is mostly responsible for the decision Sri Aurobindo has taken regarding his body....."

অসুর শক্তির সঙ্গে যুদ্ধে স্থূলদেহের বদলে অনেক সুতরাং সূক্ষ্মদেহের আশ্রয়ে যুদ্ধ করা এক অনন্য দিব্য-কৌশল। সাধক কবি অরুণ-কিরণ এই মহাপ্রয়াণের নিগূঢ় আধ্যাত্মিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লিখেছেন, '...শ্রীঅরবিন্দের দেহত্যাগ তাঁর নিজের কোন ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য নয়। এ হল বিবর্তমান পার্থিব-চেতনাতে এক মহা যুযোধন— ভগবানের দ্বারা আক্রান্ত অচেতনার বিপক্ষে বিদ্রোহ-অভিযান তাঁর নিজের উপরই তাঁকে নিতে হলো শেষে, জীবন সংশয়ের বিপদ স্বীকার করে মৃত্যু-বিবাচ্ছন্ন মুহূর্তার ছলে, যাতে তাঁর কাজের গোপনে সাহায্য হয়—সে কাজ তাঁর ব্যক্তিগত সিদ্ধির চেয়েও সর্বদাই যে তাঁর কাছে বড় ছিল। ...এ কাজ ভবিষ্যতের অনুকূল নিয়তির জন্য। (৪১)।

৯ই ডিসেম্বর বিকাল ৫টার সময় শ্রীমা অনুমতি দিলেন সেই পরিত্যক্ত দেবদেহকে মহাসমাধিস্থ করবার। সমাধির জন্য স্থান নির্দিষ্ট করা ছিল :

> "Under the 'Service tree' in the place where the giant maidenpair plants were arranged."

এক অনাড়ম্বর সমাবেশের মধ্যে কয়েকজন তাঁদের সংস্কারমুক্ত এবং নির্লিপ্ত মন নিয়ে রোজ-উত্তর আধারে সেই দেবদেহকে মহাসমাধিতে, অনন্তশয়ানে

(41) K. D. Sethna: The Passing of Sri Aurobindo: P.5.

মনস্পতি শ্রীঅরবিন্দ

শায়িত করেন সেই পরিত্যক্ত দেবদেহ। সমাধি-ফলকে লেখা রইল শ্রীমার রচিত এক পবিত্র দেব বন্দনার মন্ত্র :

> হে সচ্চিদানন্দময় অবতরণে তুমি আমাদের গুরুদেবের অন্নময় দেহের কারণ-স্বরূপ হয়েছো, সচ্চিদানন্দময় তোমার কাছে আমরা চিরঋণী রইলাম। সেই সচ্চিদানন্দময়ের কাছে, যিনি আমাদের জন্য সব কিছুই করেছেন, সঙ্কল্প নিয়েছেন, যুদ্ধ করেছেন, যন্ত্রণা ভোগ করেছেন, অনেক আশা নিয়ে সব কিছু সহ্য করেছেন, সেই সচ্চিদানন্দময়ের কাছে, আমাদের কল্যাণে, এই সবই যাঁর ইচ্ছা, যাঁর প্রচেষ্টা, যাঁর নির্মাণ, যাঁর ঈপ্সিত-সিদ্ধি, সেই পরমপুরুষের কাছে আমরা আনতমস্তকে প্রার্থনা জানাচ্ছি যেন কোনো-দিন আমরা তাঁকে বিস্মৃত না হই, এমনকি

শ্রীঅরবিন্দের মহাসমাধি মন্দির, পণ্ডিচারী।

মুহূর্তের জন্যও নয়, হে ২৪-সর আমাদের সব কিছুর জন্যই তোমার কাছে আমরা ঋণী।

পণ্ডিচেরীর আকাশ-বাতাসে প্রতিধ্বনিত হতে থাকল সেই দিব্য-বাণী যে বাণী শ্রীমা শুনেছিলেন :

"I have left this body purposely. I will not take it back I shall manifest again in the first supramental body built in the supramental way". (42).

মনস্পতি পুরুষ সম্পর্কে ব্রহ্মসূত্র এই কথাই বলেছেন।

অশ্রুসিক্ত ভক্তশিষ্যের চোখের সামনে দিব্যশ্রী লোহিত হয়ে পরিস্ফুট হলো গুরুদেবের লিখিত বাণী :

"One day I will return, a bringer of light,
Then I will give to thee the mirror of God".

বিজ্ঞানময় পুরুষের লীলাসহচরদের হৃদয়ে ঝঙ্কৃত হতে থাকল সেই অভয়বাণী :
"I am here, I am here".

শ্রীঅরবিন্দের মধ্যে যাঁরা তাঁদের সত্তাকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন, তেমন সংঘের সেই ব্রতী পুরুষেরা পূর্ণযোগের শেষ অঙ্কের জন্য কাজ করে চললেন জগদ্ধাত্রী শক্তির নির্দেশে। যোগ-ঐশ্বর্যের সব কিছুর উত্তরাধিকারিণী সব সময়েই সঙ্গে রয়েছেন গুরুর প্রতিমূর্তিরূপে সুতরাং তিনিই পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন গুরুদেবের স্বপ্ন-লক্ষ্যের শেষ অঙ্কে।

১৯৫১ সালের ২৬শে এপ্রিল শ্যামা-প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে শুরু হলো শ্রীঅরবিন্দ মেমোরিয়াল কনভেনশনের তৃতীয়বার্ষিক অধিবেশন। উদ্বোধনী ভাষণে শ্রীমা প্রস্তাব করলেন—শ্রীঅরবিন্দ আন্তর্জাতিক শিক্ষা-কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা সংকল্প। তিনি বললেন, শ্রীঅরবিন্দ মনে করতেন যে, এই উপায়েই ভবিষ্যতের মানুষকে সুন্দরভাবে অতি-মানসের জ্যোতি গ্রহণের উপযোগী করে গড়ে তোলা সম্ভব হবে। যে জ্যোতির ধারায় মানুষ রূপান্তরিত হবে দিব্য-জীবনের আধাররূপে এবং সেই মানব-সংঘের সহায়তায় পৃথিবীতে প্রকাশ পাবে নতুন আলো, নতুন শক্তি, নতুন জীবন।' উপস্থিত সুধীজনের আন্তরিক সমর্থনে সভাপতি দ্বিতীয় দিনে তিনটি সংকল্প গ্রহণ করলেন এবং সমাপ্তি ভাষণে বললেন, 'আমরা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনা করছি এই উদ্দেশ্যে যে, এখানে মহত্তর আদর্শ অনুসারে শিক্ষিত হয়ে উঠবে নরনারী, গ্রহণ নেবে নবমানবজাতি সৃষ্টির মহা-ব্রতে। এ ধরনের প্রতিষ্ঠান সফল হতে পারে না যদি হেন নরনারী আমরা না পাই, যাঁরা শ্রীঅরবিন্দের আদর্শের উপর শুধু ভক্তিই রাখবেন না, তাকে কাজে ফলিয়ে ধরতেও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকবেন। এ রকম লোকবল আশ্রমেই রয়েছে—তাঁরা এই গুরুদায়িত্ব নিতে পারবেন। যে আদর্শের প্রতীক হয়ে উঠবে এই বিশ্ব-বিদ্যালয়, আশা করি তা উপলব্ধি করবে সমস্ত বিশ্বের নরনারীকে। ...শ্রীমা যখন আমাদের সঙ্গে রয়েছেন, তখন আমাদের মনে অণুমাত্র দ্বিধা নেই যে, এই বিশ্ব-বিদ্যালয় দিনে দিনে বিস্তার লাভ করবে এবং শুধু ভারতের নয়, সমগ্র সভ্যজগতের এক গৌরবের সামগ্রী হয়ে উঠবে।..... একদিন এখানে যে বাণী ধ্বনিত হবে তা সমগ্র জগৎকে শুনতেই হবে। ...শ্রীঅরবিন্দ দিয়ে গেছেন সেই বাণী। একদিন পৃথিবীর সকল লোক চলবে শ্রীঅরবিন্দের প্রদর্শিত এই পথে।' (৪৩)। ১৯৫২ সালের ৬ই জানুয়ারি শ্রীঅরবিন্দ আন্তর্জাতিক শিক্ষা-কেন্দ্রের দ্বারোদ্ঘাটন করলেন শ্রীমা। দিব্য-জননী কাজ করে চলেছিলেন দিব্য-নির্দেশে এবং দিব্য-উদ্দেশ্যে।

'ভগবান পৃথিবীতে আমরা আছি তোমারই রূপান্তরের কর্মসাধনের উদ্দেশ্যে। তাই আমাদের একমাত্র সংকল্প, আমাদের একমাত্র অভিনিবেশ। আমাদের প্রার্থনা, তাই যেন হয় আমাদের একমাত্র সংকল্প, আমাদের একমাত্র অভিনিবেশ। আমাদের প্রার্থনা, তাই যেন হয় আমাদের একমাত্র জীবনবৃত্তি, এবং যেন আমাদের সমস্ত কাজেই তোমাদের সহায় হয় এই লক্ষ্যের পথে।' —শ্রীমার বাণী।

১৯৫০ সালে সাধক অম্বুভাই পুরানী পরিব্রাজক-প্রচারক হিসাবে পূর্ব এবং মধ্য আফ্রিকান দেশগুলিতে বহন করে নিয়ে গেলেন গুরুদেবের পূর্ণযোগের বীজমন্ত্র। সফরপূর্ব উদ্দীপনার মধ্যে সেই ভূখণ্ডের আকাশে, বাতাসে, জনগণের মনে ছড়িয়ে দিয়ে এলেন সেই বীজ। ১৯৫৪ সালে সুদূর চীনের হংকং শহরে শ্রীঅরবিন্দ দর্শনের পাঠ-চক্রে শ্রীমায়ের আশীর্বাণী সেখানকার প্রকৃতিতে দিব্য আলোর বিকিরণ ঘটালে :

"Let the eternal Light dawn on the eastern horizon—Mother".
Italian Institute for the Middle and the Far East

সংস্থার উদ্যোগে রোমে ১৯৫৪ সালে শ্রীঅরবিন্দের জীবন ও দর্শনের উপর আলোচনা চক্রে ভারতের অধ্যাত্মবাদ সেই মহাপুরুষের বাণী অবলম্বনে ইতালীয় সুধীজনের অন্তরে প্রবেশ করল। নিখিল বিশ্বমানে সর্বব্যাপী সূক্ষ্মদেহ, পণ্ডিচেরীতে জীবন্ত প্রতিমা, এবং তাঁদের সংকল্পে ধীরে ধীরে বিশ্বচেতনার এগিয়ে চলেছে প্রগতির পথে দিব্য-জীবনের সন্ধানে। অনাতম বাহক হিসাবে ডারহাম বিশ্ব-বিদ্যালয়ের Spalding Lecturer in Indian Philosophy and Religion দর্শনাচার্য আনন্দমোহন বসুর নাম উল্লেখযোগ্য।

১৯৫৫ সাল। শ্রীমা বাণী দিলেন :
"No human will can prevail against the Divine's Will. Let us put ourselves deliberately and exclusively on the side of the Divine and the Victory is ultimately certain."

ডারউইনের বিবর্তনবাদের ভাবে অনুপ্রাণিত বিজ্ঞানীদের মনে জীবন্ত প্রতিমার এই বৈপ্লবিক বাণী চিন্তার আলোড়ন এনে দিল। নতুন ধারার বিবর্তনবাদকে বিজ্ঞানীরা ভাবতে শুরু করলেন : সৃষ্টির মূল কথা হলো সিসৃক্ষা—যার গতি নিয়ন্ত্রণ করছেন স্বয়ং বাসুদেব—স্থাবরে, জঙ্গমে, বিশ্বলীলায় নিজে আত্মগোপন করে থাকবেন বলে। সৃষ্টির মধ্যে বিভেদের দৃষ্টি এসেছে অজ্ঞানতার ফলে—দেখা দিয়েছে সৃষ্টির মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং সংগ্রাম। জ্ঞানের অভাবে এই দ্বন্দ্ব এবং সংগ্রাম প্রাণের সংহারের কারণ হয়ে ওঠে কিন্তু প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে এই দ্বন্দ্ব নানারূপ অবসান ঘটিয়ে প্রাণকে সংধারণ করে দিব্যাভিমুখী করবার জন্যে, সংগ্রাম চলে অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে শুভময়কে জীবনে মূর্ত করবার জন্যে। এই সংগ্রামে জয়ী হয় দিব্যভাবে দীক্ষিত মানবজাতি। দিব্য-

(42) Mother India June, 1952: P. 16.

(৪৩) শ্রীঅরবিন্দ মন্দির বার্তিকা, আগস্ট, ১৯৫১।

চেতনার জাগরণে যাঁরা একে উপলব্ধি করেন, প্রাণের সংধারণে অমৃতশক্তির অধিকারী হয়ে ওঠেন তাঁরা—ব্রহ্মতেজে বলীয়ান হয়ে। বিধিলিপি বলে, এই ব্রহ্মতেজে বলীয়ান মানব সন্তানের দলই বাঁচবেন—অন্য কেউ নয়। দিব্য-জীবনের আশ্রয় ব্যতীত প্রাণের সংরক্ষণ বা সংধারণ সম্ভব নয়। সুতরাং জীবনযুদ্ধে বিশিষ্টতম উপযুক্ততার অধিকারী যে হবে সেই বেঁচে থাকবে—এখানে 'বিশিষ্টতম অধিকারী' শব্দটি তাঁদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য—যাঁরা দিব্য-চেতনার দক্ষতা নিয়ে দিব্য-জ্ঞানে বলীয়ান হয়ে সংগ্রামে জয়ী হবেন সত্যের কারণে, সত্যাদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্যে। কারণ নিয়তি লিখনে দিব্য ইচ্ছাই জয়ী হবে, মানুষের ইচ্ছা নয়।

এই জয় আসবে নিশ্চয়ই। ১৯৫৬ সালে প্রজাবতী বাণী দিলেন :

> "The greatest victories are the least noisy. The manifestation of a new world is not proclaimed by beat of drum."

এই জয়ের জন্য প্রয়োজন পৃথিবীতে প্রজ্ঞা-স্রোতের প্লাবন—অতিমানসের অবতরণ। যে ধারাস্নানে ধরণী শুদ্ধ হবে। এরজন্যই বিজ্ঞানময় পুরুষ দেহ পরিবর্তন করেছেন। এর জন্যই পণ্ডিচেরীতে জীবন্ত প্রতিমা এখনও দিব্য কর্মে রত। এর জন্যই আশ্রমের সেব-সংঘের ব্রতী পুরুষেরা নিঃশব্দে কর্মযোগে মগ্ন। যার জন্য চলেছে বিশ্বব্যাপী জ্ঞানযজ্ঞ—বিশ্বের ভূখণ্ডে সেই যজ্ঞের যজ্ঞাগ্নের প্রতীক হিসাবে ছুটে চলেছেন ব্রতী পুরুষেরা, একের পর এক জ্ঞান পীঠস্থানে, উত্তোলন করছেন ভারতের অধ্যাত্মজ্ঞানের বিজয় পতাকা।

মনস্পতি শ্রীঅরবিন্দের সংকল্পের রশ্মি বিশ্বের চিন্তা-নায়কদের মনে নতুন চিন্তাধারা সৃষ্টি করলে, যে চিন্তাধারার আলো এবং অন্তে ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। যেন নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে কেউ উড়িয়ে দিয়ে গেছে ভারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতির বিজয় পতাকা।

বিশ্ববিশ্রুত মনীষী জুলিয়ান হাক্সলের উপলব্ধিতে উপস্থিত হলো এক নতুন পৃথিবী—কল্পনাতীত শুভ সম্ভাবনায় ভরা—যেখানে নরে মূর্ত হবেন নারায়ণ। ধীমান কোয়েসলার উপলব্ধি করলেন এক অভিনব দিব্য-চেতনার উদ্ভব। দার্শনিক সার্ডিন তাঁর দূরদৃষ্টিতে বিবর্তনবাদের নব-বিশ্লেষিত রূপ দেখতে পেলেন—বিবর্তনের মূল লক্ষ্য ঊর্ধ্ব পথে সেই পরা-চেতনার উত্তরণ। প্রথিতযশা লাকোমতে দূর নয়ে দেখতে পেলেন বিবর্তনের এক নতুন পূর্যায়ের ঘোষণায় আগত এক নবীন ঊষার পদক্ষেপ। যেন ফিশার এবং পিটিরিম সোরোকিন প্রমুখ চিন্তানায়কদের সামনে পরিস্ফুট হয়ে উঠল বিশ্বব্যাপী ব্রহ্মবিদ্যানিষ্ঠ এক শান্ত সৌম্য মানবজাতি, সামোর জয়গানে মুখরিত ধরণী, বিশ্বব্যাপী সেই একের বিজয় পতাকা। বিশ্বব্যাপী দেখা যাচ্ছে পরিবর্তনের শুভ সূচনা। জ্যোতির্ময়ী প্রতিমা ভারতবর্ষের এক প্রান্তে নিঃশব্দে

জ্যোতির্ময়ী জগদ্ধাত্রী প্রতিমা শ্রীমা

কাজ করে চলেছেন যেমনটি শ্রীঅরবিন্দ লিখেছিলেন সাবিত্রী মহাকাব্যে সাবিত্রীর উত্তর সাধনে—'আমি চুপ করে বসে নেই। দেবতাদের পৃথিবীতে আমি নামিয়ে আনছি, নিরাশার বুকে আশা এনে দিচ্ছি, উচ্চ-নীচ সকলকে সমানভাবে শান্তি দান করছি, মূর্খ ও জ্ঞানীর উপর সমভাবেই করুণা বিকিরণ করছি। পৃথিবী যদি উদ্ধার হতে চায় ও আমি তাকে উদ্ধার করবো, তখন এই মর্তধামেই প্রেম অক্ষত চরণে বিচরণ করবে, মানুষের মন সত্যকেই সত্য বলে মেনে তার বিধানেই চলবে এবং ঈশ্বরীয় বাহিনে পূর্ণ-চার তুরীয়ের, অনন্তের তার মাঝে করে অবতরণ।'

১৯৫৬ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ধরণীর উপর অতিমানস অবতীর্ণ হলেন। এপ্রিল মাসে জ্যোতির্ময়ী প্রতিমা তাঁর সাধনায় বললেন, এই সেই মহেন্দ্রক্ষণ। যখন ধরণীর সব কিছুতে পরা-চেতনার ধারা বিকিরিত হয়েছে—যা ছিল স্বপ্ন তা বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে। এক্ষণ থেকে পৃথিবী এবং আমরা সবাই আর কখনই সেই পরা-চেতনার ধারা থেকে বঞ্চিত হব না—সব সময়ই যুক্ত থাকব। জন্মান্তরের মধ্যে সেই দিব্য-প্রভাব ক্রমশ ঘনীভূত হয়ে উঠবে। আমরা ক্রমশ এগিয়ে যাব ঈশ্বরলাভের পথে, দিব্য-জীবনের প্রতিষ্ঠায়। যে জীবনে থাকবে মৃত্যুঞ্জয়ী প্রাণ, থাকবে নিঃসর্গ সুষমা সত্য এবং আনন্দময় চেতনা।

১৯৫৮ সালে শ্রীমা বললেন, একের পর এক অতিমানসের শক্তি নেমে আসছে এবং অতিমানসের অবতরণ ত্বরান্বিত হবার উপযুক্ততা আসছে। শুধু কারোর পৃথিবীতে—এক অভাবিতের মধ্যে মানুষের সীমিত মনো-ভূমিমাপী নতুন চেতনা তাকে নতুন সৃষ্টিতে মহত্তর জীবনের জন্য। এই প্রসঙ্গে শ্রীমা বলেছিলেন যে, এই অধ্যাত্ম প্রস্তুতির একটি উল্লেখযোগ্য পর্যায়ের সূচনা হবে ১৯৬৭ সালে। ১৯৬৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে শ্রীমার বাণীতে ঘোষিত হলো—দিব্য-জন্মের মধ্যেই আমরা এখন এসে গেছি এই দিব্যজন্মেই হবে গুরু-দেবের কথামত দিব্য-জীবনে উত্তরণের কাজ প্রারম্ভিত হবে। গুরুদেবের লীলাসহচর নলিনীকান্ত গুপ্তের ভাষ্য অনুযায়ী : বিংশ শতাব্দীর এই পর্যায়েই পৃথিবীর মানুষ (প্রথম জনসাধারণ নয়) প্রথম অতিমানসের দিব্য-জন্মে অবস্থানের অভিজ্ঞতা লাভ করছে এবং অতিমানসের ধারাস্নানের যোগ্যতা অর্জন করছে। বিবর্তনের চক্রে এ এক নতুন ঊষার সূচনা যখন মানুষ উন্নীত হলো ঊর্ধ্বতর স্তরে। অতিমানসের দিব্য-জন্মে অবস্থানের ফলে সেই মানুষ সর্বপ্রথম উপলব্ধি

অরোভিল, পণ্ডিচেরী

করতে পারেন পর-মানবসত্তার তীব্রতা। কারণ, সেই দিব্য-মন্ত্রে অতিমানস অবতীর্ণ হয়েছেন পৃথিবীর দিকে, সেই আকর্ষণ নিম্নাভিমুখী হয়ে প্রকৃতির লীলাকে অমৃতের স্পর্শ দিয়েছে। ইন্দ্রিয়ের অধিকারী প্রাণে অতিমানসিকের আবির্ভাব মানুষকে প্রজ্ঞাবান করেছে। কোন এক অমোঘ এবং অদৃশ্য নির্দেশে একই সঙ্গে চলেছে : অতিমানসের অবতরণ, যার তীব্র আকর্ষণে প্রকৃতি ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে, এবং সৃষ্টির লীলায় দেখা দিয়েছে নিবর্তন এবং উত্তরণের প্রবণতা।' (৪৪)

চরৈবেতি। ১৯৬৮ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি নির্মাণমুখি যজ্ঞের সূত্রপাত—জোতী বেদীর উদ্বোধন করলেন শ্রীমা—ইউনেস্কোর আন্তরিক সহযোগিতায় মূর্ত হলো আগতপ্রায় দিব্য-জীবনের এক অভিনব প্রাণকেন্দ্র অরোভিল। অরোভিল মহানগরী—নিসর্গ প্রাকৃতিকতা মাতৃমায় নিবদ্ধ-লোক। এর উপর অধিকার থাকবে সমগ্র বিশ্বের দিব্য-জীবনের অভিযাত্রীদের। এর মধ্যে থাকবে সেইসব সম্পদ যা অতীতের ঐশ্বর্য বর্তমানকে সমৃদ্ধ করবে ভাবী প্রগতির পথে এগিয়ে যাবার জন্যে, একান্তভাবে আর্য পন্থায় : 'তস্যের বিভিন্না অতিমনুষ্যম্ এষি নানাঃ পন্থাঃ বিসৃতে অঞ্জনায়।'

১৯৬৯ সালের প্রথম দিনের ঊষা আবির্ভূতা হলেন পরা-চেতনার ধারাস্নানে পবিত্র হয়ে। জগদ্ধাত্রী প্রতিমার তুলা-প্রকারে ১লা জানুয়ারির ঊষার প্রাক্কালে অধিমানসের দিব্য-মন্ত্রে অতিমানসের প্রভাব অধিষ্ঠিত হলো। শ্রীমা বলেছেন, এই অধিষ্ঠান কখনও নয়—

"but it is established there and is fully operating."

বিংশ শতাব্দীর বর্তমান দশকে পরা-চেতনা এমন এক স্তরে নেমে এসেছে যেখানে পৃথিবল থাকলে মানুষী চেতনা উঠতে পারে। তাই ১৯৭০ সালের নববর্ষের বাণীতে শ্রীমা বললেন :

"The world is preparing for a big change. Will you help "

হে বিশ্ববাসী, অমৃতের পুত্রগণ তোমরা সহায়ক হও, প্রতিবন্ধক হয়ো না। তিনি যেন বললেন, তোমরা অন্তরে আকুতি ফুটিয়ে তোলো—'তত্র মাম্ অমৃতম্ কৃধি'—তা না হলে তোমরা সেই বিরাট পরিবর্তনকে সম্ভব করে তোলার কাজে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবে কি করে! দিব্য-জীবনকে পৃথিবীতে মূর্ত করবার অদৃশ্য প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম বিজ্ঞানময় পুরুষ যে অনাগত ঊষাকে কল্পনা করে ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছলেন—'ঊষা আসবে'—সেই ঊষা এসেছে। এই সময়েই 'অহংশূন্য' দল বা সংঘ দিব্য-জীবনের প্রতিষ্ঠায় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে—বলে গেছেন দিব্য-জীবনের দিশারী শ্রীঅরবিন্দ। বিশ্বজনের সামনে ভাসছে শ্রীমার যুগোপযোগী বাণী :

"Divine Power alone can help India. If you can build faith and cohesion in the country it is much more powerful than any man-made power."

এই নতুন মন্ত্রে প্রতিধ্বনিত হয়েছে সেই অতীত ঋক্-মন্ত্রের পবিত্র সূর : 'সমানী বা আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ। সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি।। যথা বঃ সুসহাসতি।।' বিশ্বমুক্তি যজ্ঞের যজ্ঞমণ্ডপে যাঁরা বিশ্বকল্যাণের ব্রত নিয়ে শুভচিত্তে সমবেত হবেন তাঁদের সমবায়ী মনে হবে একই আকূতি করে থাকবে। তবেই তাঁরা সুসংবদ্ধ হতে পারবেন—অভীষ্ট সিদ্ধির কারণে।

অনেকের দলে কিছু ভাগ্যবান দিব্য-জীবনের স্পন্দন অনুভব করে দিব্যাহ্বে স্থিত হবেন। ১৯৭১ সালের আশীর্বাণীতে শ্রীমা বললেন :

"Blessed are those who take a leap towards the Future."

এখানে তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন সেই বহু-আকাঙ্ক্ষিত দিব্যজীবনের বিধিলিপি নির্দেশিত ভবিতব্যের।

আজ বিশ্ববাসীর মনে জাগ্রত হোক মনস্পতি শ্রীঅরবিন্দের গায়ত্রী-মন্ত্র : তৎ সবিতুর্বরং রূপ জ্যোতিঃ পরমা ধীমহি। ধিয়ঃ সতোন প্রচোদয়েৎ।।

আজ বিশ্বের দিকে-দিগন্তে ধ্বনিত হোক সেই প্রার্থনার বাণী যা শ্রীমা জানিয়েছেন মনস্পতির আবির্ভাব-শতবর্ষ পূর্তির প্রাক্কালে : 'হে পরম-পিতা, সনাতন সত্তা আমরা যেন একমাত্র তোমারই আজ্ঞাধীন হই এবং আমাদের জীবন যেন সত্যাশ্রয়ী হয়ে থাকে।' (৪৫)।

.....যা বলেছেন : শ্রীঅরবিন্দ অতীতের সম্পদ নন্—তিনি কালজয়ী পুরুষ। শ্রীঅরবিন্দ উত্তরণের পথে চলমান এক আশ্চর্য প্রগতি। আমাদের প্রগতির কারণে আমরা সেই অক্ষয় যৌবনের আশ্রয় গ্রহণ করবো যাতে আমরা সমান তালে চলতে পারি, পথ-চলায় পিছিয়ে না পড়ি।' (৪৫)।

মা-র আশীর্বাদে দিব্য-অভিযানে এগিয়ে যাবার পরিবেশ, প্রস্তুতি এবং শক্তি বিশ্ববাসী পাচ্ছে—তারা এগিয়ে চলেছে এবং চলবেও। তারা চলবে ততদিন, যতদিন না মনস্পতির মনস্কামনা পূর্ণ হয়।

চরৈবেতি। চরৈবেতি।। চরৈবেতি।।

(44) Nolini Kanto Gupta : The Yoga of Sri Aurobindo : Part 10 : p p. 174—5.

(45) Sri Aurobindo's Action : Special Issue : August 15, 1971

দুঃখে সুখে বাঁচা

নিখিলচন্দ্র সরকার

চা খেতে খেতে অনীশের খেয়াল হলো, সিগারেট ফুরিয়ে গেছে। আর দুটো কি তিনটে কাঠি পড়ে আছে প্যাকেটে। সিগারেট না হলে তো রাত্রে ভীষণ কষ্ট হবে। চা শেষ করে কেটের পাঞ্জাবিটা পরে নিল সে, শালটাও জড়িয়ে নিয়েছে গায়ে। মানু ঘরে ছিল না; সম্ভবত অতসীর ওখানে। বেশ আছে ওরা। নিজেরাই খুশি-মতন ঘরে বেড়ায়। অতসীর কথা ভাবতে গিয়ে কি যেন মনে পড়ে গেল হঠাৎ, আপন মনেই হাসল একটু।

দিনের আলো ফুরিয়ে যাচ্ছে দ্রুত। গাছে গাছে ছায়া কমল ঘন হচ্ছে। পাখি-দের কিচির মিচির। আর অল্পক্ষণের মধ্যেই শেষ আলোটুকুও মরে যাবে। মাঠে ক্ষেতে শাল মহুয়ার মাথায় ছোপ ছোপ কুয়াশা জমছে। শীত বাড়ছে যেন একটু একটু করে। এরই মধ্যে ধুলো, ঘাস অল্প অল্প ভিজে উঠেছে।

অনীশের আজ বেরোবার কোন ইচ্ছে ছিল না। দুপুরে খেতে খেতে প্রায় বেলা গড়িয়ে গিয়েছিল। রোদে পিঠ দিয়ে খানিকক্ষণ, গতকালের কাগজ পড়েছে, সেই ঘুনোঘুনি, গলাকাটা। অনীশের ভাল লাগেনি। দীপেন্দুর মুখটা আবারো মনে পড়ছে। অস্বস্তি কাটাবার জন্যে শেষে খেলাধুলো সিনেমার পাতা উল্টে পাল্টে দেখল কিছুক্ষণ। তারপর কাগজটা একপাশে রেখে উঠে পড়েছে অনীশ। চোখ দুটোও যেন একসময় ভারী হয়ে উঠেছে। ঘরে এসে লেপটা টেনে নিয়ে শুয়ে পড়েছিল। ঘুমটা যেন কিছুতেই ছাড়তে চাইছিল না। অবেলায় ঘুমিয়ে খারাপই করেছে সে। শরীরটা বেঙতে লাগছে, গলাটাও একটু ভার ভার।

স্টেশনে বেশ লোকজন। গরম জামা-কাপড় পরে সব বেড়াতে বেরিয়েছে। অনীশের ইচ্ছে, সিগারেট কেনলাই, আরো টুকিটাকি কয়েকটা জিনিস কিনে, তাড়া-তাড়ি বাড়ি ফিরে আসে। মন্দিরটার কাছা-কাছি এসেছে অনীশ। মানু আর অতসীর সঙ্গে ওর দেখা। ওরা ফিরছে তখন। অনীশকে দেখে ওরাও দাঁড়িয়ে পড়েছে। অতসী মানুর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে। লাজুক চোখে ও তাকে দেখছিল। অতসীর মুখে অল্প অল্প হাসি। মানুও হাসছে।

'কতটা গিয়েছিলি তোরা?' অনীশ মানুকে কথাটা জিজ্ঞেস করতে করতে প্যাকেটের শেষ সিগারেটটা ধরিয়ে নিল।

'কোথায় আর যাব, এখানেই ঘোরা-ঘুরি করছি।'

'মনে হচ্ছে, খুব ঘুমিয়েছেন?' অতসী ঢাকনা নয় ভাঁপাতে।

'দেখে বোঝা যায়?' অনীশ একদৃষ্টে চেয়ে থেকে শুধোয়।

'হুঁ—।' অতসী ঘাড় হেলিয়ে ফের বলল, 'চোখ দুটো ফোলা ফোলা লাগছে।'

'নাঃ, এই অবেলার কাজটা ঠিক হয়নি।'

'আমার তো খালি ভয় হয়, ঘুমোলেই বুঝি জ্বর এসে যাবে। সেই ভয়েই দুপুরে আর ঘুম হয়ে ওঠে না।' অতসী তরাট চোখে ওকে একবার দেখল।

'শীতকালে ঘুমোলেই দেখছি, শরীরটা আরো বেশি ম্যাজ ম্যাজ করে।'

'তবে আর ঘুমোন কেন!' অতসী হেসে ফেলেছে। হাসিটা ওর ভারি মিষ্টি, হাসলে ওকে দেখতে আরো ভাল লাগে।

'খুব বলেছো অতসীদি, জান না তো, ঘুমের ব্যাপারে সেনসার ভীষণ কড়া!'

'একটু একটু বুঝতে পারছি!' অতসীর গলায় সামান্য কৌতুক ছিল যেন।

'ঘুমোতে পারলে ওর মতন কি আর জিনিস আছে, কি বলো অতসী?' অনীশ ওর মুখের দিকে হাসি হাসি চোখে চেয়ে রইল একটু সময়।

অতসীও হেসে ফেলল, 'কি জানি, এখনও বুঝবার সুযোগ পাইনি। তবে জানেই পারি না। শরীরটাই গোলমাল করে ফেলে।' অতসী ছোট ছোট চোখ করে দেখল একবার।

'অনেক সময় ওষুধেরও কাজ করে এটা তা জান?' অনীশ মুখের ওপর থেকে সিগারেটের ধোঁয়া বাঁ হাত দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছিল।

'না।' অতসী মাথা ঝাঁকিয়ে হাসল, কোমল গলায় পরে বলল, 'যখন শরীর খুব খারাপ ছিল, তখন খালি ঘুম পেত, বেশি হাঁটা-হাঁটি করতে পারতাম না, মাথা ঘুরত। দেখেছি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে অসুখ হাপ ধরে যেত।' অতসী এবার অনেক মজা পেয়েছে যেন।

'তোমরা দেখছি ভীষণ বেরসিক।'

'মোটেই না সবাই আপনার মতন হলে, কি ব্যাপারটা হবে একবার ভেবেছেন?' বলেই খিল খিল করে হাসতে লাগল অতসী। ওর চোখে মুখে কিসের এক দুষ্টুমি।

'সে তো হলো, কিন্তু তুমি এই এক্ষুণি বেরিয়েছো যে?' মানুর গলায় কৃত্রিম বিস্ময় ও গাম্ভীর্য ছিল।

'তুই যেন অবাক হয়ে গেলি!'

'হওয়ারই তো কথা, আমি তো ভাবতেই পারছি না।' মানু চোখ মুখের এক ভঙ্গি করে হাসল।

'মানু ঠিকই বলেছে। আপনি কিন্তু সত্যিই খুব একটা বেরোন না।' অতসী গাঢ় চোখে একবার চেয়েই মুচকি হেসে সরিয়ে নিল দৃষ্টি।

'এটা ঠিক বললে না, বলতে পার কম বেরোই।' সিগারেটটা শেষ করে এনেছে অনীশ, আর একবার টেনে নিয়ে টুকরোটা ফেলে দিল, পরে সোজাসুজি ওর মুখের দিকে চেয়ে বলল, 'তোমরা আর বেরোবে বলো, সেই তো সেদিন, ধানোয়ার রোড আর ঐ কিসের কাছটায় ধোরাঘুরি করা, অনেকবার তো হয়েছে!'

'বুঝেশুনে তাই তো করছে সবাই।'

'বিশ্বাস কর, ঐ হট্টগোলটা আমার ভাল লাগে না।'

'এখানে আবার হট্টগোল কোথায়?' মানু ছোট্ট চোখ একবার মাথার দিকে, পরে চোখ ঘুরিয়ে আনতে আনতে বলল, 'নিজেরা খুশিমতন একটু হাঁটবো, বেড়াবো তার আবার হট্টগোল!'

'ভিড়টা আমারও একদম সয় না।'

'তুমি আর বলো না অতসীদি, একটুতেই যা হাঁপিয়ে পড় না!'

"এই, এখন হাঁপাই না।' প্রতসী মানুর কানের কাছে মুখ নিয়ে কি বলল ফিসফিস করে। ও হাসছিল ফিক ফিক।

মানু ওর দাদার দিকে তাকিয়ে থেকে শুধালো, 'কোনদিকে যাবে তুমি?' অতসীও চেয়ে থাকল। ওর খুতনীটা মানুর কাঁধের কাছে ছুঁইয়ে রেখেছে।

'সিগারেট কিনতে বেরিয়েছি, ফুরিয়ে গেছে।'

'কাই বলো!'

'শুধু এইজন্যেই বেরিয়েছেন?' অতসী ওর চোখে চোখ রেখে মুখ টিপে টিপে হাসছে।

'এটা একটা কারণ তো বটেই, তাছাড়া একটু ঘুরে আসা।'

'কী নেশা বাবা!' অতসী সোজা হয়ে দাঁড়াল, চোখেমুখে প্রচণ্ড একটু মজা।

'নেশা ভীষণ পাজী জিনিস।' অনীশও ওর মুখের দিকে চেয়ে হালকাভাবে হাসল। পরে আস্তে আস্তে বলল, 'তবে নেশা ছাড়া মানুষ নেই।'

'তা নেই, কিন্তু এরও তো জাহবেজাত আছে।' অতসী পিঠের চুলগুলোকে খোঁপা করে নিতে নিতে হাসল।

'মজাটা কি জান, যে নেশা করে তার কাছে ওর বিচারটা অন্যরকম।'

'ওসব বিচারে আমাদের কাজ নেই। তারচেয়ে চলো সোনাদার সঙ্গে ঘুরে আসি।' মানু তাকাল ওর দাদার মুখের দিকে।

'চল ঘরেই আসি একটু।' অনীশও বোনের মুখের ওপর চোখদুটো কিছুসময় স্থির করে রাখল। পরে অতসীর দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে মৃদু হেসে শুধোয়, 'তোমার কষ্ট হবে না তো হাঁটতে?'

'না—।' অতসী মাথা নাড়িয়ে নাড়িয়ে বলল, কি ভেবে হেসে উঠল পরমুহূর্তেই। একটু সময় চুপ করে থেকে বলল, 'মানু তো আবার এক্ষুনি বলে উঠবে, আমি হাঁটতেই পারি না, খালি হাঁপিয়ে উঠি?'

'ও নিজেই বা কি!'

'ইস্—আমার সঙ্গে অতসীদি পারবেই না হেঁটে!'

'তা হয়তো পারবো না, কিন্তু আগের চেয়ে অনেক শক্ত হয়েছি বলো।' অতসী টান টান চোখ করে একপলক দেখে নিল ওকে। বেশ খুশি খুশি দেখাচ্ছিল।

'কোনদিকে যাবে?'

'তোরাই বল না কোনদিকে যাবি?'

'কি অতসীদি, বলো।'

'স্টেশনের দিকে নয়, তার চেয়ে ধলেশ্বরীর রোড অনেক নিরিবিলি।'

'তোমার খালি নিরিবিলি!' মানু অতসীকে মৃদুভাবে একটা ঠেলা মেরেছে। ওর কথা বলার মধ্যে কী এক রহস্য ছিল।

অতসীও মানুকে খুব আস্তে একটা চিমটি কাটল, অস্ফুটে বলল, 'খুব বাড়িল হয়েছো, দাঁড়াও!' অতসী হঠাৎ যেন কেমন লজ্জা বোধ করতে লাগল। মানুর সঙ্গে তার এই ধরনের আচরণে ইতিপূর্বে অনেক কথাই হয়। ওর কাছ থেকেই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অতসী অনেক কিছু জেনে নিয়েছে। ওর দাদার সম্পর্কে অতসীর কৌতূহল ক্রমশই বাড়ছিল। ওর দাদাও ঘনিষ্ঠ কোন আত্মীয়ের মতন গভীর সহানুভূতি নিয়ে তার সঙ্গে কথা বলেছে। মানুর সঙ্গে তার সম্পর্কটা আরো সহজ, মধুর হয়েছে। কখনো কখনো মনে হয় ওরা যেন অনেক-কালের চেনা, পরস্পর পরস্পরের দীর্ঘ-কালের বান্ধবী। মাঝে মাঝে ইয়ার্কি ফাজলামিও চলে। মানুটা হঠাৎ হঠাৎ এমন-সব ছেলেমানুষী করে! ওভাবে তখন বলার কি দরকার ছিল ওর দাদার কাছে! বেচে বেচে ওরা দুজনই তো বাগান থেকে ফুল-গুলো তুলেছে। কোন বুদ্ধি থাকে যদি ওর, কে নিয়েছে সেটা না জানালে কি চলতো না ওর! কী লজ্জাতেই না পড়েছিল সে। আবার বলে কিনা গায়ে এসে প্রজাপতি বসেছে! কি ভাবল ওরা দাদা। এখনও যেন মনের মধ্যে সেই প্রজাপতিটা উড়ছে তো উড়ছেই!

'হঠাৎ যে খুব গম্ভীর হয়ে গেলে অতসীদি!'

'মোটেই নয়।' অতসী খিল খিল করে হেসে উঠেছে।

'তোমাকে গম্ভীর দেখলে আমার খারাপ লাগে।' মানুও সশব্দে হেসে উঠল।

'মাঝে মাঝে এক একটা এমন কথা বল না যে গম্ভীর না হয়ে উপায় আছে?'

'বললে তো খুব খুশি হও দেখি।'

'এমা—, কী অসভ্যরে!' অতসী ইশারা করে মিহিগলায় বলল, 'শুনবে, আস্তে বল।'

মানু খুব কাছে এগিয়ে এলো হঠাৎ, আস্তে আস্তে ইয়ার্কি মেরে বলল, 'আমি কিছু খারাপ করছি না তোমার, উল্টে বরং উপকারই করছি।'

'তুমি না আজ দুদিন ধরে যা তা বলছো আমায়!'

'ও, বললেই বুঝি দোষ, কিছু টের পাই না আমি, না?'

'মোটেই না।'

'লুকিয়ে লাভ নেই, আমারও বোঝার বয়েস হয়েছে।' একটু থেমে হেসে হেসে মানু আবার বলেছে, 'সোনাদার সম্বন্ধে তো তোমার আগ্রহের শেষ নেই।'

'তোরা ফিসফিস করে কি বলছিস আর হাসছিস রে?'

'না, কিছুই না, ও আমাদের কথা।' মানু অতসীকে ছোরে একটা চিমটি কেটে দিয়েছে।

'উঃ।' অতসীও ওকে ধরতে গিয়েছে, পারল না। মানু এক দৌড়ে অনেকটা পথ এগিয়ে গেছে।

সন্ধ্যের ছায়া ঘন হয়ে উঠেছে। গাছে গাছে পাখিদের চীৎকার ক্রমশই বাড়ছে। ধোঁয়ার মতন কুয়াশা ভাসছিল মাঠে ক্ষেতে গাছের মাথায়। ঝোপের ভেতরে ঝিঁঝি পোকা ডাকছিল। ঘাস মাটি গাছগাছালি লতাপাতা ধুলোর যেন একটা গন্ধ নাকে এসে লাগছে। কয়েকবার টেনে টেনে গন্ধটা নাকে নিল অতসী, নিতে নিতে একবার অনীশকে পরিপূর্ণ চোখে দেখল, ওর সারা চোখ মুখে এখন কী এক সুখ যেন ফুটে রয়েছে, হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করল, 'গন্ধটা বেশ লাগে, তাই না?'

'আমার তো খুবই ভাল লাগে।'

অতসী আর অনীশ পাশাপাশি হাঁটছিল, হাঁটতে গিয়ে অনেক সময় ওর হাতটা অতসীর গায়ে লেগে যাচ্ছে। পথের দুপাশে বড় বড় গাছ, ফলে অন্ধকারটা ওখানে সামান্য গাঢ় যেন।

হাঁটতে হাঁটতে অতসী এক সময় বলল, 'এই সন্ধ্যের সময়টাই বড় খারাপ লাগে আমার।' অতসীর চোখ থেকে এই মুহূর্তে যেন খানিক আগের সুখের লাবণ্যটুকু ফুরিয়ে গেল। আবার সেই ক্লান্তি, সান্নিধ্য বিষণ্ণতা, হয়তো বা কোন দুঃখও চোখ দুটোতে জড়িয়ে আছে। সে অন্য কোন কথা ভাবছিল এখন। সন্ধ্যের অন্ধকারটাকে বড় যেন ভয় তার।

অনীশ সঙ্গে সঙ্গে মুখ তুলল, 'কেন?'

'কেন বলতে পারবো না, আলোটুকু ফুরিয়ে এলেই আমার কী রকম করতে থাকে।'

'এটা তো জগতেরই নিয়ম। কোন মানে নেই এই ভয়ের।'

'হয়তো নেই। আগে তো এটা আমার খুবই হতো, আজকাল কমেছে। অবশ্য বেশিক্ষণ থাকে না।'

'অদ্ভুত লাগছে তো!'

'আমি যেন অন্ধকারটাকে বুঝতে পারি, টের পাই। আমার অস্বস্তি হতো। ওই সময়টুকু পেরোলেই সব ঠিক আবার।'

একটু থামল অতসী। কি ভাবল যেন মনে মনে। পরে বলল, 'আমার নিজের কি মনে হয় জানেন?' বলে অতসী আবার যেন কি ভেবে নিল, একটু উদাসীন দুঃখী গলায় বলল, 'বাবার কথা আমার প্রায় কিছুই মনে নেই, তবু একটা ছবি অস্পষ্ট-ভাবে মনে পড়েছে বহুবারই, ঠিক সন্ধ্যের মুখটাতেই বাবাকে খাটিয়ায় চাপিয়ে হরিবোল দিতে দিতে শ্মশানে নিয়ে গিয়েছিল। ওটা যেন কেমন করে সেই অবুঝ মনে গাঁথা হয়ে গিয়েছিল।' অতসী কথা শেষ করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

মানু দাঁড়িয়ে পড়েছে, 'মাঠ দিয়ে যাবে?'

'না, এখন সোজাই চল, পরে শর্টকাট হবে।' অতসী বলল।

'ঠিক আছে, তুমিই তাহলে আমাদের গাইড।'

'তবে আর নেই আমি।' অতসী ও পা পিছিয়ে গেল।

'আর হলোই বা, এতে ভ্যে আর ভয়ের কিছু নেই।' অনীশ হাসছিল মৃদু মৃদু। ওর এই কথার মধ্যে আরো একটা অর্থ ছিল যেন।

অতসী চোখ আনত করেছে। অনীশের কথাটা নিয়ে সে মনে মনে খানিকক্ষণ খেলা করল। হাঁটতে হাঁটতেই চুপি চুপি

পার্লে গ্লুকো— আরো বেশী ভাল স্বাদ— অনেক বেশী পুষ্টিকর

পার্লে গ্লুকো বাচ্চাদের হেসে-খেলে বেড়ে ওঠার মজার সাথী

ভারতে সবচেয়ে বেশী কাটতির বিস্কুট পার্লে গ্লুকো

everest/308-7/PP BN

এক সময় বলল, 'সময় হলে এমনিতেই হবো, কিছু বলতে হবে না তখন।' অতসী মুখ উঁচু করে এবার হেসে উঠল।

কি একটা বলার জন্যে মুখ তুলেছিল অনীশ, তাকিয়ে দেখে, মানু ওদের দিকে কেমন একধরনের চোখ করে চেয়ে আছে। সে চুপ করে গেল। কথা না বলে ওরা হাঁটছিল।

পথের দু-ধারের বাড়িগুলোয় লোক এসে গেছে। আলো জ্বলছিল, হইচইও শোনা যাচ্ছে। অনেকেই রাস্তায় নেমে পড়েছে। কেউ কেউ আবার ট্রানজিস্টার নিয়েও ঘুরছে। স্টেশনে যাওয়ার রাস্তাটাই ধানেশ্বর রোডের সঙ্গে এসে মিশেছে। বড় রাস্তার বাঁ পাশ দিয়ে সরু একটা পথ নেমে গিয়েছে। জমিটা এখানে অনেক চওড়া। খানিকটা এগুলে ধান জমি, আর গুটি-কতক বাড়ি। বাড়িগুলো ফাঁকা, ভাঙাচোরা। লোকজন নেই বললেই হয়, সব কেমন খাঁ খাঁ করছে। ওদিকটায় খুবই নির্জন। ফসল তুলে নেওয়ার ক্ষেতগুলোকে আরো বেশি ফাঁকা লাগে। একদিন কি খেয়ালে, রোদ উঠে যাওয়ার পরও ওদিকটায় সে ঘুরতে গিয়েছিল, তখনই কেমন এক অস্বস্তি হয়েছিল তার। এখানে কারা ছিল একদিন?

খানিকটা এসে একটা মুদির দোকান পেয়েছে ওরা। দোকানের মালিক এক-জন বাঙালী। পুরনো, রং উঠে যাওয়া একটা সাইনবোর্ড ঝুলছে দোকানের মাথায়। নির্ভরযোগ্য বাঙালীর একমাত্র প্রতি-ষ্ঠান নাকি। বিজ্ঞাপনে আছে সর্ব রকমের সুযোগ-সুবিধে পাওয়া যায় এখানে। কটা লোক একটা বেঞ্চিতে বসে কাগজ পড়ছে, চা খাচ্ছে, কেউ কেউ আবার কোথায় কি দরকার আছে, যাওয়ার ব্যবস্থা কি ইত্যাদি জেনে নিচ্ছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে, আরো বহু রকমের খবরাখবর নিচ্ছে।

এগিয়ে এসে অনীশ সিগারেট আর বেললাই কিনল। একটা বিস্কুটের প্যাকেট আর চা-ও নিয়েছে। কাল সকালেই তো আবার লাগবে। অনেক দিন থাকবে বলে একটা বন্দোবস্ত করে নিয়েছে ভদ্রলোকের সঙ্গে। একটা কথা ভদ্রলোককে আজ জানানোরও দরকার ছিল অনীশের। আগামীকাল আধ মণের মতন চাল পাঠিয়ে দিতে বলে গেল।

রাস্তায় নেমে অনীশ সিগারেট ধরাল। ওরা আস্তে আস্তে হাঁটছিল। কটা গরুর গাড়ি শব্দ করে করে চলে যাচ্ছে। রাস্তার দুপাশে বড় বড় বাড়ি, বাগান, ইউক্যা-লিপটাস গাছ, রাস্তার ঠিক ওপরই শিশু-গাছ আর আম।

এক সময় অতসী চেঁচিয়ে উঠল, "দেখ, দেখ মানু।"

সবাই তাকিয়ে দেখল, বিরাট চাঁদটা গাছ-গাছালির পাশ দিয়ে উঠে আসছে। দেখতে দেখতে অন্ধকার সরে যাচ্ছিল।

অনীশ মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে বলল, "চাঁদটাকে আজ সম্পূর্ণ নতুন লাগছে। সিম্পলি ওয়ান্ডারফুল।"

"কলকাতায় থাকতে একদিনও দেখিনি এসব।"

"আমরাও না।" মানু অতসীর কাঁধে একটা হাত রাখল। অল্প অল্প হাসছিল ও। "কোথেকে দেখবি, যেখানে আলো-হাওয়াই ঢুকে না, সেখানে আবার চাঁদ!" অনীশ খানিকটা ধোঁয়া গিলে ফেলেছে, কথা বলতে গিয়ে গলার কাছে কি যেন একটা আটকে গেছে মনে হলো। হঠাৎ কেমন কান্না এলো তার।

"হয়তো কখনো সখনো ভুল করে দেখে ফেলেছি, মনে নেই কিছু।" অতসী সামান্য অন্যমনস্ক হয়ে কি ভাবল, পরে আস্তে আস্তে বলল, "দু-জায়গার পরি-বেশই আলাদা, এখানে তো যা দেখছি সবই ভাল লাগছে আমার।"

"আমারও ভীষণ ভাল লেগেছে অতসীদি।" মানু হেসে উঠল। আবেগে চোখ ছোট ছোট হয়ে এসেছে ওর। অতসীকে জড়িয়ে ধরেছে ও।

"আসলে কলকাতা আমাদের অনেক-কালের চেনা তো, তাছাড়া সুখের চেয়ে দুঃখের অভিজ্ঞতাই বেশি ওখানটায়।" অনীশ সিগারেট টানতে টানতে অতসীকে একবার দেখে নিল।

"ওসব ভাবলে এখনও আমার ভয় হয়।" অতসীর গলাটা যেন বেদনায় ভিজে উঠেছে। কথা বলতে বলতেই সে অন্যদিকে চোখ ফেরাল।

চাঁদটা ইতিমধ্যে আরো অনেকখানি উঠে এসেছে। লাল টকটকে পোয়াতটা আর নেই এখন। স্নিগ্ধ নরম জ্যোৎস্নায় সব ভরে উঠেছে। ওরা হাঁটছিল আস্তে আস্তে। একটা মোটরগাড়ি জোরালো হেডলাইট জ্বালিয়ে ধুলো উড়িয়ে চলে গেল। ওরা সরে দাঁড়িয়েছে একপাশে। নাকে মুখে রুমাল চেপে ধরেছে। ধুলো কমলে আবার হাঁটতে লাগল। অতসী তখনো রুমাল চেপে রয়েছে মুখে। বিরক্তি নিয়ে সে বলে উঠল, "লোকগুলো একে-বারে অসভ্য ইডিয়ট।"

গাছের ডাল পাতার ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো টকরো টকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে রাস্তার ওপর। দেখে মনে হয়, কে যেন নিপুণ হাতে আলো-ছায়ার বরফি কেটে রেখেছে। মানুর কি খেয়াল হলো হঠাৎ। ওই কালো আর সাদার ছকের ওপর দিয়ে সে এক্কা-দুক্কা খেলার মতন করে লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে গেল।

অনীশ সিগারেটের টুকরোটা ফেলে দিল একটু পরে। অতসী আরও ধীরে-ধীরে হাঁটছিল। অনীশ জিজ্ঞেস করল, "তোমার মামা আজ বেরোন নি!"

"তা কি আর বেরোয় নি, তবে আমার সঙ্গে তো দেখা হয়নি!"

"উনি খুব দেশ ঘুরেছেন, অনেক রকমের অভিজ্ঞতা হয়েছে নাকি, কিছু-কিছু বলবেন বলেছেন।"

রাঙা মামার চাকরিই তো বাইরে-বাইরে, অনেক জঙ্গলে-টঙ্গলেও গেছেন।" একটু সময় চুপ করে থাকে অতসী। অনীশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বলল, "মাকে নিয়েই হয়েছে মুস্কিল, কোথাও বেরোতে চায় না।"

"আমার মারও তাই। ঘরের কাজই যেন ফুরোয় না!" অনীশ হাসতে থাকে, অতসীও হাসল।

"আমার মার ব্যাপারটা একটু আলাদা।" অতসী দীর্ঘশ্বাস ফেলল, বলল, "পরের ঘরে খেটে খেটে মা যেন আজ নিজের অধিকারটাও ভুলে গেছে। মার দিকে তাকালে আমার কষ্টই বাড়ে খালি।" অতসীর গলা ধরা-ধরা, একটু বিষণ্ণও। ও মুখ নীচু করে হাঁটছিল।

অনীশও কথা বলল না কিছু সময়, সেও নীরবে ওর পাশে পাশে হাঁটছে। কি ভেবে ওর দিকে তাকাল, অতসীর মুখের ওপর বিষণ্ণতাটুকু এখনও যেন লেগে রয়েছে, ওকে দেখতে দেখতে অনীশ বলল, "দুর্ভাগ্য যে কখন কার ওপর কিভাবে আসে বলা শক্ত, এই মানুকেই দেখ না। এরই মধ্যে সব শেষ করে বসে আছে ও।" একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আস্তে আস্তে অন্যদিকে চোখ ফেরাল সে, একটু নীরব থেকে আবার বলল, "আমরা যে ওকে এত করে বলি একটু জোর-চোর, ভাল লাগবে, ও শুনেই না। কথাও কম বলে আজকাল।"

"মানুর কাছে আমি সব শুনেছি।" বলতে বলতে চোখ তুলেছে অতসী। কি একটা ভাবতে ভাবতে একটু পরে আবার বলল "মানুরও দোষ কি, আমিও তো দেখেছি, দুঃখ অসহ্য হলে কথাও কমে যায়, কিছুই ভাল লাগে না তখন।"

"সেটাও তো ধীরে-ধীরে আসে এক সময়।"

অতসী চোখ ছোট ছোট করে একবার দেখল অনীশকে, বলল "আসে, তবে কারো কারো বেলায় অনেক সময় লাগে।"

"আমি তো উল্টোটাই দেখছি সব দিন থাকছে, মানুটা যেন আরো ছেলেমানুষ হয়ে যাচ্ছে, মনে মনে ভীষণ ভেঙে পড়ছে ও।"

হাওড়া কুষ্ঠকুটীর

সর্বপ্রকার চর্মরোগ, বাতরক্ত, অসাড়তা-দোষ একজিমা সোরাইসিস দূষিত ক্ষতাদি আরোগ্যের জন্য সাক্ষাতে অথবা পত্র লিখুন। প্রতিষ্ঠাতা: পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা কবিরাজ, ১নং মাধব ঘোষ লেন খোড়ো, হাওড়া। শাখা: ৩৬ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯। ফোন: ৬৭-২০৪১।

"ছোটটাও তো কম নয়!"

"তাই বলে নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবে না?" অনীশ অন্যদিকে তাকাল। তার কষ্ট হচ্ছিল।

"হয়তো চেষ্টা করছে সান্দ্রি, পারছে না।"

"সংসারে কম-বেশি আমরা সবাই তো দুঃখ পাই, পেয়েছি, কে জানে আরো হয়তো পাওনা আছে অনেক, তবু এর মধ্যেই আমাদের মানিয়ে চলতে হয়, না হলে বাঁচা যায় না!" একটু থেমে আবার বলল, "এছাড়া উপায়ই বা কি! ঠেকানো যখন সম্ভব নয় আমাদের, তখন মেনে নেওয়ার জোরটুকুই দরকার।" অনীশ চুপ করল, সিগারেট ধরাল আবার, ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে অন্যমনস্ক হয়ে কি ভাবছিল। কি ভেবে অতসীর মুখের দিকে অপলকে চেয়ে থাকতে থাকতে শুধোলো, "তুমি দুঃখ পাওনি, জমি পাইনি?"

অতসী অস্ফুটে বলল, "পাইনি আবার!"

"পাই বলেই তো অন্য দুঃখকেও মেনে নিতে পারি।" ধোঁয়া ছেড়ে অনীশ আবার বলল, "সান্দ্রিটা না বোকা, ভীষণ বোকা।" বোকা যাচ্ছিল অনীশ বোনের জন্যে এই মুহূর্তে গাঢ় মমতা ও কষ্ট বোধ করছিল। ঘন ঘন সিগারেটে টান দিচ্ছিল সে।

একটু সময় কোন কথা বলল না কেউ। সান্দ্রির জন্যে ওরও এখন দুঃখ হচ্ছিল। বেড়াতে বেড়াতে অনেক দিন সে দেখেছে, সান্দ্রি বসে পড়েছে এক জায়গায়। ঘুরতেও ভাল লাগে না। কেমন উদাসীন দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। জড়ানো গলায় মানুকে বলেছে, "তোরা যা। আমি বাড়ি চলে যাচ্ছি।" অতসী অবাক হয়ে গেছে। পরে মানু তাকে সব বলেছে এক এক করে। সংসারে কি তারা এতই দুঃখী। ভাবতে গিয়ে দীর্ঘশ্বাসে বুকটা ভরে উঠেছে শুধু।

অতসী এখন অন্য কথা ভাবল। এই দুঃখের প্রসঙ্গ আর ভাল লাগে না। ওর মুখের ওপর থেকে ম্লান ভাবটা সরে গেছে এখন। সামান্য হেসে বলল, "এখানে এসে তো আমার খুবই ভাল লাগছে। সব নতুন মনে হচ্ছে আবার। না এলে অনেক কিছুই হারাতাম!" অতসী চোরা চোখে দেখতে দেখতে হাসল কি ভেবে।

"হ্যাঁ—, আমিও তো বলি, এসব জায়গায় মানুষে শরীর মন সারাতেই আসে।" অনীশ হেসে উঠল।

অতসীর মাথায় কী এক দুষ্টু বুদ্ধি খেলে গেল। ঠোঁট কামড়ে ধরেছে সে, চোখের তারায় দুষ্টুমি, অল্প-অল্প হাসছে, বলল, 'মনের ব্যাপারটা বড় জটিল।"

"জটিল বলে কি তাকে আরো জটিল করতে হবে?" অনীশ একদৃষ্টে চেয়ে থাকল ওর মুখের দিকে।

অতসী হাসল, "কেউ কি আর সাধ করে তা করে, হয়ে যায়।" পরে ধীর গলায় বলল, "এই আমাকেই দেখুন না, আপনারা না থাকলে যে কী হতো কে জানে।" একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো তার।

"আমরা তো উপলক্ষ মাত্র।"

"উপলক্ষ!" শব্দটা টেনে টেনে অস্ফুটে উচ্চারণ করল অতসী। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে ফের বলল, "ভাগ্যিস, এই উপলক্ষটাই সময় সময় আসলের মতন হয়ে যায়!"

"কি জানি!" অনীশ মজা করে হাসছিল।

"আপনি স্বীকার করেন না?" অতসী পরিপূর্ণ চোখে তাকাল অনীশের দিকে।

"অস্বীকারও করছি না, হলে তো ভালই।" সিগারেটটা খেতে আর ইচ্ছে করছিল না তার, ফেলে দিল বিরক্তিতে। সকাল থেকে আজ অনেকগুলো খাওয়া হয়ে গেছে। জিভে যেন কোন স্বাদ নেই। একটু একটু জ্বালাও করছিল।

অতসী নীচু হয়ে অন্যমনস্কভাবে একটা আমপাতা কুড়িয়ে নিল, পাতাটা ছিঁড়তে ছিঁড়তে বলল, "আমার এইটুকু বয়েসেই কম অভিজ্ঞতা হলো না, আমি তো দেখেছি অন্যের দুঃখ বোঝে, এমন মানুষের সংখ্যা সংসারে বড় কম।" অতসী মুখ নীচু করেছে। ধীরে ধীরে হাঁটছিল ওর পাশে পাশে।

অনীশ সঙ্গে সঙ্গে কোন জবাব দিল না। অতসীর এই কথাগুলো তার মনের মধ্যে গুঞ্জন তুলেছে যেন। এটা ওর কথার কথা নয়, অতসীর বিশ্বাস। ওর মতন সেও তো অভিজ্ঞতা দিয়ে জেনেছে, তার দুঃখও বুঝতে চায়নি কেউ, বিশ্বাস করে ঠকেছে, কষ্টই বেড়েছে শুধু। অনীশ কেমন আবেগ বোধ করছিল, বলল, "তুমি জান না অতসী, আমরাও যে পোড়খাওয়া, অনেক কিছুই দেখেছি।"

অতসীর চোখেও এক ধরনের আবেশ নেমে এসেছে, অনুচ্চ গলায় বলল, "আপনাদের সঙ্গে মিশে এই কদিনেই মনে হয়েছে, আপনারা যেন আমাদের অনেক কালের চেনা, দীর্ঘদিনের আত্মীয়।"

"কথাটা সবার ক্ষেত্রেই খাটে।" দুজনেই চোখে চোখে তাকাল, কি ভেবে একসঙ্গে হেসে উঠল।

মানু লাফিয়ে পড়েছে, বলল, "আরো এগোবে?"

"কি দরকার এবার ফেরা যাক।" অতসী অনীশকে আস্তে করে বলল।

"হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে তোমার?"

"বলুন তো, আরো অনেকটা যেতে পারবো।"

"না, এই হিম খাওয়া ঠিক হবে না আর, ফিরেই চলো।" পরে অনীশ মানুকে ডাকল, আজ আর নয়, চলে আয়।"

মানু এগিয়ে এলো।

"এবার বাড়ি চলো মানু।" অতসী মানুর ওপর চোখ রেখে হাসল, হেসে হেসেই ফের বলল, "আমি কিন্তু আরো যেতে পারতাম।"

"তাই তো দেখছি!" মানুও মুচকি মুচকি হাসছিল।

অতসী মাথা মুখ ঘোমটার মতন করে ঢেকে নিয়েছে। ঠাণ্ডা কমশই বাড়ছে। পা দুটোও ভিজে উঠেছে শিশিরে। জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছিল সব। সেই জ্যোৎস্না-ভেজা পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে অতসী বারবার যেন অন্যমনস্ক হচ্ছিল।

(ক্রমশঃ)

প্রকাশিত হল

বর্ষপঞ্জী ১৩৭৯

দেশ বিদেশের সকল তথ্যে পূর্ণ বাংলা ভাষায় একমাত্র 'ইয়ার বুক'

গত ২৬ বছর ধরে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। গুণ আছে বলেই বর্ষপঞ্জী এই দীর্ঘকাল ধরে সকলের সমাদর লাভ করছে। চলতি দুনিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখতে হলে বর্ষপঞ্জী চাই-ই। এই সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ :—পশ্চিমবঙ্গ ও অন্যান্য রাজ্যে সাম্প্রতিক নির্বাচনের যাবতীয় তথ্য, ১৯৭১ সালের সেন্সাস এবং

॥ বাংলাদেশ সম্পর্কে বৃহৎ তথ্যবহুল বিভাগ ॥

দৃঢ় বোর্ড বাঁধাই, ৮০৮ পৃষ্ঠা, মূল্য ৮ টাকা, ডাকমাশুল স্বতন্ত্র

এডভান্সসহ এখনি আপনার অর্ডার পাঠান

প্রকাশক : এস, আর সেনগুপ্ত অ্যান্ড কোম্পানী

৩৫ এ, গোয়াবাগান লেন, কলিকাতা-৬ । ফোন : ৩৫-৪৭১৭

বিজ্ঞানের কথা

* গ্রামের মানুষের জন্য জাতীয় স্বাস্থ্য পরিকল্পনা— একটি পরাজয়ের দলিল
* আবহাওয়াকে যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে ব্যবহারের সর্বনাশা পরিকল্পনা

আমাদের দেশে শতকরা আশিজন থাকেন গ্রামে। কাজেই দেশের মানুষের স্বাস্থ্যরক্ষার কিছু ব্যবস্থা করতে গেলে গ্রামের দিকেই আগে নজর দেওয়া দরকার। এখনো পর্যন্ত সরকারী উদ্যোগে হেলথ সেন্টার ইত্যাদির মাধ্যমে যতোটুকু আয়োজন করা হয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় যৎসামান্য, তদুপরি চিকিৎসক ও ওষুধপত্রের অভাবে অকার্যকর। তা ছাড়া, সরকারী দুর্নীতি তো আছেই, যার ফলশ্রুতে এমন কি পরিবার পরিকল্পনা পর্যন্ত ভেস্তে যায় ও লক্ষ লক্ষ টাকা গায়েব হতে পারে।

যাই হোক, শোনা যাচ্ছে ভারত সরকার গ্রামাঞ্চলের জন্যে একটি জাতীয় স্বাস্থ্য পরিকল্পনা রচনা করেছেন এবং আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই তা কার্যকর হতে চলেছে। কেন্দ্রীয় পরামর্শে ও কেন্দ্রীয় অর্থানুকূল্যে রাজ্য সরকার এই পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছেন।

পরিকল্পনাটি সংক্ষেপে এই রকম : রেজিস্ট্রিভুক্ত চিকিৎসকরা (যোগ্যতাসম্পন্ন ও যোগ্যতাহীন), যাঁরা কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছেন বা শিক্ষানবীশী করেছেন এবং ভারতীয় ব্যবস্থা মতে (আয়ুর্বেদ, যুনানী, সিদ্ধ ও হোমিওপ্যাথি মতে) চিকিৎসা করেন, এঁদেরই ২,০০০ বা তারও বেশি গ্রামের মানুষের স্বাস্থ্যরক্ষার ভার নেবেন। তাঁরাই হবেন যুবাল মেডিকেল প্র্যাকটিশনার বা গ্রামের চিকিৎসক। চার মাসের একটি সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে তাঁদের জন্যে। প্রশিক্ষণের উদ্যোক্তা হবেন ভারতীয় ভেষজ ও হোমিওপ্যাথির কেন্দ্রীয় গবেষণা পরিষদ। প্রশিক্ষণ চলবে আয়ুর্বেদীয়, হোমিওপ্যাথিক, যুনানী ও সিদ্ধা কলেজে, হাসপাতালে ও ভারতীয় ভেষজের প্রথম শ্রেণীর ডিসপেনসারিগুলিতে। এই প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য হবে গ্রামের চিকিৎসকদের এমন যোগ্যতাসম্পন্ন করে তোলা যাতে তাঁরা সাধারণ পীড়াগুলির নির্ণয় ও চিকিৎসা করতে পারেন, রোগ-প্রতিষেধক ব্যবস্থা নিতে পারেন, স্বাস্থ্য বিষয়ে শিক্ষা দিতে পারেন, প্রাথমিক শারীরবিদ্যার জ্ঞান অর্জন করেন, পরিচিত রোগগুলো ঠিকভাবে চিনতে পারেন ও সেই রোগাক্রান্তদের বড়ো হাসপাতালে পাঠাতে পারেন।

প্রস্তাবে বলা হয়েছে চার মাসের প্রশিক্ষণের মধ্যেই এই ইপ্সিত লক্ষ্য অর্জন করা যাবে, অর্থাৎ গ্রামের চিকিৎসকরা উল্লিখিত বিষয়গুলোতে পারদর্শী হয়ে উঠবেন। চার মাসের প্রশিক্ষণে কতটা স্বাস্থ্য কোন বিষয়ে তারও একটা হিসেব পরিকল্পনায় পাওয়া যাচ্ছে। মাত্র সপ্তাহে শারীরবিদ্যা, শারীরস্থান, স্বাস্থ্য বিষয়ক ধারণা, রোগ এবং রোগের উদ্ভব ও বিস্তার, সাধারণ আঘাত ও ক্ষত, পৃথক পৃথক রোগ ও রোগনির্ণয় এবং বড়ো হাসপাতালে পাঠাবার জন্যে রোগের সঠিক বিচার। বাকি দশ সপ্তাহে পৃথক পৃথক রোগের চিকিৎসা ও তৎসম্পর্কিত ব্যবস্থাদি। এই দশ সপ্তাহের মধ্যে তিন সপ্তাহে আয়ুর্বেদ, চার সপ্তাহে হোমিওপ্যাথি ও তিন সপ্তাহে প্রাথমিক চিকিৎসা (ফার্স্ট এইড) সম্পর্কে আলোপাথি।

গ্রামের চিকিৎসকদের থাকতে হবে হেলথ সেন্টারের মেডিকেল অফিসারের পরিচালনাধীনে। তাঁরা বেতন পাবেন মাসে ১৫০ টাকা, ব্যক্তিগত প্র্যাকটিস করতে পারবেন না। গ্রামের যে-সব মানুষ চিকিৎসিত হবেন তাঁদের মধ্যে তিন একরেরও অধিক জমির মালিকদের কাছ থেকে পয়সা নেওয়া হবে—প্রেসক্রিপশনের জন্যেও, ওষুধের জন্যেও (অথচ এই মানুষটিই যদি শহরের যেরা হাসপাতালে যান কিংবা হেলথ সেন্টারে তাহলে বিনা পয়সায় চিকিৎসিত হতে পারেন)।

পরিকল্পনাটি শুধু যে অবৈজ্ঞানিক তাই নয়, বিপজ্জনকও বটে।

অবৈজ্ঞানিক এ কারণে যে গ্রামের এই চিকিৎসকদের যে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে তা স্বাস্থ্যরক্ষা ও রোগ-নিরাময়ের বিজ্ঞানসম্মত নয়। কথাটা পরিষ্কারভাবে বলা দরকার। রোগ সারাবার জন্যেই ওষুধ, রোগ সারাবার কিসের হিসেবেই ওষুধের শুরু। ওষুধ দিতে হলে অবশ্যই জানতে হয় কোন রোগে কী ওষুধ ইত্যাদি। যাকে বলা হয় ভেষজবিদ্যা। এই ভেষজবিদ্যা সব সময়েই যে বিজ্ঞানসম্মত ছিল তা নয়। স্বাস্থ্যরক্ষা ও রোগ-নিরাময়ের জন্যে সেই প্রাচীনকাল থেকেই বহুবিধ উপায় অবলম্বিত হয়ে এসেছে, কোনোটা ফলপ্রসূ, কোনোটা নয়। আগেকার কালে এই সমস্ত উপায়ের মূলে ছিল অনেকখানি কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাস। বিজ্ঞানকে তখন পাওয়া যায়নি। কিন্তু আজকের দিনের অবস্থা তা নয়। ভেষজবিদ্যা এখন নিশ্চিতরূপেই একটা বিজ্ঞান হয়ে উঠছে এবং সপ্রমাণ কারণেই আগেকার কালের ফলপ্রসূ উপায়গুলোও এখন এই বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। বলা বাহুল্য, স্বাস্থ্যরক্ষা ও রোগ-নিরাময়ের কোনো একটি দেশজ উপায় ভেষজবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হবার পরে দেশজ থাকে না, হয়ে ওঠে বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞান অবশ্যই গ্রহণীয়। কাজেই দেশের মানুষের স্বাস্থ্যরক্ষা ও রোগ-নিরাময়ের জন্যে এখন আমরা কাকে গ্রহণ করব—সে-কোনো দেশজ উপায়কে, না ভেষজ-বিজ্ঞানকে? অবশ্যই বিজ্ঞানকে। আর এই বিজ্ঞানের মধ্যেই তো দেশজ প্রস্তাবিত উপায় যথোচিত পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে অন্তর্ভুক্তও হয়ে থাকে। এ-কারণে একথা কেউ বলবেন না যে স্বাস্থ্যরক্ষা ও রোগ-নিরাময়ের দেশজ উপায়গুলো নিয়ে গবেষণা ও অনুসন্ধান বন্ধ হোক। বরং উল্টো। সারাদেশ জুড়ে আরো বৃহৎ পরিকল্পনা ও আরো প্রচুর অর্থসংস্থান নিয়ে এই গবেষণা ও অনুসন্ধান চলুক। তাতে ভেষজবিজ্ঞানই সমৃদ্ধ হবে, বিজ্ঞান হিসেবে আরো সম্পূর্ণতা পাবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কথাটা থেকেই যায়, স্বাস্থ্যরক্ষা ও রোগ-নিরাময়ের গ্রাহ্যপথ একটিই—ভেষজবিজ্ঞানের পথ। দ্বিতীয় কোনো পথ নেই।

বলা বাহুল্য, ভেষজবিজ্ঞান এখনো পর্যন্ত দেশের সব মানুষের কাছে পৌঁছতে পারে নি। বিশেষ করে গ্রামের মানুষের কাছে একেবারেই না-পৌঁছবার মতো। সেটা ভেষজবিজ্ঞানের দোষে নয়, সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক কারণে। দেশের সরকারও এজন্যে অবশ্যই দায়ী। কিন্তু এ ব্যাপারটার ফল হয়েছে মারাত্মক। ভেষজবিজ্ঞান যেখানে পৌঁছতে পারেনি সেখানে অখণ্ড প্রতাপে কায়েম হয়ে রয়েছে ভাগ্য-ভবিষ্যৎ, অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ড, তেতো ধাতু ধারণ, অন্ধবিশ্বাস ও এমনি আরো অনেক কিছু। হাতুড়েদের পসার হয় এ-কারণে যে কিছু রোগ বিনা ওষুধেই সারে (হয়তো একটু বেশি সময় নিয়ে)। কোনো একটি টোটকার অসুখ সারলেও সারতে পারে কিন্তু তাই বলে সেই টোটকাটি চলতে পারে না, যথাযথ পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে সেই টোটকার বিশ্লেষণ চাই, তাকে ভেষজবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত করা চাই। তাই বলে স্বাস্থ্যরক্ষা ও রোগ-নিরাময়ের জন্যে সরকারী কোনো পরিকল্পনায় এগুলো গ্রাহ্য নয়।

CENTRAL LIBRARY

সরকারী পরিকল্পনায় 'আরোগ্যনিকেতন' ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। ডেস্টিনিস্ট্রাকে কোলে নিয়ে কিন্তু এই কথাটি পাড়ো যায় না। অভিধানের অবশ্যই আছে একটি প্রাচীন পুরাতন প্রসঙ্গ। ধন্বন্তরি তাঁর নিজের চিকিৎসা-ব্যবস্থাটি ইচ্ছে হোমিওপ্যাথি, তাঁর মতেই তাঁর চিকিৎসা ব্যবস্থা হচ্ছে আয়ো প্যাথি—যে ব্যবস্থায় লক্ষণের বিপরীত দিয়ে দিয়াগুই ওষুধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়। যাই হোক, এই 'আয়োপ্যাথি' নিয়ে কথা বলার জন্যে সরকারী পরিকল্পনার সঙ্গে যাঁরা যুক্ত তাঁদের সঙ্গে—তাঁরই যখন আধুনিক চিকিৎসার বিশেষজ্ঞ বলে গণ্য হবার কথা। আধুনিক ডেস্টিনিস্ট্রাকে বিশেষজ্ঞ আমি যাঁদের নিই এমনতর দুটিই এমন একটি সম্মেলনকে সম্ভব করার কথা ভাবতে পারেন।

তাহলে এই পরিকল্পনায় কোন ত্রুটিগুলো সাধিত হচ্ছে? একদল যোগ্যতাহীন বাঁচু—যারা আয়ুর্বেদ হোমিওপ্যাথি সম্পর্কে চিকিৎসা করে থাকে—তাদের ১৬ সপ্তাহের কোর্স একসঙ্গে করে আয়ুর্বেদ হোমিওপ্যাথ ও আয়োপ্যাথের অপরাধ বরদাস্ত করা হচ্ছে এবং তাদেরই হাতে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে মানুষের চিকিৎসার ভার। অর্থাৎ সরকারী পরিকল্পনায় স্বাস্থ্যরক্ষা ও রোগ-নিরাময়ের একমাত্র বৈজ্ঞানিক পথটি পরিত্যক্ত হচ্ছে। এই চিকিৎসাও বিনামূল্যে নয়। জনসাধারণের ওপরে ব্যবস্থাপত্র ও ওষুধের মূল্য ধার্য হবে। জনসাধারণ নির্ধারণ করবে কে সরকারী নীতিপত্র থেকে তার কোনো হদিশ পাওয়া সম্ভব কি?

এই কোর্স সপ্তাহের ত্রুটিগুলি যদি প্রকৃত ডেস্টিনিস্ট্রাকেও হত তাহলেও গ্রামের এই চিকিৎসকেরা চিকিৎসাবিদ্যার বা এমন কি রোগনির্ণয়েও কতখানি পারঙ্গম হতে পারতেন সে-বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ আছে। উচ্চতম যোগ্যতাসম্পন্ন চিকিৎসকও বহু বছরের অভিজ্ঞতা নিয়েও অনেক সময়ে রোগনির্ণয়ে ভুল করে থাকেন। অভিজ্ঞতা যতো কম, ভুল হবার সম্ভাবনা তাতো বেশি। প্রতিষেধের ব্যাপারেও যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা অর্জনের একটা সীমানা থাকা দরকার যাতে রোগনির্ণয়ে ভুল হবার সম্ভাবনা বিপজ্জনক স্তরে উঠতে না পারে।

পরিকল্পনার রচনাকারীরা (অর্থাৎ ভারত সরকার) বলছেন, 'আধুনিক আয়োপ্যাথিক ডেস্টিনিস্ট্রাকে' রোগনির্ণয় ও চিকিৎসা বড়ো বেশি 'সোফিস্টিকেটেড', তার জন্য প্রচুর সাজ-সরঞ্জাম চাই, প্রচুর অর্থ চাই। গ্রামে গ্রামে আরো বেশি ডেস্টিনিস্ট্রাকে স্থাপন করার মতো অর্থসংস্থানও নেই। তা ছাড়া 'আয়োপ্যাথিক ডেস্টিনিস্ট্রাকে' শিক্ষিত ডাক্তাররা শহরের সুখসুবিধা ছেড়ে গ্রামে যেতে চান না। অতএব—

অতএব গ্রামের মানুষের ভাগ্য ছেড়ে দেওয়া হোক এমন একদল ব্যক্তির হাতে যাঁরা ডেস্টিনিস্ট্রাকে চুড়ান্ত পরীক্ষা পর্যন্ত দেননি।

সরকারী বিবৃতি সত্ত্বেও বলতে হয় ভারত সরকারের এই আকৃতি ভয়ঙ্কর কিছু, কারণনাশ প্রয়োগের মানুষের ওপর সরাসরি প্রয়োগ করা হচ্ছে না, সরকার সাধারণ প্রয়োগ করা হচ্ছে। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে গ্রামের চিকিৎসার সুযোগ থেকে কোটি কোটি মানুষ বঞ্চিত হবেন।

*

সরকারের কোটিপতি ডাক্তার তৈরির ওপরে ও কুপোষ্ট সার্ভিস প্রতিষ্ঠার যে-প্রস্তাবটি নিচের সারণীটি রয়েছে তা এই কথা পড়া যেতে পারে।

১২১৫ সালের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নে

৮৫০,০০০ ডাক্তার

আগামী পরিকল্পনায় ৫০,০০০ জন নতুন ডাক্তার এবং প্যারামেডিক্যাল সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন চিকিৎসাকেন্দ্রে যোগদান করবেন।

শহর এবং গ্রামের পার্থক্য ইউনিয়নগুলিতে ট্রেনপাতাকে কারখানায় এবং সমস্যাবহুল গ্রামাঞ্চলে বিশেষজ্ঞরা কাজে নিযুক্ত থাকবেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই মধ্যশ্রেণীয়। সাইবেরিয়া এবং দূরপ্রাচ্যে নতুন প্রকল্পগুলিতে কাজ করার ইচ্ছা ও আগ্রহ প্রকাশ করবেন। সমস্ত ডাক্তারই স্ব স্ব ক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবে কাজ পাবেন।

নতুন ডাক্তারদের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর লোক আছে। সমরসিত প্রজাতন্ত্রের ইউনিয়নগুলিতে ৮০টিরও বেশি মেডিক্যাল ইনস্টিটিউট এবং শিক্ষাকেন্দ্র আছে। সেখানে চিকিৎসা বিষয়ে সর্বপ্রকার শিক্ষা দেওয়া হয়। বায়ো-ফিসিকস, চিকিৎসাবিষয়ক সমস্যা, ইমেজ-ট্রানিকস এবং সাইবারনেটিকস—এসবই তাদের পাঠ্যসূচীর অন্তর্গত।

অনুমান করা হয় সোভিয়েত ইউনিয়নে পরিবার-পরিকল্পনা ব্যবস্থা এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। দুগ্ধজাতের প্রসার আরো ব্যাপক হয়েছে, বৈবাহিকতার হার কমে যাবার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। সকলেই সুস্থ থাকেন, কথাটি বলা হচ্ছে বিশেষ করে মার্কিন মুলুকের তুলনায়, কেননা আমেরিকার মানুষের একমাত্র এই ব্যাপারটি ছাড়া অন্য সবকিছুতে কমবেশি সুস্থ। সম্প্রতি আরো একটি কথা শোনা যাচ্ছে। মার্কিনী মুলুকের নাকি এমন একটি সংকট ঘনিয়ে এসেছে—যাকে ভালো ভাষায় বলা হচ্ছে লাইফ ক্রাইসিস—যেটা কাটিয়ে উঠতে আমেরিকাকে যথেষ্ট হিমসিম খেতে হবে। অর্থাৎ আমেরিকার মতো এমন একটা সমৃদ্ধিসম্পন্ন দেশকে নানা ধরনের সমস্যার প্রতিষেধক হিসেবে মার্কিনীরা কি-সবের কথা ভাবছেন, বিশেষ করে ডেস্টিনিস্ট্রাকে ব্যবস্থা,

আমেরিকাকে স্বাস্থ্যের ডিক্রেজের ব্যবহারের সর্বনাশা মার্কিনী পরিকল্পনা

সুস্থদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে কেন সম্প্রতি সুস্থ ব্যক্তি ধরা পড়ে এমন দরনের রোগের বহু সংখ্যক ক্ষেত্রে ধরা পড়ার মাঝে লোকজনের দেখা গিয়েছে। এই নিয়ে বলা যাচ্ছে সম্প্রতি হাসপাতালে সুস্থ বিভিন্ন অসুস্থতা হলেই সেখানে ডাক্তারদের কাছে যাওয়া হচ্ছে, এমন কি সেখানকার চুরিও হয়ে গিয়েছে। কিন্তু যখন কিছুই হবার নেই, দুঃখজনক প্রচার আরো ব্যাপক হচ্ছে, ডেস্টিনিস্ট্রাকের কথা বলা হবার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। সকলেই সুস্থ থাকেন, কথাটি বলা হচ্ছে বিশেষ করে মার্কিন মুলুকের জন্য করে, কেননা আমেরিকার মানুষের একমাত্র এই ব্যাপারটি ছাড়া অন্য সবকিছুতে কমবেশি সুস্থ। সম্প্রতি আরো একটি কথা শোনা যাচ্ছে। মার্কিনী মুলুকের নাকি এমন একটি সংকট ঘনিয়ে এসেছে—যাকে ভালো ভাষায় বলা হচ্ছে লাইফ ক্রাইসিস—যেটা কাটিয়ে উঠতে আমেরিকাকে যথেষ্ট হিমসিম খেতে হবে। অর্থাৎ আমেরিকার মতো এমন একটা সমৃদ্ধিসম্পন্ন দেশকে নানা ধরনের সমস্যার প্রতিষেধক হিসেবে মার্কিনীরা কি-সবের কথা ভাবছেন, বিশেষ করে ডেস্টিনিস্ট্রাকে ব্যবস্থা,

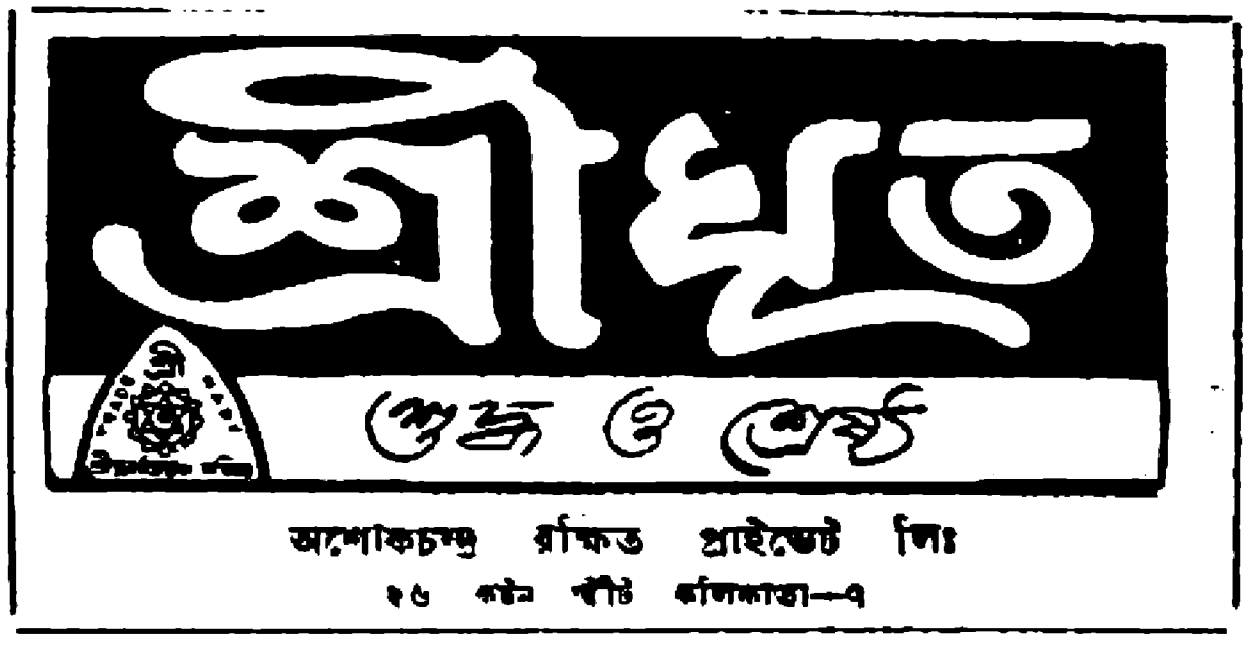

তার কিছু বিরূপ বিজ্ঞানের কথার জাল অমন্য দিয়েছি। এমন সমস্ত রাসায়নিক ব্যবহার করা হয়েছে যার ফলে বৃহৎ এলাকা জুড়ে অরণ্য নিশ্চিহ্ন. সেটা এমনই শোচনীয় ভাবে যে আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে সেখানে নতুন অরণ্য সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা কম। ফলে পশুপাখির জগতও লোপ পাবার মুখে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের বিজ্ঞানীরা তো বটেই, এমন কি খোদ আমেরিকার বিজ্ঞানীরাও এই ক্রুর ধ্বংসকাণ্ডের জন্যে দায়ী ব্যক্তিদের নিন্দা করেছেন এবং বিজ্ঞানের এই অপব্যবহার বন্ধ করার দাবি তুলেছেন। নির্বিচারে বোমা ফেলাটাও একটা সুস্পষ্ট অপরাধ। শুধু সামরিক লক্ষ্যবস্তুর ওপরে নয়, মার্কিনীরা ভিয়েতনামের যেখানে-সেখানে বোমা ফেলে যাচ্ছে, এমন কি শহরের বাইরে ফাঁকা এলাকাতেও। যখন গোটা দেশ জুড়ে তৈরি হয়েছে বড়ো বড়ো গর্ত, যেখানে জল জমে আর মশার জন্ম হয়। ভিয়েতনামে ম্যালেরিয়া রোগটি যে আবার ফিরে এসেছে সেজন্যে সরাসরি দায়ী মার্কিনী যুদ্ধবাজরা। আরও শোনা যাচ্ছে, বোমা ফেলে বাঁধগুলো নাকি ভেঙে দেওয়া হবে। তার মানেই গোটা দেশে প্লাবন। এ থেকে বোঝা যায় মার্কিনী যুদ্ধবাজরা কি ধরনের যুদ্ধ চালাতে চায়।

এমনি ধরনের যুদ্ধ চালাবারই নতুন অস্ত্র—নাইল ব্লু। অরণ্য লোপ করা, ম্যালেরিয়া ডেকে আনা, প্লাবন ঘটানোর চেয়েও এবারের অস্ত্র আরো. কী বলব, পৈশাচিক। আর কোনো শব্দ না পেয়ে পৈশাচিক বললাম। ব্যাপারটা জানলে পাঠকরা বুঝতে পারবেন, এমন কি পিশাচরাও তুলনায় অনেক মানবিকবোধ-সম্পন্ন।

এই অস্ত্র কোনো বিস্ফোরক পদার্থ দিয়ে তৈরী নয়। এ হচ্ছে এমন কতকগুলো উপায় যা আবহাওয়াকে বদলে দেয়। যেমন, বৃষ্টি করানো। বিজ্ঞানের কলচর পাঠকরা জানেন নির্দিষ্ট এলাকায় কৃত্রিম বৃষ্টিপাত ঘটাতে বিজ্ঞানীরা সফল হয়েছেন। বিজ্ঞানী-দের ধারণা ছিল, তাঁদের এই সাফল্য শুধু এলাকার কৃষিকাজের সহায়ক হবে। কিন্তু মার্কিনী যুদ্ধবাজরা এই সাফল্যকেই ব্যবহার করতে চায় যুদ্ধের প্রয়োজনে। সম্ভবত ইতিমধ্যেই ব্যবহার শুরু হয়েছে। যুদ্ধের প্রয়োজনে অবরুদ্ধ বৃষ্টি করানোর এলাকাটি, অনেকের অনুমান, হো চি মিন সড়ক।

শুধু বৃষ্টি করানো নয়, আরো আছে। ভূমিকম্প, বন্যা, তাপমাত্রার হেরফের ঘটিয়ে প্রাকৃতিকজগতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি—এই হচ্ছে অস্ত্রের আরো কয়েকটি প্রয়োগ। অর্থাৎ, প্রকৃতিজগতে এমনিতেই যে অস্থিরতাগুলো রয়েছে, গিয়েছে তাকে এমনভাবে উস্কে তোলা যাতে একটা প্রলয়ঙ্কর ব্যাপার ঘটে যেতে পারে, প্রকৃতিজগতে যা মাঝে মধ্যে ঘটেও থাকে।

আরো আছে। সকলেই জানেন আমাদের এই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ওপরের দিকে ওজোন-গ্যাসের একটি স্তর আছে যা সূর্যের অতি-বেগুনী রশ্মিকে টেকিয়ে রাখে। এই ওজোন স্তরটি আছে বলেই সূর্যের অতি বেগুনী রশ্মি পৃথিবীর মাটিতে পৌঁছতে পারে না ও জীবজগৎ বেঁচে থাকে। অর্থাৎ মায়ের আঁচলের মতো একটি পর্দা যেন পৃথিবীকে বেষ্টন করে আছে। মার্কিনী অস্ত্রে এই পর্দায় ফুটো করার কথা বলা হয়েছে। তখনই তখন সেই ফুটো দিয়ে অতি-বেগুনী বিকীরণের গোটা কতক এসে পড়বে ফুটোর তলার নির্দিষ্ট এলাকার মাটিতে এবং সেখানকার গোটা জীবজগৎ ছারখার করে দেবে।

ওজোন পর্দায় ফুটো করাটা মোটেই অসম্ভব কাজ নয়। ভৌতিক উপায়ে হতে পারে, রাসায়নিক উপায়েও। শুধু ফুটোটি করার সময়ে হিসেবটি এমন পাকা হওয়া চাই যেন ফুটোর তলার নির্দিষ্ট এলাকার মাটিটুকু হয় ভিয়েতনামের।

ভূমিকম্প? কোনো জায়গায় ভূমিকম্প ঘটতে চলেছে কিনা, এখনো পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা আগে থেকে তা বলতে পারেন না। কিন্তু কোনো জায়গায় ভূকম্পের টেউ-গুলো যদি সঠিকভাবে নির্ধারণ করা যায় তাহলে ঠিক সময় বুঝে দূরে একটি বিস্ফোরণ ঘটিয়ে এই জায়গাটিতে বিস্ফোরণ ঘটানো সম্ভব।

বন্যা? এক্ষেত্রেও ঠিক ঠিক সময়ে ঠিক-ঠিক মাত্রায় কতকগুলো বিস্ফোরণ ঘটিয়ে এমন একটি অবস্থা সৃষ্টি করা যাতে ঘূর্ণিঝড় ও সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ নির্দিষ্ট একটি এলাকার ওপরে আছড়িয়ে পড়ে।

নাইল ব্লু প্রকল্পের সবটাই জানা গিয়েছে তা নয়। ইউরোপের পত্রপত্রিকায় এ-বিষয়ে লেখালেখি শুরু হয়েছে 'সায়েন্স অ্যান্ড গভর্নমেন্ট রিপোর্ট' (খণ্ড ১, সংখ্যা ২২)-এ প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের সূত্রে। তবে যারা এই প্রকল্পের রচয়িতা—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বিভাগ—তারা এ-ব্যাপারে একেবারেই নির্বাক, একটি কথাও প্রকাশ করতে রাজী নয়। প্রবন্ধলেখক অন্য নানা সূত্রে খবর সংগ্রহ করেছেন। এই প্রকল্প রূপায়ণের জন্য ১৯৭২ সালে ৩০ লক্ষ ডলার খরচ করা হচ্ছে।

হিমালয়ের জন্ম কিভাবে?

একথা প্রায়ই বলা হয়ে থাকে, দুই মহাদেশের মধ্যে ধাক্কা লাগার ফলে কিভাবে পর্বত গড়ে ওঠে হিমালয় হচ্ছে তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এক্ষেত্রে দুই মহাদেশের একটি হচ্ছে ভারত, অপরটি অবশ্যই এশিয়া। কিন্তু হায়দ্রাবাদের ন্যাশনাল জিও-ফিজিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ডঃ আর এল আহাভালে বলছেন, দুই মহাদেশের মধ্যে ধাক্কা লাগার ফলে নয়, হিমালয় তৈরী হয়েছে ভারত নামক মহাদেশ ও তৌথিয়ান নামক সমুদ্রতলবাহী ভূত্বকের দুই অংশের মাঝখানে শক্তির ফলে। টেথিয়ান সমুদ্র বিস্তৃত ছিল এককালে ভারত মহাসাগর থেকে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত, আজ থেকে কুড়ি কোটি বছর আগে। ভারত ছিল মাডাগাস্কার লাগোয়া, অতীতের বিশাল মহাদেশ গোন্ডওয়ানাল্যান্ডের অন্তর্ভুক্ত। সেখান থেকে প্রাচীন টেথিয়ান সমুদ্রের মধ্যে দিয়ে উত্তরদিকে সরতে সরতে ভারত শেষপর্যন্ত এশিয়ায় পৌঁছেছে। ডঃ আহাভালের মতে, দুই মহাদেশের মধ্যে এই ধাক্কা লাগার আগেই হিমালয় তৈরী হয়ে গিয়েছিল। কেন না, সাম্প্রতিক পরীক্ষায় জানা গিয়েছে যে বয়সের হিসেবে হিমালয়ের কোনো কোনো পাথর এই ধাক্কা লাগারও আগেকার কালের।

নীল তিমির ভবিষ্যৎ

জীবিত প্রাণীদের মধ্যে বৃহত্তম হচ্ছে নীলতিমি, লম্বায় ১০০ ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে, ওজনে ১০০ টন পর্যন্ত। আশঙ্কা করা হচ্ছে, নীলতিমি লোপ পাবার মুখে। লোপ যাতে না পায় সেজন্যে গত কয়েক বছরে সমস্ত রকমের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও নীল তিমির ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত।

নীল তিমি যদিও কোনো বিশেষ এলাকার নয়, কিন্তু সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় দেখতে পাওয়া যায় মেরু সমুদ্রে, বিশেষ করে দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে। তারপরে উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরে, উত্তর আটলান্টিকে ও অন্যত্র।

খোলা নৌকায় যখন তিমি শিকার করা হত, নীলতিমির বিরাট আকার ও তৎপরতার জন্যে নীলতিমি শিকার করা তখন প্রায় একটা অসম্ভব ব্যাপার ছিল। নীলতিমির ব্যাপক শিকার শুরু হয় হার্পুন সঙ্গীনের আবিষ্কার ও জাহাজে ভাসমান কারখানার প্রচলন হবার পরে। ১৯৩০-৩১ সালে প্রায় ৩০,০০০ নীলতিমি শিকারীদের হাতে প্রাণ হারিয়েছিল।

তারপরে অবশ্য এই সংখ্যা আরো কমেছে, কিন্তু বন্ধ হয়নি। ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক চুক্তি হয়েছে কতকগুলো সময়ে নীলতিমির শিকার বন্ধ রাখার জন্যে, বাচ্চা নীলতিমি ও সবৎসা নীলতিমিকে অব্যাহতি দেবার জন্যে—কিন্তু বিশেষ ফল পাওয়া যায়নি। তখন আন্তর্জাতিক তিমি কমিশন নীলতিমির শিকারের ওপরে পুরোপুরি নিষেধাজ্ঞা জারি করেন—প্রথমে উত্তর আট-লান্টিকে ও ১৯৬৫ থেকে গোটা বিশ্বে। কিন্তু আশঙ্কা করা হচ্ছে, গোটা বিশ্বেই নীলতিমির সংখ্যা এখন এতই কম যে এই নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও নীলতিমির বিলোপ ঠেকানো যাবে না।

—সুরেন্দ্রনাথ

কীটপতঙ্গের প্রেম

আনসারউদ্দিন আহমাদ

ঝিঁঝি পোকা সকলেই চেনেন। অনেকে এও জানেন ঝিঁঝি পোকা ঘরের ভিতর থেকে ডেকে থাকে। আমাদের দেশে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে আমগাছে ঝিঁঝি পোকা ডাকলে আমরা ধরে নেই আম পাকার দিন ঘনিয়ে এসেছে। আম পাকার সঙ্গে ঝিঁঝি পোকার ডাকের সম্পর্ক জানা না গেলেও একথা সত্য ঝিঁঝি পোকার ডাকার তারতম্যের সঙ্গে তাপমাত্রা উঠানামা করে। গেছো ঝিঁঝি পোকার ক্রমবর্ধমান ডাক থেকে দিনের তাপমাত্রা পরিমাপ করা যায়। পনেরো সেকেন্ডে পোকাটি কতবার ডাকে সেটা প্রথমে গুনে নিন। এর সঙ্গে ৩৯ যোগ করুন। মোট সংখ্যা যত হোল, সেটাই ফারেনহিট তাপমাত্রায় দিনের তাপমাত্রা বলে বিবেচিত হবে।

উপরের এ তথ্যগুলি হয়তো কমবেশী অনেকেরই জানা, তবে ওটা প্রায়ই অজানা যে প্রেম-নিবেদন মুহূর্তে ঝিঁঝি পোকার ডাকের পরিবর্তন ঘটে। ঝিঁঝি পোকার প্রতিটি ডানায় একটা করে মসৃণ করার যন্ত্র ও একটা ধারালো যন্ত্রের মত রয়েছে। ডানা দুটির পরস্পর ঘর্ষণের ফলে যে শব্দ বের হয় সেটাই ঝিঁঝি পোকার ডাক। মসৃণ করার যন্ত্রের মত অংশে ঝিঁঝি পোকার দাঁত রয়েছে। পুরুষ ঝিঁঝি পোকা (সঙ্গীতকার অর্থে গায়ক) সাধারণত ডাকার সময় শতকরা ৪৭টি দাঁত ব্যবহার করে থাকে। অবশ্য সে যখন প্রেম নিবেদনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে তখন দাঁতের ব্যবহার বৃদ্ধি পায়, শতকরা ৮৯-এ গিয়ে পৌঁছে। এছাড়া তখন তার ডাক এত অনিয়মিত হয়ে পড়ে যে, দিনের তাপমাত্রা বলা সে মুহূর্তে সম্ভব নয়। তখন একমাত্র এটুকুই কল্পনা করা যায় যে, ওরা এখন 'মরণপণে' ব্যস্ত।

পুরুষ ঝিঁঝি পোকা যখন একনাগাড়ে ডেকে চলে মেয়ে ঝিঁঝি পোকা তখন পাশে বসে কণ্টকর সময় কাটায়, মাঝে মাঝে উৎসাহ দিয়ে পুরুষটাকে কনুই দিয়ে ধাক্কা দেয়। ভাবখানা, 'কী বেরসিক রে বাবা! এই যে পাশে বসে আছি একবার চোখ তুলে তাকাতেও কি নেই!' শেষপর্যন্ত পুরুষ ঝিঁঝি পোকা তার গান থামায়, পাখা দুটি উপরে তুলে ধরে। মেয়ে ঝিঁঝি পোকাটির কানে ওর গান যদি সুধা বর্ষণ করে এক-মাত্র তখনই সে ওর পিঠে চেপে বসে এবং পুরুষ ঝিঁঝি পোকাটির পাখার সন্ধি-স্থলের ঠিক পিছনে অবস্থিত পেয়ালার মত দেখতে মাংসগ্রন্থি থেকে খেতে শুরু করে। মাংসগ্রন্থি থেকে একরকম আঠালো রস বের হয় যা মেয়ে ঝিঁঝি পোকাটি খেতে খুব ভালবাসে। পুরুষটির গান গাওয়া ও মেয়েটির কনুই দিয়ে ধাক্কা মারা—মন দেওয়া-নেওয়ার এই খেলা প্রায় আধ ঘন্টা সময় পর্যন্ত চলতে থাকে। এ সময়ের ভিতর মেয়ে ঝিঁঝি

মেয়ে ম্যান্টিসপোকা

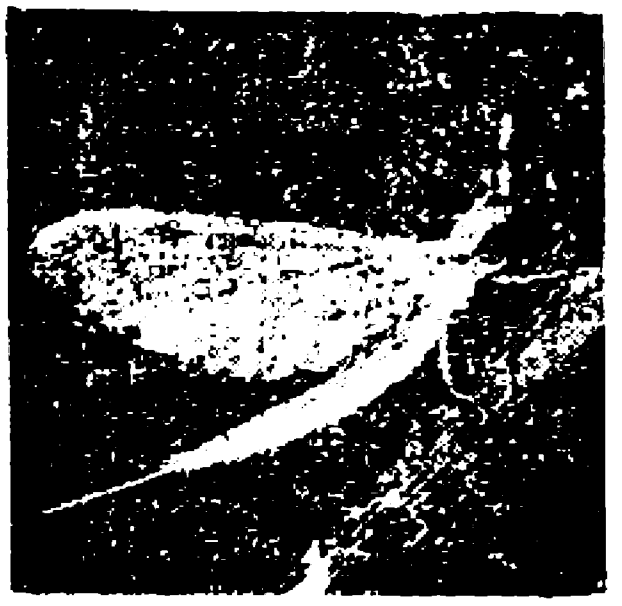

পোকা পরিতৃপ্তি লাভ করে, পুরুষটি নিস্তেজ হয়ে পড়ে। পূর্ববাস এখানে ইতি টানে। এরপর তাদের মিলন ঘটে।

একটা প্রবাদ রয়েছে, কোন প্রেমিক মানুষের মন পেতে হলে মুখ দিয়ে ঢুকতে হয়। অর্থাৎ ভাব জমানো বা মনপাওয়া যাই বলুন না কেন, খাওয়াদাওয়ার মাধ্যমে তার শুরু প্রসার ঘটে। এ যেন ডারউইনের বিবর্তনের প্রভাবক-এর ভূমিকার মত, যার উপস্থিতিতে বিবর্তন তাড়াতাড়ি ঘটবে বটে অথচ নিজে বিবর্তনের কোন অংশ নেবে না। তাই মনে হচ্ছিল প্রকৃতির মধ্যে প্রেম ও খাওয়ার আনন্দের ভিতর প্রায় একটা যোগসূত্র রয়েছে। এ আনন্দ স্ত্রী ম্যান্টিস পোকা যুগপৎভাবে উপভোগ করে থাকে। পুরুষ ম্যান্টিস স্ত্রী ম্যান্টিসের সঙ্গে জোড় বাঁধার সময় কখনও কখনও স্ত্রী পোকাটি তার প্রেমাস্পদকে গোগ্রাসে গিলে ফেলে। গুপ্ত প্রণয় শেষ হওয়ার আগে স্ত্রী ম্যান্টিস পোকা পুরুষ পোকাটির প্রায় অর্ধেক গলাধঃকরণ করে। জীবন বিনিময়ে ভাবী বংশধরের মধ্যে স্বাক্ষর রেখে যাওয়া এর কোনটার জন্য বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ ভাব তার মনে খেলা করে না। পুরুষ ম্যান্টিস পোকা নীরবে প্রেমের বেদীতে আত্মাহুতি দেয়।

প্রেম ও পুষ্টির ব্যাপারে উন্নতি লক্ষ্য করা যায় 'এমপিড মাছির' কিছু প্রজাতির মধ্যে। এরা ছিপছিপে খাদের অংশে শিকার করে থাকে। এ ধরনের খাদের ভিতর রয়েছে ছোট মাছ অথবা ফুলের পাপড়ি। এমপিড মাছির সামনের পায়ে অবস্থিত মাংসগ্রন্থি থেকে নিগত এক ধরনের পাকানো সূক্ষ্ম রেশমী সুতা মাছ বা ফুলের পাপড়িকে জড়িয়ে অনুষ্ঠানিকভাবে তাদের পছন্দ করা মেয়ে বন্ধুর সামনে এনে হাজির করে। জীব-বিজ্ঞানীরা ঠিক এমনি ধরনের প্রেম প্রণিধান করে মাছির বেলায়ও লক্ষ্য করেছেন। এর ফলে ম্যান্টিস পোকার মত কদর্য পরিণতি এদের ভাগ্যে ঘটে না। এরা বরং অনেক চালাক। স্ত্রী এমপিড মাছি

মেয়েটি সুতোর ছড়ানো কিনারের চামড়ায় কাজে ভারি পুরুষ মাঝি দাঁড়ের ঘর্ষণে যে ইসিরে পড়বে এমন ভয় তুলেই নয় শুধু। এমনিতে কুঁড়ের ছাড়ে মাঝিগুলি সহজে ছাড়তে চায়। তবে মাঝিগুলির সকল কাজের জন্য সাহায্য করবার জন্য কিনারে ও ধারে ধারে দুটি করে ছোট ছোট ছিদ্র করা থাকে। ছিদ্রে দড়ি পরিয়ে দুদিকে টেনে দিলে ছিদ্রগুলি সঙ্কুচিত হয়ে ছোট হয়ে যায়। ফলে ছিদ্রের ব্যাস কমে যায়। ছিদ্রের ব্যাস কমে গেলে দড়ি ছিদ্রের মধ্যে আটকে যায়। তখন দড়ি ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে সহজে সরে যেতে পারে না। এইভাবে দড়ি ছিদ্রের মধ্যে আটকে থাকে। এই দড়ি ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে সহজে সরে যেতে পারে না। এইভাবে দড়ি ছিদ্রের মধ্যে আটকে থাকে।

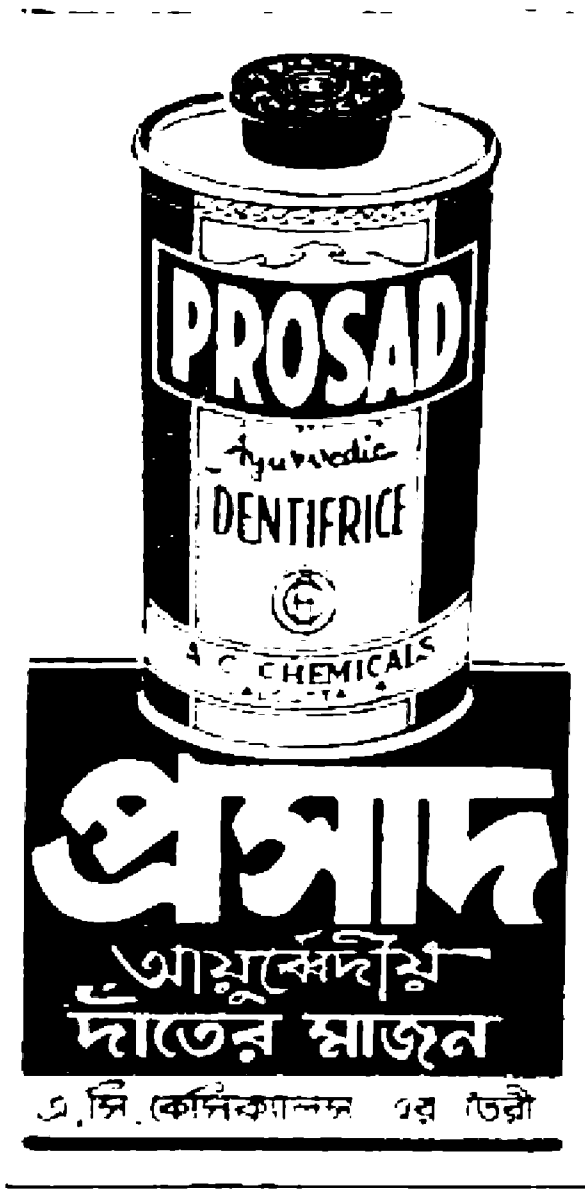

ডাটা
গুঁড়া সাবলাই
কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত
(কুকমী)
প্রাঃ লিঃ এর
একমাত্র ব্র্যাণ্ড

ডাটা—মহামান্য হাইকোর্ট কর্তৃক রেজিষ্টার্ড ও ১৯৫৮ সনের ১৩ নম্বর আইনে সংরক্ষিত
২০৭, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা—৭

ছেলেটি সুতোর ছড়ানো কিনারের চামড়ায় কাজে ভারি পুরুষ মাঝি দাঁড়ের ঘর্ষণে যে ইসিরে পড়বে এমন ভয় তুলেই নয় শুধু। এমনিতে কুঁড়ের ছাড়ে মাঝিগুলি সহজে ছাড়তে চায়। তবে মাঝিগুলির সকল কাজের জন্য সাহায্য করবার জন্য কিনারে ও ধারে ধারে দুটি করে ছোট ছোট ছিদ্র করা থাকে। ছিদ্রে দড়ি পরিয়ে দুদিকে টেনে দিলে ছিদ্রগুলি সঙ্কুচিত হয়ে ছোট হয়ে যায়। ফলে ছিদ্রের ব্যাস কমে যায়। ছিদ্রের ব্যাস কমে গেলে দড়ি ছিদ্রের মধ্যে আটকে যায়। তখন দড়ি ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে সহজে সরে যেতে পারে না। এইভাবে দড়ি ছিদ্রের মধ্যে আটকে থাকে।

কোন কোন প্রজাতির স্ত্রী মাছের সুগন্ধি গ্রন্থি রয়েছে। এজাতীয় স্ত্রী মাছকে কোন বন্ধ কাচের পাত্রে রুদ্ধ করে রাখা হলে পুরুষ মাছের কখনই আসা কিছু নেই, কেননা কাচের পাত্র ভেদ করে গন্ধ প্রবেশ সম্ভব সাক্ষাৎ করা চলে না। তবে যদি কাচের পাত্রে কোন ছিদ্র থাকে এবং সেই স্ত্রী মাছ বিশেষজ্ঞদের চক্ষু, তাহলে তীব্রগন্ধযুক্ত দ্রব্যস্থান থেকেও অনায়াসে ভেদ করে পুরুষ প্রেমিক প্রেয়সীর কাছে ছুটে আসে, আর সংখ্যায় একটা নয়, অনেকগুলি। বাহ্যিক অভ্যর্থনা প্রতি এই যে আকর্ষণ কতটা পরিমাণে জলজ্যান্ত তা দুলভ নয়। তবে সব কথার মোড়ক কথা—স্ত্রী লুকসা নট উইথ আইজ, বাট উইথ মাইনডস্—এটাই বড় সত্য। তাই বহুকাল ধরে একথাই মনে করা হত যে, স্বল্পের সুন্দরী গায়ের রঙ, পাত্র লালবর্ণের ডানার পরে আঁকা উজ্জ্বল আয়ত চক্ষু—এসবের জন্যই নাকি তাদের প্রণয় প্রেম ও পরে বিয়ে হয়ে থাকে। পরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে দেখা একথাই প্রমাণিত হয়েছে যে মধ্যের তীক্ষ্ণ সন্ধানী-ভীতই মিলন ঘটাতে পরস্পরকে কাছে টেনে রাখে। (মানুষ ছাড়া প্রায় জীবজন্তু ও কীট-পতঙ্গে বছরের একটা নির্দিষ্ট সময়ে পরস্পর মিলিত হয়ে থাকে।)

প্রেম করতে হলে পোষাক-আষাকের পাট উঠিয়ে দিতে হবে। এক না চার প্রেমিকা তার পুরু সাজের প্রশংসা করতো। সাত্যি তোমার দৃষ্টির প্রশংসা করতে হয়। চাইনা কী সুন্দরই না মানিয়েছে তোমাকে। ইচ্ছে হচ্ছে..... বাস্, বাস্ ওটুকুই যথেষ্ট। প্রেমিক-প্রবর তখন কি তখন পৃথিবীতে আছেন। প্রেয়সীর এইসব উক্তি শুনে তিনি স্বর্গলোকে বিচরণ করতেন তখন। যাহোক অভ্যর্থনা প্রতি এই যে আকর্ষণ কতটা পরিমাণে জলজ্যান্ত তা দুলভ নয়। তবে সব কথার মোড়ক কথা—স্ত্রী লুকসা নট উইথ আইজ, বাট উইথ মাইনডস্—এটাই বড় সত্য। তাই বহুকাল ধরে একথাই মনে করা হত যে, স্বল্পের সুন্দরী গায়ের রঙ, পাত্র লালবর্ণের ডানার পরে আঁকা উজ্জ্বল আয়ত চক্ষু—এসবের জন্যই নাকি তাদের প্রণয় প্রেম ও পরে বিয়ে হয়ে থাকে। পরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে দেখা একথাই প্রমাণিত হয়েছে যে মধ্যের তীক্ষ্ণ সন্ধানী-ভীতই মিলন ঘটাতে পরস্পরকে কাছে টেনে রাখে। (মানুষ ছাড়া প্রায় জীবজন্তু ও কীট-পতঙ্গে বছরের একটা নির্দিষ্ট সময়ে পরস্পর মিলিত হয়ে থাকে।)

কোন কোন প্রজাতির স্ত্রী মাছের সুগন্ধি গ্রন্থি রয়েছে। এজাতীয় স্ত্রী মাছকে কোন বন্ধ কাচের পাত্রে রুদ্ধ করে রাখা হলে পুরুষ মাছের কখনই আসা কিছু নেই, কেননা কাচের পাত্র ভেদ করে গন্ধ প্রবেশ সম্ভব সাক্ষাৎ করা চলে না। তবে যদি কাচের পাত্রে কোন ছিদ্র থাকে এবং সেই স্ত্রী মাছ বিশেষজ্ঞদের চক্ষু, তাহলে তীব্রগন্ধযুক্ত দ্রব্যস্থান থেকেও অনায়াসে ভেদ করে পুরুষ প্রেমিক প্রেয়সীর কাছে ছুটে আসে, আর সংখ্যায় একটা নয়, অনেকগুলি। বাহ্যিক অভ্যর্থনা প্রতি এই যে আকর্ষণ কতটা পরিমাণে জলজ্যান্ত তা দুলভ নয়। তবে সব কথার মোড়ক কথা—স্ত্রী লুকসা নট উইথ আইজ, বাট উইথ মাইনডস্—এটাই বড় সত্য। তাই বহুকাল ধরে একথাই মনে করা হত যে, স্বল্পের সুন্দরী গায়ের রঙ, পাত্র লালবর্ণের ডানার পরে আঁকা উজ্জ্বল আয়ত চক্ষু—এসবের জন্যই নাকি তাদের প্রণয় প্রেম ও পরে বিয়ে হয়ে থাকে। পরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে দেখা একথাই প্রমাণিত হয়েছে যে মধ্যের তীক্ষ্ণ সন্ধানী-ভীতই মিলন ঘটাতে পরস্পরকে কাছে টেনে রাখে। (মানুষ ছাড়া প্রায় জীবজন্তু ও কীট-পতঙ্গে বছরের একটা নির্দিষ্ট সময়ে পরস্পর মিলিত হয়ে থাকে।)

প্রেম করতে হলে পোষাক-আষাকের পাট উঠিয়ে দিতে হবে। এক না চার প্রেমিকা তার পুরু সাজের প্রশংসা করতো। সাত্যি তোমার দৃষ্টির প্রশংসা করতে হয়। চাইনা কী সুন্দরই না মানিয়েছে তোমাকে। ইচ্ছে হচ্ছে..... বাস্, বাস্ ওটুকুই যথেষ্ট। প্রেমিক-প্রবর তখন কি তখন পৃথিবীতে আছেন। প্রেয়সীর এইসব উক্তি শুনে তিনি স্বর্গলোকে বিচরণ করতেন তখন। যাহোক অভ্যর্থনা প্রতি এই যে আকর্ষণ কতটা পরিমাণে জলজ্যান্ত তা দুলভ নয়। তবে সব কথার মোড়ক কথা—স্ত্রী লুকসা নট উইথ আইজ, বাট উইথ মাইনডস্—এটাই বড় সত্য। তাই বহুকাল ধরে একথাই মনে করা হত যে, স্বল্পের সুন্দরী গায়ের রঙ, পাত্র লালবর্ণের ডানার পরে আঁকা উজ্জ্বল আয়ত চক্ষু—এসবের জন্যই নাকি তাদের প্রণয় প্রেম ও পরে বিয়ে হয়ে থাকে। পরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে দেখা একথাই প্রমাণিত হয়েছে যে মধ্যের তীক্ষ্ণ সন্ধানী-ভীতই মিলন ঘটাতে পরস্পরকে কাছে টেনে রাখে। (মানুষ ছাড়া প্রায় জীবজন্তু ও কীট-পতঙ্গে বছরের একটা নির্দিষ্ট সময়ে পরস্পর মিলিত হয়ে থাকে।)

প্রেমিকাদের এই সুগন্ধি গ্রন্থি এমন এক বৈজ্ঞানিক ভাবে তৈরী যা কখনোই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যায় না। সেজন্য প্রেমিকা তার প্রেমিককে ইচ্ছামত ডাকতে পারে। সেজন্য প্রেমিকা তার প্রেমিককে ইচ্ছামত ডাকতে পারে। এ ব্যাপারে তাদের উদ্দেশ্যই বলা যায়। প্রথমে আসে, ভালবাসা—এই হচ্ছে স্ত্রী মাছের নীতি।

প্রেমিকাদের এই সুগন্ধি গ্রন্থি এমন এক বৈজ্ঞানিক ভাবে তৈরী যা কখনোই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যায় না। সেজন্য প্রেমিকা তার প্রেমিককে ইচ্ছামত ডাকতে পারে। সেজন্য প্রেমিকা তার প্রেমিককে ইচ্ছামত ডাকতে পারে। এ ব্যাপারে তাদের উদ্দেশ্যই বলা যায়। প্রথমে আসে, ভালবাসা—এই হচ্ছে স্ত্রী মাছের নীতি।

'গান দিয়ে পাই মনের নাগাল'—গান ও নাচ চোখ ও কানকে মোহিত করে, মনকে বশে আনে। মানব সমাজের এ রীতি কীট-পতঙ্গ জগতেও দেখা গেছে। মরিস মাটলিঙ্ক কীট-পতঙ্গের নাচ সম্বন্ধে 'প্রাণীর পরিচয়' নামক তার বইয়ে লিখেছেন, যে মাছি ও তার পোকাকে নদীর উপর বা আলোপাশে নাচতে দেখা যায়। নাচের সময় তারা তাড়াতাড়ি পাখা ঝাপটিয়ে উপরে ওঠে ও পরে মাথার গতিতে নিচে নামে। বার বার এই পুনরাবৃত্তি চলে। নাচিয়েদের প্রায় সকলেই পুরুষ। তবে মাঝে মাঝে এক বা একাধিক মেয়ে পোকা এসে নাচে যোগ দেয়। প্রতিটি মেয়ে পোকা বেছে বেছে জোড় বাঁধে, এরকম দুজন কোথাও পাশাপাশি হয়।

সাধারণ প্রাণীর ভাষা ও ধরনের ভাবের আদান-প্রদানকে 'প্রেম' নাম আখ্যা দিতে কিছু কিছু জীব-বিজ্ঞানী উৎসাহ বোধ করেন না। তবুও কীট পতঙ্গদের মিলন পর্যবেক্ষণ করবার মানুষের মধ্যে লক্ষ্যণীয় সবরকম প্রণয়ের বৈশিষ্ট্যগুলিই খুঁজে ওঠে। যেমন বর্ণাঢ্য অঙ্গসজ্জা, সাজসজ্জা প্রদর্শন, চিত্তাকর্ষক করা, আবেগ প্রকাশ, আলিঙ্গন, একে অপরকে খাওয়া, সুগন্ধির মাধ্যমে প্রেমাভিব্যক্তি, বাদ্যযন্ত্রের প্রণয়সঙ্গীত গান দিয়ে আপ্যায়িত করা, নাচ দেখানো এমনকি নাকে ঘষা ও নিলজ্জ যৌন আবেদন প্রদর্শন।

কিন্তু কেন হয়—এ রহস্য রহস্যই থেকে গেছে। তবে, জ্ঞানী মাছি পুরুষ মাছির সংখ্যা একত্রে সংযুক্ত হয়ে মিলনের আগে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেন বা ঘুরে বেড়ায়, জলের উপর ঝুলানো কোন গাছের পাতা বা কাঠের উপর ডিম পাড়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত কেনই বা পুরুষ মাছিটি স্ত্রী মাছিটিকে মাটকোলের পিছনে বাঁসালে নেওয়ার মত করে মনমন্ত্র জলে উড়ে বেড়ায় এগুলোর বৈজ্ঞানিক সদুত্তর আজও পাওয়া যায় নি।

---

* মান ইস্টম্যান-এর লাভ আনড ইনসেক্টস প্রবন্ধের সাহায্য নিয়ে লেখা।

অমৃতপুরের যাদুকর

সত্যেন্দ্রনাথ মাইতি

CENTRAL LIBRARY

।। ২০ ।।

আজ একটু স্পেশাল করে রান্নার যোগাড় সজল। নিমন্ত্রণ বিকেলে। তাই সেভারেটা নিয়ে বসেছিল। ডাবাছিল, আরতি এলে তাকে একটা ভৈরবীর গৎ দিতে বলবে। ঠেকে নয়, মধ্যলয়ের।

সজল কোমল পর্দাগুলো বাজাবার চেষ্টা করছিল। প্রায়াস ছেড়ে কোমল রেখাবে এসে দাঁড়াত একটু।

নিচু থেকে অরুণার গলা শোনা যাচ্ছিল—যা ওপরে বাবুর ঘরটা ঝাঁট দিয়ে মুছে আয়। তাড়াতাড়ি হাত চালিয়ে কাজ কাঁকি দাপু। বসবার অনেক কাচাকুচি আছে, লোকজন আসবে।'

সজল সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পাচ্ছিল। কি এক্ষুনি ঝাঁট নিতে এসে পড়বে ভেবে সেতারটা দেয়ালের কাছে রেখে এল। আর থেকেই ওর আসার কথা।

তৎক্ষণে সে দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এ কে! সজল অবাক হয়ে ঝির দিকে তাকিয়েছিল। চিনতে পেরে-ছিল তাকে। জীবনে তা হলে এমন বিস্ময়-কর ঘটনাও ঘটে!

সজলের সেই বালিগঞ্জ স্টেশনের কথা মনে পড়ছিল। সেদিন সে অপমানিত, নিঃস্ব!

পুঁটিও ভীষণ অবাক। দাদাবাবু, তুমি! ওমা! তোমার ঘর-সংসার, বৌ!'

পুঁটি অনেক লম্বা হয়েছে। একটা কম দামী রঙিন শাড়ী পরেছে। তবে গলায় স্বর তেমনি তীক্ষ্ণ, ঝিদের মানুষের মত কথা বলার পাকা-পাকা ঢং। বোধহয় তেমনি দুখুরাও আছে।

সজল হাসতে হাসতে বলল, 'তুই কি করে এসে জুটলি রে?'

পুঁটি হেসে বলল, 'আমি ত ঐ সামনের বাড়ীতে ঝির কাজ করতাম গো। তা, সে ভাড়াটেরা কোথায় উঠে গেল। এ বাড়ীর ঠাকরুণকে বললাম, নতুন ভাড়াটে এলে একটা কাজ জুটিয়ে দিও, হা যজ্ঞ টানা-টানি চলছে। তা কপাল, আমি কি জানতাম তুমি?'

'কোথায় থাকিস আজকাল?'

'আমহার্স্ট স্ট্রীটে, ঐ যে কি একটা বড় কলেজ আছে, ওর কাছে বস্তিতে।'

'তোর মা কোথায় থাকে? ক্যানিং-এ ফিরে যায়নি?'

'মায়ে বলে দিন-রাত বাসনা ধরে আছে কিন্তু, মাত্র যে অসুখ! বাতে ধরেছে বুড়ীকে! চলতে পারে না।'

পুঁটির ঘর ঝাঁট দেওয়া শেষ হয়ে গেছিল। বালতিতে করে জল, আর ছেঁড়া কাপড়ের ন্যাতা নিয়ে এল।

নিচু থেকে অরুণার রুক্ষ গলা শোনা যাচ্ছিল, 'কাকে 'তুমি তুমি' বলে কথা বলছিস রে? তোর মুখ ত বড় খারাপ দেখছি?'

সজল তাড়াতাড়ি নিচে নেমে গেল। অরুণা রান্না চাপিয়েছিল। এখন ভাত ফুটছে হাঁড়িতে।

সজল বলল, 'এক কাপ চা করে দাও না?'

'ভাত ফুটছে নামাতে পারব না এখন—অরুণা মুখ ঝামটা দিল।

সজল মোড়াটা টেনে নিয়ে কাছে বসে বলল, 'জানো, পুঁটিকে আগে চিনতাম ভালো মেয়ে।'

অরুণা কেন যেন চটে আছে। ভাতটা টিপতে টিপতে রুক্ষ গলায় বলল, 'ভালো মেয়ে তো আমাকে উদ্ধার করেছে! আসতে না আসতেই তুই তোকারি আরম্ভ করে দিয়েছে দেখছি?' এমন বেয়াদব ঝি আমি রাখতে পারব না, তা বলে দিচ্ছি।'

সজলের বড় খারাপ লাগছিল। পুঁটির কথা অরুণাকে সহ্য বলা যায় না। কিন্তু প্রথমদিন চাকরী করার পর তাকে খাওয়ানোটা বড় অন্যায়। 'বিশেষ করে তার মা যখন অসুস্থ।

পুঁটি যাতে না শুনতে পায়, তেমনি করে সজল গম্ভীর ভাবে বলল, 'সব বলব তোমাকে পরে। কিন্তু এখন চিৎকার কোরো না।'

ভাত নেমে গেছিল। অরুণা ডুবোপুকুর দিয়ে চুলের ফেটালটা বসাল। সজল ওপরে গিয়ে চুপচাপ বসেছিল। এক সময় অরুণা চা করল, নিজে এককাপ নিল, সজলকেও দিয়ে এল এককাপ।

কিন্তু পুঁটিকে দিল না।

সজল তেমনি বসেছিল। চা খাওয়ার ইচ্ছে হয়তো আর ছিল না।

পুঁটি ঘরদোর পরিষ্কার করে থালা বাটি মেজে জল তুলে চলে যাচ্ছিল। অরুণা বলল, 'ওবেলা সকাল সকাল আসবি। বেলে জল আসার আগে। দেরি হয় না যেন?'

করুণ গলায় পুঁটি বলল, 'হ্যাঁ মা আসব।'

সজল নিজের ঘরে বসে ভাবছিল, ও হয়ত বাড়ীতে চা খেয়ে আসেনি। মনে আছে, সেবার ডেলেভাজা খাবার জন্য পুঁটো পয়সা নিয়েছিল সজলের কাছ থেকে।

অরুণা এত নিষ্ঠুর না হলেই পারত। 'কি বাজার টাজার যেতে হবে না আকাশ পাতাল ভাবলে চলবে?' —অনেক-ক্ষণ পরে অরুণা সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করছিল।

সজল ধীরে ধীরে বলল, 'অনেক বেলা হয়ে গেছে, তা হলে?'

'যাবে না ত চা করতে বলছিলে কেন আমাকে? খালি খালি দুধ চিনি চা নষ্ট করা?' অরুণা পুরো চায়ের কাপটা তুলে নিল।

৪।-টে মা তা জল হয়ে গেছে কখন।

বিকেলে সকলের আগে রেণুদি এল। হাতে একগোছা ফুল, কাগজের সুন্দর একটা বাকস। ওপরে বড় দোকানের নাম লেখা। সজল বুঝতে পারছিল, ওতে শাড়ী আছে। রেণুদি যে এত টাকা দিয়ে শাড়ী কিনে নিয়ে আসবে, সজল তা ভাবতে পারেনি, তা আশাও করেনি।

রেণুদিকে অফিসের বাইরে, এই গৃহিণীর সাজে বেশ লাগছিল দেখতে। অফিসের চেয়ে অনেক সুন্দর, সংকেত, ঘরোয়া।

সজল রেণুদিকে ঘরে নিয়ে বসাল। কিন্তু বড় গম্ভীর দেখাচ্ছিল ওকে।

'বাঃ শাড়ীটা বেশ সুন্দর ত? কত নিয়েছে?' অরুণা লোভীর চোখ নিয়ে শাড়ীটার দিকে তাকিয়ে রইল।

রেণুদি বলল, 'সেই কবে থেকে সজলকে বলছি, তোমার কষ্ট দেখতে যাব। তা ওত গ্রাহ্যই করে না'।

অরুণা হেসে বলল, 'গ্রাহ্য আর কাকে করে? সংসারের একটা কোন কাজ যদি ওকে দিয়ে হয়। শুধু বাজারটা করে দিয়েই খালাস। আর পেয়েছে একটা সেতার। রাত নেই, দিন নেই, পিড়িং পিড়িং করে বাজাচ্ছে। নয়ত কি ছাইপাঁশ লিখছে। জীবন অতিষ্ঠ হয়ে গেল রেণুদি, জীবন পোড়া কাঠ হয়ে গেল?'

সজল চুপচাপ বসেছিল এক ধারে। কোন কথা বলছিল না।

রেণুদি ঠাট্টা করে বলল, 'তবে কষ্টটা কি? বিছানা পাতবে? ঘর ঝাঁট দেবে? আঁচ ধরাবে?'

সজল বলল, 'আঁচ কিন্তু আমি অনেকদিন ধরাই রেণুদি। জিজ্ঞেস করুন ওকে, সত্যি বলছি কিনা?

রেণুদি জিজ্ঞেস করল না। 'সাক্ষীর দরকার নেই, ভাই সজল। তুমি ত গল্পকার-চার্চিল। মিথ্যে কথা তোমার মুখ দিয়ে বেরুবে? তা হলেই হয়েছে?'

অরুণা শুকনো মুখে বলল, 'সিমেন্টের কন্ট্রাক্টে কাজ করে কত লোক কলকাতায় বাড়ী গাড়ী করে ফেলল। আর ওর মাসের পনেরদিন থেকে পয়সা থাকে না? বুঝুন একবার?'

সজলের ভীষণ খারাপ লাগছিল কথাটা। এর আগেও অরুণা ওকে এসব কথা বলেছে। সজল তখন গ্রাহ্য করেনি। ঠাট্টা করেই অরুণা বলছে বলে, তার মনে হয়েছিল। কিন্তু তার অফিসের রেণুদিকে, প্রথম দিনেই এ কথাটা বলার জন্য সজলের বড় দুঃখ হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, সে ঘুষ নেয় না বলে অরুণার এই অসন্তোষটা আন্তরিক।

রেণুদি বলল, 'তুমি ওকে কতটুকু চেন, অরুণা? আমি হাড়ে হাড়ে চিনি। তা, তুমিওত চাকরী কর শুনেছিলাম?'

অরুণা বলল কলেজে হবে কি? তাকে আনতে বাঁধে কুলায় না। যা দিনকালের বাজার!

সজল যে অরুণার কাছ থেকে বাড়ী ভাড়ার টাকাটা ছাড়া আর কিছু নেয় না, সে কথাটা রেণুদি জানে না।

সজল বলল, 'রেণুদিকে একটু সরবৎ করে দাও না, অরুণা?'

রেণুদি বলল, না, না, এক গ্লাস জল দাও ভাই'।

অরুণা শুধু এক গ্লাস জলই নিয়ে এল।

রেণুদিকে খালি জল দিল বলে সজলের খারাপ লাগছিল।

সিঁড়ি দিয়ে কাদের উঠে আসার শব্দ। একটু পরেই করুণাদি আর কার্তিক এল।

করুণাও ফুল আর ঠোঙায় করে মিষ্টি নিয়ে এসেছে।

সজল রেণুদিকে ওদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল।

কার্তিক অঙ্কের মতই হেঁচে করে কথা বলছিল। আবহাওয়ার কথা শেষ করে, রাজনীতিতে পড়তে যাচ্ছে এমন সময় নিচ থেকে ডাক ভেসে এল—

'সজল? আছিস, নাকিরে.....

সজল তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যেতে যেতে বলল, 'হারাধনদা এসেছে, আমি যাই।'

একটু পরেই হারাধনদা ঢুকে ধপ্ করে তক্তপোষের ওপর পা তুলে বসে পড়ল। গায়ে সেই চিরন্তন হাফসার্ট, ভুঁড়ি আছে বলে পেটের দিকটা উঁচু হয়ে আছে। হাতে তালি দেওয়া ছাতা, ফাটা আধময়লা কাপড়ে কোঁচাটা উল্টে নিয়ে, কোমরে গোঁজা। হাতে খবরের কাগজে জড়ানো করেক কিট লম্বা সরু কি একটা জিনিস।

করুণা এবং কার্তিকের মুখ, হারাধনের এই কিছুটা অমার্জিত আচরণে কেমন রুক্ষ হয়ে উঠেছিল। রেণুদিও যেন একটু অবাক হয়ে গেছে।

হারাধনের ওদিকে খেয়াল থাকার কথা নয়। চোঁফটাই দু'একবার মুছে নিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'কিরে বৌমা কোথায়? ডাক দেখি তাকে?'

সজল হারাধনদাকে একটু থিতিয়ে আনার জন্য শান্ত গলায় বলল, 'এই ত এলে। বোসো ভাল হয়ে। এসেছ যখন, তখন ত দেখবেই?'

'তুই বললেই হল? ডেকে নিয়ে আয় তাকে? আগে বৌমাকে দেখি। চালাক-চতুর কিনা? বি-এ পাশ করলে হবে কি? তুই ত একটা আস্ত হাঁদারাম। সংসারের ঘোর পাঁচি কিছু বুঝিস জানিস?'

হারাধনদা নিজের স্পীডেই বলে যাচ্ছিল।

সজল বলল, 'তোমাকে একটা পাখা এনে দেব, হারাধনদা? গরম লাগছে?'

'দে তাই দে। মোটা মানুষ, একটু গরম লাগে?'

সজল হাতপাখা আনতে গিয়ে দেখে, অরুণার মুখ হাঁড়ি হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে পল্টু এসে গেছে কখন!

সজল বলল, 'তুমি যাও একবার। হারাধনদা ডাকছে?'

অরুণা আলু কোটা থামিয়ে সজলের দিকে কটমট করে তাকাল।

সজল শান্ত গলায় বলল, 'হারাধনদা গ্রামের লোক। এমনি করে কথা বলাই অভ্যেস। তাই বলে তুমি রাগ করবে? হারাধনদা আমার কত উপকার করেছে, তুমি জান?'

অরুণার গলার ঝাঁঝ শুনে সজলের কান লাল হয়ে উঠছিল। 'তোমার উপকার করল ত আমার কি? ছিছি দিদি, কার্তিকদা কি ভাববে বলত? যতসব 'লোফার' ছোটলোক নিয়ে তোমার কারবার?

সজল গম্ভীর হয়ে বলল, 'মানুষ হিসেবে তোমার দিদি আর কার্তিকদার চাইতে হারাধনদা অনেক বড়!'

সজলের গলার স্বরটা ইস্পাতের মত শক্ত। অরুণা তাকিয়ে রইল সজলের কঠিন মুখের দিকে।

পল্টিও অবাক হয়ে দুজনকে দেখছিল।

'বৌমা কইরে? এল না?' দ্রুত হাত পাখা চালাতে চালাতে হারাধনদা আবার চেঁচিয়ে বলল। অরুণা কখন পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

হারাধনদা অবাক হয়ে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে রইল অরুণার দিকে। তারপর বোধহয় সামলে নিল একটু—'এই ত বেশ বৌমাটি হয়েছে। বৌমা, ওই সজলের ওপর বিশ্বাস টিশ্বাস করবে না। ওকে আমি জানি। একটা বোকা হাঁদা। সেই আমার সঙ্গে কলকাতা এসেছিল...।'

সজল মাঝপথে থামিয়ে দিল, 'হারাধনদা ও রান্না করতে করতে এসেছে।' 'ও তাই নাকি? বেশি কিছু রান্না করবে না বৌমা। এ অবস্থায় করতে নেই। খালি ডাল, আলুভাতে ভাত? ব্যস্।'

অরুণা এতক্ষণে কথা বলার অবকাশ পেয়ে শুকনো ভদ্রতার হাসি হেসে বলল, 'আমরা গরীব মানুষ। এর চেয়ে বেশি কি খাওয়াব আপনাকে?

হারাধনদা বড় মজা পেল—'এই ত বেশ বলেছ বৌমা? এসো, এদিকে এসো। হ্যাঁ, এইটা খোল ত?'

অরুণা অনিচ্ছা সত্ত্বেও খবর কাগজে মোড়া জিনিসটা খুলল।

অরুণা, কার্তিকদা, রেণুদি সকলেই তাকিয়েছিল, জিনিসটা দেখার জন্য। কিন্তু কেউ চিনতে পারল না। শুধু সজল চিনল এবং জিনিসটা কত দামী তা বুঝতে পারল।

সকলের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে হারাধনদা বিজয়ীর মত বলল, 'আপনারা চিনতে পারলেন, জিনিসটা কি?'

কার্তিক সবজান্তার মত বলল, কি আর। মাদুরত দেখছি?'

হারাধন যেন ধমকে উঠল, 'মাদুর? এমন মাদুর দেখেছেন কোথাও?'

পুরুষ—
প্রভাবপ্রবণ;
উদ্দীপক।
অস্থিরচিত্ত এবং
অসাবধান।
পুরুষের এই
রকমারি মেজাজ
ফোটাতে চাই
'টেরোসেল'
সার্টিং!

টেরোসেল

'টেরোসেল'! আপনার যৌবনরূপ ফুটিয়ে তুলবে
করে দিবে। সকতলালের 'টেরোসেল' সার্টিং-এর রং সব
অপূর্ব—হাল্কা রঙগুলোও তুলবে শালীনতা। ডিজাইনে সেরা!
এই সার্টিং পরে দেখুন—কেমন সুপুরুষ হয়ে উঠেছেন।
সেরা সুতোর সাথে পলিয়েস্টার মিলিয়ে নিখুঁতভাবে তৈরী।
'টেরোসেল' সার্টিং পরে পুলকিত আনন্দের ছন্দে মেতে উঠুন!

সকতলালে গ্রুপ

AITARA-M.245 BN

রেণুদি অবাক হয়ে বলল, 'মাদুর বটে। তবে এমন সরু, মিহি, সুন্দর—কখনো দেখিনি।' করুণা মুখ বাঁকিয়ে হাত দিয়ে স্পর্শ করলে একবার।

সজল বিরক্ত হয়ে বলল, 'হারাধনদা, তুমি পাঁচিশ টাকা খরচ করে তুমি আমাদের জন্য এটা নিয়ে এলে কেন? আমরা তোমার পর? আমাদের সঙ্গে তোমার ভদ্রতা?'

হারাধন ধমকে উঠল, 'তুই চুপ কর তো! তোর জন্য নিয়ে এসেছি এটা? আমি ত বৌমার জন্য নিয়ে এলাম। তুই চিৎকার করছিস কেন? এ্যাঁ?'

জিনিসটা যে কি, অরুণা তখনও বুঝতে পারেনি। কিন্তু সজলের মুখে ব্যাপারটা শুনে অবাক হয়ে গেছল।

একটু পরে অরুণা চা করতে গেল।

কখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। রাত্রি নামছে। ছাদের রেলিং শিশির পড়ে পড়ে ভিজে উঠছে।

সজল এতক্ষণ অপেক্ষা করে করে হতাশ হয়ে উঠেছিল। আরতি তা হলে আসবে না। হয়ত চিঠি পায়নি। হয়ত বিয়ের খবর তাকে দিইনি বলে অভিমান হয়েছে।

আরতি আসবে না—এই কথাটা মনে আসতেই সজলের মন কেমন একটা বিষণ্ণতায় ভরে ওঠে। আজ সন্ধ্যায় তার কাছে সে-ই সবচেয়ে আকর্ষণ, সবচেয়ে সুন্দর অভিধা। এতদিন তাকে দেখেনি সজল। সে না এলে আজকের সব আয়োজন যে ব্যর্থ হয়ে যাবে!

সজল ছাদের ওপরে গিয়ে রাস্তাটা যতটুকু দেখা যায়, দেখে এল একবার। কিন্তু আরতিকে দেখা গেল না।

ঘরের ভেতর সজলের চা খাচ্ছে। প্লেটে করে গোটা নিয়ে আসা সন্দেশ। অরুণা পুঁটিকে দিয়ে সিঙ্গাড়া আনিয়েছে কখন।

একটু আগে খেয়েছে বলে সজল আর চা খেল না। অরুণা অগত্যা চা-টা পুঁটিকে দিয়ে দিল।

ভালো না লাগার জন্য সজল নিজের ঘরে চলে এসেছে। নিচে থাকার খুব একটা দরকার নেই। রেণুদির সঙ্গে কার্তিকবাবু আর করুণা রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করছিল। হারাধনদা বসে বসে হাত পাখা নেড়ে চলেছে। পরিবেশ সম্পর্কে তার তেমন চেতনা নাই। সজলের অনুপস্থিতি সম্পর্কে সে কিছু মনে করবে না।

সজল চুপ চাপ শুয়েছিল বিছানায়। এই মুহূর্তে বড় ক্লান্ত লাগছে, ব্যর্থ মনে হচ্ছে নিজেকে। আরতির বাসায় নিজে গিয়ে সঙ্গে আসা উচিত ছিল। তা হয়নি বলে এখন অনুতাপ হচ্ছিল সজলের।

সজল ঘড়িটা দেখল, রাত সাতটা। এর মধ্যেই মনে হয়, অনেক রাত হয়েছে। আকাশের মুখ এখন নিঃসঙ্গ শিশির পাণ্ডুর বিষণ্ণ হয়ে উঠছে। বড় রাস্তার ওপর দিয়ে কোন রিকশার টংটাং শব্দ, একটা নির্দিষ্ট ছন্দে বেজে বেজে, আবার মিলিয়ে গেল। স্তব্ধ ঘরটায় তারই প্রতিধ্বনি যেন কিছু-তেই থামছে না! যেন এই রেয়ারের চৌবা-চ্চার ওপর, সেতারের ওপর একটি অশ্রু-সমুদ্যমান ছন্দ, শব্দ এখনও করুণ বৃষ্টি-বিন্দুর মত ঝরে ঝরে পড়ছে!

সজল কতক্ষণ চুপচাপ শুয়েছিল। হারাধনের গলার স্বর শুনে চমকে উঠল, কান পাতল ভালো করে...।

সজল প্রথমে বিশ্বাস করতে পারছিল না। কিন্তু সে জানে, এই শান্ত গলার স্বর, এই সেতারের সরু তারের প্রতিধ্বনির মত মৃদু সুরেলা কথা, তার ছাড়া আর কারুর নয়।

সজল দ্রুত নিচে নেমে গেল!

গান গাচ্ছিল কার্তিক, তবলা বাজাচ্ছিল হারাধন।

গানের প্রস্তাবটা অবশ্য হারাধনের। রান্না হতে দেরি আছে। অথচ সকলে মিলে গল্প করার মত পরিবেশ এটা নয়। আরতি অত্যন্ত শান্ত। শুধু তাই নয়, তার নীরব নম্র ব্যক্তিত্ব, তার প্রশান্ত উপস্থিতি জন্য সকলকে অনেকখানি প্রভাবিত করে রেখেছে, যার ফলে রাজনীতি বা অন্যকোন মুখ-রোচক আলোচনা জমছে না। রেণুদির আরতিকে খুব ভাল লেগেছে। হাতে মেজ-রান দেখেই রেণুদি ধরেছিল, একটু সেতার বাজাও না ভাই। আরতি রাজি হচ্ছিল না।

হারাধন বলল, কেউ গান জানে না?'

করুণা কার্তিককে দেখিয়ে বলল, 'জানে মানে? গানের মাস্টার। স্কুল আছে।'

হারাধন দু হাত জোড় করে নমস্কার করল। এ ভঙ্গিটা তার এত আন্তরিক ছিল যে, কেউ আপত্তি করল না বা হাসল না।

হারাধন ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'ও সজল একটা হারমোনিয়াম জোগাড় কর না কোথা থেকে? গান টান শুনি একটু। ইনি ওস্তাদ লোক আছেন।'

কার্তিক অবজ্ঞার সঙ্গে বলল, 'শুধু হারমোনিয়াম কি হবে? তবলা ছাড়া?'

করুণা বলল, 'তবলা আবার কে বাজাবে কার্তিক?'

হারাধনদা বিনীত গলায় বলল, 'আমি এক প্রায় সেরের মত একটু আধটু ঠেকা দিই। তাতে যদি চলে?'

চলে ত বোঝাগেল, কিন্তু ঐ দুটো বস্তু পাওয়া যাবে কোথায়? শেষ পর্যন্ত পুঁটি সন্ধান দিল, বাড়ীওয়ালার মেয়ে গান শেখে, তবলা হারমোনিয়াম দুই-ই আছে।

সজল চুপচাপ গান শুনছিল। আধুনিক গান সে সহ্য করতে পারে না। আধুনিক গানের কথা, সুর, তার রুচিকে আঘাত করে। কিন্তু কোন উপায় নাই। ভরসার কথা এই দ্বিতীয় গানটা হলেই বোধহয় শেষ হবে।

আরতিও জানালা দিয়ে চুপকরে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল। কাচের গ্লাসে একগুচ্ছ সজেজ, শুভ্র রজনীগন্ধা সাজানো। আরতি এই টাটকা ফুলগুলি নিয়ে এসেছে। সকলের মনে হচ্ছিল, এত কালের উপহারের মধ্যে আরতির এই উপহারটুকুই সৌন্দর্যে, ব্যবহারিকতায় তুলনাহীন।

আরতির মুখ দেখেই সজল বুঝতে পারছিল, এই আধুনিক গান তারও ভাল লাগছে না।

রেণুদি চুপ করে আরতির গা ঘেঁষে বসেছিল। করুণা কার্তিকের গানের সঙ্গে মাঝে মাঝে তাল দিচ্ছে।

গান থামতে আরতি বলল, 'রেণুদি!'

হারাধনদা মাথা নাড়ল, 'হুঁ, গলা বটে একখানা।'

রেণুদি কিছু বলল না।

করুণা বলল, 'মন্ত্রদানে হাজার হাজার লোকের সামনে কার্তিক গান গেয়েছে। কার্তিক, ঐগানটা গাওনা?'

শুধু সজল চুপ করেছিল। তার মনে হচ্ছিল, আরতি কার্তিককে 'কনসোলেশন প্রাইজ' দিল।

এতক্ষণে রেণুদি কথা বলল, 'আরতি সেতার শোনাও একটু।' সজল নিয়ে এস যন্ত্রটা। সেই কখন থেকে বলছি!'

আরতি সেতারটা আস্তে আস্তে বাঁধছিল। চোখ বুজে সুরটা মেলাচ্ছিল। বা হাতটা প্রসারিত করে সেতারের কানে মোচড় দিচ্ছিল কখনো কখনো। সজল দেখছিল একটি দীর্ঘ একটি নিটোল নিরাভরণ হাত, কী সুন্দর আঙ্গুলগুলি, যেন সুন্দর বেদনায় ভরে আছে।

অনেকক্ষণ পরে আরতি মুখ তুলে তাকালো। কিন্তু সে তাকানো হয়ত কোন নির্দিষ্ট বস্তুপুঞ্জকে দেখার জন্য নয়। সে তাকানো উদাসীন, অপার্থিব!

সজলকে ইশারায় কাছে ডাকল আরতি।

মন্ত্রমুগ্ধের মত এগিয়ে যেতে, আরতি সজলকে চুপি চুপি জিজ্ঞেস করল, 'বল? কি বাজাব?'

সজল কিছু বলল না। অর্থাৎ আরতি যা খুশি বাজাতে পারে।

কি ভেবে নিয়ে আরতি আবার কয়েকটা পর্দা নতুন করে বাঁধল।

অনেকক্ষণ কেটে গেছে। ঘরে একটা কম পাওয়ারের নীল আলো জ্বলছিল। আরতির কাছেই ফ্লাসে-রাখা শুভ্র রজনীগন্ধার ডাঁটাগুলি এখন আরও জীবন্ত।

আরতি আলাপ শেষ করেছিল। রাগ 'অরুন্ধতী'। কোমল গান্ধারটি আশ্চর্য রূপ নিয়ে বারবার ফুটে উঠছে। সজলের মনে হচ্ছিল, আব্বাসের আত্মা আজ এই ঘরের কোন অন্ধকার কোণে বসে, আরতির ঐ আলাপ শুনছে। আলাপ হল ধ্যান। কথাটা আব্বাস বলেছিল একদিন। বাইরের পৃথিবীর সব চঞ্চলতাকে নিজের অন্তরের নীরবতায় নিমগ্ন করে ভুলতে না পারলে আলাপ হয় না। সজল কি কোনদিন এমনি করে আলাপ করতে পারবে? এ জীবনে কি তা সম্ভব?

তান শেষ করে আলা বাজিয়ে আরতি শেষ করল। তবলাটা কেউ বাজায়নি।

অনেকক্ষণ কেউ কোন কথা বলছিল না।

হারাধনদাই প্রথম বলল, 'দেখেই বুঝেছিলাম গুণী মেয়ে।'

রেণুদি বলল, 'তুমি ভাই, রূপে গুণে সরস্বতী। কী মিষ্টি হাত তোমার?' আরতি আসার জন্য সজল আজ গর্বিত।

কার্তিক বলল, 'হ্যাঁ, সেবার সেতার শুনেছিলাম বটে এক জনের কাছে। সেও তার জয়ন্তী বাজাচ্ছিল। কী হাত! যেন বিদ্যুৎ।'

সজলের মনে হচ্ছিল, কথাটার মধ্যে সূক্ষ্ম বিদ্রূপ আছে। অর্থাৎ আরতির হাত সেই বিদ্যুৎ গতি শিল্পীর হাতের মত নয়। এর দ্বারা আরতিকে ছোট করার যে চেষ্টা আছে, তাতে কার্তিক আনন্দ পাচ্ছে মনে মনে।

আরতি চুপ করে রইল। শুধু হাসল একটু।

কিন্তু এই হাসিটুকু, কি করে যেন ঘরের সমস্ত বিদ্রূপের আবিলতাকে অস্বীকার করে আলোর মত বিজয়ী হয়ে ফুটে রইল!

অতিথিরা খেতে বসেছিল। সজল বসেনি, যদিও আরতি বলেছিল বসতে।

অরুণা পরিবেশন করছিল। কিন্তু সজলের তা ভালো লাগছিল না। হারাধনদা গ্রামের মানুষ। খেতেও পারে সে। বালিচকের শশীর হোটেলে সে ঠাকুরকে নাস্তানাবুদ করেছিল। আর আজ ত মাছ হয়েছে, মাংস হয়েছে।

সজল অরুণাকে বলল, 'হারাধনদাকে আর একটু মাংস দাও, ঝোল দাও। অরুণা দিল, কিন্তু যেন অনিচ্ছা সত্ত্বে। ছোট একটা টুকরো মাংস, যাতে শুধু হাড় আছে। আর আধ চামচ ঝোল।

'আর একটু ভাত দাও হারাধনদাকে।

অরুণা এর আগেও ভাত দিয়েছে। আবার একটু ভাত ছিল।

হারাধনদা গোগ্রাসে সেগুলোও খেয়ে ফেলল।

সজলের কেমন করুণ লাগছিল। স্ত্রী ছেলেমেয়ে ছেড়ে থাকা হারাধনদার এই জীবনটার কথা ভাবলে সজল অন্যমনস্ক হয়ে ওঠে!

করুণা আর কার্তিক হারাধনের খাওয়া দেখছিল। রেণুদি নির্বিকার।

আরতি বলল, 'রান্না খুব সুন্দর হয়েছে বৌদি।'

কিন্তু সজল লক্ষ্য করছিল, আরতি নিজে প্রায় কিছু খাচ্ছিল না।

করুণা এবং কার্তিকের দিকে সজলের মনোযোগ না দেবার জন্য অরুণা মনে মনে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিল হয়ত আরতির কথা শুনে শুকনো মুখে বলল, 'আমরা ত ভাই তোমাদের মত গুণী মানুষ নই।'

রেণুদি বলল, 'গুণে কাজ কি? এই ত সুন্দর রান্না করেছ। গান পাও শুনলাম। চাকরীও কর। আর কি চাই?'

সকলের খাওয়া হয়ে গেছিল। তাই দেখে হারাধন তাড়াতাড়ি শেষ করে একটা নিঃশ্বাস ফেলল।

খাওয়া শেষ হতে দেরি হওয়ায় হয়ত হারাধনদার মনে একটা ক্ষীণ অপরাধ বোধ এসে থাকবে বেশ হয়।

একটু আগে করুণা আর কার্তিক ট্যাক্সি করে চলে গেছে। রেণুদি ঐদিকেই যাবে। কিন্তু তবু সে ওদের সঙ্গে যায়নি।

সজল এগিয়ে দিতে এসেছিল। রেণুদির ট্রাম এসে যাওয়ায় হারাধনদাকে নমস্কার করে বিদায় নিয়ে চলে গেল। যাওয়ার আগে আরতির হাত ধরে বলেছিল, খুব ভালো লাগল তুই তোমাকে। আমার বাড়ী এসো একদিন। রেণুদি ঠিকানাটা লিখে নিল তাড়াতাড়ি করে।

হারাধন বড় বাজারের দিকে যাবে এবং আরতি যাবে মৌলালি। দুজনে তিন জনই গোল দীঘির ধার দিয়ে কলেজ স্ট্রীটের মোড়ের দিকে হাঁটছিল। যেতে যেতে হারাধন বলল, 'সজল তোকে টেনে যাব না এখন?'

সজল একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কেন?'

না বলছি, গেলে আমার বাড়ী যাস। বেলেঘাটার খাল পেরোলেই আমার বাড়ী। যাকে জিজ্ঞেস করবি হারাধন অধিকারীর ঘর সেই দেখিয়ে দেবে।'

আমরা প্রমাণ পেয়েছি

নতুন ম্যাকলীনস্ ফ্রেশমিন্ট

অন্যান্য টুথপেস্টের তুলনায় দাঁতকে আরো শুভ্র ও শক্ত করে তোলে

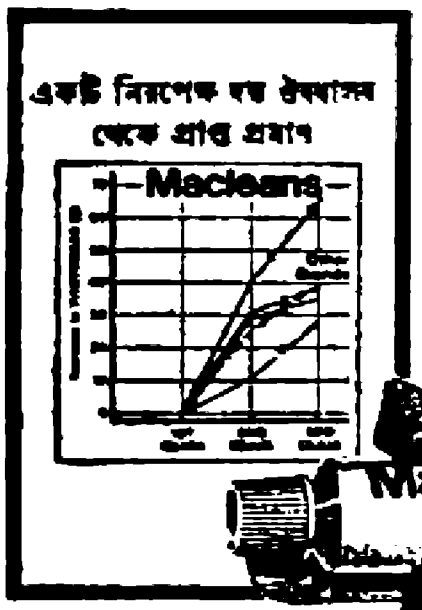

বিশ্বের একটি নিরপেক্ষ বস্তু ঔষধালয় সেরা টুথপেস্টগুলি নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন এবং নিশ্চিতরূপে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে ম্যাকলীনস্ দাঁতকে আরো শুভ্র করে। ম্যাকলীনস্ ফ্রেশমিন্টের নতুন চমৎকার স্বাদটি উপভোগ করুন। দাঁতকে আরো শুভ্র, আরো শক্ত করার এটাই প্রমাণিত উপায়।

ম্যাকলীনস্ দাঁতকে আরো শুভ্র আরো শক্ত করার জন্য সারা বিশ্বে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

OBM-7092-BN

নতুন ম্যাকলীনস্ ফ্রেশমিন্ট আরো শুভ্র, আরো শক্ত দাঁতের জন্য।

সজল কিছু বুঝতে পারছিল না। কিন্তু আর হাসি পাচ্ছিল। ব্যাপারটা হারাধন অধিকারীর মাদুরের দোকান দেখানোর মত।

হারাধনই বলল, 'ও শালা বুড়োর চাকরী আর পোষাচ্ছে না। বয়স হল। যে দু পাঁচ বিঘা জমি জরুপা, পুকুর টুকুর আছে, তাই নিয়েই থাকব ভাই। শালা, চাকরী মানেই চাকরগিরি? বুঝলি না? তোর মত আর দু তিনটা পাশ দিইনি? বাবুর চাকরী কোথায় পাব বল?'

হারাধনদা সজলের দুর্দিনের আশ্রয়, এবং সে আশ্রয় দেবার মন যে কতবড় ছিল, তা অরুণা জানে না! ছিপছিপে মত মনের গঠনও তার নয়।

হারাধনের 'বাস' এসে যাচ্ছিল। তাই তাড়াতাড়ি বলল, 'হ্যাঁ শোন, বৌমাকে ভাড়ার টাকার দেখাবি। প্রথম পোয়াতী। সাবধানে থাকতে বলবি।' তুই ত আবার একটা গাধা। ছোটমাকে নিয়ে এসে রাখনা কদিন।

সজল বলল, 'সে আসবেনা। লিখেছিলাম।'

হারাধনদার বাসটার চলে যাওয়ার দিকে সজল অনেকক্ষণ বিষণ্ণ চোখ মেলে তাকিয়েছিল।

আরতি ধীরে ধীরে বলল, 'লোকটি বড় ভালো'।

সজল হাঁটতে হাঁটতে আরতিকে তার প্রথম কলকাতার জীবনের ঘটনা বলছিল।

হারাধনদা সেদিন না থাকলে সজল কোথায় অন্ধকারে তলিয়ে যেত। গুণময় মহাপাত্রের লোকানের একধারের রান্নাঘরে সেই রাত্রি আটটার সময় কলাই-ওঠা থালাতে ভাত খাওয়া! কী দুর্দিন গেছে তখন। হারাধনদা তার সেই কাঁদনের একমাত্র আশ্রয়!

আরতি বলল, একটু চল। ঐ শেয়ালদা দেখা যাচ্ছে।

রাস্তায় এই রাত্রে এখন লোক চলাচল একটু কম। হ্যারিসন রোডের বাঁ দিকের ফুটপাত ধরে দুজনে আস্তে আস্তে চুপচাপ হাঁটছিল।

এক সময় আরতি হঠাৎ একটা প্রশ্ন করে বসল, 'তোমার বড় দুঃখ, না সজলদা?' সজল বিস্মিত হল, এমন একটা সত্য প্রশ্ন, এতো সহজভাবে, বিনা দ্বিধায় যে আরতি জিজ্ঞেস করতে পারে, তা সজল ভাবতে পারেনি।

সজল ধীরে ধীরে বলল, 'তুমি বুঝলে কি করে, আরতি?'

আরতি একটু মৃদু হাসল। 'তোমাকে চিনি বলে?'

সজল অসহায়ের মত বলল, 'কোথা দিয়ে কি যে হয়ে গেল, বুঝতে পারলাম না। বিয়েটা একটা একসিডেণ্ট। বিশ্বাস কর, আমি বাধা দিলাম।'

আরতি সংক্ষেপে ঘটনাটা শুনে বলল, তা কদ্দিন আগে? মাস চার পাঁচেক আগে একটা সন্ধ্যায়। আমাকে, মানে বুঝলে না...।'

'চার পাঁচ মাস?' আরতি যেন একটু চমকে উঠল। তারপর বলল, ঐ কার্তিক-বাবু, করুণা, এরা খুব ভালো লোক নয় শুনে মনে হয়। অবশ্য নিন্দা করা আমার ঠিক নয়, সজলদা। কিন্তু তোমার জন্য বড় ভয় হচ্ছে। তুমি যে বড্ড সরল, সহজ সুন্দর। তোমার নিজের জগতে তুমি থাক। অন্তত সে জগৎটা খুব একটা নিষ্ঠুর নয়।'

সজল কথাগুলো নীরবে শুনে যাচ্ছিল।

আরতি আবার বলল, দুঃখ তোমাকে পেতেই হবে, সজলদা। ভুল করলে তার প্রায়শ্চিত্ত আছে, তা নিতে হবে। তবে দ্যাখো, কখনও কখনও দুঃখটা জীবনের পরীক্ষা। তারপর হাসতে হাসতে বলল, এবার জীবনের ইউনিভার্সিটিতে পড় কিছু দিন। মাষ্টার ডিগ্রী পেয়ে যাবে!'

সজল এই হাসিতে যোগ দিতে পারল না। একটু ভেবে সে বলল, 'অরুণার জীবনের সঙ্গে আমার জীবনের যে এতো অমিল, এটা বিয়ের আগে বুঝতে পারিনি, আরতি!'

আরতি বলল, জানি। মেয়েদের অভিনয় ধরতে পারা খুব কঠিন কাজ, সজলদা। সে তোমার মত লোকের সাধ্য নয়। কিন্তু তুমি আর কন্দুর যাবে?'

চল, আর একটু তোমার সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে যাই। বড় ভালো লাগছে আজ। আমার দুঃখ কেউ বোঝেনি, আরতি। কেউ না; শুধু তুমি বুঝেছ।'

আরতি আস্তে আস্তে বলল, 'খুব ধৈর্য ধরবে সজলদা। এখন তোমার সবচেয়ে কঠিন সময়। ধৈর্য হারালেই কিন্তু ভেসে যাবে।'

সজল কিছু না ভেবেই নিজেস করল, 'আচ্ছা আরতি, যদি কোন দিন আমার বিপদ হয় তুমি আসবে?'

আরতি সজলের মুখের দিকে তাকাল। কিন্তু এই অন্ধকারে মুখের রেখা দেখা যায় না।

'কি, কিছু বললে না?'

তখনও আরতি নিরুত্তর।

নীলরতন সরকার হাসপাতালের ওপরে এখন অন্ধকারগুলো মমতার মত ঘন। একটেলা টালির শেডটা এই রাত্রে অপারেশন টেবিলের মত শুয়ে আছে। হাসপাতালের সামনের ফুটপাতে ন্যাড়া গাছটার নিচে এর মধ্যেই একটা ভিখিরি রাত্রির বিশ্রামের জন্য ছেঁড়া চট বিছিয়েছে। পাশে একটা পথের কুকুর।

একটু পরে আরতি বলল, একি! হাঁটতে হাঁটতে এদ্দুরে এসে পড়লে?

সজল এদিক ওদিক তাকাল একটু। জায়গাটা সে ঠিক চিনতে পারছে না!

'বাস আসছে, উঠে পড়।'

সজল এ পকেট ও পকেট হাতড়াল।

আরতি হেসে ভ্যানিটি ব্যাগটা খুলে পয়সা দিয়ে বলল, 'আবার কবে দেখা হবে?'

সজল বলল, 'আমার প্রশ্নটার কোন উত্তর দাওনি, আরতি!'

আরতি মুখ নিচু করে আস্তে আস্তে বলল, 'মুখে না বললে উত্তর হয় না বুঝি?'

সজল জীবনে এমন অমৃতের স্পর্শ আর কখনো পায়নি। এর কাছে জীবনের অনেক দুঃখও তুচ্ছ! অনেক আঘাতও সহনীয়। অনেক যন্ত্রণাও বেদনার আরোগ্যের অধিকার, এই নম্র ভালোবাসার স্নিগ্ধতার মধ্যে! সজল আজ ধন্য হয়ে গেল!

ঘরটা অন্ধকার। অরুণা শুয়ে পড়েছে তা হলে! ইস আজ যা পরিশ্রম গেছে ওর শরীরের ওপর দিয়ে! খেয়ে নিয়ে ভালোই করেছে! তাছাড়া সজল অনেক দেরি করেও ফিরল!

রান্নাঘরে ঢুকে সজল আলো জ্বালল। তার ভাত তরকারি ঢাকা আছে। ক্ষুধিত সজল ঢাকা খুলে খেতে বসল।

নিজেকে তার এখন খুব হালকা লাগছিল। জীবনের সমুদ্রে সে যখন দিক হারিয়ে ফেলছিল, তখন দূরে বাতিঘরের ক্ষীণ আলোটা চোখে পড়ল তার। আর অন্ততঃ দিক ভ্রম হবে না। একটা নিরাপদ বন্দর পাওয়া যাবেই!

খাওয়া শেষ করে সজল শুতে এল। কিন্তু একি! অরুণা ঘরটা ভেতর থেকে বন্ধ করেই শুয়েছে? অনেক ডাকা-ডাকিতেও কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

অগত্যা সজল নিজের ঘরে এসে বই-গুলোকে তোষকের নিচে দিয়ে বালিশের মত করে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ল। ঘুমে তার চোখ জড়িয়ে আসছে।

।।২১।।

একটা অতৃপ্ত তন্দ্রার মধ্যে সজলের ভাবছা মনে হচ্ছিল, কে যেন দরজায় আস্তে আস্তে ধাক্কা দিচ্ছে।

সজল কয়েক মুহূর্ত কান পেতে শুনল। তারপর আস্তে আস্তে উঠে কপাট খুলল। অরুণা অভিমানের সুরে বলল, 'তুমি শুতে যাওনি কেন ঘরে?' সজল খুশি হল। 'কতো ডাকলাম, তোমার ঘুম ভাঙ্গল না। তাই—' 'ওমা! ঘুম ভাঙ্গলনা বলে এখানে এসে শোবে? চল ঘরে যাই'।

সজল ধীরে ধীরে সন্ধ্যার সব তিক্ততা ভুলে যাচ্ছিল। অরুণার হাত ধরে তাকে বিছানায় নিয়ে এল। বড় ছোট তোষকটা। দুজনের শুতে কষ্ট হয়।

অরুণা খুব কাছে সরে এল, হাত দিয়ে সজলের গলা জড়িয়ে ধরে চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। এক সময় গাঢ় স্বরে বলল, শুনছো, আমি কিন্তু রেগেছিলাম। রাগ করে দরজা খুলিনি। সেই যে আরতিকে

এগিয়ে দিতে গেলে, আর পারো নেই। কি পাও ও মেয়েটার মধ্যে, হ্যাংলো! আর এদিকে দুজনে একসঙ্গে খাব বলে বসে আছি তো আছি-ই। তা তুমিই বল, আমি আর কতক্ষণ জেগে রইব? কী টায়ার্ড ছিলাম আজ।'

সজল খুশি গলায় বলল, 'তাইতো আমি রাগ করিনি। খেয়েদেয়ে দিব্যি শুয়ে পড়লাম।'

অরুণা ঠোঁট ফুলিয়ে অভিমানের সুরে বলল, 'তুমি কাছে না শুলে আমার ঘুম ভালো হয় না, জানো? কেমন ভীষণ ফাঁকা ফাঁকা লাগে।'

এই গভীর রাতে, এই ঘনিষ্ঠতার মধ্যে সজলের মনে, শরীরে একটা উত্তাপ সঞ্চারিত হচ্ছিল।

পৃথিবীটা এখন ক্লান্ত, ধূসর অন্ধকারের ডানা দিয়ে ঢাকা। কোথাও কোন সাড়া শব্দ নেই। কেবল নীরব শিশির বিন্দুগুলি আকাশের সমগ্র শরীর থেকে তীব্র মদের মত চুইয়ে চুইয়ে ঝরছে পৃথিবীর মাটিতে, শহরের ফুটপাতে।

অরুণা সজলের দিকে পাশ ফিরে শুতে শুতে জিজ্ঞেস করল, 'আরতি, রেণুদি কি বলল গো আমার কথা'?

'ভালো বলেছে। সবাই খুশি।'

'আর তোমার হারাধনদা?'

'হারাধনদা ত আমাকে কত সাবধান করে দিয়ে গেল। প্রথম পোয়াতী বলে আগে থেকে ডাক্তার দেখাতে বলল, ছোটমাকে আসার জন্য লিখতে বলল।

'যাই বল বাপু, তোমার হারাধনদা কিন্তু বড্ড 'আনপলিশড'। কাঁড়িকলা, দিদি সে কথা বলছিল'।

সজলের পিঠে যেন কেউ হঠাৎ চাবুক মারল!

'ওকে আজ ডাকা তোমার ঠিক হয়নি। অন্যদিন ডাকলে পারতে'। দিদিরা ভাবল তোমার 'টেস্ট ভালো নয়।' সজল চুপ করে রইল।

'আর রাক্ষসের মত কী খেতে পারে? ভাতাটাত সব কম পড়ে গেছল? পুঁটির জন্য আবার পাউরুটি কিনে আনলাম। কি? কথা বলছনা কেন?' ঘুম পাচ্ছে?'

অরুণা সজলের পিঠে খোঁচা মারল।

'হারাধনদার ঋণ আমি জীবনে শোধ করতে পারব না'।

অরুণা সজলের গলার স্বর শুনে অবাক হল।

সজল আবার বলল, 'তোমাদের ঐ পোষাকী ভদ্রতার ধার ধারিনা আমি।'

সজল এমন কড়া কথা বলতে পারে, এমন বাক্তিত্বও যে তার মধ্যে আছে, অরুণা তা ভাবতে পারেনি।

'এই হারাধনদা কতদিন নিজে কম খেয়ে আমায় খাইয়েছে। তুমি আজ তারই খাওয়ার খোঁটা দিলে? লোককে খেতে ডেকেছি, পেট ভরে খাওয়াব বলেই। তোমার মন যে এত ছোট, তা আমি ভাবতে পারিনি'!

সজল বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। এই বিছানার শুয়ে থাকা তার পক্ষে অসম্ভব। অরুণার শরীরের স্পর্শ তখন গরম লোহার মত দহ জানাচ্ছে।

আলোটা নিবিয়ে সজল দরজা খুলে পথে বেরিয়ে পড়ল। একটু খোলা হাওয়ার জন্য সে পাগল হয়ে উঠছে!

সজল ধীরে ধীরে হাঁটছিল। নির্জনপুর স্ট্রীট এখন নির্জন। দোকান পাটের দরজা বন্ধ।

সারা শহরটা যেন প্রাগৈতিহাসিক কোন মৃত মহানগরী যেখানে জীবনের কোন স্পন্দন নেই। শুধু মাঝে মাঝে রাস্তার আলোগুলো বরফের মত ঠাণ্ডা সাদা চোখে তাকিয়ে আছে।

সজল এগিয়ে যাচ্ছিল, গোলদীঘির ধারে কোন বেঞ্চে বসে ঠাণ্ডা হাওয়ায় সে একটু শান্ত হতে পারে।

কিন্তু গেটগুলো বন্ধ। ভেতরে ঢুকতে হলে বেড়া ডিঙিয়ে যেতে হবে। সজলের তা ইচ্ছা করছিল না। তার শরীরেও এখন একটুও শক্তি নেই।

এগিয়ে যেতে যেতে সজল সেনেট হলের সামনে এসে দাঁড়াল। স্তব্ধ গম্ভীর হলটাকে এখন এই গভীর রাত্রির ক্যানভাসে, মহেঞ্জদরোর মত কোন বিরাট প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার বলে মনে হয়। বিরাট বিরাট থামগুলি বিশাল উঁচু খিলান, বিস্তীর্ণ সিঁড়িতে বেজে ওঠা প্রতিধ্বনি, আর ওপরের সমুদ্র-আকাশ, সব যেন এক ধূসর মন্থর গম্ভীর আলাপ!

একটি থামের আড়ালে সজল কতক্ষণ চুপ করে বসেছিল। দেয়ালের দিকে দু-একজন ভিখিরী ঘুমিয়ে আছে। সামনে গোলদীঘির জলের ওপর অন্ধকারের স্তর জমা হয়ে আছে এখন।

রাত্রি শেষের বাতাসে শীত শীত করছিল একটু। সজল ক্রমশঃ শান্ত হয়ে আসছিল। মনের উত্তাপ ধীরে ধীরে কমে আসার পর কেমন একটা নিরাসক্ততা, লজ্জা, তাকে ঘিরে ধরছিল। আশ্চর্য, বিবাহটা এমন কঠিন দায়ারোগ্য বন্ধন হয়ে উঠবে জীবনের ওপর এত অত্যাচার হয়ে উঠবে, সজল তা ভাবেনি। ভাবতে পারেনি। একটা গভীর ব্যর্থতাবোধও তাকে এই মুহূর্তে আচ্ছন্ন করে তুলছিল।

সজল কতক্ষণ হাঁটুতে মুখ গুঁজে চুপ করে বসেছিল। দূর থেকে ভেসে-আসা একটা শব্দে ফিরে তাকিয়ে দেখল, শ্যামবাজার থেকে প্রথম ট্রাম আসছে। তাতে আলো পড়ছে ট্রাম লাইনের ওপর।

সজল পূর্ব দিকে তাকাল। নগরীর ছাদের ওপরের আকাশে রঙ ফিরছে এখন। অন্ধকার ভেঙে ভেঙে, সন্তর্পণে দিগন্ত সূর্যের আবির্ভাবের জন্য ভূমিকা রচনার মগ্ন এখন!

ঠিক এমনি ভোরে বাবা বিছানা ছেড়ে যেত। অমৃতপুরের গন্ধপাকার মাটিতে, ধানমাঠে আকাশে তখনও রাত্রির ঘুমের আর্দ্রতা। পথঘাটে কেউ নেই। শুধু খড়ই গ্রামের উত্তর ধার দিয়ে প্রতাপদীঘির দিকে যে রাস্তাটা এঁকে-বেঁকে চলে গেছে, তার ওপর দিয়ে হয়ত একটা গরুর গাড়ী ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে। তার পেছনে পথের দুধারে নিশাচরের শেষ আলোয় বিচ্ছিন্ন নিম ও অশথ গাছের সারি ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। বাবা মাঠের ধারে সূর্যোদয়ের পানে মুখ করে স্তব্ধ তাকিয়ে আছে।

সেই অমৃতপুরের স্মৃতি, অমৃতপুরের অনুভব, অমৃতপুরের জীবন আজ ক্রমশঃ অবাস্তব হয়ে উঠছে। ভিত্তি থেকে, উৎস থেকে ক্রমশঃ দূরে সরে যাচ্ছে সে। জীবনের আশ্চর্য পরিবর্তন! কী আশ্চর্য দৃশ্যান্তর! কী করুণ বিস্ময়কর ব্যর্থতা!

সেদিন অফিস শেষে বিশ্বময়ের বাড়ী যাবে বলে সজল সোজা দক্ষিণ দিকে হাঁটছিল। পথে কোথাও ট্রামে-বাসে উঠে পড়বে একটু খালি দেখে। কোনদিকে খেয়াল ছিল না। হাজরার মোড়ে সব সময় ভীড় লেগে থাকে। ভীড়টা এড়িয়ে পশ্চিমদিকের ফুটপাত ধরে একমনে হেঁটে হেঁটে হঠাৎ মনে হল, তার নাম ধরে কে যেন ডাকছে। কিন্তু কে ডাকে? প্রথমে ভাবছিল, এক স্টলের কেউ ডাকছে বোধহয়। বহুদিন সে কাছাকাছি জায়গায় কাটিয়েছে। স্টলওয়ালারা তার চেনা, সজল নিজেই একদিন স্টল দিয়েছিল।

সজল ভালো করে কান পাতল। কিন্তু ডাকতে ডাকতে যে প্রৌঢ় লোকটি দ্রুত এগিয়ে এল, সে আর কেউ নয় তারই আগের বাড়ীওয়ালা বৈকুণ্ঠ দাস। 'নমস্কার সজলবাবু।'

সজল নমস্কার করল। বৈকুণ্ঠবাবু খুশি হয়ে বলল, 'সেই যে গেলেন মশায় একবারও এলেন না এদিকে। বেঁচে আছি কিনা সে খোঁজ-খবরও ত নিতে হয়। আর যাই হোক আপনার সঙ্গে ত মশায় বাড়ীওয়ালা-ভাড়াটে সম্পর্ক ছিল না?'

সজলের মনে পড়ছিল, সুদিনে একবার বাড়ীওয়ালা ভাড়া নিতে চায়নি! সজল বিনীত গলায় বলল, 'এদিকে এক্ষিন পরে এলাম। আচ্ছা, ঐ ঘরে নতুন ভাড়াটে এসেছে নিশ্চয়ই। কেমন লোক?'

বৈকুণ্ঠবাবু একটু ক্ষুণ্ন গলায় বলল, 'না, মশায়, আর ভাড়াটে বসাইনি। তাছাড়া আপনার মত খালি হাত-পাওয়ালা ভাড়াটে কোথায় পাব বলুন? একজন করেকদিন মাত্র ছিল। এখানে নাকি লোকজন মুখ দেখা যায় না। তাই চলে গেল। ভাবলাম থাক। নিজেদেরই থাক ওটা। কিন্তু আপনি কোথায় আছেন, কেমন আছেন বলুন?'

সজলের কথা বলতে বিশেষ ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু পাছে সে মনোভাবটা প্রকাশ হয়ে পড়ে, এজন্য বেশি আগ্রহ দেখিয়ে বলল, 'থাক মির্জাপুরে। অফিসটাও কাছে হয়।'

'আপনি নাকি সিমেন্ট লস্তরের কাজ করেন?'

'হ্যাঁ তা করি।'

তা হলে খুলেই বলি, 'সজলবাবু। এক টনের মত সিমেন্ট করে দিতে পারবেন? বাড়ীটা মেরামত করব। সব শালাই ব্ল্যাকের দাম চায়!'

সজলের আদৌ ভালো লাগছিল না। তবু এই কথায় যদি শেষ হয়, সেই ভেবে বলল, 'দরখাস্ত করুন। দেখব তাড়াতাড়ি দেওয়া যায় কিনা? তবে কথা দিচ্ছি না।'

বৈকুণ্ঠবাবু কন্ট্রোলের বাজে একটন সিমেন্ট পেতে পারে শুনে বোধহয় ধন্য হয়ে গেল।

না, হাতে ওঠা যাবে না। সজল ধীরে ধীরে হাঁটতে শুরু করল।

বেল বাজতেই আজ হরিহরদা কপাট খুলে দিল। সজল বলল, 'সুচিতা নেই?'

সুচিতা ওপর থেকে গম্ভীর মুখে ধীরে ধীরে নেমে আসছিল।

সজলের ইচ্ছা করছিল এই বোনটাকে আজ একটু আদর করে কিন্তু তা হয় না। বিনু বেঁচে থাকলে আজ এতবড় হত। বিনুকেও এখন এমনি করে আদর করা আর সম্ভব হত না! সকালবেলার আলো চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অরুণোরও রং বদল হয়। অথবা শীতের পাতা ঝরার শেষে বসন্তের আয়োজন।

সুচিতা সজলকে ওপরে নিয়ে এসে বিস্ময়ের সুরে বলল। দুহাত দিয়ে নিজের সুন্দর চুলগুলো দুদিকে সরাতে সরাতে এক সময় গম্ভীর গলায় বলল, 'কী ব্যাপার বলুন ত? ভুলে গেলেন আমাদের?'

সুচিতা কেন এত বিষণ্ণ, গম্ভীর, সজলের জানতে খুব ইচ্ছা করছিল। কারণ সজল কোনদিন ওকে এমন অবস্থায় দেখেনি।

'কি? কোথায় ছিলেন এদ্দিন?'

সজল বিনুর কথাটা বলতে চায় না। বলল, 'এ বাসায় তো এখন নেই। সেই আমি কলেজ স্ট্রীট অঞ্চলে চলে গেছি। অফিসে কাজের চাপ। তাই আসা হয়ে ওঠেনি। সে ছোক, বিশ্বময়ের খবর কি বল?'

সুচিতা বলল, 'দাদার খবর আপনার কাছ থেকে পাব বলেই তো মনে করেছিলাম। অপেক্ষা করেছিলাম এদ্দিন।'

'কেন? আমাকে বিশ্বময় চিঠি লেখেনি বহুদিন।'

'আমাদেরও না। তবে শেষ চিঠিতে লিখেছিল 'মানব মুক্তি' কাগজ চলছে না। বন্ধ হয়ে গেছে। আগে বিজ্ঞাপন পাওয়া যায়নি। সঙ্গে যে ভদ্রলোক ছিল, ছেড়ে চলে গেছে। চারদিকে দেনা। বাবাকে অবশ্য দেনার কথাটা বলিনি আমি। যাবার আগে বাবার সঙ্গে কি নিয়ে খুব তর্ক হয়েছিল। রাজনীতিটিতি বুঝিও না আমি এসব।'

সজল অবাক হয়ে বলল, 'তারপর?'

এদিক ওদিক তাকিয়ে সুচিতা শুকনো মুখে বলল, 'বাবাকে বলবেন না যেন, আমি লুকিয়ে আড়াইশ টাকা পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু জানেন, দাদা টাকাটা নেয় নি। ফেরত দিয়ে দিয়েছে।'

সজল অবাক হয়ে বলল, 'কেন?'

'ভিক্ষে করে নাকি মানবমুক্তি আসবে না। শুনুন কথাটা একবার! আমি কি ওসব মুক্তিফুক্তি বুঝি? আমি বুঝি, দাদা অসুবিধায় পড়েছে। তা টাকাটা ফেরৎ পাঠিয়ে দিল! ভাগ্যি বাবা বাড়ীতে ছিল না কদিন। নইলে জানাজানি হয়ে যেত!'

সজল স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। বিশ্বময়কে সুচিতা এতো ভালবাসে!

অথচ বিশ্বময়ও সত্য, তার আদর্শের দিক থেকে। সে তার নিজের দায়িত্ব নিজেই বইবে। ভুলের দায়িত্ব, সফলতার দায়িত্ব, সবই তার নিজস্ব।

সুচিতা বলল, পাটনায় নাকি চাকরীর চেষ্টা করছে। চাকরী করে দেনা শোধ করবে।' তন্দিন মানবমুক্তির চেষ্টা বন্ধ থাক। পৃথিবীর কোন মহৎ আদর্শ রূপায়ণের নাকি সর্টকাট পথ নেই। বুঝলেন কিছু?

সজল বলল, 'আর কিছু লেখে নি?'

'হ্যাঁ, ছবি আঁকছে এখন—কথাটা বলেই সুচিতা হাসল।

অর্থাৎ বিশ্বময় যে ছবি আঁকছে, এই একটা ব্যাপারে সুচিতা খুশী। বলতে বলে, সুচিতা ঘর থেকে চলে গেল।

তারপর একটু পরে ফিরে এসে বলল, 'আজ একটুনি যাবেন না যেন।'

সজল বলল, 'যাব না একটা শর্তে। সেই গানটা শোনাবে একটু?'

সুচিতা চোখ দুটো বড় বড় করে অবাক হয়ে বলল, 'ওমা, কোন গানটা?'

'যে-কেহ মোরে দিয়েছ সুখ...সবারে আমি নমি?'

যে জীবনে সুখ দিয়েছে তাকেও নমস্কার করি, যে দুঃখ দিয়েছে তাকেও। সজল ভাবছিল, এতো গীতার সেই স্থিত প্রজ্ঞার কথা!

'আচ্ছা সজলদা আপনি রবীন্দ্রসঙ্গীত খুব ভালোবাসেন। তাই না?'

'ভালোবাসি কিনা, বা কতটা ভালোবাসি কি করে বলব? তবে কি জান? বাবার বইগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করেছিলাম এক সময়। তাই থেকে মনে হয়, এই গানগুলি মন্ত্রের মত, কখনও বা তার চেয়েও বেশী। সেই জন্যই বার বার শুনতে ইচ্ছা হয়।'

'তবে লিখুন না? কি গলা আপনার? আমার খাস্টার মশাইকে বলব?'

'বলবে। মৃত্যুর পরে।' তন্দিন মুখ বুজে অপেক্ষা কর।'

সুচিতা মুখ বেঁকিয়ে বলল, 'বড় বুড়োর মত কথা বলছেন আজ।'

হরিহরদা অনেক খাবার নিয়ে এল। অন্যান্য দিনের চেয়ে বেশী। সজলের মনে হচ্ছিল, আজ যেন উৎসব বাড়ী।

সুচিতা প্লেটগুলো সাজিয়ে রাখছিল। 'নিন, খান। আমি বসে আছি। অফিস থেকে ফিরলেন ত?'

সজল ঠাট্টা করে বলল, 'আগে থেকে তোমার পাশ করার খাওয়াটা খাইয়ে দিচ্ছ নাকি?'

'দিচ্ছি। তখন যদি না আসেন। আসবেন ত আবার ছ' মাস পরে।'

'দেরী করে এলে বেশী আদর পাওয়া যায়। বুঝলে না? এই দেখ, কত খাবার?'

অনেকক্ষণ পরে সজলকে এগিয়ে দিতে এসে সুচিতা কপাট ধরে দাঁড়াল। সজল লক্ষ করছিল, ওর মনটা আবার ভারী হয়ে উঠছে। বোধহয় বাড়ীতে একা থাকার জন্য। ওর কোন বন্ধুকেও সজল কখনও দেখে নি। হয়ত ওর বাবা স্বদেশী করে বলে, এই অভিজাত পল্লীতে ওরা একটু স্বতন্ত্র, একটু আলাদা। তাই সুচিতার বন্ধু হয় নি কেউ।

অথবা সজলের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুলও হতে পারে।

সজল যাবার জন্য তৈরী হয়ে হাসতে হাসতে বলল, 'এরকম খাওয়াবে বললে ঘন ঘন আসব।'

সুচিতা এ ঠাট্টায় যোগ দিল না। তাকে এখন অনেক শান্ত, গম্ভীর মনে হচ্ছিল।

'জানেন সজলদা, আজ দাদার জন্ম দিন ছিল। কোথায় সে আজ আছে, কেমন আছে, কিছু জানতে যদি দেয়? কি যে রাগ ধরে, আপনাকে কি বলব?'

সুচিতা বাইরের দিকে তাকিয়ে চুপ করল!

সজল যন্ত্রমুগ্ধের মত দাঁড়িয়েছিল। তারপর এক সময় বলল, 'কিছু ভেব না সুচি, বিশ্বময় যেখানে থাক ভালই আছে। সে তোমাকে ভালোবাসে। কোথায় তোমাদের ছেড়ে যাবে? মন খারাপ করো না। কেমন? আজ আসি।'

মাথা নীচু করে সজল ধীরে ধীরে পথে নামল।

(ক্রমশঃ)

ঊনিশ শতকের তিনজন রবীন্দ্রানুরাগী মহিলা কবি

বিশ্বরঞ্জন সেনগুপ্ত

(ক)

স্বর্ণকুমারী, মানকুমারী ও মৃণালিনী ঊনবিংশ শতাব্দীর সিরাজীমাধের কবি। এঁরা তিনজন গত শতাব্দীর পর পর তিন বছরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চতুর্থ কন্যা স্বর্ণকুমারীর জন্ম হয় ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে, মাইকেল মধুসূদনের জ্ঞাতি ভাতুষ্পুত্রী মানকুমারী বসু ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন, মৃণালিনীর সেন। জন্ম হয় ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে।

স্বর্ণকুমারী রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠা হলেও তাঁর সাহিত্যরচনার সূত্রপাত হয়েছে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের আত্মপ্রকাশের সমসাময়িক কালে। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দীপ নির্বাণ' প্রকাশিত হয় ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় তারও কয়েক বছর পরে। মৃত্যুর (১৯৩২) মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে, ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে তাঁর শেষ উপন্যাস 'মিলনরাত্রি' প্রকাশিত হয়। এদিক থেকে দেখতে গেলে স্বর্ণকুমারীর কাব্য উন্মেষ রবিকরেই সাধিত হয়েছে। মানকুমারী ও মৃণালিনীর কাব্য-সাধনার কালও রবীন্দ্রপ্রতিভাদীপ্ত। এই তিনজন কবিই সেই সূর্যালোক থেকেই ভাবনা আহরণ করেছেন— এখানে তাঁদের মিল রয়েছে। এঁরা রবীন্দ্রসাহিত্যানুরাগিণী, রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভাবনার ভাবিত—অবিশ্য অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী, বিহারীলাল চক্রবর্তী প্রমুখ কবির কবিতার প্রভাবও এঁদের উপর লক্ষণীয়।

এই তিন কবির চেয়েও কামিনী রায়ের কবিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অনেক বেশী। কিন্তু এই তুলনা শুধুমাত্র রবীন্দ্র-প্রভাবের বিচারেই সহগামিনী তা-ই নয়, এঁরা একে অপরের কবিতারও অনুরাগিণী—এদিক থেকেও এঁদের কিঞ্চিৎসাম্য রয়েছে। মৃণালিনীর 'প্রতিধ্বনি' কাব্যের ছিন্নমুকুল কবিতাটি, 'ভগিনী শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত উপন্যাসের চার চরিত্র কনক, নীরজা, হীরুা ও প্রজ্ঞাদের উদ্দেশ্যে লেখা। মৃণালিনীর নিঝরিণী কাব্যের 'সেফালী' লেখা হয়েছিল স্বর্ণকুমারীর 'বিদ্রোহ' উপন্যাসখানি লক্ষ্য করে। আবার নিঝরিণীর কবি মৃণালিনীকে উদ্দেশ্য করে মানকুমারী লিখেছেন 'নিঝরিণীর কবি'।

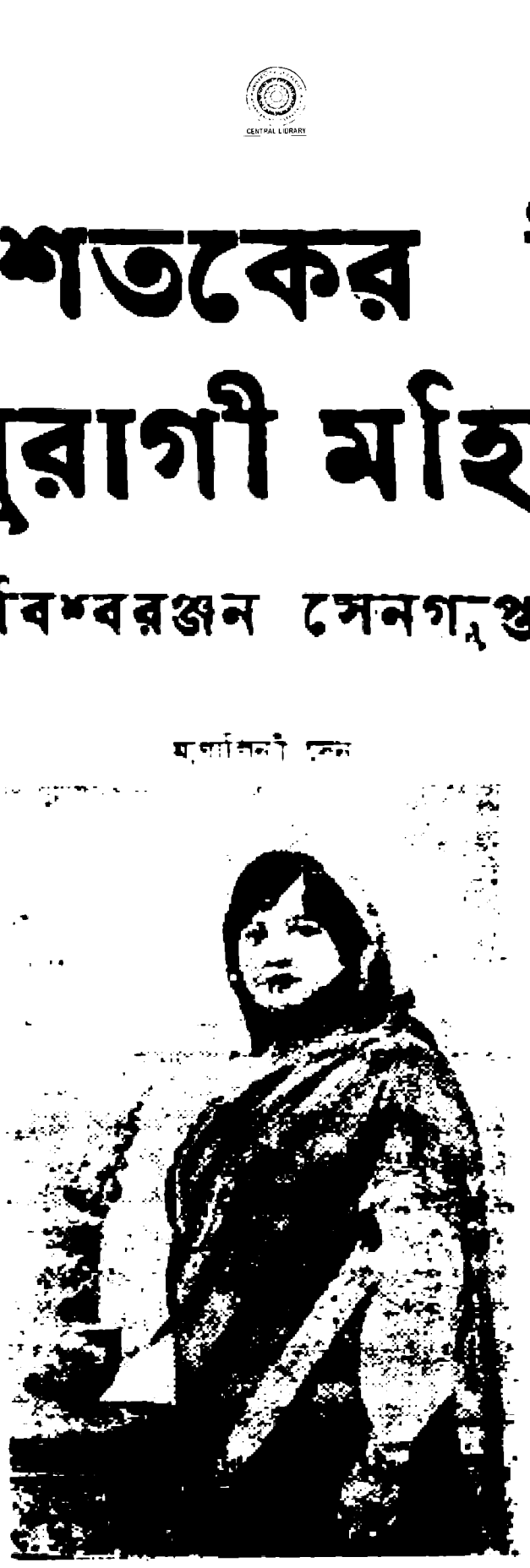

(খ)

স্বর্ণকুমারী ১২৮৫ বঙ্গাব্দের (ইং ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ) ভাদ্র মাসে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে জানকীনাথ ঘোষালের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। জানকীনাথ সিভিলিয়ান ছিলেন। পরবর্তীকালে দেশসেবকরূপেও তিনি খ্যাতি লাভ করেন। স্বর্ণকুমারী তাঁর 'দি ফেটাল গারল্যান্ড'-এর ভূমিকায় লিখেছেন যে, তাঁর স্বামীর উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতা না থাকলে কবিরূপে আত্মপ্রকাশ সম্ভব হত না। সঙ্গীতের প্রতি তাঁর বাল্যকাল থেকেই গভীর অনুরাগ ছিল। ঠাকুরবাড়ীর সাংস্কৃতিক বাতাবরণে তাঁর কাব্যপ্রীতি লালিত হয়ে, সেই প্রীতি বিকশিত হয় তাঁর স্বামীর সোৎসাহ অনুপ্রেরণায়।

স্বর্ণকুমারীর প্রকাশিত পুস্তকের সংখ্যা কম নয়। কিন্তু তিনি প্রায় আঠারো বৎসরকাল ভারতী পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন, এই-ই সম্ভবতঃ তাঁর সবচেয়ে বড় কীর্তি। উনবিংশ শতাব্দীর শেষে পদ্য-সাধিকারূপে তাঁর নাম বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

স্বর্ণকুমারীর প্রকাশিত গ্রন্থের নাম : দীপনির্বাণ (উপন্যাস, ১২৮৩), ছিন্ন-মুকুল (উপন্যাস ১২৮৭), মালতী (উপন্যাস ১২৮৬ বঙ্গাব্দ), কাহাকে ? (১২৯৬) স্নেহলতা (১২৯৯ বঙ্গাব্দ নিবারণের (১২৭৭), বিদ্রোহ (১২৯০) পুণ্যের মাশা (১২৯৬), বিচিত্র (১৩২৮), স্বপ্নবাণী (১৩২১), মিলনরাত্রি (১৩২৬)। কাব্যগ্রন্থ —গাথা (১২৮৭ বঙ্গাব্দ), বসন্ত-উৎসব (১২৮০), কবিতা ও গান (সংকলন ১৩০২ বঙ্গাব্দ), দেবকৌতুক, ও মুদ্রিত কবিতাবলী। তাঁর অন্যান্য লেখা—নোটসমূহ, আইসীলের জীবনী, হুগলীর ইমামবাড়ী (১২৯৪ বঙ্গাব্দ) গল্পগুচ্ছ, পুরিমা।

স্বর্ণকুমারীর সর্বশেষ উপন্যাস সম্পর্কে সমসাময়িক এক পাঠকের অভিমত ছিল এইরকম : 'মিলনরাত্রি—শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত। মূল্য দুই টাকা। গ্রন্থের অধিকা মহোদয়ার পরিচয় দিতে হইবে না, অর্ধ শতাব্দীর অধিককাল হইতে তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবা করিয়া আসিতেছেন ; এই বৃদ্ধ বয়সেও তিনি সেবা ত্যাগ করেন নাই। মিলনরাত্রি তাঁহার সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফল। তিনি যে কথাটি বলিতে চান, সুস্পষ্ট ও স্পষ্ট করিয়া বলেন, কোন ঘোর-পেঁচ রাখেন না। আর ভাষার কথা—তিনি সে বিষয়ে অগ্রণী রূপেই অবস্থিতা। উপন্যাসখানির আখ্যানভাগ স্বদেশী ব্যাপার, সুতরাং সকলেরই ভালো লাগিবে।' (ভারতবর্ষ, ১৩শ বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩৩২ বঙ্গাব্দ)।

১৯৩২ খৃঃ স্বর্ণকুমারী পরলোকগমন করেন।

মানকুমারী বসু তাঁর আত্মকাহিনীতে বলেছেন, '১২৭১ সালে ১৩ই মাঘ বাল্য-কালে মাতুলালয়ে শ্রীধরপুরে এ অভাগিনীর

বিজ্ঞাপন।

কাব্যকুসুমাঞ্জলি।

[illegible] প্রণীত, [illegible] কবিতা পুস্তক প্রকাশিত।

বঙ্গভাষার অনুপমেয় কাব্য।

মূল্য অগ্রিম বার্ষ ... ১৸ পোষ্টেজ ... ৵০
নমুনার বার্ষ ... ৬০ পোষ্টেজ ... ৵০

পূজনীয় ৺ রমেশচন্দ্র দত্তোপাধ্যায় রায় বাহাদুর, C. I. E. মহোদয়ের পত্র।

"পরিচয়ে [illegible] কবিতা অতীব মধুরভাবপূর্ণ।" ইত্যাদি

[illegible] "কাব্যকুসুমাঞ্জলির" অনেকগুলি কবিতা পড়িয়াছি। প্রত্যেকটি [illegible] হইয়াছে। [illegible] ভাষায় [illegible] কবিতার [illegible] কিন্তু বিশেষ [illegible] হইয়াছে। ইহাতে যে না আছে, সে দোষ [illegible] পাওয়া যাইতে পারে না। এই কবিতাগুলিতে যে দোষ নাই। [illegible] ভাষা সরল, ভাবগুলি [illegible], [illegible] সরল, মধুর ও মধুময়। [illegible] [illegible] পাঠ করিলে [illegible] পরিতৃপ্ত হইবেন।

[illegible] ১৸ [illegible] ডাকমাশুল ৵০

[illegible] ১৸ কলিকাতা ও পাস।

[illegible] শ্রীমতী [illegible] প্রণীত।

[illegible] ডাকমাশুল ১০৵০।

[illegible] মূল্য দুই টাকা

জন্মগ্রহণ। শিশুকালে আমার 'আদরিনী' ধাত্রীরাই নাকি আমার নামকরণ হইয়াছিল মানকুমারী।

আমার মনে হয়, একদিন আমার এক ভাগিনীকে দিয়া একখানি ছোট খাতা বাঁধাইয়া লইয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, 'খাতাখানা আমাকে দে, আমি তোকে গান লিখিয়া দিব।' আমি তাহা দিলাম না। আজি নির্জনে বসিয়া সেই খাতা এবং পেন্সিল কলম লইয়া তাহার নামকরণ করিলাম লাইব্রেরীর উপাখ্যান। কিন্তু সেই লাইব্রেরী পুস্তকে কি লিখিয়াছিলাম, তাহা আমার ভাল মনে নাই।...যাহা হউক সেই লাইব্রেরীই আমার প্রথম রচনা।' (বঙ্গের মহিলা কবি/যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত)।

মানকুমারী যে বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সেই বংশে মাইকেল মধুসূদন ছাড়াও একাধিক ব্যক্তি কবি-শক্তিসম্পন্ন ছিলেন। মানকুমারীর এক পিতামহ পাঁচকড়ি দত্ত সুকবি ছিলেন। মানকুমারীর পিতা আনন্দমোহন দত্তচৌধুরীও দুর্গাস্তব, শিবস্তব, গণেশবন্দনা প্রভৃতি রচনা করেছিলেন।

সাগরদাঁড়ি গ্রামের নিকটবর্তী বিদ্যানন্দকাটী গ্রামের বসু পরিবারে ১২৭১ সালের ৭ই মাঘ মানকুমারীর বিয়ে হল। তাঁর স্বামী গোপনে তাঁর কবিতা রচনার উৎসাহ দিতে লাগলেন। চৌদ্দ বৎসর বয়সে মানকুমারী 'পুরুষোত্তমের প্রতি ইন্দুমালা' শীর্ষক অমিত্রাক্ষর ছন্দে বীর-রসপূর্ণ এক কবিতা লিখে স্বামীকে দিয়েছিলেন।

কিন্তু মাত্র সাড়ে আঠারো বৎসর বয়সে মানকুমারী তাঁর স্বামীকে হারালেন। তাঁর শোকোচ্ছ্বাস 'প্রিয়প্রসঙ্গ' নামক গদ্য-কাব্যে লিপিবদ্ধ হল। গঞ্জনার ভয়ে লেখিকার নাম ও পরিচয় গ্রন্থে অনুল্লেখিত রইল।

মানকুমারী দীর্ঘজীবন লাভ করেছিলেন। দীর্ঘকাল ধরে তিনি সাহিত্য-চর্চা করেন। প্রকাশিত গ্রন্থ ছাড়াও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর নিবন্ধাদি প্রকাশিত হয়েছিল এবং কয়েকটি পুরস্কৃতও হয়েছিল।

১৯৬৩ খৃঃ মানকুমারীর মৃত্যু হয়।

তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের নাম : 'প্রিয়প্রসঙ্গ' ও 'বনবাসিনী' (১৮৮৮), 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি', কনকাঞ্জলি (১৮৯৬) ও বীরকুমার বধ (১৩১০ বঙ্গাব্দ)।

মৃণালিনী সেনও দীর্ঘজীবন লাভ করেছেন। ১৮৭৭ খৃঃ তাঁর জন্ম হয়। মাত্র সম্প্রতি ৮ই মার্চ, ১৯৭২, তাঁর মৃত্যু হয়।

মৃণালিনীর পিতার নাম লাডলিমোহন ঘোষ। মাত্র ১০ বৎসর বয়সে পাইকপাড়ার রাজা ইন্দ্রচন্দ্র সিংহের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। বিবাহের অল্পকাল পরেই তাঁর স্বামীর মৃত্যু হয়।

স্বর্ণকুমারী দেবী

তাঁর গ্রন্থাদির নাম প্রতিধ্বনি (১৮৯৫), নির্ঝরিণী(১৮৯৫), কনকোলিনী, মনোবীণা (১৯০০)। এই চারটি কাব্যগ্রন্থ হতে কবিতা নির্বাচন করে এবং পরবর্তী কিছু কবিতা যোগ করে ১৯৬২ খৃঃ মৃণালিনীর কাব্য-সংকলন 'প্রনিকম ও উত্তরা' প্রকাশিত হয়।

স্বামীর অকালমৃত্যু মৃণালিনীর কাব্য-ভাবনাকে উৎসারিত করেছিল। কিন্তু মৃণালিনী এক অর্থে বিদ্রোহিনী। স্বর্ণকুমারী ও মানকুমারী, বিশেষ করে দ্বিতীয়জন অতি অল্পবয়সে স্বামীহারা হন। কিন্তু মৃণালিনী বৈধব্য বেশিদিন মানলেন না। হয়তো তিনি বুঝেছিলেন, পৃথিবীকে তাঁর অনেক কিছু দেবার আছে। ২৬ বৎসর বয়সে মৃণালিনী কেশবচন্দ্র সেনের পুত্র নির্মলচন্দ্র সেনকে বিবাহ করেন। নির্মলচন্দ্র সেন তখন ইণ্ডিয়া অফিসের 'শিক্ষা উপদেষ্টা' ছিলেন। নির্মলচন্দ্রের সঙ্গে তিনি লণ্ডন চলে যান এবং সেখানেই বাস করতে থাকেন। বিদেশে গিয়ে তিনি ইংরাজী লেখা শুরু করেন। সেখানে তিনি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সভায় যে সকল ভাষণ দিয়েছিলেন, ১৯৫০ খৃঃ 'নকিং অ্যাট দি ডোর' নামে তার সংকলন প্রকাশিত হয়। ডঃ কালিদাস নাগ এই পুস্তকের মুখবন্ধ লিখে দিয়েছিলেন।

First woman Flier in India? Nikhil Sen, Sunday Magazine, Th Amrita B. Patrika, 26.3.72

নানা কারণে তাঁর নাম বাঙালীর ইতিহাসে স্মরণীয়। এই দুঃসাহসিক মহিলা ভারতীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম বিমানযানে ভ্রমণ করেন। আবার মিস ক্যাথরিন মেয়োর 'মাদার ইণ্ডিয়া' প্রকাশিত হলে মৃণালিনী তার যথাযোগ্য জবাব দিয়েছিলেন।

পাইকপাড়ার রাণী মৃণালিনী বিংশ শতাব্দীর জাগ্রত মহিলা সমাজে উনবিংশ শতকের সুযোগ্য প্রতিনিধি। উনবিংশ শতকের নারীজীবনের মহিমা ও সংস্কার, এবং সেই সংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে নব-জীবনের জয়গান—এই দুই ধারায় তাঁর কাব্য প্রবাহিত।

ইংরাজী ভাষায় তাঁর রচনাসমূহও বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিল। প্রসঙ্গতঃ, লণ্ডনে তিনি মহাত্মা গান্ধীর বাংলা ভাষা শিক্ষিকা ছিলেন। ১৯১৭ খৃঃ ওয়েস্ট-মিনস্টারের 'ইস্ট ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের' এক সভায় মৃণালিনী রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এক ভাষণ দেন। বিদেশে রবীন্দ্রচর্চার ক্ষেত্রে এ ঘটনা তৎকালীন সময়ের বিচারে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(গ)

'গাথা' স্বর্ণকুমারীর প্রথম প্রকাশিত কাব্য। বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ডে (১৯৬৩) ডঃ সুকুমার সেন 'গাথা' কাব্যের প্রকাশকালরূপে সন ১২৯৭ বঙ্গাব্দ নির্দেশ করেছেন। কিন্তু ঐ কাব্য-গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের টাইটেল পৃষ্ঠায় সন ১২৮৭ সাল মুদ্রিত আছে। কলিকাতা বাল্মীকি যন্ত্রে শ্রীকালীকিঙ্কর চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত'—এই বয়ানের নীচে সাল উল্লেখিত। 'উপহারে' 'স্নেহের রবিটি' বলে যাকে সম্বোধন করা হয়েছে তিনি নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথ।

'গাথায়' চারটি কবিতা আছে—(১) সাধ্র সম্প্রদান (২) সাধের ভাসান (৩) গরল-পরিণয় ও (৪) অহংগিনী। 'খড়্গ-পরিণয়ের' কাহিনী টডের 'রাজস্থানের' প্রথম পরিচ্ছেদ, ৩০৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত মেবারের রাণা রত্ন ও অম্বররাজকন্যার গোপন বিবাহ অবলম্বনে রচিত। বিহারী-লালের শেষ কাব্য 'সাধের আসন'। এই কাব্যের প্রথম তিন সর্গ 'ভারতী' পত্রিকায় সন ১২৯৫-৯৬ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। 'গাথা' কাব্যের টাইটেল পৃষ্ঠায় মুদ্রিত সাল যদি নির্ভুল হয়, তবে নিশ্চিত যে স্বর্ণ-কুমারীর কাব্য 'গাথা' বিহারীলালের কাব্যের পূর্বে প্রকাশিত হয়। অতএব 'সাধের ভাসান' এই নামকরণে বিহারী-লালের প্রভাব নেই।

'সাধ্র পরিণয়ের' কাহিনী রোমাণ্টিক এবং তাতে বিশেষ জটিলতা নেই। অজিত নলিনীকে ভালবেসেছিল। কিন্তু নলিনী শৈশবেই আর একটি যুবককে হৃদয় সঁপে দিয়েছে। পূর্ব প্রণয়ী বিদেশ থেকে ফিরে এলো। নলিনীকে সে ভুল বুঝলো। অতঃপর নলিনী সন্ন্যাসিনী হয়েছে। কত বর্ষ কত মাস কেটে গেছে। শেষে একদিন অনুতপ্ত প্রণয়ী নলিনীকে এক বিজন বনে যৌবনে যোগিনীরূপে আবিষ্কার করল। সেই বিজন বনে কোথায় পুরোহিত? সেই বনের মধ্যে এক কালিকা মন্দিরের

স্বর্ণকুমারী দেবীর গাথাকাব্যের উপহারপত্র

উপহার।

ছোট ভাইটি আমার,

যতনের গাথা হায় কাহারে পরাব আর ?

স্নেহের রবিটি, তোরে আয়রে পরাই,

যেন রে খেলার ফুলে ছিঁড়িয়ে ফেলোনা ধূলে,

হয়ত ভাইটি তুই—ভাইতে ভরাই।

পুরোহিতকে তারা বিবাহকার্য সম্পাদন করতে অনুরোধ করল। তারপর,

মন্ত্রপাঠ করি, পরাইয়া মালা
বালার হাতটি স্বহাতে নিয়ে,
সম্প্রদান তাহা করিল যতনে,
বিধিমতে দিল তাদের বিয়ে।
একবার শুধু আঁখিজল কথা
একবার হিয়া কাঁপিল তাতে,
একফোঁটা তার আঁখিজল শুধু
পড়িল তখন বালার হাতে।'

১৩০২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয় স্বর্ণ-কুমারীর কবিতা ও গানের সংকলন 'কবিতা ও গান'। সংকলনগ্রন্থের মুখবন্ধরূপে যে বিজ্ঞাপন সন্নিবিষ্ট আছে, তাতে লেখিকা বলেছেন যে, 'গানের অধিকাংশই আমার অপরাপর গ্রন্থ হইতে সংকলিত, কেবল 'বসন্ত উৎসবের' সমস্ত গান ইহাতে স্থান পায় নাই; প্রসঙ্গহানি ব্যতিরেকে যে কয়েকটি গান উদ্ধার করা যায়, সেই কয়েকটি মাত্র ইহাতে উদ্ধৃত হইয়াছে। দুই একটি গান ইংরাজী ভাব লইয়া রচিত।' 'রচয়িত্রী' মুখবন্ধ রচনার স্থান ও তারিখ নির্দেশ করেছেন—মহীশূর, ভাদ্র, ১৩০২'।

সংকলন গ্রন্থটি 'ভাই'-এর উদ্দেশে নিবেদিত। কোন ভাই তার উল্লেখ নেই। রবীন্দ্রনাথ কবিরূপে এ সময়ে যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করেছিলেন। তাই, মনে হয়, গ্রন্থখানি তাঁকেই উপহৃত। উপহার একটি ক্ষুদ্র কবিতায়—

ভাই,
সামান্য এ উপহার যোগ্য নহে তব!
শুষ্ককুল দু'চারিটি, নাহি যত্ন নব;
তবু যদি লহ হবে ও পুণ্য স্নেহের স্পর্শে
সরস সুভাবে পুন হাসিবে এ সব।'

কবিতাগুলির মধ্যে কয়েকটি 'ভারতী' পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। কয়েকটি কবির বালারচনা। 'স্বর্ণকুমারীর কবিতা রচনায় অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ও বিহারীলালের প্রভাব দেখা যায়।' (বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস—ডঃ সুকুমার সেন। দ্বিতীয় খণ্ড। নবীন প্রীতিকবিতা।) রবীন্দ্রনাথের প্রভাবও অস্পষ্ট নয়। অধিকাংশ কবিতায় নারী-হৃদয়ের সহজ সরল উচ্ছ্বাস প্রকাশিত।

সংকলিত রচনাগুলিকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে—(১) কবিতা (২) গান (৩) জাতীয়সঙ্গীত ও (৪) ধর্মসঙ্গীত। কবিতার তুলনায় গানগুলিতে পরিণত কবিরের ছাপ সুস্পষ্ট। প্রত্যেকটি গানের প্রারম্ভে রাগ ও তালের নির্দেশ আছে। স্বরলিপিরও কয়েকটি গান রচিত। মল্লার কাওয়ালি রাগের একটি গান—

নিঃঝুম নিঃঝুম গম্ভীর রাতে—
কম্পত পল্লব দক্ষিণ বাতে,
পেখনু সজনি,
সুতনির রজনী,
অম্বরে চন্দ্র ন তারকা ভাতে

স্বর্ণকুমারীর ধর্মসঙ্গীতগুলির মধ্যে কয়েকটি ব্রহ্ম উপাসনা সঙ্গীত। আবার কৃষ্ণ ও শ্যামাবিষয়ক পদও আছে। মিশ্র রামপ্রসাদী সুরে রচিত 'মা বলে আর ডাকব না মা, নাম রেখেছি পাষাণের মেয়ে.....' গানে শুধু রামপ্রসাদী সুরই নয়, প্রসাদী গানের শৈলীপ্রভাবও সুস্পষ্ট।

স্বর্ণকুমারীর জাতীয়সঙ্গীতের মধ্যে কয়েকটি অপূর্ব। 'ভ-মল্লহরী' রাগের এই জাতীয়সঙ্গীতটি রবীন্দ্রনাথ ও পরবর্তীকালের সঙ্গীতকার অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জাতীয়-সঙ্গীত স্মরণ করিয়ে দেয়। 'বড় সাধ বড় আশা বড় আকিঞ্চন—। পরাতে, জননি, তোরে রত্ন আভরণ—!'

স্বর্ণকুমারী কাব্য-কবিতা ছাড়া উপন্যাস এবং বিজ্ঞানবিষয়ক নিবন্ধও রচনা করেছিলেন। ডঃ সুকুমার সেন তাঁর বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্বর্ণকুমারীর যে সকল গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন, তাছাড়া আরও অন্তত দুখানা পুস্তকের নাম পাওয়া যায়। 'ভারতী' পত্রিকার কার্যাধ্যক্ষ কর্তৃক, 'কালিয়াবাগান বাগানবাটি, অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা' হতে প্রচারিত স্বর্ণকুমারী, সত্যেন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে 'পুষ্পমঞ্জরী' ও 'পৃথিবী' নামের দুখানি গ্রন্থের উল্লেখ পাই। প্রথম-খানিতে স্বর্ণকুমারী রচিত 'বালক-বালিকাদের মনোরঞ্জক গল্প কবিতাদি' রয়েছে এবং দ্বিতীয়খানিতে তিনি 'পৃথিবী সম্বন্ধীয় বিজ্ঞানরহস্য' বর্ণনা করেছেন।

স্বর্ণকুমারী দেবীর গ্রন্থগুলি তৎকালীন সংবাদপত্রে বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়েছিল। তাঁর একখানি গ্রন্থের পরিশিষ্টে 'ওপিনিয়নস্ অব দি প্রেস' সন্নিবিষ্ট রয়েছে। ক্যালকাটা রিভিউ বলেছেন—

"We should no more hesitate to call it one of the ablest in the whole literature of Bengal".

তাঁর 'বসন্ত উৎসব' কাব্যগ্রন্থ সম্বন্ধে সমসাময়িক সমালোচকের মন্তব্য এই—

"There is no melodrama in Bengali, that we know of, which is so thoroughly chaste and sweet, so rich in charms of poetry, and, therefore, so well calculated to improve the taste of the play-going public, we have little hesitation in declaring that it will, at no distant date revolutionise the existing style of opera-writing in Bengali ..... Indian Mirror.

ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন পত্র বসন্ত উৎসবকে 'সুপিরিয়র মরাল টোন অ্যান্ড পিউরিটি অব সেন্টিমেন্টস অ্যান্ড একসপ্রেশনস'-এর জন্যে উচ্চপ্রশংসা করা হয়েছে। একখানি বাংলা পত্রিকা 'নববিভাকর' লিখেছেন—'ইহার কবিতাগুলি প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত উৎকৃষ্ট ও বিশুদ্ধভাবে পরিপূর্ণ।'

(ঘ)

মানকুমারী বসু মাইকেল মধুসূদন দত্তের সম্পর্কিত ভ্রাতুষ্পুত্রী। মানকুমারী (১৮৬৩-১৯৪৩) 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' 'কনকাঞ্জলি' 'বীরকুমার বধ' প্রভৃতি কবিতা ও কাব্য রচনা করে মহিলাকবিরূপে যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করেছিলেন। মহিলাকবিরূপে তাঁর স্বীকৃতিস্বরূপ কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ১৯০৯ সালে ভুবনমোহিনী স্বর্ণপদকে ভূষিত করে।

যশোহর জিলার সাগরদাঁড়ির নিকটবর্তী শ্রীধরপুরে তাঁর জন্ম। পিতার নাম আনন্দমোহন বসুচৌধুরী। সাগরদাঁড়ি এবং কপোতাক্ষ নদতীরবর্তী ভূখণ্ডের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং মাইকেলের কবিপ্রতিভা তাঁকে কবিতা রচনায় অনুপ্রাণিত করে থাকবে। মাইকেল স্মরণে রচিত তাঁর কবিতা 'কবির শ্মশানে' এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' মানকুমারীর প্রথম কবিতাগ্রন্থ। দ্বিতীয় গ্রন্থ 'কনকাঞ্জলি'তে সংকলিত কবিতাগুলি শৈলী ও ভাবনার বিচারে অধিক পরিণত। কিন্তু তাঁর প্রথম গ্রন্থও যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছিল। বস্তুতপক্ষে কবিরূপে আত্মপ্রকাশ করবার সঙ্গে সঙ্গেই মানকুমারী খ্যাতিলাভ করেছিলেন। 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' সংকলনে গ্রথিত 'আমার দেশ' কবিতাটি প্রথম 'নব্যভারত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। মানকুমারীর গ্রন্থের প্রকাশকের নিকট লিখিত পত্রে কবি রাজনারায়ণ লিখেছেন যে ঐ কয়েকটি পংক্তি তিনি বার বার পাঠ করে মুখস্ত করেছিলেন। ঐ পত্রে তিনি আরও লিখেছেন, 'মায়ের কুটীর' শিরস্ক কবিতা হৃদয়বিদারক। উহা পড়িবার সময় অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলাম না।' [পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্নের নিকট লিখিত রাজনারায়ণ বসুর পত্র, ৭ই কার্তিক, ব্রহ্ম শক ৬৪]

কবি নবীনচন্দ্র সেন মানকুমারীকে লিখেছেন, 'আপনার সুললিত কবিতার অক্ষরে অক্ষরে আপনার সরল সুমধুর হৃদয়ের কবিতামৃত প্রবাহিত, অক্ষরে অক্ষরে কবিতার উচ্ছ্বাস, অক্ষরে অক্ষরে ভাবুকতার তরঙ্গ'। [২১শে অক্টোবর, ১৮৯৩]

দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'কনকাঞ্জলি' প্রকাশিত হয় সন ১৩০২ সালে। 'হেয়ার প্রাইজ ফাণ্ড এসে' রূপে গ্রন্থখানি শ্রীতারাকুমার কবিরত্ন কর্তৃক প্রকাশিত হয় [কলিকাতা, ২৫নং পটলডাঙ্গা স্ট্রীট, অরুণী প্রেসে বি. কে চক্রবর্তী এণ্ড ব্রাদার্স কর্তৃক মুদ্রিত। মূল্য ১৲ টাকা, ডাকমাশুল /১০ আনা]

গ্রন্থের উৎসর্গপত্র কবিতায় লিখিত। গ্রন্থারম্ভে শ্লোক 'তস্যাহং ন প্রপদ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি।' শেষের কয়েকটি পংক্তি—

'জ্বলন্ত অক্ষরগুলা
এনেছিনু 'দিব' বলি,
ও চরণে দিতে, একি!—
হইল 'কনকাঞ্জলি'!!
আমি কি করিব প্রভো!
কি দোষ আমার তায়?
তোমার বাতাসে, ছাই—
কেন সোনা হয়ে যায়?'

'নিবেদন' শিরোনামায় 'পরমারাধ্যতম শ্রীযুক্ত কবিরত্ন মহাশয়ের শ্রীশ্রীচরণে' উদ্দিষ্ট পত্র সন্নিবিষ্ট হয়েছে। কবি লিখেছেন, 'দেব! এ জগতে ফুলের ফুটিয়াই সুখ, পাখীর গান গাহিয়াই সুখ, মানবেরও লিখিয়াই সুখ, কিন্তু ইহা ছাড়া আরও একটি কথা আছে, ফুলের শোভা ও সৌরভ যখন অপর-চিত্ত বিনোদন করে, তখনই ফুলের ফুলজীবন সার্থক হয়, বিহঙ্গসঙ্গীত যখন অপরের শ্রুতি মুগ্ধ করে, তখনই কলকণ্ঠের গান করা সার্থক হয়, মানবের কবিতাও যখন পরের হৃদয়ে আদরপ্রাপ্ত হয়, তখনই সে কবিতার জীবন সার্থক হয়।' গদ্য রচনার ভঙ্গীতে বঙ্কিমী প্রভাব লক্ষণীয়।

'প্রকাশকের নিবেদনে' 'শ্রীশ্রীতারা-মা'র দাসানুদাস শ্রীতারাকুমার শর্মা লিখেছেন—'শ্রীশ্রীতারা-মা'র চরণে সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি যে, গ্রন্থকর্ত্রীর এই সকল গাথা বঙ্গবাসীর গৃহে গৃহে কীর্তিত হউক, এবং ইঁহার স্বর্গীয় প্রতিভায় পুণ্যালোক লাভ করিয়া জীবলোক পবিত্র হউক।' [কলিকাতা, ২৫ পটলডাঙ্গা স্ট্রীট, শ্রীতারাকুমার শর্মা]

মানকুমারীর কবিতার বক্তব্যও প্রধানত রোমান্টিক। জীবন সম্পর্কে ভাবাবেগময় রোমান্টিক উচ্ছ্বাস ঊনবিংশ শতাব্দীর কবিদের রচনায় উদ্গীরিত হয়ে উঠেছিল, বলা বাহুল্য, মহিলাকবিগণের রচনা তার ব্যতিক্রম হতে পারে না। গীতিকবিতার ক্ষেত্রে এই গোটা যুগটাই উচ্ছ্বাসের, স্বপ্নের বা স্বপ্নভঙ্গের, বেদনার অবাস্তব আর্তির। তাই একালের কবিদের রচনায় স্ফূর্তি ঘটেছে গীতিকবিতায়। কামিনী রায়ের 'আলো ও ছায়া' এইকালের নারীহৃদয়ের মর্মবাণী। মানকুমারীর 'অভিনন্দন' (আলো ও ছায়ার কবির প্রতি) কবিতায় ঐ একই অনুভূতি ব্যক্ত।

মানকুমারীর কবিতা, হেমচন্দ্রের ভাষায়, 'বিশদ, উদার, গম্ভীর এবং মধুরভাবে পরিপূর্ণ।' তারাকুমারের নিকট লিখিত এক পত্রে কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, 'পুস্তকখানি পড়িয়া আমি চমকৃত হইয়াছি। যেখানেই খুলি, সেইখানেই মন আকৃষ্ট হয়। ...কবিতাপ্রিয় ব্যক্তিমাত্রেই, যিনি ইহা পাঠ করিবেন, তিনিই গ্রন্থকর্ত্রীর ক্ষমতা এবং প্রভাব অনুভব করিতে পারিবেন, এবং তাঁহার প্রতিভার ছটায় মোহিত এবং পুলকিত না হইয়া থাকিতে পারিবেন না [কবিবরে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের পত্র, ২০শে জানুয়ারী, ১৭]।

একই বৎসরে মৃণালিনী দেবীর দুইখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'প্রতিধ্বনি' প্রকাশিত হয় সন ১৩০১ সালের ১৬ই শ্রাবণ (ভূমিকার তারিখ), ঐ একই বৎসর চৈত্র মাসে প্রকাশিত হয় তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'নির্ঝরিণী'।

প্রথম গ্রন্থ 'প্রতিধ্বনির' ভূমিকায় কবি লিখেছেন, '১২ বৎসর বয়স হইতে এই ১৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত আমি যতগুলি কবিতা সময়ে সময়ে রচনা করিয়াছি, তাহার অধিকাংশ এই পুস্তকে প্রকাশিত হইল।'

প্রতিধ্বনির সূচী বৈচিত্র্যময়। কয়েকটি গান আছে, যথা—মধু চাঁদিনী রাতিতে, শরতে মধু জোছনায়, আমার কাছে এসো গো তবে, আকুল হৃদি, কে যাবি তোরা প্রভৃতি। কবিতায় লিখিত পত্র আছে (বালাসখী—শ্রীমতী কমলিনী দেবী স্নেহাস্পদেষু, ভাগলপুরে), প্রকৃতি বর্ণনামূলক কবিতা আছে 'প্রভাতে প্রকৃতি', আছে স্মৃতিপূজামূলক কবিতা 'পরম পূজনীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরলোকগমন উপলক্ষে', 'বঙ্কিম বিয়োগে ভারতমাতার আক্ষেপ' ও "সরোজিনী" (পরম পূজনীয়া পরলোকগতা অগ্রজা সহোদরাভগিনী সরোজিনীর প্রতি)। কয়েকখানি ধর্মসঙ্গীতও আছে।

দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'নির্ঝরিণী' উৎসর্গীকৃত হয়েছে স্বামীদেবের স্বর্গারোহণ চিরস্মরণীয় জন্য'। তাঁর স্বামীর মৃত্যু হয় ১৩০১ সালের ১লা জ্যৈষ্ঠ, সোমবার, দশমী তিথিতে। প্রথম কবিতাগ্রন্থের 'পত্র' কবিতা পাঠ করলে বোঝা যায় শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর সঙ্গে তখনও মৃণালিনীর পরিচয় ঘটেনি। (১২৯৯ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাস), কিন্তু 'নির্ঝরিণী' কাব্যগ্রন্থটি মৃণালিনী উপহার দিয়েছেন গিরীন্দ্রমোহিনীকে। উপহার-কবিতা নিম্নরূপ—

শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী—পূজনীয়া ভগিনী শ্রীশ্রীচরণারবিন্দেষু—

দিদি!

সারা বরষের পরে,—
আকুল অশ্রান্ত স্বরে,—
গাহিনু যে গান, মোর
এ হৃদয় নির্ঝরিণী,
সামান্য মানবভাবে—
ধীরে ধীরে ভেসে আসে—
বাহিরে, দু' একটি তার
ক্ষীণতর প্রতিধ্বনি!

* * *

এক বরষের আগে—বহিত আরেক ভাগে
এ হৃদয় নির্ঝরিণী,
গাহিত আরেক [illegible]
এক বছরের মাঝে—
স্রোতোমুখে ফিরিয়াছে,
এখন সঙ্গীতে তার
নাহিক আর সে তান।

সে উল্লাস নাহি আর—
এখন এ গানে তার,
এখন যা আছে,
বলা কে বুঝিবে তার আর?
যদি কেহ বোঝে, দিদি!
তবে ঐ তব হাসি,
তাই লয়ে আসিয়াছি
দিতে তোমা' উপহার।

চৈত্র, ১৩০১
আপনার সেই
স্নেহের মৃণাল।

মৃণালিনীর কবিতার ভাষা ও ভাব বিহারীলাল ও রবীন্দ্রানুসারী। 'সাধের আসন' 'বিরহিনীর উক্তি' 'বিদায় সঙ্গীত' 'বিশ্বদেবতা' প্রভৃতি কবিতার শীর্ষনাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। গিরীন্দ্রমোহিনীর সঙ্গে মৃণালিনীর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। আবার রবীন্দ্রনাথের ভগিনী 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদিকা স্বর্ণকুমারী দেবীর সঙ্গে গিরীন্দ্রমোহিনীর সখ্য ছিল। গিরীন্দ্রমোহিনী এবং স্বর্ণকুমারী পরস্পরকে 'মিলন' বলে ডাকতেন। এই সূত্রে মৃণালিনীও রবীন্দ্রভাবপরিমণ্ডলেরই একজন। ভাষা ও ভাবগত অনুগামিতার কথা বাদ দিলেও, রবীন্দ্রনাথের প্রতি মৃণালিনীর শ্রদ্ধা যে কতখানি গভীর ছিল তা 'নিন্দুক' (নির্ঝরিণী) কবিতা থেকে বোঝা যাবে।

নিন্দুক

(কোন বিখ্যাত কবির বিরুদ্ধে শ্লেষোক্তি পাঠ করিয়া লিখিত)

হে নিন্দুক! তুমি কেমনে বুঝিবে
কবির প্রাণের ভাষা?
বামন হইয়া ধরিতে চন্দ্রমা
দেখি যে তোমার আশা।

• • •

আসিয়াছে রাহু! কবিরে গ্রাসিতে
আসাই হয়েছে সার,
রবির প্রখর কিরণে তুমিই
পুড়ে হবে ছারখার।

• • •

পারে বাহাদুরী; হিংসুকের কাছে—
তোমার মত যে হবে;
মূর্খের ফাঁড' বলিয়া হাসিবে
সুজন, সুবুদ্ধি সবে।

(২০শে মাঘ, ১৩০১)

'বামন' 'রাহু' প্রভৃতি শব্দ উদ্দিষ্ট সমালোচককে চিহ্নিত করে দিয়েছে। কাব্য-রসিক কাব্যবিশারদ 'রাহু' এই ছদ্মনামে রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমল' প্রথম সংস্করণ (১২৯৩) সম্বন্ধে ব্যঙ্গ কবিতা লেখেন। এই ব্যঙ্গ কবিতাসমষ্টির দ্বিতীয় সংস্করণ কলিকাতা, ভবানীপুর পার্থিব যন্ত্রে, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ কর্তৃক মুদ্রিত হয়ে সন ১৩০১ সালে, প্রকাশিত হয়। এইভাবে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের সর্বপ্রথম সমালোচনা ব্যঙ্গ কবিতা দিয়ে হল।

একটি কবিতার দৃষ্টান্ত—

'উঁচুসুরে রে পাখরা কবি
খোপের ভিতর থাক ঢাকা
তোর বকবকম্ আর ফোঁসফোঁসানি
তাও কবিতের ভাবমাখা!
তাও ছাপানি গ্রন্থ হল।
নগদ মূল্য—এক টাকা!!!

• • •

চুনোগলি হার মেনেছে
মৌলিকতা দেখে
যত মুদিমালা বাংলা পড়ে!!

রবি ঠাকুর লেখে। —বাহা! (দেশ, সাহিত্য সংখ্যা, ১৯৬২, রবীন্দ্র পরিচয়-গ্রন্থপঞ্জী, পুলিনবিহারী সেন সংকলিত।)

নির্ঝরিণীর অধিকাংশ কবিতায় স্বামীহারা কবিহৃদয়ের শোকোচ্ছ্বাস প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এই কাব্য-সংকলনেও 'নিন্দুক' ও 'বিশ্বপ্রেম' বা 'কবির প্রাণের ভাষা' প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত বা তাঁকে নিবেদিত কবিতা রয়েছে। কবির সমস্ত শোকোচ্ছ্বাস রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর ভাবে সমাহিত হয়েছে। স্মিতীর কবিতায় মৃণালিনী লিখেছেন—

'তুমি—প্রেমকমলের সে সুরভি-ঘ্রাণে
হইয়া পাগলপারা,
তাই,—অধীরে ব্যাকুল খুঁজিয়া বেড়াও
আপনি আপনহারা।
যেন,—নাভির সুরভে পাগল হরিণ
ছুটিয়া বেড়াও বনে,
আছে,—আপনাতে তাহা ভ্রমেও সাধের
উদয় হয় না মনে।

• • •

আমি,—বুঝেছি তোমায়, বুঝি তোমার
ও অসীম প্রেমরাশি!
তাই,—নিতে উপহার, এনেছি আমার
প্রেম, ভক্তি, অশ্রু, হাসি।

(চৈত্র, ১৩০১)

উপর্যুক্ত কবিতার ভাব, ভাষা ও ছন্দের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কবিতার সাদৃশ্য লক্ষণীয়। (যথা, 'আমি জগৎ ভুলিয়া যেতাম গাহিয়া আকুল পাগলপারা', 'আমি পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি আপন গন্ধে মম/কস্তুরীমৃগ সম')। মৃণালিনীর অন্য একটি কবিতা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। 'হাসি' কবিতাটি ('গ্রন্থের শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের রাজর্ষি' উপন্যাস।) রাজর্ষি উপন্যাসের বালিকাকে উপলক্ষ্য করে লেখা। কবিতার শেষ স্তবকে রাজর্ষি উপন্যাসের স্রষ্টার উদ্দেশে কবি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন এইভাবে—

'যে গড়েছে এই করুণা প্রেমের
মধুর ভক্তিস্থ ছবি,—
অনন্ত প্রেমের পাইয়া আস্বাদ
অমর সে মহাকবি।'

(হাসি। নির্ঝরিণী,
৪ঠা আশ্বিন, ১৩০১)

ঊনবিংশ শতকের মহিলা কবিদের রবীন্দ্রানুগামিতার এক লক্ষণ তাঁদের কাব্যে উদার মানবিকতা ও স্বদেশপ্রীতির উন্মেষ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যে মানুষের প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা ও স্বদেশের প্রতি গভীর অনুরাগের স্বাক্ষর রেখেছিলেন। সমাজ-সচেতন মহিলাকবিদের হৃদয়েও তা সঞ্চারিত হয়েছিল। অবশ্য এই মানবিকতা ও স্বাদেশিকতার পূর্বসূত্র রয়েছে ঊনবিংশ শতাব্দীর নেনেশ্বর মধ্যে। রবীন্দ্রনাথে তার পুষ্টি। এই সার্বিক জাগরণ নারীসমাজেও তীব্র আলোড়ন তুলেছিল। রবীন্দ্রসেবিত সাহিত্যের মধ্য দিয়ে ঊনবিংশ শতকের মহিলাকবিগণ মুক্তচিত্তে কবিতার জগতে বিচরণ করতে পেরেছেন।

এই আলোড়ন নারীসমাজের বন্ধনমুক্তি ঘটিয়ে তাকে সংস্কারমুক্ত করতে প্রয়াস পেয়েছিল। ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে তাদের পরিচয় ঘটেছে। ইংরেজ কবিদের ভাবনা তাদের ওপর ছায়া ফেলল। স্বর্ণকুমারী ইংরেজ কবি মুরের অনুবাদ করেছিলেন, মৃণালিনী ওয়ার্ডসওয়ার্থ (আমরা সাতটি) এবং হেমাঙ্গ হেমান্সের (বালকের লোক। কবিতার অনুবাদ করেছিলেন।

সংস্কারমুক্তির এই মহাক্ষণে প্রাচীন সমাজের নীতিমালা তাদের কবি-ভাবনাকে শৃঙ্খলিত করতে পারেনি। স্বর্ণকুমারী 'আজ ভোর' (সৌন্দর্যলোকের প্রতি প্রেম), চুপ চুপ' (কণ্ঠের প্রতি দেবযানী), 'কি বোঝ তোমরা' (অজ্ঞানের প্রতি জ্ঞানকুমারী উল্লুপী) প্রভৃতি কবিতা লিখেছিলেন। এই সমস্ত কবিতার নায়ক-নায়িকাদের প্রেম সমাজনিষিদ্ধ হলেও তা মহিলাকবিদের কবি-ভাবনাকে অনুপ্রাণিত করেছিল। জ্ঞান-কুমারী বসু আরও দুঃসাহস দেখিয়েছেন। তাঁর প্রোতের ফুল (কলকাতলি) 'একটি পতিতা অপঘাতমৃত্যু রমণী দর্শনে লিখিত'। কবিতাটি বহুল বর্তমানকালের বিচারেও একান্ত দুঃসাহসিক—

"আমাদের ভয়ে ফুল যদি ভেসে যায়
যদি অনুতাপী পাপী প্রীতি নাহি পায়,
বৃথা গান ধর্মগীতি
বৃথা জ্ঞান 'বিশ্বপ্রীতি'
আমাদের এ জীবন বৃথা এ ধরায়!
আয় তোরা বাঁচি মরি
ঝাঁপ দিয়া জলে পড়ি,
বাঁধিয়া আনিব ফুলে স্নেহমমতায়।

মানকুমারীর 'প্রতাপ' (স্বর্গত বঙ্কিম-চন্দ্রের চন্দ্রশেখরের প্রতাপ। কবিতায় প্রতাপ-শৈবলিনীর প্রেমমহিমা সংকীর্তিত।

উদার মানবিকতা, সংস্কারমুক্ত ভাবনা ও সমাজহিতৈষণা তিন কবিরই বৈশিষ্ট্য। 'নির্ঝরিণী' কাব্যের মুক্তোৎসব কবিতায় মৃণালিনীর এই বৈশিষ্ট্য ব্যক্ত হয়েছে ফরিদপুরের বৈদ্যুবিপাকের উল্লেখ করে মৃণালিনী লিখেছেন—

মাগো তোর তনয়ার, রেখেছিস কিবা আর,
সুধসাধ নিয়েছিস চুরে;
সব তুই দিয়েছিলি, এরি মাঝে কেড়ে নিলি,
এবে এই ধরণী উপরে
আর মোর কিছু নাই, স্বজনে ভগিনী ভাই
ইহাদেরই মুখ চেয়ে আছি
এদের দেখিলে দুখ, বিদরে যেন রে বুক
তাই তোর ক্রোড়ে এই যাচি।

CENTRAL LIBRARY

গন্ধারী

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

শনিবার সুতরাং বিলাস সকাল সকাল বাড়ী ফিরেছে। বগলে একটা বড় প্যাকেট। আরতি হাসিমুখে এগিয়ে এলো : বাঃ আজ বেশ তাড়াতাড়ি এসেছো। কি আনলে গো? দেখি।

বিলাস আরতিকে এড়িয়ে ঘরে ঢুকতে বোলো—তুমি বড় বিরক্ত কর। দেখছো খেটে-খুটে জর্জর, আগে একটু জিরোতে দাও। এখনও ভদ্রতা শিখলে না।

আরতি লজ্জায় চুপসে গিয়ে বলে—না-না আমি বুঝতে পারিনি, তোমার শরীর খারাপ। ভুল হয়ে গেছে কিছু মনে কোরো না।

বিলাস ইজিচেয়ারে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল। আরতি একটা হাতপাখা এনে আস্তে আস্তে হাওয়া করতে লাগল।

আরতির স্পর্শে বিলাসের বিয়ে-থা বেশীদিন না হলেও, বেশ কিছুদিন হয়েছে; কিন্তু তাদের ব্যবহারে চালচলনে, কোথায় যেন একটা ফাঁক হয়ে গেছে। স্নেহ, প্রীতি, ভালবাসা ইত্যাদি তাদের দুজনকে এখনও যেন নিঃশেষে মিলিয়ে দিতে পারে নি। সংকোচের একটা বিরাট ব্যবধান দুজনকে পৃথক করে রেখেছে।

বিলাস চোখ বুঁজিয়ে বেশ একটু কর্কশ-ভাবেই বলে, মাথাটা টিপে দাও। স্নেহের দাবী নয় যেন একটা প্রচণ্ড আদেশ।

আরতি পাখা রেখে মাথা টিপতে লাগল।

—জোরে, জোরে। বিলাসের যেন তাতেও আরাম হচ্ছে না।

—আরো জোরে। বিলাস ভুরু কুঁচকে আদেশটা ছুঁড়ে দিল।

আরতি তার রোগা হাত দিয়ে যতদূর সম্ভব জোরে জোরে টিপতে লাগল। পরিশ্রমের বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠলো কপালে।

বিলাস হঠাৎ খাড়া হয়ে উঠে বসল—তোমার হাত দুটো দিন দিন যেন লোহার-

কুলীনের মত খস্ খসে হয়ে যাচ্ছে। থাক আর দিতে হবে না।

আরতি হাঁপাতে হাঁপাতে থেমে যেতে বলে, কি করব বল, বাসন মাজতে মাজতে জল তুলতে তুলতে হাত দুটো অমন হয়েছে। আগে ও রকম ছিল!

বিলাস তিড়িংবিড় করে উঠলো—তোমার ঐ এক কথা। খোঁটা দিতে পারলে আর ছাড়ো না। আমার অবস্থায় কুলোচ্ছে না, তাই কি রাখতে পারি না। এই কথাটা সময়ে অসময়ে তুলে খোঁটা দিতে পারলেই তোমার শান্তি।

আরতি কাপড়ের আঁচল দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে, ভয়ে ভয়ে বলে— না না আমি সত্যিসত্য ভেবে বলিনি। সত্যি বিশ্বাস করো।

বিলাস কিছুমাত্র নরম না হয়ে বলে—তা ছাড়া কি? থেকে থেকে তোমার ঐ এক কথা। আমি কি কিছু ভাবি? তোমার হাত কবে নরম ছিল? মধ্যবিত্ত ঘরের বৌ-ঝিরা যেখানে যত তোমার তার চারি ভাগ কাজ করেও কেমন সুন্দর, তাদের একটা লাবণ্য আছে। তাকিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে। আর তোমার!

আরতি শোনাই যায় না এমনি মৃদু কণ্ঠে বলে—সে কি আমি অস্বীকার করছি।

আমি তো বলছি আমাকে দেখতে সুন্দর নয়। তুমি দয়া করে বিয়ে করেছ।

—কি, কি বলল, এক মুহূর্তও কি বাড়ীতে শান্তিতে থাকতে দেবে না। যখনই আসব এই চুলোচুলি। বিলাস রেগে উঠে পড়ল—ঠিক আছে আমি চললুম। ঘরের চে আমার রাস্তাই ভাল। অনেক শান্তি।

আরতি ভয়ে দৌড়ে এসে পথ আটকে দাঁড়ালো—না না যেয়ো না। এই দেখো তিন সত্যি করছি, আর যদি কখন কোন কথা বলি। আমার অন্যায় হয়েছে। তুমি বস চা, কলঘরে যাও।

বিলাস কোন উত্তর দিল না। একে একে অফিসের ধকলটুকু খুলতে লাগল। আরতি ইতিমধ্যে স্টোভ জেলে ফেলেছে। তৈরী হবে লুচি আর আলুভাজা। বিলাস বাথ-রুমের চৌবাচ্চায় চান সেরে ঘরে এল। আরতি একবার আড়চোখে দেখে নিয়ে ভয়ে ভয়ে বলল—তোমার সাবানটা আজকে একটু দেবে? অনেকদিন সাবান মাখিনি।

—বাঃরে, তোমাকে তো ৩ মাসে একটা সাবান এনে দিয়েছি।

—ওমাসে নয়তো, তারও আগের মাসে।

—ওই একই হোলো।

—একটা সাবান তিন মাসের বেশী চলে না।

—তোমার সাবানের খরচ জোগানো আমার সাধ্যের বাইরে। একটা জমিদারী থাকলে ঢেলে করে দেখতুম, তা যখন নেই পাশেই গা ধোও।

বিলাস তার নিজের ভালো সৌখীন সাবান আলমারীতে চাবি দিয়ে রাখল। আরতি দ্বিতীয় আর কোন কথা না বলে আপন মনে লুচি ভাজতে লাগল। বিলাস ভালো জামা কাপড় পরে ইজি চেয়ারে এসে বসল। বেশভূষা অতিশয় সৌখীন। মিহি ধুতি, গিলে পাঞ্জাবি। কানে আতর। মুখে কিছু স্নো এবং পাউডারের প্রলেপ।

—ওকি হচ্ছে? বিলাসের আকস্মিক প্রশ্নে আরতি চমকে মুখ তুলে তাকালো।

—বেলা তোমার লুচি ভাজছি তো।

—কখন খাবে শুনি। ও তো তুমি পঞ্চাশজনের মত ভেজেছ। তোমার মত লক্ষ্মী হাত গরিবের সংসারে চলে না। কতদিন বলেছি ঐ একটিন ঘিয়ে পুরো মাস চালাতে হবে। সারাদিন অফিসে মাথার কাজ। সারা মাস একটু ঘি খেয়ে সামলে নেবো, তোমার জন্যে তারও উপায় নেই। ধুমধাড়াক্কা সাতদিনেই সব শেষ করে বসে দেখছি।

—তুমি যেন কি? এই তো মাত্র তোমার মত বারোখানাই ভেজেছি। আরতি একটু হাসবার চেষ্টা করল। বড় করুণ আর ফিকে।

—একটু বুঝতে শেখো। সারাদিন যারা মাথার কাজ করে তাদের একটু করে ঘি না খেলে চলে না। যারা বাড়ী বসে থাকে, মাথার কাজ করে না তাদের শাক-পাতা যা হোক খেলেই চলে—বুঝেছ।

—সে তো আমি বুঝি। আমার জন্যে আর কবে লুচি ভেজেছি।

—ঐ, ঐ দেখ। ঠিক বোকা রাস্তায় গেল। মেয়েদের আর কিছুতেই সন্তুষ্ট করা যায় না। যা পাচ্ছো তা অনেক বাড়ীতেই মিলবে না। একটু লুচি খাচ্ছ, অমনি হিংসে। তাও সখ করে নয় নিতান্তই স্বাস্থ্যের জন্যে। আশ্চর্য!

—কি বলছ তুমি? তোমার মন এত নীচু! আমি কি বললুম আর তুমি কি মানে করলে।

—ঠিকই বুঝেছি। তোমার মনের কথা আমি বুঝি না! এতদিন ঘর করছি।

আরতি আর কথা না বাড়িয়ে, বিলাসকে খেতে দিল। নিজের ভাগে জুটলো এক কাপ চা।

—এই দেখো। বিলাস একটু শ্লেষের হাসি হেসে বলল। আরতি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল—কি হয়েছে?

—তোমাকে হাজার দিন বলেছি, এত বড় বড় কাপে পুরো এক কাপ চা দেবার কোন দরকার নেই, সেই এক কাপ চা!

—ভাবলুম তোমার শরীর খারাপ, তাই একদিন দিয়েছি।

—তোমার নিতে আর কি? রোজগার তো আর করতে হয় না। এদিকে মাসে মাসে চায়ের খরচ জোগাতে আমার জিভ বেরিয়ে যায়।

—ঠিক আছে আমি চা খাওয়া ছেড়েই দেবো। তাহলে তোমার খরচ বেঁচে যাবে।

—ঐ কথায় কথায় অভিমান। বাপ-মা তো আর সংসার কি করে চালাতে হয় শেখান নি, খালি নাচতে আর গাইতে শিখিয়েছেন।

—সব দেখে শুনেই তো বিয়ে করেছিলে।

—সামান্য ভদ্রতাও তো শেখো নি। অনবরত মুখে মুখে জবাব আর তর্ক।

বিলাস বাইরে বেরিয়ে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছিল।

আরতি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল—তুমি বেরিয়ে যাচ্ছ? এখুনি আসবে তো?

—কেন?

—বাজার ফুরিয়েছে। বাজার না করলে রান্না হবে না। বিলাস কোন উত্তর না দিয়েই চট, চট করে বেরিয়ে গেল।

শনিবার, শনিবার ক্লাবে জোর আড্ডা হচ্ছে। নাটুকে দল ভাড়া করা মেয়ে এনে রিহার্শাল দেয়। বিলাস সটান সেখানে গিয়ে হাজির হল। সবরা হৈ হৈ করে উঠল—

—আরে এসো এসো, ঠিক সময়ে এসেছ ব্রাদার। পাঁচটা টাকা জলদি ছাড়ো দেখি।

—কি হবে টাকা?

—আরে বাদর টাকাতে কি না হয়!

চিন্তা পাটি মনস্থ করবার ফাঁকে একবার আড় চোখে বিলাসের দিকে তাকালো। তারপর একটু সার এসে বলল:

—টাকার কি হবে আমার কাছে শুনবেন।

—বলুন। বিলাস এবারকার ফোন একেবারে যেন গলে গেল।

—আজ শনিবার জানেন তো?

—খুব জানি, ঘড়ি যা বারবেলা ছেপেছিল।

—ও তাই নাকি?

—হ্যাঁ, শেষ পালিশ এসে বসি।

—ও হো, বেটি বুঝি সিনেমার আবদার ধরেছিলেন। বাক শুনুন, আজ শনিবার, সবাই চাঁদা দিন একটু ভোজের ব্যবস্থা করা যাক।

—উত্তম প্রস্তাব। তা পাঁচ টাকাতেই হবে তো?

—দশ টাকা দিলে অবশ্য আরো ভাল হয়।

—তা দিন না। বিলাস এক কথায় লাট্ করে দশ টাকার একখানা নোট বুক পকেট থেকে বার করে চিত্তার হাতে গুঁজে দিল।

—হুররে। থ্রী চিয়ার্স ফর বিলাস চন্দ্র। চীৎকারে ঘর ফেটে গেল।

বিলাস সিগারেট ধরিয়ে এক কোণে ব্রিজ খেলতে বসে গেল। দেখতে দেখতে খেলা বেশ জমে উঠল। ভদ্কার পেলোয়াড়দের ভালোমন্দ হাঁড়ির কাঁটা ঘন্টে চক্র পাকে পাকে।

রাত তখন অনেক। বিলাস বাড়ী ফিরল, লুচি, কষা মাংস আর রামড়ার চোঙার তুলতে তুলতে। বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে একটু ব্র্যান্ডি খেয়েছিল। বেশ একটা মৌতাতী নেশা হয়েছে। শরীর গরম, মনও বেশ শরিফ। গুন গুন করে গান গাইতে গাইতে ঘরে ঢুকলো।

আরতি জানলার গরাদে মাথা রেখে, অন্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়ে আকাশ-পাতাল ভাবছিল, ঘাড় না ফিরিয়েই জিজ্ঞেস করল—এত রাত হল?

—হ্যাঁ তা একটু হল, কি করা যাবে?

—রাত যে এদিক ওদিক করিয়ে জল হয়ে গেল।

শ্রীঅনিলচন্দ্র
কাশী
বেনারসী ও সিল্ক শাড়ী
৬২ হ্যারিসন রোড (দোতলা) কলিকাতা

—মাত্র দে। আমি আর খাবো না, খেয়ে এসেছি।

—সাঁচা! ভাল হয়েছে। আজকে যা অখাদ্য রান্না হয়েছে তুমি খেতে পারতে না।

তাড়াতাড়ি আলো নিভিয়ে দও, আমি এখনি শুতে চাই।

—বাড়ীও তুমি তো ভাল মন্দ খেয়ে এসে আমি দুটি পিণ্ডি গিলি নি।

বিকাশ জামা-কাপড় ছাড়ছিল, ঘাড় নাড়িয়ে বল—হাঁ আমার সংসারের সামান্য জিনিস তো তোমার আছে পিণ্ডিই তবে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার তো এর করতে হয় না। তোমাকে আমি আজ সাফ বলে রাখছি এর চে ভাল সাজ-স্বচ্ছন্দ যদি তুমি আর কোথও পাও, বিনাদ্বিধায় তুমি চলে যেতে পার।

—ইস্, তুমি কি ভেবেছ যা তা বলছি ছি।

—ঠিকই বলছি। তোমার মনের কথা বুঝতে পারি না। মেয়েদের পরীক্ষায় অনেকের সততা আর চরিত্র পরীক্ষায় অনেকের ভাল উৎরে—নির্দ্বিধায়।

—তুমি কি তাই আমার পরীক্ষা করছ। আজ দু' বছর হল একখানা কাপড় দাও নি। আমি ছেড়া আর ময়লা কাপড় পরে ঘরে বসে থাকি, কোথাও যেতে পারি না। ও বাড়ীর গিন্নি এসে কত কথা বলে—তোমার স্বামী এতবড় চাকরে, তুমি এমন ছেড়া ময়লা কাপড় পরে থাক কেন? আমি কেন রকম কাটিয়ে দি—ভাল কাপড় তোলা আছে দিদি। কাজকর্ম এত ভাল কাপড় পরে আর কি হবে।

বিনা অস্ত্রোপচারে
অর্শ থেকে
আরাম পাবার
জন্য
হ্যাডেসা
মলম
ব্যবহার করুন!

—খানিও তোমার মহাভারত। ওর বাবোটার সময় ঘরে ঢুকে আর ভাল লাগে না।

—খামখা কেন? তুমিই তো আরম্ভ করলে। এই সেদিন তুমি নিজের জন্যে এক জোড়া ভাল কাপড় এনেছ আমার আজ এনেছো আর এক জোড়া। এদিকে আমার কাপড় আর সেলাই করে কুলিয়ে চলছে না।

—ও এবই মধ্যে প্যাকেট খুলে দেখা হয়ে গেছে। আর হিসেব জানতে আরম্ভ করেছ।

—খুলে দেখতে যাব কেন। ঐ তো দেখাই যাচ্ছে ছেঁড়া প্যাকেটের ফাঁক দিয়ে।

—বাইরে ভদ্র সমাজে মিশতে গেলে, ফরসা ভালো জামা-কাপড় না পরলে মান থাকে না—সে বুদ্ধি তোমার আছে?

—পর না কে বারণ করছে। কিন্তু তোমার তো ঐ দশখানা কাপড়। আমি আমি বলেই বল—এ-মাসে বড় টানাটানি চলছে মাসে। তার মানে তুমি আমায় পরীক্ষা করতে চাও। আজ কতদিন সিনেমা দেখি নি' কতদিন একটু ভাল যাই নি। তুমি তো রোজই বাইরে বেশ ভালো ভালো খেয়ে আস।

বিকাশ আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল সারা রাত তুমি ভোগিল কর। আমাকে এখন ঘুমুতে দাও, সারাদিন খাটুনির পর।

ঘর অন্ধকার হয়ে গেল। তবুও আরতি জানালায় আরতির ছায়া মূর্তি জানালার ধারে নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইল।

—তাহলে তুমি আমাকে খেতে দিতে না আজ, বেশ।

আরতি অন্ধকারেই ভাতের হাঁড়িতে এক ঘটি জল ঢেলে দিয়ে এল। হঠাৎ পাশের বাড়ীতে সকলে এক সঙ্গে সজোরে কেঁদে উঠল। আরতি তাড়াতাড়ি জানালার ধারে এসে দাঁড়াল। বিলাস বিছানায় একটু উসখুস করে অবশেষে জিগেস করল—

—কি হল ও বাড়ীতে?

—জিতেনবাবুর বৌ ভুগছিলেন। বোধ হয় এক্ষুনি মারা গেলেন। ঐ তো বাড়ীর সামনে ডাক্তারের গাড়ী দাঁড়িয়ে। আহা এই সেদিন বিয়ে হয়েছিল।

—এ। যাক ভদ্রলোক বেঁচে গেলেন। আবার একটা বিয়ে করলেই হল। জানালাটা বন্ধ করে দাও।

—কেন থাক না বোধ।

—না, ও-সব প্যান-প্যানানি রাত দুপুরে ভাল লাগে না।

আরতি জানালাটা বন্ধ করে দিয়ে ওপাশের জানালার ধারে সরে গেল। তার মনটা কেমন যেন ধু-ধু হু-হু করছে। ফুটফুটে সুন্দর বৌটা এই তো কেমন চলে গেল। জিতেনবাবু তো প্রাণের চেয়ে ভালবাসতেন শোনা যায়। কই ধরে রাখতে পারলেন।

ওপাশের বড় তিনতলা বাড়ীর জানালায় আলো জ্বলে জ্বলে উঠছে। ঐ ঘর থেকে হঠাৎ তবলার চেহাই আর ঘুঙুরের ঝম ঝম শব্দ ভেসে এল, সঙ্গে সঙ্গে বাদ্য যন্ত্রের ঐকতান।

—ও কি! কিসের আসর হচ্ছে ওখানে, বলল।

—ঐ তিনতলার বাড়ীটার সেই কিনারায় নাচিয়ে মেয়েটা থাকে না? আজ দেখ না বাড়ীটার সামনে কত বড় বড় গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। কত বড় বড় লোককে যে মেয়েটা নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে।

—জানালাটা বন্ধ করে দাও

—থাক না, বেশ হাওয়া আসছে।

—না ওসব গায়ে ঢুকলে বেলেল্লাপনা চলবে না। বন্ধ কর, বন্ধ কর।

আরতি জানালাটা বন্ধ করে সরে এল। ঘরের ভেতর মশা, আরশোলা, আর মৃদু সঙ্গীত একই সঙ্গে ভেসে বেড়াতে লাগল।

—নাও এবারে আলোটা জ্বেলে চট্ করে খেয়ে নাও।

—নাঃ আজ আর খেতে ভাল লাগছে না। মাথা ধরেছে। তাড়াতাড়ি ভাতেও জল ঢেলে দিয়েছি। আর খাব না। আরতি পা গুটিয়ে মশারির ভেতর ঢুকে পড়ল।

—আজ সারাদিন ভয়ানক ঘোরাঘুরি গেছে।

—কেন অত ঘোরালে? আরতি বিলাসের কপালে হাত রাখল।

—আর বল কেন? মাথাটা একটু টিপে দাও না।

আরতি নিঃশব্দে মাথা টিপতে লাগল। বাইরের নানা রকম শব্দ ঘরে ভেসে আসছে। উচ্চকিত হাসি, মর্মন্তুদ কান্না, আবার সেতারের মুখে ভৈরবী ঘুঙুরের তাল বাদ্যযন্ত্রের সম্মিলিত আঘাত। সব পাশাপাশি অতান্ত সুস্পষ্ট।

রাত বাড়তে থাকে। আরতি আর মাসে আর প্রবৃত্তি হয় মিলেমিশে। বিলাসের মধ্যেও এক কনফ্লাট শুরু করে দেয়। স্বামী হিসেবে আরতির কাছ থেকে তার যাবতীয় সব পাওনা আদায় করে নেয়। ছাড়ে না কিছুই। রাত গড়িয়ে চলে, অন্ধকার চন্দ্রাতপের তলায়। ক্লান্ত বিলাস এখন ঘুমে অচেতন। আরতির চোখে ঘুম নেই। তার ভাবনা কেবল সাংসারিক সুখ-দুঃখ আর হাসিকান্নাকে ঘিরে পরিবৃত হয়। পরিপূর্ণ একটি সংসারের, শান্তি দিয়ে ঘেরা সুখের একটি সংসারের ছবি যেন সোনার হরিণের মত তার সামনে দিয়ে পালিয়ে যেতে চায়।

এক সময় শেষ রাতে হয়ত একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল, বিলাসের ধাক্কায় ধড়মড় করে উঠে বসল।

—নাও নাও ওঠো। মনে নেই আমাকে আজ সকালেই বেরোতে হবে।

আরতি চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে পড়ল। চোখ দুটো লাল হয়ে জ্বালা করছে। শরীরে যেন তার কোন শক্তি নেই। স্রেফ মনের জোরে চলছে। সে একটু অবাক হয়ে প্রশ্ন করল—

—আজ তো রবিবার!

—হ্যাঁ রবিবারই তো, আজ আমাদের ডাক্তার-চিকিৎসকদের স্টীমার পার্টি আছে না!

—আজ আর যাব না। চল আমরা দুজনে কোথাও একটু ঘুরে আসি। অনেকদিন এক সঙ্গে বেরোই নি।

—ওসব বাজে কথা রাখো। চট্ করে একটু চা করে দাও। বিলাস ব্রাস করতে করতে মুখ ধুতে চলে গেল।

আরতি চোখে মুখে একটু জল দিয়ে নিল। চোখ দুটো ভীষণ কড়কড় করছে। মনে মনে ভাবল চোখ দুটো একবার ডাক্তারকে দেখালে হয়। প্রায়ই মাথা ধরে, একটু পড়াশোনা করলেই জল গড়ায়, ঝাপসা দেখে। কাল রাতে খোলা জানালার পাশে অতক্ষণ না দাঁড়ালেই হত। ঠাণ্ডা লেগে গেছে।

এখুনি স্টোভ ধরাতে হবে। বিলাসের না চাই, ডিম সেদ্ধ চাই, টোস্ট চাই। এখুনি সে বেরোবে। স্টোভ নেড়ে দেখল তেল আছে, চলে যাবে। স্পিরিটের শিশি খালি। বড় শিশিটা উঁচু তাকে তোলা আছে। তার হাত পায় না। বিলাসের জন্যে অপেক্ষা করতে হলে দেরি হয়ে যাবে। আর দেরি মানেই গালাগাল। পায়ের আঙুলের উপর ভর দিয়ে দেহটাকে যতদূর সম্ভব উঁচু করে আরতি স্পিরিটের শিশিটা নাগালের মধ্যে পেতে চাইল। হাত লেগে পাশের একটা ছোট্ট শিশি কাত হয়ে গড়িয়ে পড়ল। আলগা কাঁচের ছিপি ঠিকরে পড়ল মেঝের উপর। শিশির তরল-পদার্থ তাক থেকে গড়িয়ে আরতির কপালে, সেখান থেকে তার দু' চোখে।

অসহ্য জ্বালায় আরতি চিৎকার করে উঠলো।

বিলাস বাথরুম থেকে জিগেস করল—কি হল?

—শিগ্গির এস, আমার চোখে কি পড়েছে?

—কি আবার পড়ল। জ্বালাতন!

বিলাস কাজ সেরে ঘরে এল—কই কোথায়। আরে এ তো কার্বলিক এ্যাসিড। সর্বনাশ!

—চোখ দুটো জ্বলে যাচ্ছে। কি হবে গো! একবার দেখ না।

—একবার দেখ না! সাত তাড়াতাড়ি ওখানে কি করতে গিয়েছিলে? নিজের নাক কেটে অপরের যাত্রা ভঙ্গ করা। কোথায় চা খেয়ে তাড়াতাড়ি বেরোবো।

—না না তুমি চলে যাও। সার হয়ে যাবে হয়তো।

—চোখে জল দাও।

আরতি হাতড়ে হাতড়ে বাথরুমের দিকে চলে গেলো। বিলাস কাপড় হয়ে পড়ল সাজগোজ নিয়ে। ধোপ-দুরস্ত ফাইন জামা-কাপড়, চকচকে জুতো, রুমালে সেন্ট।

আরতি হাতড়ে হাতড়ে ফিরে এল। জল দেওয়ার ফলে জ্বালা আরো বেড়ে গেছে। কপালের উপর চামড়া পুড়ে কুঁচকে হলদে হয়ে গেছে।

—কমলা! বিলাস কোট ঠিক করতে করতে জিগেস করল।

আরতি দাঁতে দাঁত চেপে বলল—অনেকটা। যন্ত্রণায় তখন আর অন্য কিছু নিয়ে কথা বেরোচ্ছে না।

—নারকেল তেল লাগিয়ে দাও, আর চোখ বুজে চুপ করে সারাদিন শুয়ে থাকে। আমি চল্লুম। দেরি হয়ে যাচ্ছে।

বিলাস বেরিয়ে গেল তার পিকনিকে।

সন্ধ্যে পেরিয়ে রাত নামল। তারায় ভরা আকাশ তখন ঝিম ঝিম করছে চারপাশে। বিলাস ফিরে এল। সারা দিনের হৈ হুল্লোড়ে আরতির কথা তার মনেই ছিল না। বাড়ীর সামনে আসতেই পাশের বাড়ীর এক ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন—

—এই যে বিলাসবাবু, আপনার সঙ্গে একটা কথা ছিল।

বিলাস অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। ভদ্রলোক ধীরে ধীরে গুছিয়ে বলেন—

—আপনি চলে যাবার পর, আপনার বাড়ীতে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে। মানে আপনার স্ত্রী তাকের উপর থেকে কি পাড়তে গিয়েছিলেন এমন সময় তাঁর চোখে এ্যাসিড পড়ে যায়। আমার স্ত্রী গিয়েছিলেন আপনার বাড়ীতে। তিনিই প্রথম খবরটা জানতে পারেন। তারপর আমরা সবাই মিলে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেছি।

বিলাস হতভম্ব হয়ে প্রশ্ন করল—আমি চলে যাবার পর ঘটেছে?

—হ্যাঁ। আপনার স্ত্রী যখন ঠিক আপনি বেরিয়েছেন আর সেই সময়।

—ও।

—আপনি একবার দেখে আসুন। ডাক্তার বলছিলেন বড় দেরি হয়ে গেছে। আর একটু আগে জানলে হয়ত চোখ দুটো বেঁচে যেত।

কেউ বলেন ঃ ভূত আছে
কেউ বলেন ঃ ভূত নেই

এ-বিষয়ে গভীর গবেষণা করেছেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

দেবতাদের সম্পর্কে আছে কতশত পুরাণ।
তবু দেবতাদের অস্তিত্ব নিয়েও দ্বিমত,
অথচ ভূতদের নিয়ে কোন পুরাণ নেই;
তাই

ভূতপুরাণ

(লেখকের জন্মদিন উপলক্ষে সদ্য প্রকাশিত)

মূল্য চার টাকা মাত্র

লিখে সেই অভাব পূরণ করলেন তারাশঙ্কর। এ বই-এর ছবিও এঁকেছেন তিনি। ভূতেরা আপনার শত্রু নয়, পরম মিত্র। ভূতের রাজ্যের খবর পেতে হলে, ভূতের সঙ্গে ভাব করতে হলে 'ভূত-পুরাণ'ই আপনার একমাত্র সম্বল। অশেষ যত্নে প্রকাশিত।

শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিঃ

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড । কলিকাতা-৯

বিলাস আবার ফিরে চলল সে পথে এসেছিল সেই পথে। একটা খালি ট্যাক্সি আসছিল, উঠে বসল। হাসপাতালের বিরাট হলঘর। সারি সারি বিছানা। বিচিত্র রোগের পসরা সাজিয়ে রোগীরা অপেক্ষা করে আছে। প্রত্যেকের স্বতন্ত্র চিন্তা আর বেদনার কুহকমায় ঘরের আলো কেমন যেন ম্লান অবচ্ছায়া হয়ে গেছে।

বিলাস টিনের চেয়ারটা সরিয়ে এনে আরতির বিছানার পাশে বসল। তার কপাল আর চোখ তুলোর পুরু ব্যান্ডেজ বাঁধা।

—কে এলে।

বিলাস নীচু গলায় বলল—আমি। এখন কেমন আছ।

—ওই আছি এক রকম। আরতি মুখে ফিকে হাসি। তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল—বোধহয় অন্ধ হয়ে যাব। তখন কি হবে বল ত?

—কি আবার হবে। দেখতে পাবে না।

আরতি বিলাসের জবাব দেবার ধরণ দেখে চুপ করে রইল। কিন্তু অদ্ভুত চিন্তা তাকে আবার সবাক করে তুলল।

—এখন হবে জানলে, তোমাকে সেব বারের মত ভাল করে একবার দেখে নিতুম। আর তো তোমাকে দেখতে পাব না। কি গো। চুপ করে রইলে। ভাবছ বোধহয়, অনেক খরচ হয়ে যাবে তোমার। এই হাসপাতাল, ডাক্তার, ওষুধ।

বিলাস যেন একটু চমকে উঠল—না না কি যা তা বলছ। তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে ওঠো।

—ভাল হয়ে উঠলেও তোমার কোন কাজেই তো আমি আর লাগব না। আমি তো অন্ধ হয়ে যাব।

—সে দেখা যাবে।

—তুমি বরং আর একটা বিয়ে কর।

—হ্যাঁ ওসব এই নির্ভর আশ্রয়ে থেকে কল্পনা করতেই ভাল লাগে। একটা বিয়ে করেই হিম-সিম আবার আর একটা করে না খেয়ে মরি।

—আমি না হয় ভিক্ষে করে খাব।

—ওসব তোমার মনের আশঙ্কা। আমার মনটাকে যাচাই করে দেখছ। করলে কি তোমার সত্যি ভাল লাগবে।

—কেন লাগবে না। তুমি সুখী হও এই আমি চাই।

—বাজে বোকো না, চুপ করে শোও।

—আমার বোধহয় মরে যাওয়াই ভাল। এ জীবন আর কি কাজে লাগবে?

—ভুল হতে পারে; কিন্তু তুমি মরবে না। যাক আমি এখন চলি। আসার কাল আসা যাবে।

—একবার কাছে সরে এস না, একটু হাত দিয়ে তোমাকে দেখি।

—না না ওসব ছেলেমানুষীর কোন মানে হয় না।

বিলাস চলে এল। আরতির দীর্ঘ হাসপাতাল জীবন বিলাসের এমনি ছাড়া-ছাড়া সহানুভূতিহীন আসা-যাওয়ার মধ্যে দিয়ে শেষ হয়ে গেল। বিলাসের হাত ধরে সে ফিরে এল তার ঘরে। কত দীর্ঘ পরিচিত পরিবেশের মাঝে শুরু হল তার অপরিচিত জীবন।

বিলাস কখন আসে কখন যায় আরতি টের পায় না। কেবল গভীর রাতে বিছানায় তার উপস্থিতি আরতি বুঝতে পারে। তখন আরতির জগৎ আবার ফিরে আসে ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে। তখন মনে হয় সে পৃথিবীতেই আছে, পৃথিবীর কামনা বাসনার অতি পরিচিত ভোগরাজ্যে। কিন্তু অন্য সময় মনে হয় সে যেন পৃথিবীর বহু দূরে। অস্পষ্ট শব্দ আর জীবনের কলরব যেন বিগত জীবনের স্বপ্ন। চোখ দিয়ে যা দেখা যায় না মন দিয়ে তার নাগাল পেতেই দিন কেটে যায়।

আরতির কাছে আরতির জীবন মরে গেছে। কিন্তু বিলাস বেঁচে আছে। সে যেন নতুন করে জীবন পেয়েছে। তার সব কটি ইন্দ্রিয়ে যৌবনের জোয়ার খেলছে। বাইরের রূপ-রস-গ্রাহ্য জগতের সঙ্গে তার গভীর আত্মীয়তা। তাই আরতি যখন মাঝে মাঝে বলে—

—আজ একটু বস না গো আমার পাশে। দুটো কথা বলি। বিলাস লাফিয়ে ওঠে- আমার অত সময় নেই। ক্লাবে যেতে হবে। ঐ বামনদির সঙ্গে কথা বল।

—ও বড়ো মানুষ, রাস্তায় বাস্ত থাকে।

—আমার সঙ্গে রাস্তরে বোলো।

—বাব্বা! রাত্তিরে কি আর কথা বলার মত অবস্থা থাকে তোমার। কি সব ছাই-পাঁশ খেয়ে আস। তারপর আমাকে এমন পাগলের মত জড়িয়ে ধর। আমার বাপু তখন যেন কেমন ভয় ভয় করে। ইচ্ছে করে তোমার চেহারাটা তখন কেমন হয় একবার দেখি।

—সারাদিন নিষ্কর্মার মত বসে থেকে দিন দিন যাচ্ছেতাই অশ্লীল হয়ে যাচ্ছ তুমি।

—কেন যা ঘটে তা মুখে বললেই বুঝি অশ্লীল হয়ে যায়।

—তোমার সঙ্গে তর্ক করার সময় আমার নেই।

বিলাস বেরিয়ে গেল। আরতি ডুবে গেল চিন্তার অন্ধকার রাজ্যে। বিলাস চলে গেল ক্লাবে।

—এসো এসো বিলাসচন্দ্র, আজ এত দেরী!

—আর বল কেন ভাই, ঝামেলা কি একরকম। উনি ঠিক বেরোবার মুখে বসলেন, আবদারই বলতে পার—এস, পাশে বস একটু, গল্প করি।

বন্ধুরা হো হো করে হেসে উঠল।

—যারে তুমি বলেই ভাই এইসব 'বেয়ার' কর। একটা অন্ধ মেয়েকে সারা-জীবন বয়ে বেড়ান। তুমি ভাই আদর্শ স্বামী—আইডিয়াল হাসব্যাণ্ড।

চিত্র রসিকতা করে বল—আরে মশাই কানা মেয়েও মেয়ে। তার চোখদুটো নেই পারে কিন্তু শরীরের আর পাঁচটা জিনিস দিয়ে সে পুরুষের লালসা মেটাতে পারে। বিলাসবাবু চালাক লোক, সব বোঝেন।

বিলাস বলে—ওর চোখদুটো গিয়ে একদিকে বেশ ভালই হয়েছে। আগে আমার উপর ওর একটা লালসা ছিল। এখানে নিয়ে চল, ওখানে নিয়ে চল। এই নাও, ঐ নাও। এখন আর তা নয়। এখন আমার দয়ার উপর নির্ভর করে আছে। ভয়! পাছে আর একটা বিয়ে করে ফেলি।

বন্ধুরা আর এক দফা হাসলেন। বিলাসের কথাটা তাঁরা রসিকতা ভাবলেন বোধহয়। আরতির নিজস্ব গৃহকোণের দর্শন এইসব চক্ষুষ্মানদের কাছে উপেক্ষিত। এখানে সবাই চোখ দিয়ে দেখে, মন দিয়ে উপভোগ করে। এখানে প্রলোভন আর আনন্দের ছড়াছড়ি।

এই জগতে রোজ রোজ বিলাস অবগাহন করে। ইন্দ্রিয় ভরে নেয় উত্তাপ। তারপর ফিরে যায় তার গৃহকোণে। সেখানে প্রস্তুত আছে নারী তার উত্তপ্ত যৌবন-ভরা দেহ নিয়ে। নাইবা থাকল তার দুটি জাগর চোখ। রাতের গভীর অন্ধকারে বিলোল কটাক্ষের কিবা প্রয়োজন। তবু শুনতে চায় তার সারাদিনের চিন্তা, অথবা গভীর দার্শনিক কথা। পৃথিবীর মানুষ তাকে নামিয়ে আনে প্রয়োজনের সংকীর্ণ গণ্ডীতে। সেখানে সবাই ষড়যন্ত্র সেখানে সবাই গান্ধারী।

CENTRAL LIBRARY

সবার আমি

কানন দেবী

।। আট ।।

হৃদয়ে চেতনার আলো স্পষ্ট করে ফুটে ওঠবার আগেই অজানাতে যেন বিধাতার কাছে চেয়ে বসেছি সৌন্দর্য-মাধুর্যের বর্ণাঢ্যিকা। তাঁর অকৃপণ দানে আজ আমার প্রাপ্তির করপুট পূর্ণ। তবু, একটা কথা বারবার মনে হয়। দেবতা তাঁর আলোর বন্যায় আমাদের স্নান করিয়ে দিতে উন্মুখ থাকলেও সদা উদ্যত রাখেন নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ঘাতপ্রতিঘাতের নিয়ম শাসনদণ্ড। যারা যত দুর্লভসাধী তাদের পরীক্ষাও বুঝি ততই কঠিন। মূল্য না দিয়ে কোনো কিছুই পাবার উপায় নেই। পাওয়ার আনন্দও তাতে অনেকখানি ম্লান হয়ে যায় বলেই কি?

এই নিবন্ধের প্রথমে যা বলেছি তারই পুনরাবৃত্তি করে আবার বলছি, আমার জীবনের চলার পথ উঁচু-নীচু, পাহাড়ের মতই এবড়ো-খেবড়ো, অসমতল ছিল। গাইতি দিয়ে কেটে কেটে পথ সৃষ্টি করতে করতে আমি আপন লক্ষ্যে এসে পৌঁছেছি। আর তারজন্য কোনো ক্ষয়ক্ষতিকেই যত বোঝ মধ্যে আনিনি।

এর জন্য সাধ্যের অতীত মূল্য দিতে হয়েছে। ভয়াবহ অভিজ্ঞতার ভ্রূকুটিতে চমকে উঠেছি কতবার। কিন্তু থমকে দাঁড়াইনি একবারও। আজ তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতায় সারা মন নুইয়ে পড়ে, যিনি আমায় দাঁড়াবার শক্তি দিয়েছিলেন।

মানুষের মধ্যে মহত্ত্ব দেখেছি। উদারতাও দেখেনি এমন নয়, কিন্তু তার চেয়ে বেশী দেখেছি সীমাহীন নীচতা, অন্ধ কৃপণতা আর অমানবীয় নিষ্ঠুরতার বর্বর রূপ। তাই ত আজ হৃদয় আনন্দে কলমল করে ওঠে যখন ভাবিমহৎ স্বপ্নের আমি বাস্তবের কাছে উটুল হাত দিইনি বলে ভাই আমাকে সত্যিকারের ভয় দেখাতে পারেনি। আর এইখানেই বোধহয় আমার জিত। কারণ এইখানেই বিধাতার দেওয়া কল্পনার জয়-ধ্বজা ওড়াতে পেরেছি।

আজ মনে হয়, যখনকার সামান্যতম ব্যর্থতার অসহনীয় অন্ধকার, ঠিক তখনই অভিজ্ঞতারই প্রয়োজন ছিল পরবর্তী জীবনে প্রাপ্তির গৌরবকে শাণিত করে তোলার জন্য। আরও একটা মধুর অভিজ্ঞতার প্রসাদে সারা চিত্ত যেন পরিপ্লাবন করেছে বারবার। সেটি হচ্ছে এই, অন্ধকার যখন গাঢ় হয়ে ওঠে, তখনই আসে আলোর দূতী। যখন অকূলপাথারে মনে হয় তরী না ডুবেই পারে না, ঠিক তখনই মেলে কূলের দিশা।

তাই ত এই বিরুদ্ধতার জন্য আমার মনে এতটুকুও ক্ষোভ নেই। বরং বাধা ছিল বলেই তাকে অতিক্রম করবার সংকল্প এমন দুর্বার হয়ে উঠেছে। কত উপত্যকা, খাদ, পর্বতের অধিত্যকা পার হতে হয় বলেই না মহিমার কাছে নবীন হোয়া এত প্রবল!

চড়ে ভাতে ভারী মজা লাগে, এ যেন যেন অদৃশ্য দানবের সঙ্গে আমার শক্তির লড়াই। অনুভব করেছি আমাদের চারপাশেই শত্রু নয়, আমাদের ভেতরেই রয়েছে অনেক বিরোধী শক্তির ছায়াচর, যারা প্রতিমুহূর্তে চাইছে মনোবলের অটল সাধনাকে খণ্ডবিখণ্ড করে দিতে। বাইরের চাপ অন্তরের এই অদৃশ্য শত্রুর ক্ষেত্রে অনেক বেশী। বাইরের বাধা হয়ত বা কাটানো যায়, অন্তরের দুর্বলতাকে জয় করা অনেক সময়ই দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। কিন্তু সর্বনাশের প্রান্তে দাঁড়িয়েও তার করাল গ্রাসের মুহূর্তটি এড়িয়ে ছুটে আসা এবং অতল গহ্বরে তলিয়ে যাবার শঙ্কা থেকে নিজেকে মুক্ত করার রোমাঞ্চের মধ্যে কুলছাপানো আনন্দের স্বাদ পাওয়ার সুযোগ ঘটত কি যদি-না এসব বিপত্তি থাকত?

মানুষের হৃদয়ে কল্পনার ধারা অতি ক্ষীণস্রোতে বয় বলেই না জগতে দুঃখ এত বেশী? কিন্তু কারো অন্তরাত্মা যদি প্রতি রক্তকণা দিয়ে কিছু কামনা করে, মানুষের ভয় তার কণ্ঠরোধ করে দিতে পারে না। হতাশার চরম মুহূর্তেও হঠাৎ সামান্য ঘটনা প্রতিদিনের বাঁধাধরা জীবনের ছকের

যোগাযোগ চিত্রে কানন দেবী ও ছবির গাঙ্গুলী

মধ্যেও যেন হঠাৎই জেগে দেয় ভরসার আলো।

কেমন করে? অসংখ্য উদাহরণের মধ্যে একটিই তুলে ধরি।

নিউথিয়েটার্সে 'বিদ্যাপতি' ছবির কাজ করবার সময়ই প্রথম অন্ধগায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দের সংস্পর্শে আসবার সুযোগ ঘটে। বিস্মিত হয়ে দেখতাম, বাইরের চোখ দিয়ে দেখতে না পেলেও তাঁর অন্তর্দৃষ্টি এমন অস্পর্শ রকমের জাগ্রত যাকে বলা যায়—মানসচক্ষু অথবা তৃতীয় নেত্র। কোন্ দৃশ্যে, কোন্ সময় সান্ধ্যবিলম্বিতের কতটা আছে, কোন্ দিকে যেতে হবে বা দাঁড়াতে হবে, পরিচালক একবার দেখিয়ে দিলেই তিনি এমন নির্ভুলভাবে তা পালন করতেন যে, অনেক চক্ষুওয়ালাকেও তাঁর কাছে হার মেনে যেত। গভীর বিস্ময়ে লক্ষ্য করতাম অন্ধগায়ক আপন মনে পদক্ষেপ দিয়ে অথবা হাত দিয়ে চলাফেরার পরিধিটুকু মেপে নিতেন। দু-চার মুহূর্ত নীরব থেকে ভেবে নিয়ে আপন ভূমিকা সম্বন্ধে অবহিত হতেন। তারপরই ফাইনাল টেকে তাঁকে দেখতাম সসম্মানে উত্তীর্ণ হতে।

শুধু কি তাই? ঘরের মধ্যে বসে আছেন, হঠাৎ বাইরে কোনো কিছু ঘটলে অথবা পরিচিত কেউ এলে কেমন করে যেন টের পেয়ে যেতেন। অমনই দ্রুতপদে বাইরে এসে তার সঙ্গে হাসি-তামাশার মজলিশ চলত।

ওঁকে দেখতাম আর ভাবতাম জীবনের এতবড় দুর্ভাগ্যকে বহন করেও যিনি সার্থক হতে পেরেছেন, লক্ষ লক্ষ শ্রোতা ও দর্শককে আনন্দে ভরিয়ে দিচ্ছেন, তিনি ঈশ্বরের রুদ্ররূপের অন্তরালের বরাভয়কেও নিশ্চয়ই উপলব্ধি করেছেন। নইলে অন্ধের মধ্যে এত আনন্দ এত প্রাণময়তা এলো কেমন করে? আর বিধাতার সবচেয়ে বড় দান দৃষ্টিশক্তি না পেয়েও ইনি আপনাকে অসহায় মনে করেন না ত? তাহলে আমার আর নিজেকে নিঃসহায় মনে করা চলে কি? এঁর তুলনায় আমি ত অনেক সবল। মনের মধ্যে নূতন করে জোর পেতাম যেন।

'বিদ্যাপতি'তে কৃষ্ণচন্দ্র দের মুখে আমার নাম ছিল রাধে। মনে পড়ে, রঙমহলের মেকআপ রুমে থাকলে সেটের বাইরেও উনি আমায় ঐ নামেই ডাকতেন। আবার কোনো বিষাদস্তব্ধ মুহূর্তে হঠাৎ যদি তাঁর মুখোমুখি হতাম কেমন করে জানি না আমার মনটা যেন তিনি দেখতে পেতেন বাইরের প্রত্যক্ষ দৃশ্যবস্তুর মতই। বলতেন 'রাধে, হৃদয়-বৃন্দাবন আঁধার রাখলে তিনি এসে বসবেন কোথায়?'

কখনও বলতেন, 'যে কঠিন তপস্যায় তুমি রত তাতে বাধা ত আসবেই। তুমি যে শ্রীরাধা। অশ্রুপাথার পার না হলে কি শ্যামের কাছে পৌঁছানো যায়? তুমি ত এত বেদপুরাণের গল্প পড়। তপস্বীদের ধ্যান ও ধারণা জপ শোনোনি কি দেবতাদের ছলা-কলার খবর? ধ্রুব পরীক্ষা?—সঙ্গে সঙ্গে সপ্তর্ষির মতই তাঁর সাধককণ্ঠে অনুরণিত হোতো—'হে ধনী কর অবধান'—

ঐ কথাগুলির মধ্যেই যেন কোন অন্তরালের দেবতার আশ্বাসবাণী শুনতে পেতাম। তখনই মনে হোতো বাধামন্থনের মাঝে যে গরল ওঠে বোধহয় কেবল তাই পান করেই মৃত্যুঞ্জয় হওয়া যায়। বাকী সবই ভাববিলাসিতা। এই বেদনামন্থনের সময় নিরাশা আসে। আসে ক্ষোভও। কিন্তু সে আবিলতা কেটে যেতে না যেতেই আভাষ পাই যে বাইরে থেকে যা দেখতে অভিশাপের মতন, তা হয়ত বরদানেরই রূপান্তর। আর এই বরদানকে চেনা সম্ভব একমাত্র বর-দাতার দেওয়া বিষাদদৃষ্টির প্রসাদেই।

কিন্তু শুধু স্বপ্ন দেখলেই চলবে না। জীবনের হাজারো পরীক্ষা, অবিশ্বাসের বাধা ও সন্দেহের আঁধি থেকে মনকে মুক্ত রাখতে হবে। বিশ্বাস রাখতে হবে তার অটল সত্যতায়। ভুলে গেলে চলবে না যে, মানুষ মূলত ধ্যানজগতের জীব, মাংস-পেশীর জগতের নয়। বাদও শেষের প্রসো-ভনই মনকে সহজে টানে—আর তার চেয়েও সহজে লক্ষ্যভ্রষ্ট করে।

তাই ত আজ আমার সারা চেতনা জুড়ে একটা সোনালী প্রত্যয় যেন টীকা দিয়ে বলে যে, এসব অসঙ্গতি, স্ববিরোধ, এতসব গ্লানি আর দুর্বোধ্য থাকবে না যদি অন্তরে সেই আলো একবার জ্বলে। তার একটি স্ফুলিঙ্গ দিয়ে শিল্পী জ্বালায় শিল্পের বাতি, জ্ঞানী জ্বালায় জ্ঞানের দীপ, প্রেমিক প্রেমের তারা। কেবল করতে হবে তারজন্য দুশ্চর তপস্যা। নৈলে সে আলো তার রঙীন পা রাখবে কোথায়? আজকাল-কার ক্ষুদ্র, বামন, শ্রীহীন মরচেতনার পঙ্কপুটে? ছিঃ!

আগে হৃদয়কে হতে হবে শত সহস্র-দল যার পাপাড়িতে চাঁদের হাসি, মৃণালে প্রত্যয়ের আগুন, পরিমলে নীলিমার পুণ্য-গন্ধ। সবচেয়ে দুঃখ যাদের দেখে গড়পড়তা সাধারণ জীবনের সন্তুষ্টি নিয়ে অধিকাংশ মানুষই সুখে থাকে। কিন্তু যে আলোয় কণিকাপ্রসাদে বেঁচে সুখ, ভাবাবেশে আনন্দ, কর্মে দীপ্তি, তার পূর্ণ দানকে এড়িয়ে চলার জন্য আমরা হয়ে উঠি পাগল। যেন ক্ষুদ্র জানার এতটুকু পরিধির বাইরে আর কিছুই নেই। যেন ঐ বদ্ধচেতনার চতুঃসীমার বাইরের মরুরূপ মিথ্যা।

তাই বলছিলাম, জীবনকে নির্ভয়ে দেখতে শিখলে তবেই সত্যের দর্শন মেলে। নৈলে নয়।

(চলবে)

অনুলিখন—সন্ধ্যা সেন।

বার্ট্রাণ্ড রাসেল

বিজয় দেব

দর্শন সম্বন্ধে বার্ট্রাণ্ড রাসেল একবার বলেছিলেন : 'হয় যা জান তাই বিজ্ঞান আর যা তুমি জান না, তাই হলো দর্শন'। প্রায় শৈশব থেকেই তাঁর জীবনে এই ধরনের মর্মভেদী প্রশ্ন ভীড় করে। এমন কি জগতের ইতিহাসও যেন সেই ইঙ্গিত বহন করে। তাঁর মা কোথাও লিখেছিলেন, খোকার বয়স যখন মাত্র তিনদিন তখনই মাথা তুলতে সুরু করে। খুব চটপটে। তার চোখ যেন সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে।' ঠিক মৃত্যুর মুহূর্ত অবধি তাঁর দৃষ্টি একইভাবে বিশ্ব চরাচরে নিবদ্ধ ছিলো।

উই নদীর তীরে ১৮৭২ খৃঃ ১৮ই মে এ-যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক জন্মগ্রহণ করেন। জন্ম মুহূর্তেই ডাক্তার বলেছিলেন : 'অদ্ভুত ছেলে'। তাছাড়া এ ধরনের নাদুস-নুদুস শিশু খুবই কম দেখা যায়। তাই নামকরণের সময় ঠাকুরমার ইচ্ছে ছিলো নাম রাখা হোক 'গালহাম'। দিদিমা কেঁদে গিয়ে ঈশ্বরের দিব্যি দিয়েছিলেন : এই নাম সত্যি সত্যি তার উপর বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। পরিশেষে একটি বোঝাপড়ার এসে সেদিনের অনুষ্ঠান কৌতূহলী শিশুর নাম রাখা হয় বার্ট্রাণ্ড রাসেল।

জীবনের সায়াহ্নকালে বার্ট্রাণ্ড রাসেল স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে লিখেছিলেন : 'আমার ছোটবেলা ছিলো সত্যিই দুর্দশাগ্রস্ত। জন্মের এক বছর পরই বাবা দুরারোগ্য রোগে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। আমার কাকা উন্মাদ হয়ে যান। দিদি র‍্যাচেলের বয়স যখন দু বছর তখন মা ডিপথেরিয়ার সংক্রমণে আক্রান্ত। দাদা ফ্রাঙ্কেরও ডিপথেরিয়ার আক্রমণে জীবনসংশয় হয়ে ওঠে। র‍্যাচেল ও মা একই রোগে মারা যান। তারপর বাবা প্রায় ১৮ মাস জীবিত ছিলেন। ফ্রাঙ্ক কাঁদছিলো। আমি কেমন যেন চুপ করে দাঁড়িয়ে পরপর সব দেখছিলাম।'

রাসেলের বাবা ছিলেন যুক্তিবাদী। তাঁর বন্ধু ছিলেন জন স্টুয়ার্ট মিল। তাই ছেলেদের শিক্ষার জন্য তিনি দুজন নিরীশ্বরবাদীকে বাড়ীতে ডেকে নিয়ে আসেন। কিন্তু ফ্রাঙ্ক এবং বার্ট্রাণ্ড পিতৃ-মাতৃহীন হয়ে পিতামহ-পিতামহীর আশ্রয়ে পেম্‌ব্রুকের বাড়ীতে উঠে আসেন।

রাসেলের জীবনব্যাপী যার প্রচণ্ড প্রভাব লক্ষণীয়, তিনি হলেন পিতামহী লেডি রাসেল। তৎকালীন ইংলণ্ডের অনেক প্রথাগত ধারণাকে ভেঙ্গে দিয়েছিলেন তাঁর উদার মতবাদ দ্বারা। ব্রিটীশ রাজতন্ত্রকে সমালোচনা করে আইরিস হোমরুলের স্বপক্ষে তাঁর আপন মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। সেই বাড়ীর আবহাওয়ায় একদিকে যেমন ছিলো প্রাচীন নীতিবাদের অনুশাসন, তেমনি অন্যদিকে উদার মতবাদের মুক্ত হাওয়া। সেই পরিবেশে দু ভাই শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। রাসেলকে তাই জীবনের কোন এক মুহূর্তে বলতে শুনি : 'মূলতঃ নীতিবাদী শিক্ষায় আমার বাল্য, কৈশোর কাটলেও আমি আমার অপকর্ম এটা, পাপ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে গভীরভাবে তা বিবেচনা করতাম।'

একবার মাদার শিপটন রাসেলের সামনে বলে ওঠেন : '১৮৮১ সালের শেষে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে।' সেই বছরই কেন একটি দিনে আকাশ ঘন অন্ধকারে ডুবে গেলো। ঝড় বইতে সুরু করলো। সবাই ভাবলো এই বুঝি বা প্রলয়! কিন্তু কিছুই ঘটলো না। এমন কি ধীরে ধীরে ১৮৮১ খৃঃ কেটে গেলো, সেই পৃথিবী সেই পৃথিবীই রয়ে গেলো। তখন বালক রাসেলের মনে প্রথম সন্দেহের বীজ অঙ্কুরিত হলো। তাই বোধহয় আজও তিনি সন্দেহবাদী বলে পরিচিত।

অঙ্কশাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁর কৌতূহলের কারণ বলতে গিয়ে যেন তিনি স্মৃতিভারে খানিকটা অনমনস্ক হয়ে পড়েন : 'জানা বয়ঃসন্ধিকালে কোন একটি ঘটনা আমাকে আত্মহত্যার জন্য প্ররোচিত করে। কিন্তু হঠাৎ যেন এই গণিতশাস্ত্রই আমাকে বাচানোর জন্য এগিয়ে এলো।'

রোমান্টিক কবিতা বার্ট্রাণ্ড রাসেলকে প্রায় সম্মোহিত করে রাখতো : 'কবিতা আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই এই বিশ্ব-সংসার যেন ক্রমশঃ বিলয়মান রেখায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো... তখন সত্যিই মনে হতো আমি কোথায়?'

যখন তিনি প্রায় ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী হয়ে পড়েন তখন জন স্টুয়ার্ট মিলের রচনা তাঁর হাতে আসে। মুহূর্তেই যেন কি এক বিপ্লব ঘটে যায়। দেখতে পান তৎক্ষণে তাঁর বিশ্বাস ভেঙ্গে চুরমার।

বার্ট্রাণ্ড রাসেলের জীবনে প্রথম প্রণয় যার সঙ্গে ঘটে, তিনি হলেন কেমব্রিজের গোষ্ঠীভুক্ত এলিস পিকারসেল পিয়ার্স। পারিবারিক দিক থেকে তখন তিনি প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন। এখানে বিচ্ছেদ ঘটানোর জন্য তাঁকে কূটনৈতিকের দায়িত্ব নিয়ে প্যারিসে পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। কিন্তু সমস্ত বাধা অতিক্রম করে তিনি ১৮৯৪ খৃঃ এলিসকে বিয়ে করেন। অবশ্য এ বিয়ে মাত্র সাতেরো বছর স্থায়ী ছিলো। এলিসের ব্যক্তিগত দিক থেকে কোন চাহিদা ছিলো না বলেই রাসেলের পক্ষে অঙ্কশাস্ত্রের জগতে গভীর অনুসন্ধানে থাকা সম্ভব ছিলো। বস্তুতঃ এলিস তখন তাঁর জীবনে প্রায় অপরিহার্য। ১৯১০ খৃঃ বিখ্যাত 'প্রিন্সিপিয়া ম্যাথমেটিকা' প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়।

এই গবেষণামূলক রচনা সম্বন্ধে প্রখ্যাত প্রয়োডিক্টার মন্তব্য করেছিলেন : 'আমার ধারণা রাসেল বা হোয়াইটহেড কেউই বইখানি আগাগোড়া পাঠ করেন নি।' অধ্যাপকের উপাসক এসেও তাঁকে শুনতে হয়েছে : 'কুড়িজন পাঠকও বোধহয় সমগ্র রচনা পড়েন নি।' তাছাড়া বর্তমানে রাসেলের ধারকতাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

একদা বিখ্যাত অঙ্কশাস্ত্রবিদ কি এই হার্ডি রাসেল তাঁর একটি ভুলের কথা স্বীকার দেন। দু-শত বছরের পর একদিন তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে দেখতে পেলেন সেখানের কোন একজন কর্মী তার হাতের ফাইলে অপ্রয়োজনীয় বই হেলফ থেকে তুলে নিয়ে রাখছে। তারপর নষ্ট করে ফেলবে। হঠাৎ যেন সেই কর্মী লাইব্রেরীতে রক্ষিত একখণ্ড কপি 'প্রিন্সিপিয়া ম্যাথমেটিকা' তুলে নিয়ে মুহূর্তমাত্র দ্বিধাগ্রস্ত...ঠিক তখনই ধ্বনি ভেঙ্গে যায়।'

এমন কতগুলো ঘটনা তাঁর জীবনে ঘটেছে যা পৃথকভাবে বিস্ময়কর মুহূর্ত সৃষ্টি হয়ে আজও বিরাজ করছে। বিভিন্ন বিষয়ের লেখাপড়া ও বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গে অবসর মুহূর্তের সদ্ব্যবহার করতে গিয়ে গিলবার্ট মারে, ডি এইচ লরেন্স, লুডউইগ উইটজেনস্টিন, জোডি ওটোলিন মোরেল,

ব্লুমসবেরী গোষ্ঠী, টি এস এলিয়ট এবং ডোরোথি কলরাড-এর মতো বিখ্যাত ব্যক্তিদের সঙ্গে বিতর্কমূলক আলোচনায় প্রবেশ করেন। ছাড়াও কনরাডের উপর তাঁর বিশেষ বন্ধুত্বতাও পরিলক্ষিত হয়, যার জন্য তাঁর দুই ছেলের নামই তিনি কনরাড রাখেন।

১৯২০ খৃঃ বিবাহের আদর্শ তাঁর মধ্যে জন্মপ্রেরণা সৃষ্টি করে। এবং তখনই তাঁর বাইরে পরিভ্রমণ ঘটে। তিনি সেখানের এই রূপান্তরকে সাদরে গ্রহণ করেন। সেই সঙ্গে দারিদ্রপীড়িত অবস্থা এবং দুর্দশার মুখোমুখী হয়ে তিনি হতাশ হতেও পড়েন। যে ক্যাপিটেলিজমকে একদা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এখন মনেপ্রাণে বিশ্বাস করছেন যে, এখানে অন্যরকম বিকল্প কোন বাস্তবতাও নেই। বাড়ি ফেরে আসার সঙ্গে সঙ্গে ১৯২০-২১ খৃঃ পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার আমন্ত্রণ নিয়েছিলেন। এবং সেখানে প্রায় নয়মাস কাটিয়ে তিনি গুরুতররূপে পীড়িত হয়ে পড়েন, এমন কি খবরের কাগজে নিজের মৃত্যুসংবাদ দেখে বিস্মিত হয়ে পড়েন। ডোরা ব্ল্যাক তখন তাঁর সঙ্গী। ইংলাণ্ডে প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁদের বিয়ের অনুষ্ঠান শেষ হয়।

১৯২১-৩১ খৃঃ মধ্যে প্রায় পনেরোখানি বই প্রকাশিত হয়। যার মধ্যে সমাজিক চিন্তাধারার বর্ণচ্ছটা প্রসারিত হয়ে আছে। যেমন 'ম্যারেজ অ্যাণ্ড মরালস'। এখানে তিনি প্রচলিত নৈতিক বোধকে অনাবৃত করেছেন। ধর্মীয় এবং নৈতিক প্রত্যয়গুলিই যে বিশ্বের পরিহার্য দুঃখ এবং দুর্দশার কারণ তা বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি নরনারীসাম্যের ক্ষেত্র সমর্থন যৌন-স্বাধীনতা দাবী করেন। সেই সঙ্গে প্রাক-বিবাহ ক্ষেত্র রমণীর যৌন-অভিজ্ঞতা অবশ্য কাম্য, এমন কি সেই সঙ্গে অপরিহার্যও বটে। তাছাড়া বিয়ের পর অনাগতকে তিনি সেকেলে বলে অভিহিত করেছেন। অবিসম্বাদিতভাবে মূলতঃ বিবাহ-বিচ্ছেদের কারণ নয়, সেখানে ঈর্ষাই সর্বক্ষেত্রে কারণ হিসেবে প্রযোজ্য। ভালবাসার ক্ষেত্রে কোনরূপ বাধা নিষেধ আরোপ করা সঙ্গত নয়। কারণ তাই হলো পার্থিব দুঃখের মূল কারণ। ১৯৩০ খৃঃ প্রকাশিত কনকোয়েস্ট অব হ্যাপীনেস-এ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা লক্ষণীয়। এখানে মানবসমাজকে প্রত্যয় উৎপাদনে ক্ষমতাসম্পন্ন বিষয়ের জন্য আবেদন করেছেন যে তারা যেন তাদের আত্মার অনুসন্ধান ব্যাপৃত থেকে নিজেদের বিলয় করে তাহলেই তাদের পক্ষে সুখের সন্ধান সহজ হয়ে ওঠবে।

১৯২২ খৃঃ এবং ১৯২৩ খৃঃ দুবার রাসেল 'চেলসা' কেন্দ্র থেকে শ্রমিক প্রার্থী হিসেবে পার্লামেন্টের সদস্যের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত হন। এবং তখনই সোভিয়েট রাশিয়াকে স্বীকৃতি দেবার জন্য ব্যাপক প্রচারকার্য চালান।

১৯৩০ খৃঃ থেকে তাঁর জীবনে দুঃখবাদ এবং বিষণ্ণতার পর্ব সরে। সেই সময়েই তিনি দর্শনের ক্ষেত্রে 'প্রত্যাবর্তন করেন। স্থির করেন তাঁকে যে করেই হোক দার্শনিক খ্যাতি পুনরুদ্ধার করতে হবে।

১৯৩৬ খৃঃ রাসেল তাঁর সচিব প্যাট্রিসিয়া হেলেনকে বিয়ে করেন। ইতিপূর্বে তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী ডোরা নিজের প্রেমিকের নিয়ে একই বাড়ীতে বাস করতেন। বয় চারটে সন্তানের মধ্যে দুটোর জনক বলে রাসেল নিজেকে পরিচিত করেন। প্যাট্রিসিয়াকে নিয়ে তিনি 'অ্যাক্টিভ' পেপারস্' সম্পাদনা করেন।

১৯৩৭ খৃঃ আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অধ্যাপনার আমন্ত্রণ পেয়ে সেখানে পাড়ি দেন। তবে সেখানে অতি শীগগিরই তাঁর মারেজ অ্যাণ্ড মরালিটির জন্য বিশেষ বিতর্কের সূচনা হয়। পরিশেষে তাঁর নিয়োগপত্র প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। কারণ হিসেবে ছিলো আমেরিকার শিক্ষানীতির সঙ্গে রাসেলের নৈতিক অসঙ্গতি। সমগ্র আমেরিকা তখন অর্থনৈতিক এবং সামাজিক দিক থেকে তাঁকে অবরোধ করে রাখে। বস্তুতঃ তখন তাঁকে বিপদের মধ্যে কাটাতে হয়। কিছুদিন পরই তিনি বার্নস ফাউণ্ডেশনে অধ্যাপনার কাজে যোগ দেন। অবশ্য দু বছর পরই তাঁকে এই চাকরীও হারাতে হয়। ফাউণ্ডেশনের প্রধান তাঁর বিরুদ্ধে কোর্টে অভিযোগ করেন যে, তাঁর বক্তৃতা ভাসা-ভাসা। কিন্তু সেই বক্তৃতাবলীই তাঁর পরবর্তী রচনা 'হিস্ট্রী অব ওয়েস্টার্ন ফিলজফি'র অন্তর্গত। পরিশেষে রাসেল কেসে জয়ী হন এবং ইংলাণ্ড প্রত্যাবর্তন করে কেম্ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে অধ্যাপনার কাজে যোগদান করেন। সেই সঙ্গে তিনি আজীবন সদস্যরূপে নির্বাচিত হন।

জাপানে আণবিক বোমা বিস্ফোরণের পরই হাউস অব লর্ডস-এ এক অসাধারণ বক্তৃতা দান করেন। সেখানে হাইড্রোজেনের ধ্বংসক্ষমতা সম্বন্ধে বহুৎ শক্তিবর্গকে সতর্ক করে দেন। ১৯২৩ খৃঃ প্রকাশিত তাঁর 'এ-বি-সি অব দি এটম'এ এটম বোমার পূর্বাভাস স্পষ্ট ছিলো।

১৯৫০ খৃঃ তিনি অস্ট্রেলিয়া ভ্রমণে যান হন। তারপর অধ্যাপনার কাজ নিয়ে আমেরিকায় চলে আসেন। এখানে জানতে পেরেছেন যে, তিনি সাহিত্যের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন।

১৯৫২ খৃঃ তাঁর জীবনে নতুন যুগের সূচনা হয়। তখন প্যাট্রিসিয়ার সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে। এবং আমেরিকান লেখিকা এডিথ ফিন্চ্‌কে রাসেল বিয়ে করেন। তখন রোজেনবার্গ দম্পতির মৃত্যুদণ্ড তাঁকে গভীরভাবে বিচলিত করে তুলেছিলো।

১৯৫৭ খৃঃ বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার জন্য রাসেলকে কলিঙ্গ পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

কিউবান সংকটের মুহূর্তে তাঁর নিজস্ব পদ্ধতিতে প্রত্যক্ষভাবে যোগাযোগ করার জন্য তিনি ক্রুশ্চেভ এবং কেনেডীকে ব্যক্তিগতভাবে আবেদন জানিয়েছিলেন। তেমনি ভিয়েতনাম সমস্যায় তিনি নেহরু এবং চু-এন-লাইকে একইভাবে সমাধান করার জন্য লিখেছিলেন।

১৯৬৩ খৃঃ পর থেকে তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময়ই ভিয়েতনাম যুদ্ধের জন্য ব্যস্ত হয়। তিনি আমেরিকার নির্লজ্জ ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করেছেন এবং সেই সঙ্গে আমেরিকার প্রতি ব্রিটিশ সরকারের সমর্থন থাকাতে প্রতিবাদস্বরূপ লেবার পার্টির সভ্যপদ ত্যাগ করেন। এবং ১৯৬৭ খৃঃ তাঁর প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য রচনা 'ওয়ার ক্রাইমস্ ইন ভিয়েতনাম।'

রাসেল কখনো কাজে বিরতি টেনে আনেননি। ১৯৬৩ খৃঃ কোন এক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে তাঁর দিনের কর্মসূচী সম্বন্ধে যে কথা প্রকাশ করেন, তা হলো : সকাল ৮টা থেকে ১১-৩০ মিঃ চিঠিপত্র এবং খবরের কাগজ দেখা (প্রতিদিন গড়ে ১০০ খানি চিঠি আসে); ১১-৩০ মিঃ থেকে বেলা ১টা—লোকজনের সঙ্গে দেখা করা; বেলা দুটো থেকে চারটে—সাধারণতঃ সাম্প্রতিক পরমাণবিক রচনা দেখি; বেলা চারটে থেকে রাত সাতটা—আবার তখন লোকজনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার অথবা আমার লেখা; রাত আটটা থেকে ভোর একটা—তখন আমি নিজেকে হয় লেখার টেবিলে অথবা পড়ার টেবিলে বসিয়ে রাখি।

ছোটগল্প রচনায়ও তাঁকে দেখা যায়। আশী বছর বয়সে তিনি প্রথম ছদ্মনামে তাঁর গল্প গো পত্রিকায় প্রকাশ করতেই

পাঁচিশ পাউন্ড পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। প্রথম সংকলন সাটান ইন দি সাবারবস' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে তিনি উত্তেজিত হয়ে বলেন : আমার জীবনের প্রথম আশী বছর কেটে গেলো দর্শনের জগতে এখন আমার একান্ত কামনা পরবর্তী আশী বছর যেন উপন্যাস বা ছোটগল্প নিয়ে কাটে।'

ব্রিটীশ এম্পায়ারিলিস্ট ঐতিহ্যের সন্তান এবং ম্যাথমেটিক্যাল লজিসিয়ান বার্ট্রান্ড রাসেল ৯৭ বছর বয়সে নর্থ ওয়েলস-এ ১৯৭০ খৃঃ ২ ফেব্রুয়ারী পরলোক গমন করেন।

বার্ট্রান্ড রাসেল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং জওহরলাল নেহরু সম্বন্ধে যে ধারণা পোষণ করতেন, তা যেন নিম্নলিখিত পত্রাবলীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে আছে। সেই সঙ্গে ভিয়েৎনাম যুদ্ধ সম্বন্ধেও একখানি চিঠি উল্লেখযোগ্য।

১৯২০ খৃঃ ২২ ফেব্রুয়ারী দি লীডার'এ সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে লোয়েস ডিকিনসন বার্ট্রান্ড রাসেল এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্য নিম্নোক্ত একটি সভার বর্ণনা দিচ্ছিলেন : 'কেমব্রিজ গার্ডেনে জনের এক সন্ধ্যা। মিঃ বার্ট্রান্ড রাসেল, আমি এবং টেগোর নিরিবিলিতে সেখানে বসে রয়েছি। তিনি তাঁর কয়েকটি কবিতা প্রায় সঙ্গীতের মতো আবৃত্তি করলেন। কি অপূর্ব কণ্ঠস্বর! তাছাড়া রয়েছে অচেনা ঢং। সর্বমিলে ঐকতান যেন এই ভ্রমাট অন্ধকারে ভেসে ফিরছিলো। তারপর রাসেল কথা বলতে সুরু করেন। সেই সন্ধ্যায় তখন মনে হচ্ছিলো রাসেলের কথা যেন বিদ্যুতের মতই ঝলমলে। টেগোর তখন নীরবতায় তলিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু পরবর্তী কোন এক সময়ে তিনি বলেছিলেন, সেদিন রাসেলের কথাগুলো তাঁর কাছে বারবার আশ্চর্য মনে হচ্ছিল। তখন সজ্ঞানভাবে চরম পর্যায়ে তাঁর উত্তরণ ঘটেছিলো বলে তিনি বহুদূরে থেকে তা যেন শুনতে পেয়েছিলেন। আমার কাছে আজও চরম বিস্ময় তিনি কি সব শুনেছিলেন?'

প্রিয় মিঃ চ্যাটার্জি,

১৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৩

...লোয়েস ডিকিনসন যেসব সাক্ষাৎকারের বিবরণ দিয়েছিলেন, তা অস্পষ্ট হলেও এখনো আমার স্মৃতিতে তা উজ্জ্বল হয়ে আছে। এর আগে রবার্ট ট্রেভেলিয়ান এবং লোয়েস ডিকিনসন টেগোরকে আমার বাড়ীতে নিয়ে আসেন। আমার স্বীকার করতে আপত্তি নেই যে, তাঁর অতিন্দ্রীয়বাদে বিশ্বাসীর ভাবভঙ্গী আমাকে মোটেই আকর্ষণ করতে পারেনি। বরং আমার একান্ত ইচ্ছে হচ্ছিলো যদি তিনি এই মুহূর্তে অধিক স্পষ্ট হতেন। তাঁর কোমল বরং ছলনাময় ব্যবহার যেকোন ব্যক্তিকে অনুভব করার সুযোগ দেয়ে যে একমাত্র সত্তাই তাকে বিনিময় বা যোগাযোগ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। তাঁর আত্মসমাহিত ভাব যেন তাঁর আকোকে দুর্বল করে তুলে। স্বাভাবিকভাবে বাণী হিসেনে তাঁর অতিন্দ্রীয়-দর্শন প্রত্যক্ষ করা যায়, কিন্তু বর্ণনার মাধ্যমে তা সত্যিই সম্ভব নয়।

শুভেচ্ছা সহ

আন্তরিকভাবে আপনার

বার্ট্রান্ড রাসেল

১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৪

প্রিয় মিঃ বার্নলে,

মিঃ নেহরু আমার বন্ধু ছিলেন। তিনি অবশ্য স্নায়ুযুদ্ধ (কোল্ড ওয়র) প্রতিরোধের জন্য বিভিন্ন নীতি অনুসরণ করেছিলেন। যদিও তিনি জগতের দারিদ্র্য দূর করার ব্যাপারে আন্তরিক হয়েও সফলকাম হতে পারেননি...,

আন্তরিকভাবে আপনার

বার্ট্রান্ড রাসেল

২৬ নভেম্বর, ১৯৬৫

প্রিয় মিঃ রবার্টসন,

...আপনার রাসেল জন্মের বেদনার প্রতি আমার গভীর সহানুভূতি রয়েছে। কিন্তু নিষ্ঠুর যুদ্ধে আমেরিকা যে আক্রমণকারীর ভূমিকা গ্রহণ করেছে, তার সক্রিয় প্রতিরোধ এখন সত্যিই অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।...

আমেরিকার জনগণকে হতাশ করা আমার উচিত নয়। যদিও সেখানের জনসাধারণকে তাদের সরকার পরিচালিত যুদ্ধের চরিত্র সম্বন্ধে কখনোই ওয়াকিবহাল করতে দেওয়া হয়নি।

...সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকান পরিচালিত ভিয়েৎনামের যুদ্ধই প্রথম এবং শেষ নয়। বিশ্বের জনগণ যেখানে মর্যাদার সংগ্রামে রত, সেখানে আমেরিকার জনগণের বোঝা উচিত তাদের সরকারের চরিত্র এবং যা সময়মতো তা কাটানো যায় তার জন্য সচেষ্ট হওয়াও উচিত।

সম্প্রতি আমাদের কাজের বিবরণের পুস্তিকা পাঠাচ্ছি। অবিচার প্রতিরোধে আপনার প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করছি। সেই সঙ্গে আপনি সত্যিই প্রশংসার যোগ্য।

আন্তরিকভাবে আপনার

বার্ট্রান্ড রাসেল।

অঙ্গনা

স্বামী যদি দুষ্কৃতিকারী হয়

রত্নাকরনি বাল্মীকি প্রথম জীবনে ছিলেন দস্যু রত্নাকর। পৌরাণিক কাহিনীতে দস্যু রত্নাকরের রূপান্তরে দৈবী মহিমার প্রাধান্য ঘোষিত হয়েছে। কারণ, দেবতারাই উদ্যোগী হয়ে তাঁর দুষ্কৃতকর্মে এবং নর-হত্যার যথার্থতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলে-ছিলেন। সেই প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রত্নাকর পরম বিশ্বাসে উত্তর দিয়েছিলেন যে তাঁর এই কাজ যদি পাপ হয় তবে তার অংশীদার সবাই অর্থাৎ তাঁর মা, বাবা এবং সর্বোপরি স্ত্রী। কিন্তু তাঁর বিশ্বাস টলে উঠলো যখন বাড়ি গিয়ে তিনি সবার কাছে জানতে চাইলেন যে তাঁর এ কাজ যদি পাপ হয় তবে তাঁরা এতে অংশ নেবেন কিনা? মা-বাবা সরাসরি জানিয়ে দিলেন যে, সন্তানের পাপ-পুণ্যের অংশ তাঁরা নেবেন না। বৃদ্ধবয়সে সন্তানের কর্তব্য মা-বাবার দেখাশোনা করা। রত্নাকর শুধু সে দায়িত্ব পালন করছে তার বেশি কিছু তাঁরা জানতে চান না। এবার তিনি এলেন স্ত্রীর কাছে। ইতি-মধ্যে মা-বাবার উত্তর শুনে তিনি বেশ কিছুটা মুষড়ে পড়েছেন। এবার সেই বিশ্বাসভাব কাটিয়ে সহজ স্বাভাবিক হতে পারবেন এই আশায় তিনি স্ত্রীর কাছে সেই একই প্রশ্ন রাখলেন। কিন্তু এবারও তাঁকে হতাশ হতে হলো এবং প্রচণ্ডভাবে। স্ত্রী সোজাসুজি তাঁকে জানিয়ে দিলেন যে, স্বামীর কর্তব্য স্ত্রীকে ভরণপোষণ করা। এটাই শাস্ত্রবাণী। এবং স্বামী কিভাবে সে দায়িত্ব পালন করবেন সেকথা তো তাঁর জানার কথা নয়। তিনি আরো জানিয়ে দিলেন যে শুধু স্বামীর পুণ্যেরই তিনি আধা অংশীদার, পাপের নয়। রত্নাকর চমকে উঠলেন। তিনি এতদিন স্থিরনিশ্চয় ছিলেন যে, ভরতঃ স্ত্রী তাঁর পাপ-পুণ্যের সহ-অংশীদার। মা-বাবার কথা ছেড়ে দিলেও স্ত্রী যে তাঁকে এতখানি হতাশ করবেন একথা তাঁর জানা ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে এক বিরাট পাপবোধ তাঁকে পেয়ে বসলো। তিনি আতংকে শিউরে উঠলেন এই ভেবে যে বিরাট পাপের বোঝা তাঁকে একা বইতে হবে। অথচ এতদিন তিনি পরম নিশ্চিন্তে সকলের কল্যাণের জন্য এই পাপকার্য অনুষ্ঠিত করে যাচ্ছিলেন। এমন কি স্ত্রীও তাঁর পাপের দায়িত্ব নিতে রাজি নয়। তিনি যেন নিঃসহায় হয়ে পড়লেন। এ রকম যে ঘটতে পারে তা তিনি এক মুহূর্তের জন্যও কখনো আশা করেন নি। এরপর তিনি ছুটে এলেন ছদ্মবেশী দেবতাদের কাছে এবং সব পাপ স্বীকার করে মুক্তির পথনির্দেশ চাইলেন। সেদিনই এবং সেই মুহূর্ত থেকে তাঁর জীবনে এলো রূপা-ন্তর। মুক্তির নির্দেশ পেয়ে তিনি গভীর ধ্যানে সমাধিস্থ হলেন। এবং ঘটনা-পরম্পরায় তিনি দস্যু রত্নাকর থেকে উন্নীত হলেন মহর্ষি বাল্মীকিতে। রত্না-কর নামের যথার্থ মহিমায় তিনি উদ্ভাসিত হলেন স্বীয় কর্মের সুকৃতিতে।

রত্নাকরের জীবনের এই যে ব্যাপক পরিবর্তন এজন্য সম্পূর্ণ কৃতিত্ব দাবী করে এসেছেন দেবতারা। কিন্তু সেদিন মা-বাবার কাছ থেকে বিমুখ হবার পরেও তিনি যদি স্ত্রীর কাছে বিমুখ না হতেন তাহলে হয়তো লুণ্ঠনবৃত্তি এবং নরহত্যা থেকে তিনি কোনক্রমেই বিরত হতেন না এবং পথিকরূপী দেবতাদের মৃত্যুও তাঁর হাতে অনিবার্য ছিল। আর এ তো তাঁর স্বাভাবিক প্রত্যাশা ছিল যে স্ত্রী অন্তত সব কাজে তাঁকে সমর্থন করবেন। কিন্তু যে মুহূর্তে তাঁর সেই প্রগাঢ় বিশ্বাসের ভিত আলগা হয়ে গেল তখন তিনি আর দাঁড়াবার মতো জায়গা খুঁজে পেলেন না। তাই মনে হয় যে, রত্নাকরের এই পরি-বর্তনে সবচেয়ে সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে-ছিলেন তাঁর স্ত্রী। দেবতারা কৃতকর্ম সম্পর্কে তাঁর মনে সংশয় সৃষ্টি করে-ছিলেন একথা সত্য। তবে সেই সংশয় দূরীভূত করতে এবং সমস্ত পাপের জন্য শুধু রত্নাকরকে নির্দিষ্ট করেছিলেন তাঁর স্ত্রী। এই মূল ভূমিকার কথা কিন্তু কোথাও তেমন সোচ্চার ঘোষিত হয় নি। রত্নাকরের স্ত্রী তাই রয়ে গেছেন উপেক্ষিতাই রয়ে গেছেন। যিনি কিনা এমন একটি মূল্যবান রত্ন আমাদের উপহার দিলেন তাঁর কথা আমরা ভুলে রইলাম। রত্নাকরের পরি-বর্তনে দেবতাদেরই জয় জয়কার। কোথাও এ কৃতিত্বে তাঁর স্ত্রীর ভূমিকা মূল্য করা হয় নি। অথচ রত্নাকরকে বাল্মীকি-রূপে পাওয়ার মূলেই হচ্ছেন তিনি। সেই-সঙ্গে তিনি স্বামীকে সৎপথে পরিচালিত করতে স্ত্রীর ভূমিকা কতখানি সে পথ নির্দেশও রেখে গিয়েছেন এবং মাধ্যমে বিশ্বের প্রথমা নারী [illegible] রত্নাকর-পত্নী এক মূল্যবান ঐতিহ্য। যুগ থেকে যুগান্তরে তিনি সকল স্ত্রীকে এমনিভাবে স্বামীর অন্যায় কাজের বিরোধিতা করে তাঁকে সুস্পষ্ট পথ-নির্দেশ দেবার ইংগিত করছেন।

স্বামীকে অন্যায় এবং অসত্য সম্বন্ধে সচেতন করে সুপথে পরিচালিত করার এই হলো ভারতীয় নারীর সুমহান ঐতিহ্য।

এবার এক নজর নিজেদের দেখে নেওয়া যাক। কোন সুনির্দিষ্ট নিরিখে নয়। এমন কি এই সুমহান ঐতিহ্যের পটভূমিকাতেও। কারণ, যে নারী একদিন এই যুগান্তকারী ঐতিহাসিক অধ্যায় রচনা করেছিলেন আজকের নারীর সেই ভূমিকা পালনের ব্যর্থতা তাঁকে লাঞ্ছিত, ক্ষুব্ধ এবং ক্লান্ত করবে। তাই উপরিউক্ত কাহিনীটিকে শুধু বলার জন্যই বলা হলো।

আমরা দুর্নীতির বিরুদ্ধে অনেক কথা বলি। সমাজবিরোধিতার মূলকে উপড়ে ফেলার ইচ্ছে প্রকাশ করি। খুবই ক্রান্তিকর হলেও ঘুরে ফিরেই একথাগুলি আমাদের শুনতে হয় এবং প্রয়োজন-অপ্রয়োজনে শোনাতেও হয়। এককথায় আমাদের মনের সদিচ্ছাকে প্রকাশ করার জন্যই এতসব করা। কিন্তু আমরা কখনো হিসেবের কড়ি মিলিয়ে দেখি না। কি বললাম আর কি করলাম তা ভাবি না। এর ফলে আমরা নিজেদের যে কি ভীষণ ক্ষতিসাধন করে চলেছি সেটুকু ভেবে দেখি না। আমাদের লাভের পাল্লাটা ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী হচ্ছে এবং লোকসানের ভার বয়ে বয়ে অন্যদিকের পাল্লাটা মাটিতে ঠেকছে। আর এ তো খুবই স্বাভাবিক

কারণ একটি নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে ডাক্তারি ফি আর ওষুধের দাম কতো তা স্ত্রীমাত্রেরই বেশ জানা। কিন্তু আকাঙ্ক্ষা তো আমাদের গগনচুম্বী। স্বামীর আয়ে কুলোক আর না কুলোক এই আকাঙ্ক্ষা আমাদের চরিতার্থ করতেই হয়। আর সব ব্যাপারে একটা তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মনোভাব আমাদের পেয়ে বসেছে। সব কিছুতেই নিজেকটা সাত-কাহন করে প্রচার করা চাই। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ না করে আমি থাকতে পারছি না। আমাদের মতো মাঝারি আয়ের পরিবারে একটা বড় অংশ যে চলে যায় ডাক্তারি খাতে একথা খুবই সত্যি। কিন্তু তা নিয়েও কেউ কেউ গর্ব প্রকাশ করতে ছাড়েন না। আমার এক আত্মীয়া ডাক্তারের কথা উঠলেই বলেন যে, বড় ডাক্তার না দেখালে আমাদের বাড়ির অসুখ সারার নয়। এই তো সেদিন খুকুর একটু সর্দিজ্বর হলো এতো টাকা ফি দিয়ে বড় ডাক্তার আনতে হলো। তারপর তিনি বেশ গর্বভরে টাকার অঙ্কটা বললেন। তাঁর মনোভাব এরকম যে প্রস্তুত এখানে তিনি জিতে গেছেন। এরকম জয়ের আত্মতৃপ্তিতে কারো কোন আপত্তি থাকতে পারে না। তবে প্রশ্ন হলো যে সাধারণ সর্দিজ্বরে অতো টাকা ফি দিয়ে বড় ডাক্তার ডাকার মতো আয় তাঁর স্বামীর নয়। অসুখ-বিসুখ হলে বড় ডাক্তার ডাকতে হবে বৈকি। তাবলে সবসময় বড় ডাক্তার নিয়ে পড়ে থাকলে এই বাড়তি টাকা আসবে কোত্থেকে সে প্রশ্নও তাঁর থাকা উচিত। কিন্তু আমার ধারণা সে জ্ঞান তাঁর নেই। তাঁর লক্ষ বড় ডাক্তার ডাকা, সুতরাং স্বামীকে সেই লক্ষ পূরণ করতেই হবে। নাহলে স্ত্রী বিগড়ে বসবেন। নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার জানিয়ে বলবেন যে, স্বামীর সংসারে এসে তাঁর কোন সখই পূরণ হলো না। অথচ পাশের বাড়িতে নিত্য বড় ডাক্তারের যাতায়াত। তিনি আরো অনেক অভিযোগ করবেন তবু একবার তলিয়ে দেখবেন না পাশের বাড়ির ভদ্রলোকের সঙ্গে তাঁর স্বামীর আয়ে কি আকাশ-পাতাল প্রভেদ। অশান্তি এড়ানোর জন্য স্বামী পূরণ করে চলেন স্ত্রীর বড় ডাক্তারের সাধ। আর এর ফলে তাঁকে চিন্তা করতে হয় মাইনের বাইরে আরো কিছু আয়ের। বলা বাহুল্য যে, সে পথে সাধুতা থাকে না। কিন্তু অসাধুতা ছাড়া স্ত্রীর মন জোগানো সম্ভব নয়। এমনিভাবে স্ত্রীর সাধ মেটাতে গিয়ে স্বামী দুর্নীতির আশ্রয় নিচ্ছেন। যার অপর নাম সমাজবিরোধিতা। রত্নাকর-পত্নী স্বামীকে সমাজবিরোধী কাজ থেকে নিবৃত্ত হতে সাহায্য করেছিলেন। আর আমরা জেনেশুনে স্বামীকে সে নরকে ঠেলে দিচ্ছি। একথা বিন্দুমাত্র আমাদের বিবেক-দংশন হয় না।

এর মূল কারণ সম্ভবত যে, আমরা দুর্নীতি এবং সমাজবিরোধিতাকে ভিন্ন-রূপে দেখছি। অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জন বোধে দুষ্ট হওয়াকে আমরা বলি দুর্নীতি। আর কোন গর্হিত অপরাধ অর্থাৎ খুন ইত্যাদিকে বলি সমাজবিরোধিতা। রত্নাকর একই সঙ্গে দুটি কাজই করছেন। আরো সহজ করে বলা যায় যে, অর্থ উপার্জনের জন্যই তিনি নরহত্যার পথ বেছে নিয়েছিলেন। এর কোনটাই সামাজিক ন্যায়বিধান অনুযায়ী নয়। দুটি কাজই ঘোরতর সমাজবিরোধিতার সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু আমরা বে-আইনী অর্থ উপার্জনকে সমাজবিরোধিতার পর্যায়ে ফেলি না। এ শুধু নিজেদের স্বার্থে। অথচ আমরা সবাই জানি যে খুন-ছিনতাই যেমন সামাজিক অপরাধ তেমনি উৎকোচ গ্রহণও সামাজিক অপরাধ। এমনিতে দুয়ের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। তফাৎ যা তা হলো যে একটা ভদ্রলোকী পদ্ধতিতে এবং অন্যটা হঠকারিতায়। যারা সাহসে কুলোয় এবং ভদ্রতার মিশায় যারা হাত পাকাতে পারে নি তারা শেষ পথের আশ্রয় নেয়। আর একদল চোস্ত ভদ্রতার মুখোশ পরে প্রথম পথে চলছেন।

দুর্নীতি এবং সমাজবিরোধিতার মূলোচ্ছেদে স্ত্রীর ভূমিকাই এখন সবচেয়ে সক্রিয় হওয়া প্রয়োজন। স্ত্রী স্বামীর পুণ্যের সহ-অংশীদার, পাপের নয়। তাই স্বামীকে পাপের পথে যেতে দিয়ে স্ত্রী স্বতন্ত্র পাপ অর্জন করছেন। যার ওপর নাম সামাজিক অপরাধ। এই অপরাধ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে এবং স্বামীকে নিবৃত্ত করতে তিনি এক বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন যা করেছিলেন রত্নাকর-জায়া। কিন্তু সে-পথে আমাদের সবচেয়ে বড় অন্তরায় হলো লোভ। লোভের পোকা আমাদের কুরে কুরে খাচ্ছে। তাই স্বামীর সামর্থ্যের অভাব জেনেও আমরা বেমক্কা বায়না ধরি। নিজেকে বাদ দিয়ে আমরা চোখা-চুকুরে কেউই পাঠ। কোন কোন মা একথা বলতে খুব গর্ববোধ করেন যে তাঁর ছেলে বা মেয়ে যিন-এগারোটি বিষয়ে সংকুচিত নয়। একটু পাকা বিস্কুট নাহলে ওদের চলে না। তাঁরা স্বামীর কাছে আব্দারের সুরে বলেন যে, সেই ছোটবেলা থেকে ওদেরকে খুব ভাল বিস্কুট কিনে খেতে অভ্যস্ত করেছি সেরকম আর পাও না। খুকু, খুদু ওই বিস্কুট খেতে চায়। উপরন্তু সামান্য বিস্কুট কিন্তু পরিমাণে খুবই সংকল্প। এই বিস্কুট থেকে যে কি ধরনের গঠন তৈরী হচ্ছে তা তিনি জানেন না। না জেনে-শুনে তিনি স্বামীর আরো একটু বেশী উপার্জনের আকাঙ্ক্ষাকে।

স্ত্রীর কর্তব্য সর্বপ্রকারে স্বামীকে দুর্নীতিমুক্ত করা। স্ত্রীর কাছে স্বামী প্রায় কোনকিছুই গোপন করেন না। সব জেনেও যদি স্ত্রী স্বামীকে দুর্নীতি মুক্তিতে সাহায্য না করেন তবে যে সামাজিক অপরাধ করা হবে তা থেকে তাঁরা কেউ রেহাই পাবেন না। একথা সত্য যে, সব স্ত্রীই স্বামীর দুর্নীতিকে ঘৃণা করেন। তবু জানার সঙ্গে সঙ্গে এ ব্যাপারে স্ত্রীর সতর্ক হওয়া প্রয়োজন এবং স্বামীকে দুর্নীতিমুক্ত করতে সক্রিয় পদক্ষেপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। বৃহত্তর সামাজিক মঙ্গলবোধে উদ্বুদ্ধ হয়েই তা করা উচিত। রত্নাকর-জায়াও একদিন এই মঙ্গলবোধেই অনুপ্রাণিত হয়ে স্বামীকে অসৎ কর্ম থেকে নিবৃত্ত হতে সাহায্য করেছিলেন। আর সেখানেই রয়েছে স্বামীর তথা সমাজের মঙ্গলায়তনের নিদানরূপে স্ত্রীর যথার্থ পদক্ষেপ। তবু এ পথেই দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ সম্ভব।

—প্রশীলা

বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ

দ্বিতীয় মুদ্রণের কাজ শুরু হচ্ছে। তিন খণ্ডে একত্রে গ্রাহক চাঁদা ১৯ টাকা। গ্রাহক তালিকাভুক্তির সময় পাঁচ টাকা জমা দিতে হবে। প্রথম ও দ্বিতীয় কিস্তির সময় সাত টাকা করে দিতে হবে। রাজ্য সরকারের অনুদান পেলে দ্বিতীয় কিস্তির সময় এই অনুদানের সমপরিমাণ অর্থ কম নেওয়া হবে। ডাক বিভাগের মাধ্যমে এক সঙ্গে বেশী সংখ্যায় পাঠানো না যাওয়ায়, ভি. পি. পি. পেতে অনেকের দেরী হচ্ছে।

যোগাযোগ করুন :—

সাক্ষরতা প্রকাশন

পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি,

৩৭এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

বিদ্যাসাগর স্মারক জাতীয় সমিতি

এক নজরে

দেহদান : ইদানিং পশ্চিমী দুনিয়ায়, বিশেষ করে আমেরিকায় যে চক্ষুদান, দেহদান (আক্ষরিক অর্থে) প্রভৃতির হিড়িক পড়েছে তা তার মানবিক মূল্য হারিয়ে একটা বড় রকমের সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কয়েক দশক আগেও ইংলন্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের মেডিকাল ছাত্রদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজনে মড়া পাওয়া একটা কঠিন সমস্যা ছিল। কারণ আমাদের দেশের মতো অগণিত ভিক্ষুক, ভবঘুরে সেসব দেশে কোনদিনই ছিল না, আজও নেই। সুতরাং মেডিকাল কলেজ সংলগ্ন হাসপাতালগুলিতে রেজিমেন্ড মড়া পাওয়ার কোন উপায় ওদের নেই। তারপর সব মৃতব্যক্তির দেহ ধর্মীয় মতে সমাহিত করার রীতি এতদিন পর্যন্ত সেসব দেশে অতি নিষ্ঠার সঙ্গে পালিত হয়ে এসেছে। এসব কারণে একদা এশিয়া আফ্রিকা থেকেও পশ্চিমী দেশগুলিতে মৃতদেহ চালান যেত এবং ঐ ব্যবসা করে পয়সাও করেছিল অনেকে। আর ঐসব দেশেরই একদল শব-চোর রাত্রির অন্ধকারে কবর থেকে সদ্যসমাহিত শব তুলে নিয়ে গিয়ে হাসপাতালে বিক্রি করে প্রচুর রোজগার করত। শব চুরির হিড়িক ইংলন্ডে একসময় এত বেড়ে গিয়েছিল যে তা বন্ধের জন্য ঐ অপরাধে মৃত্যুদণ্ডের বিধান সেদেশে একদা বলবৎ হয়েছিল। ক্যাথলিক দেশগুলিতে এখনও মেডিকাল কলেজে ব্যবচ্ছেদের জন্য চুরি করা শব ব্যবহার পোপের নির্দেশে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

মেডিকাল ছাত্রদের শিক্ষার জন্য শবের অভাব দূর করতে ইদানিং মানবতাবাদী এবং মরণোত্তর ধর্মীয় রীতি-নীতিতে অবিশ্বাসী কিছু কিছু লোক মৃত্যুর পর তাঁদের দেহ বিশেষ কোন মেডিকেল কলেজে দান করার জন্য—'উইল' করা শুরু করেন এবং তাঁদের সে মহৎ দান একদা বিশেষ সংবাদ হিসাবে সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশিত হত। কিন্তু সম্প্রতি ঐ মহৎদানের চাপ আমেরিকার মেডিকাল কলেজগুলির পক্ষে একটা রীতিমতো সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং বহু কলেজ কর্তৃপক্ষ নিরুপায় হয়ে ঘোষণা করতে বাধ্য হচ্ছেন যে, বেশ কিছুদিনের মধ্যে আর কোন দেহ তাঁদের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব হবে না। ইলিনয় মেডিকাল স্কুলে সারা বছরে ৩৬০টি মৃতদেহের প্রয়োজন হয়, কিন্তু এই বছরের অর্ধেক না পেরোতেই তাদের হাতে ৩১০টি উইল করা মৃতদেহ জমে গেছে, কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, আরও ২১,০০০ ইলিনয় রাজ্যবাসী মেডিকাল স্কুল কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে রেখেছেন। তাঁদের মৃতদেহ যেন মেডিকাল ছাত্রদের শিক্ষার কাজে ব্যবহার করা হয়। ওহিও স্টেট ইউনিভার্সিটি স্কুল অফ মেডিসিনের সারা বছরে ৮০টি মৃতদেহের প্রয়োজন হয়। কিন্তু এখনই তাদের হাতে ১২৭টি মৃতদেহ জমে গেছে, তাদের কোল্ড স্টোরেজে আর শব রাখার জায়গা নেই। ইউনিভার্সিটি অফ উইসকনসিন মেডিকাল স্কুলে বছরে ৬০টি শব-ব্যবচ্ছেদ হয়, কিন্তু ঐ কলেজের দপ্তরে পাঁচ হাজার দেহদানীর আবেদন স্তূপীকৃত হয়ে উঠেছে।

এই দেহদানের জন্য গণ-আবেদনের পিছনে দুটি বড় কারণ আছে বলে মনে করা হচ্ছে। প্রথম কারণ, ধর্মের আবেদন মানুষের মনে আর আগের মতো সাড়া জাগায় না, তাই মরণোত্তর ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলি এখন অনেকের কাছেই অবশ্য পালনীয় বলে মনে হয় না। তাঁরা এখন দেহকে মাটির নীচে পুঁতে মাটিতে পরিণত করার চেয়ে শিক্ষার মহৎ কারণে দান করাকে বড় বলে মনে করছেন। আর দ্বিতীয় কারণ, যেটি প্রথম কারণের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ, যে মাটিটুকুর নীচে বিগত-প্রাণ দেহটির শেষ আশ্রয় পাওয়ার কথা তার কল্পনাও সাধারণ মানুষের আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে। আমেরিকার যে কোন কারখানায় এখন দু-হাত চওড়া, চার হাত লম্বা জমির দাম কয়েক হাজার ডলার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ধর্মবিশ্বাস বাড়ছে : কদিন আগে সরকারীভাবে '৭১ সালের লোকগণনার যে হিসাব প্রকাশিত হয়েছে তা দেখে মনে হয়, এদেশে মানুষের ভগবানে বিশ্বাস বাড়ছে। ইতিপূর্বে '৬১ সালে যখন লোকগণনা হয় তখন সারা ভারতে মোট এক লক্ষ ১০ হাজার ১৮৮ জন জানিয়েছিল যে তাদের কোন ভগবানে বিশ্বাস নেই; ঐ সংখ্যা ছিল সারা ভারতের তৎকালীন মোট জনসংখ্যার ০·০৩ শতাংশ। এবার সে জায়গায় দেখা যাচ্ছে, মোট ৩৬ হাজার ৮৩ জন জানিয়েছে যে তারা নিরীশ্বরবাদী এবং ঐ সংখ্যা এবারের মোট জনসংখ্যার ০·০১ শতাংশ।

এবার দেখা যাচ্ছে, গুজরাতের অধিবাসীদের মধ্যে নিরীশ্বরবাদীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। তাকে অনুসরণ করেছে যথাক্রমে মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব ও মণিপুর। গুজরাতে ১৯৬১ সালে মাত্র দুজন জানিয়েছিল যে তাদের ভগবানে বিশ্বাস নেই; কিন্তু এবার সে রাজ্যের ১,৫৪৭ জন ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করেছে। মহাত্মা গান্ধী, মোরারজি দেশাইর দেশের কয়েক হাজার মানুষের হঠাৎ ভগবান সম্পর্কে এত বেপরোয়া মনোভাব নেওয়ার কারণ কি তা অবশ্য সেন্সাস রিপোর্টে বলা হয়নি। গুজরাতের প্রতিবেশী রাজ্য মহারাষ্ট্রেও পাঁচ হাজারের বেশি মানুষ জানিয়েছে যে তারা বিশেষ কোন ধর্মানুসারী নয়; পাঞ্জাবে ঐ সংখ্যা কিঞ্চিদধিক চার হাজার এবং বৈষ্ণবের দেশ বলে পরিচিত মণিপুরে নিরীশ্বরবাদীর সংখ্যা প্রায় চার হাজার। সারা ভারতে ত্রিপুরাই একমাত্র রাজ্য যার প্রত্যেকটি অধিবাসী নিজেকে কোন-না-কোন ধর্মাবলম্বী বলে পরিচয় দিয়েছে।

প্রকাশিত রিপোর্টে পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে কোন উল্লেখ নেই। তাহলে এ রাজ্যের সব জড়বাদী কি নিজেদের একই সঙ্গে জড়বাদ ও ঈশ্বরতত্ত্বে বিশ্বাসী বলে জানিয়েছেন? মোট কথা, সেন্সাস রিপোর্টে নিরীশ্বরবাদের ব্যাপারটি খুব বিশদভাবে আলোচনা করা হয়নি।

ভিক্ষাবৃত্তির মর্যাদা : কেরল রাজ্যের ভিক্ষুকরা ভিক্ষাকে একটি মর্যাদাপূর্ণ বৃত্তিতে উন্নীত করার জন্য উদ্যোগী হয়েছে। আপাতত তেলিচেরি, কান্নানোর ও কোঝিকোড় এই তিন শহরের ভিক্ষুকরা মিলিত হয়ে একটি ইউনিয়ন গঠন করেছে এবং তাদের সে ইউনিয়নের সভাপতি হয়েছেন রাজ্যের কুষ্ঠরোগী এসোসিয়েশনের প্রধান শ্রীভার্গিজ কোরাট্টি। ভিক্ষুক ইউনিয়ন সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তাদের সদস্যরা যতটা ভিক্ষা চেয়ে শহরবাসীদের উত্যক্ত না করে শহরের নির্দিষ্ট কয়েকটি স্থানে ইউনিয়নের ব্যাজ পরে ভিক্ষা চাইবে। তাতে ভিক্ষা অনেক বেশি পাওয়া যাবে বলে তাদের ধারণা। আর রোজ সকলে ভিক্ষায় না বেরিয়ে তারা অন্যান্য শ্রমজীবীদের মতো সপ্তাহে দেড়দিন অন্তত ছুটি ভোগ করবে। প্রয়োজন হলে আট ঘণ্টার শিফ্‌ট ডিউটিও তারা চালু করবে এবং প্রতিদিন যা সংগ্রহ হবে তা তারা নিজেদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে নেবে।

পরিকল্পনাটি নিঃসন্দেহে অভিনব, এবং এর মধ্যে একটা সাম্যবাদী চিন্তাধারারও পরিচয় মেলে। কিন্তু কেরলের ভিক্ষাজীবীরা ঐ পরিকল্পনার ফাঁকটুকু নিশ্চয়ই নজর করেননি। তারা না হয় শহরের নির্দিষ্ট কয়েকটি জায়গায় ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে চলমান পথিকদের করুণা উদ্রেকের চেষ্টা করবে। কিন্তু তাদের ইউনিয়নের যারা সভ্য নয় সেই সব ভিক্ষুক ত সেই সময় তাদের ছেড়ে যাওয়া স্থানগুলি দখল করে নিয়ে আগের মতোই আর্তকণ্ঠে ভিক্ষা চেয়ে সব পথ মুখর করে রাখবে! তাদের ত গায়ের জোরে সরানো যাবে না, কোনরকম গণ্ডগোল হলেই সেখানে পুলিসের আবির্ভাব ঘটবে আর সেই সঙ্গে অনর্থ। সুতরাং পরিকল্পনাটি সফল হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না।

—প্রত্যক্ষদর্শী

॥ মিনারের ওপরে মিনার ॥

দক্ষিণারঞ্জন বসু

কুঠী নয়, কোটি কোটি
মিনারের ওপরে মিনার
আকাশের স্পর্শ করে আছে,
যদিও রয়েছে ছুঁয়ে মনের কিনার—
এ দৃষ্টি পৌঁছে না সেথা
যতই না আসি তার কাছে।
পদ্মার প্রমত্ত নীরে
ছায়া তার সূচির ভাস্বর,
আমরা বিমুগ্ধ হই
সে নদীর শুনে কলস্বর।
সবুজ সবুজ সোনা
দিকে দিকে প্রাণের প্রকাশ,
হেথা মৃত্যু অস্বীকৃত
জীবনের পরম আশ্বাস।
এই সে শিলাইদহ
নবতম শান্তিনিকেতন,
যুগতীর্থে এসে করি
শতাব্দীর কাঁদারে স্মরণ।
এ বাতাস এ মাটিতে
এসে যেন স্বর্গ পেলাম,
এ ধূলায় মনখানি
সহস্র প্রণতি সাথে রাখিয়া গেলাম।

॥ দুর্গাপুর বন্দীজ ॥

অনীতা গুপ্ত

যেন কোন দর্পিত সম্রাট—
প্রসারিত দুই বাহু,
কঠিন মুঠিতে বন্ধ দুই তীর,
মায়াবী এ চাঁদের আলোয়
দ্যুতিমান ইস্পাতের হীরক মুকুট।

তথাপি আঁধার দেখ অতল গভীরে।
অবাধ ঢেউয়ের কান্না কঠিন কপাটে,
সামনে সুদৃঢ় লৌহ,
সম্রাট অটল।

সাফল্যগর্বিত এক ঊর্ধ্বশির জীবনে আঁধারে
অশ্রুর দারুণ বিদ্রোহ:
আসন্ন বর্ষায় তার মুক্তি সুনিশ্চিত।

॥ যেমন দেহের কোষে মন ॥

শিশির ভট্টাচার্য

যেমন দেহের কোষে মন,
অণু অণু খুঁজে
কিংবা
প্রসারিত ভেঙে
কোথাও
পাবে না কেউ তাকে।
যদিও সে আছে,
একাকী
অত্যন্তভাবে কাছে
এবং বস্তুত
মনছাড়া শরীরের অস্তিত্ব পুতুল।

তেমনি রক্তের ক্রমে তুমি—
চেতনার উজ্জয়িনী স্রোত,
যেন ওতঃপ্রোত
ধমনী শিরায়
সমুদ্রের জোয়ার সফেন
শঙ্খচিল এবং নুলিয়া।

অথচ কেমন তুমি
দ্বিধাহীন সহজ উধাও
আশ্চর্য স্বাধীন—
উদ্ভাসিত রৌদ্রময় নীলে;
যখন মিছিলে
আমি শুধু গোত্রহীন মুখ
অতিব্যস্ত দিন থেকে দিন
উদাসীন প্রখর গৈরিকে।

বাড়িটার সামনে এসে থমকে দাঁড়াল সুমিতা।

এতক্ষণে কেমন যেন ভয় ভয় করছে। হাতের তালু ঘেমে গেছে। গলা শুকিয়ে গেছে যেন।

সামনে সেই দীর্ঘ বাড়িটা। সাততলা উঁচু। আর্মোরিয়ান ধাঁচে তৈরী। সোজা চওড়া গলির মতো। দুদিকে নিয়েট দেওয়াল। খানিক দূরে গিয়ে দুটো পাশাপাশি লিফট। কেতাদুরস্ত নারীপুরুষ ব্যস্তভাবে যাতায়াত করছে: দু-একটা উর্দিপরা বেয়ারা ছোটাছুটি করছে চারদিকে।

সুমিতা চোখ ফিরিয়ে এদিক-ওদিক দেখে নিল। পাশেই ফুটপাতের গা ঘেঁষে সারি সারি গাড়ি দাঁড়ালো। নিশ্চয়ই অফিসারদের। বিরাট বিরাট সব দেশী সাহেব। এদেরকেই বেশী ভয় সুমিতার।

ও একবার ভাবল এসেই ভুল করেছে। বরং ফিরে যাওয়াই ভাল।

কিন্তু পরক্ষণেই মায়ের মুখটা ভেসে উঠল। দীর্ণ একটা অস্তিত্ব। সূক্ষ্ম সুতোয় জীবনটা ঝুলছে যেন। সুমিতার মনে হল পক্ষপাতায় ভর।

সুতরাং শীলাকে চাই। পেতেই হবে তাকে। যেমন করেই হোক।

সুমিতা এগিয়ে গেল।

দারোয়ানকে বলল, আছ—

গলাটা কেঁপে উঠল। আবার হাতের তালু ভিজে গেল।

ভোলো রকমে সুমিতা বলল — এটাই তো কাস্টমস্টাল ট্র্যাভেলিং—

বিজ্ঞের মতো দারোয়ান হাসল। বলল—এখানে অনেকগুলো অফিস আছে। কাস্টমস্টাল সাততলায়। লিফটমে উঠিয়ে যান। ডানদিকে—

ভয়ে ভয়ে সুমিতা একবার লিফটের দিকে তাকাল। সেখানে তখনও ব্যস্ত নারীপুরুষের ভিড়। পাশাপাশি দুটো লিফটে অনবরত উঠছে নামছে।

একটু হেসে সুমিতা বলল — মানে, আমার এক বন্ধুর কাছে এসেছি। ও আসতে বলেছিল। কিন্তু ও অফিসে এসেছে কিনা—

দারোয়ান বলল—ঠিক আছে। ডানদিকে ওই ঘরে চলিয়ে যান—জিজ্ঞেস করুন কোইকে।

ডানদিকের কাঁচের আস্তরণটার দিকে চেয়ে সুমিতা বলল—ওখানে?

দারোয়ান মাথা নাড়ল।

সুমিতা এগিয়ে গেল।

কাঁচের মধ্যে দিয়ে ভেতরটা দেখা যাচ্ছে। সারি সারি চেয়ার টেবিল। এক দঙ্গল লোক নিবিষ্ট মনে কাজ করছে। একটা মেয়ে খটেখাট করে টাইপ করে যাচ্ছে। সুমিতার মনে হল শব্দটাও কান পাতলে শোনা যাবে। কিন্তু যেতে হবে কোনখান দিয়ে? মাঝখানে যে কাঁচের এক পার্টিশন।

হঠাৎ দেখল এক জায়গায় লেখা 'পুশ'।

সুমিতা আলগোছে ঠেলল। মুহূর্তে ভেতরে যাওয়ার পথ হয়ে গেল।

আ, কি ঠাণ্ডা ভেতরটা। শরীরটা জুড়িয়ে গেল যেন।

সুমিতা ইংরেজী তর্জমা করে নিল। বলতে হবে—আমি শীলা ব্যানার্জির বন্ধু। দেখা করতে এসেছি। আই শলল কি থ্যাংকফুল—

সামনে শোকেসের মতো কাঁচের টেবিল। ওপরে একটা কালো বোর্ডে লেখা রিসেপসনিস্ট। স্বল্পবেসনী একটা মূর্তিমতী আগুন টেলিফোনের রিসিভার নিয়ে ইনিয়ে-বিনিয়ে কথা বলছে।

সুমিতা দু একটা মুহূর্ত ইতস্তত করে কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

মেয়েটি রিসিভার ক্রেডলে রেখে বলল, ইয়েস—

ব্যস, সব গুলিয়ে গেল সুমিতার। এতক্ষণের তর্জমা কোথায় হারিয়ে গেল আবার। সেই হাতের তালু ঘেমে গেল। গলা শুকিয়ে গেল একেবারে।

অনেক কষ্টে বলল—মানে এখানকার শীলা ব্যানার্জি— আপনাদের কমার্শিয়াল সুপারিন্টেন্ডেন্টের পার্সোনাল—

মেয়েটি একটু বিস্মিতভাবে চাইল। কয়েক মুহূর্ত পরে বলল, ও হ্যাঁ, কিন্তু তিনি তো এখানে আর কাজ করেন না। —দিন পনেরো হল—

যেন আর্তনাদ করে উঠল সুমিতা। ফিসফিস করে বলল—কাজ করে না, কিন্তু আমি যে—

মেয়েটি বলল বোধ হয় আপনি ওর রিলেটিভ বা ফ্রেন্ড। আপনাকে বেশী কিছু বলতে পারবো না। শুধু শুনে রাখুন, সি ইজ ম্যারেড।

এবার চমকে উঠল সুমিতা। চাকরী ছেড়ে গেছে শীলার? এরা তাড়িয়ে দিয়েছে? তাহলে নিশ্চয়ই কোন অপরাধ করেছিল। এই মুহূর্তে নিজেকেই যেন অপরাধী বলে মনে হল সুমিতার। যেন সবাই ওর দিকেও সন্দেহের দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। কখনো কোনো অপরাধে কিছুতেই বন্ধবীর জন্য যেন এতক্ষণে সুমিতাই সবাইর কাছে ছোট হয়ে গেছে।

কিন্তু শীলা কি এখন ফ্রেঞ্চ বেকার? নাকি অন্য কোথাও চাকরী জুটিয়ে নিয়েছে?

ওর ভেতরের আগুন তো এত তাড়াতাড়ি নিভে যাওয়ার কথা নয়। নিশ্চয়ই ও এতক্ষণে অন্য কোনো ফ্ল্যাটে বসে ডিকটেশন নিচ্ছে। অথবা বসের সাথে ইনস্পেকশনে গেছে মনোরম কোনো পার্বত্য পরিবেশে।

কত স্নেহ, কত ভালবাসা দিয়ে বাড়ীতে তৈরী...

উষা

সেলাই মেশিনে সেলাই করে পয়সা বাঁচান

আপনার ছেলে-মেয়ের পোষাক স্নেহ ও যত্ন সহকারে, তাড়াতাড়ি ও খুব সহজে, উষা সেলাই মেশিনে নিজেই তৈরী করুন, আর ঘরে সেলাই করে পয়সা বাঁচান। উষা মেশিন চালানো খুব সহজ আর এর পেছনে রয়েছে সেলফ্যাণী উষা সার্ভিস ব্যবস্থা। তাই উষা কেনা মানেই সারা জীবনের মত সুন্দর অর্থ-বিনিয়োগ। আজই একটা কিনে নিন।

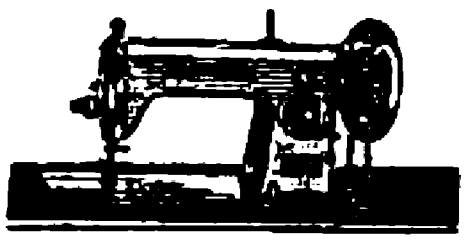

এটি হল সোজা সেলাইয়ের সুদৃশ্য আবরণযুক্ত স্ট্রীমলাইনড মডেল। আপনার উষা ডিলারের কাছে এটির এবং অন্যান্য আধুনিক মডেলের কাজ নিজে দেখে আসুন। উষা মেশিন হাতে, পায়ে এবং মোটরে-চালিত পাওয়া যায়।

Gmt. 267 72

কেনা ভাল সবার ভাল উষা

আবার কেমন যেন নিজেকে অসহায় মনে হল সুমিতার। যেন সব আলো নিভে গেছে হঠাৎ। যেন হঠাৎ পায়ের নীচের মাটি সরে গেছে। ও যে কত আশা নিয়ে এসেছিল এখানে—একটা মেয়ে এতক্ষণ ওদের কথা শুনেছিল। এবারে সে উঠে এল। ছোট্ট একটা কাগজের টুকরো সুমিতার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল—শুনুন, ওর ঠিকানাটা শুধু আমি জানি। আপনাকে লিখে দিলাম। জগুবাজারের স্টপেজে নামবেন। ডানদিকে—

কয়েক মুহূর্ত কাগজটার দিকে চেয়ে সুমিতা সম্বিত ফিরে পেল। হনহন করে বেরিয়ে এল ওখান থেকে। নমস্কার জানানোর ভদ্রতাটুকুও মনে রইল না।

বাসস্ট্যান্ডে এসে দাঁড়িয়ে শুধু ও শীলার কথাই ভাবল।

এক স্কুলে ওরা পড়েছে। একেবারে ফাইনাল পর্যন্ত। এক পাড়াতেই বাড়ি। সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে শীলা। ওর বাবা কোথায় যেন সামান্য কি একটা কাজ করতেন। অনেকগুলো ছেলেমেয়ে নিয়ে কষ্টের সংসার।

শীলা এই অবস্থা মেনেই নিয়েছিল প্রথমে। কিন্তু কলেজে উঠেই যেন ও হঠাৎ অন্যরকম হয়ে গেল। মেতে উঠল হৈচৈ নিয়ে। পিকনিক, এক্সকারসান এসব নিয়েই দিন কাটাল। ক্লাশের চাইতেও বড়ো আকর্ষণ হয়ে উঠল ক্যান্টিন আর কফি হাউস। বন্ধুদের সংখ্যা তখন নগণ্য। যত্র তত্র ধনীর দুলালরাই ওর নিত্যকার সঙ্গী।

ক্রমে সুমিতার সঙ্গে ওর দূরত্ব বাড়ল। ইংরেজীতে অনার্স পেয়ে ও কোথায় যেন চলে গেল। কানাঘুষো শোনা গেল অনেক। কেউ বলল ও বোম্বেতে পালিয়েছে এক মার্চেন্টের ছেলের সঙ্গে। কেউ বলল ও বিয়ে করেছে এক নাভাল অফিসারকে।

ক্রমে শীলার নামটা মুছে গেল সবাইর স্মৃতি থেকে।

ওর চলে যাবার কিছুদিন আগে সুমিতা ওকে একদিন শুধু বলেছিল—হ্যাঁরে, তোর কথা আমি প্রায়ই ভাবি। এমনি করে চললে কোনদিন শান্তি পাবি তুই? তার চাইতে—

শীলার দুচোখ জ্বলে উঠেছিল।

বলেছিল—নো, নেভার। আমি তোদের মতো ভাঙা ঘর থেকে দুটো সংসারে যেতে জন্মাই নি। জীবন আমার কাছে একটা চ্যালেঞ্জ। আমি দেখিয়ে দেবো যে ইচ্ছে করলে সোসাইটির উঁচুতলায় উঠে যাওয়া যায়—ইফ্ ইউ হ্যাভ অ্যাম্বিশন, অ্যান্ড, অ্যান্ড—

ওকে শেষ করতে না দিয়েই চলে এসেছিল সুমিতা।

সেই সুমিতাকেই প্রচন্ড এক অ্যাম্বিশনের মূর্তিমতী রূপ হয়ে দেখা দিয়েছিল শীলা। মাস সাতেক আগে।

কি একটা কারণে স্কুল সেদিন হঠাৎ ছুটি হয়ে গেছে।

সুমিতারা কয়েকজন সিনেমা দেখতে এল চৌরঙ্গী পাড়ায়। সুমিতা আগে এদিকে আসেনি। চাকরী পাওয়ার পরেও এই কলমল পৃথিবীতে এসে রঙীন জীবনের স্বাদ নেওয়ার সাহস ওর হয়নি। বাস থেকে এই পাড়ার ব্যস্ততা আর প্রাচুর্যের ছবি দেখে ওর বারবার মনে হয়েছে যে, এখানে ও বড্ড বেমানান।

সেদিন ওরা এলিটের দিকে এগোচ্ছে। পরে ফুটপাতের কাছে এসে নিঃশব্দে দাঁড়াল জাহাজের মতো চাউস এক মোটর। সুটপরা দীর্ঘদেহী এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। পেছনে পেছনে স্বল্পবেশী এক তরুণী।

এক মুহূর্তে সুমিতা স্তব্ধ হয়ে গেল। হ্যাঁ, শীলা ব্যানার্জি।

একটা নীল সিল্কের শাড়ি। ম্যাচ করে ব্লাউজ। গলায় কি একটা মালা। বোধহয় মুক্তোর। খোঁপাকে মাথার ওপরে তুলে বাঁধা। ঠোঁটে রঙ। গায়ে দামী সেন্টের গন্ধ। হাতে বাটিকের কাজ করা একটা ব্যাগ।

পুরুষটি ওর কোমর জড়িয়ে ধরে কি যেন বলতে বলতে যাচ্ছিল।

সেই সময় শীলা দেখল সুমিতাকে।

লোকটিকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ছুটে এল। অন্য শিক্ষিকাদের কাছ থেকে এক ঝটকায় সুমিতাকে সরিয়ে নিয়ে এসে বন্যার মতো উচ্ছল হয়ে উঠল।

—সুমি না? অবাক হয়ে গেছিস? তারপর কেমন আছিস, বল? কোথায় যাচ্ছিস? মাসীমা কেমন আছেন রে? কি করছিস এখন?

সুমিতা সব কথারই উত্তর দিল একে একে।

শীলা বলল—কিন্তু তোর চেহারা এইরকম হয়ে গেল কেন রে? বিয়ে হবে কি করে?

সুমিতা হাসল। বলল—সেজন্য চিন্তিত নই। তারপর বল্, তোর কি খবর?

শীলা হাসল। মুক্তোর মতো দাঁত দেখা গেল এবার।

বলল—দেখতেই তো পাচ্ছিস। ও হ্যাঁ, ওই যে লোকটা দেখছিস না, ও হল আমার বস। আমি ওর পার্সোনাল অ্যাসিস্টেন্ট। ইচ্ছে করেই আগুনে পুড়ে মরবে, আমি কি করব, বল্?

ও আফসোসের ভঙ্গিতে মুখে চুকচুক করে শব্দ করল।

সুমিতা কি যেন ভাবছিল।

শীলা বলল—যাক্ সে। হ্যাঁরে, তুই স্কুলে কত পাস?

এই মুহূর্তে সুমিতার কেমন যেন লজ্জা করল শীলার কাছে। ইতস্তত করে বলল—শ দুইয়ের মতো হয়।

ভ্রূ দুটো কুঁচকে শীলা কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইল। চোখ দুটো স্থির হয়ে গেল। নীচের ঠোঁটটা একটু ঝুলে গেল।

বলল—গত মাসে আমি একটা ইনক্রিমেন্টই পেয়েছি আড়াইশো টাকার। থাক্ গে, চলি রে।

ব্যাগ থেকে একটা ছোট্ট সাদা কার্ড বের করে বলল—রেখে দে। একদিন সময় করে এলে ভাল করে কথা বলব, কেমন? টাইস ইউ—

তারপর অনেকদিন ভাল করে ঘুমোতে পারে নি সুমিতা। কোনো কাজে মন লাগে নি। সারা মাস মেয়ে ঠেঙিয়ে, গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে দুশো টাকাও জোটে না। আর একটা ইনক্রিমেন্ট আড়াই শো টাকার? তার মানে মোট কত পায় শীলা?

অথচ বাবা রিটায়ার করার পর সুমিতার ওপরেই সংসার। বাবার পেন্সনের সাতষট্টি টাকার মধ্যে অর্ধেক তো যায় এঁর ওষুধপত্র আর পথ্যে। মায়ের ক্যান্সার। চিকিৎসা করা ওর সাধ্যাতীত। একটা আশা ছিল বাবুয়া। কলেজে পড়ছিল, যদি ভাল করে পাশ করে

বাসে উঠেই বসতে পেল সুমিতা। জগুবাজারের স্টপেজে নামতে হবে। ডানদিকে দেবেন্দ্র ঘোষ রোড। জিজ্ঞেস করতে হবে কারুকে সতেরো বি কোথায় হবে। আগে দেখা করতেই হবে শীলার সঙ্গে। যেমন করেই হোক।

কাল ওকে ডেকেছিলেন ডকটর বাসু।

বলেছিলেন—ডোন্ট মাইন্ড, আপনাদের আর্নিং মেম্বার কে কে?

একটু গর্বের সঙ্গেই সুমিতা বলেছিল—আজ্ঞে আমিই।

ভ্রূ কুঁচকে ছিলেন ডকটর বাসু।

বলেছিলেন—শুনুন, রেডিয়াম দিতে হলে অন্ততঃ দুটো অ্যাপ্লিকেশনের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। ধরুন হাজার দুই টাকা। অবশ্য এক্ষুনি না হলেও চলবে, যদি জোগাড় না করতে পারেন, মাস ছয়েক পর্যন্ত অবশ্য, তারপরে বুঝলেন আর, মানে—

রাতে শুয়ে শুয়ে সুমিতা ভেবেছে শীলার সঙ্গে দেখা করতে হবে। স্বপ্ন নয়, আদর্শ নয়। তার চাইতে জীবন অনেক বড়ো। তার চাইতেও বড়ো কর্তব্য। স্কুলের চাকরী বা প্রাইভেট ফার্মের চাকরী—সেটা প্রশ্নই নয়। কি করতে হয়, সেটাই গৌণ। আজ এই মুহূর্তে সব চাইতে বেশী প্রয়োজন একটা বেশী নাইনের চাকরী। ছয় মাসের মধ্যে যদি—। আর ভাবতে পারে না সুমিতা।

ফুটপাতে পাহা পর্যন্ত লোয়েটারে ঢেকে কতগুলো ছেলে জটলা করছে। বাবুয়ার কথা মনে পড়ছে সুমিতার। কতো আশা ছিল। রীতা এখনো ছোট। কতটুকুই বা ও বোঝে। কিন্তু বাবুয়া বড়ো হয়েছে। ওর উচিত ছিল সুমিতার পাশে এসে দাঁড়ানো। নিজের চোখেই তো দেখল সুমিতার দিনযাপনের গ্লানি। চাকরীর পর তিনটে টিউশনি। খাতা দেখা, চামড়ার ব্যাগে নকশা করে দেওয়া—

অথচ এতবড়ো ছেলে—সারাদিন কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। গত সপ্তাহেই সুমিতা জেনেছে যে কলেজের খাতায় ওর নাম নেই। অথচ মাইনে নিয়েছে নিয়মিত।

রাতে ওর জন্য বসেছিল সুমিতা।

বাবুয়া খেয়ে আসতেই ধরেছিল।

ধীরভাবে সব কথা ও শুনল।

তারপর বলল—হ্যাঁ, নাম নেই। কি হবে পড়ে? পরীক্ষা মানে তো টোকা। তাছাড়া চাকরী দেবে কে? কি হবে এই অর্থহীন—

চিৎকার করে উঠেছিল সুমিতা। বলেছিল—শাট্ আপ, তুই সংসারের অবস্থা দেখিস? জানিস—

ওকে থামিয়ে দিয়ে সহজ কণ্ঠে বাবুয়া বলেছে—এটাই হয় বিনি, এটাই নিয়ম। শুধু আমাদের নয়, ঘরে ঘরে। আর শ্রেণী-সংগ্রামের এই স্তরে—

ঠাস করে একটা চড় কসিয়ে দিয়েছিল সুমিতা।

বাবুয়া তারপর বেরিয়ে গেছে। আর ফেরে নি। সুমিতা, রীতা আর বাবা সম্ভাব্য সব জায়গাতেই খুঁজছে ওকে। কিন্তু কোনো খবর পাওয়া যায় নি এখনও।

মাঝে মাঝে কি একটা যন্ত্রণা হয় বুকের ভেতরে।

একটা ঝাঁকুনি খেয়ে ও চমকে উঠল। বাইস, পূর্ণ সিনেমা। জগুবাজার পেরিয়ে এসেছে কখন। হন্তদন্ত হয়ে সুমিতা নামল। হেঁটেই ওইটুকু ফিরে যেতে হল।

একটা বাচ্চা ছেলে সাহায্য করল।

একটা এঁদো গলির মতো। নীচে মিষ্টির দোকান। তার পাশ দিয়েই ওপরে যাওয়ার রাস্তা। কাঁচা নর্দমা একদিকে। কয়েকটা নোংরা বাচ্চা খেলছিল।

ইনহন করে সুমিতা উঠল। একটু ইতস্তত করে কড়া নাড়ল।

এক ভদ্রমহিলা একটুখানি মুখ বের করলেন।

সুমিতা বলল—শীলা, মানে, আমি ওর স্কুলের বন্ধু—

ভদ্রমহিলা একটুখানি কি ভেবে বললেন—আসুন—

এতক্ষণে সুমিতা চিনেছে। শীলার মা। কিন্তু একি চেহারা হয়েছে। চেনাই যায় না।

সামনে ছোট্ট এককালি বারান্দা। ইজিচেয়ারে শীলা বসেছিল।

সুমিতা চমকে উঠল।

এই কি সেই শীলা? চোখ মুখ বসে গেছে। চোখের নীচে গভীর কালি। চোয়াল বেরিয়ে এসেছে। কালচে হয়ে গেছে গায়ের রঙ।

ও একটু হাসল।

বলল—ঠিকানা কোথায় পেলি? নিশ্চয় রোজি দিয়েছে। জানিস মেয়েটা আংলো—

সুমিতা থামিয়ে দিল। বলল—ওসব কথা থাক। তোর কি হয়েছে বল। চেহারার এই অবস্থা কেন? চাকরী ছাড়লি কেন? আর এখন কি করছিস? জানিস, আমি তোর কাছে বড্ড আশা নিয়ে—

থাকগে, তোর কথা আগে বল।

শীলা আবার হাসল।

বলল—সে অনেক কথা। শুধু শুনে রাখ, আমার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে ওদের কাছে। সুতরাং, বুঝতেই তো পারিস।

শীলার মা চা দিতে এলেন। সুমিতা প্রণাম করল। উনি নিঃশব্দে ফিরে গেলেন। সুমিতাকে যেন চিনলেনই না।

শীলা বলল—সংকটের সময় মায়ের কাছেই এলাম। মায়ের মতো কে আছে বল?

ওর চোখ থেকে জল নেমে এল।

বলল—সুমি, অ্যাম্বিশানের জন্য বড্ড দাম দিলাম রে। তোরা তো জানিস, আমি ছোট্ট একটা অভাবের সংসার চাই নি। আমি জ্বলতে চেয়েছিলাম, উঠতে চেয়েছিলাম। একেবারে উঁচুতলায়। উঠেছিলামও কিছুটা। কিন্তু, কিন্তু দি প্রাইস ইজ টু হাই।

এক মুহূর্ত চুপ থেকে ও বলল—এর চাইতে ছোট্ট একটা সংসার, একজন সহৃদয় পুরুষ—

জানিস, আমি না, আমি মা একদম ফুরিয়ে গেলাম। আউট আউট ব্রিফ, ক্যান্ডেল—

সন্ধে হয়ে এল। কেমন যেন বিষণ্ণতা ছড়িয়ে গেল চারদিকে।

কোথায় যেন শঙ্খ বাজল।

দুচোখ বুজে হাত জোড় করে শীলা নমস্কার করল।

তারপর বলল—তুই সেই স্কুলেই আছিস তো?

সুমিতা বলল—হ্যাঁ।

ফিসফিস করে সুমিতা বলল—হ্যাঁ, তাই থাক। বড্ড অনারেবল প্রফেসান রে। টিচিং হল একটা মিশন। একটা মহৎ সেবা, দেশের জন্য, ভবিষ্যতের স্বপ্নের জন্য। তোরা থাক সুমিতা আগামী দিনের প্রজন্মকে গড়ে তোলার জন্য। শোন, ওদের দেখাবি যেন জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তোলে। অ্যাম্বিশান নয়, গিল্ট নয়, অ্যাড-জেস্টার নয়। ছোট্ট একটু জীবন— সেই যে গানটা তুই জানিস—আঙুলের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে—

সুমিতার চোখেও জল এসে গেল।

বলল—জানিস, আমি এসেছিলাম তোর কাছে তোদের এখানে একটা চাকরির জন্য। মায়ের ক্যান্সার—

কথাটা শেষ করতে পারল না সুমিতা। চুপ করে রইল।

শীলা চিন্তিতভাবে বলল—বুঝতে পারছি। কিন্তু—

দুজনেই চুপ করে রইল কিছুক্ষণ।

আস্তে আস্তে শীলা বলল—আমি চেষ্টা করলে তোকে সেইরকম কিছু একটা জোগাড় করে দিতে পারি। তাতে তুই মাসীমাকে বাঁচাতে পারবি, কিন্তু সুমি, নিজে যে বাঁচবি না। নারে, সে হয় না। আমি তা পারব না।

ওর কথাগুলো শেষদিকটায় যেন শোনা গেল না। মমতায় দুটো চোখ স্নিগ্ধ হয়ে উঠল।

সুমিতার মনে ভেসে উঠল মায়ের নিষ্প্রভ মুখটা। শীর্ণ এক আবেদন।

মনে হল মা যেন এই পৃথিবীর কেউ না। যেন অনেক আগেই মা ফিরে যাওয়ার পরোয়ানা পেকে গেছে। আজ আর করার কিছুই নেই। সাকে প্রতিমুহূর্তে জীবন্ত করে তোলার জন্য সে এখানে ছুটে এসেছে, সেই মা আসলে বহুকাল আগের মৃত এক স্বপ্ন ছিল।

সুমিতার ডানহাতের মুঠোটা শীলা তুলে নিল।

বলল—সুমি, লক্ষ্মী বোন, দুঃখ করিস না। জানি, মাসীমা বড্ড বাঁচতে চান, সেবাযত্ন কর। কিন্তু, কি করবি আর বল, একটু স্বার্থপর হতেই হবে।

দুজনে আবার চুপ করে বসে রইল। অনেকগুলো মুহূর্ত কেটে গেল।

সুমিতার একবার মনে পড়ল বাবুয়ার কথা। ও যদি পাশে থাকত। কোথায় এখন ও কি করছে কে জানে। কি খাচ্ছে, কি ভাবে আছে, সে খবর কেউ দিতে পারবে না। ওর মুখটাও ঠিক মায়ের মতো। মায়ের মতো ছোট্ট কপাল।

শীলা বলল—আমরা সবাই বড্ড অসহায় রে। কোন পথ নেই আমাদের।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ও।

পাশের ঘরে শাঁখ বাজল।

শীলার মুখের দিকে চাইল সুমিতা। এই মুহূর্তে শীলাকে বড্ড পবিত্র, বড্ড শান্ত বলে মনে হচ্ছে। ওর ক্লান্ত দুটো চোখের দিকে সুমিতা কিছুক্ষণ চেয়ে রইল।

রীতা এতক্ষণে নিশ্চয়ই সন্ধে দিয়েছে। শাঁখ বাজাচ্ছে গাল ফুলিয়ে। মা হয়তো শুয়ে শুয়েই দুহাত জোড় করেছেন। মা ছোটবেলায় মাঝে মাঝে সুমিতাকে ভয় দেখাত। সুমিতা দুষ্টুমি করলে মা চোখ বুজে শুয়ে পড়ত। সুমিতা তখন মায়ের বুকের ওপর লুটিয়ে পড়ত। বলত—মা, চোখ মেল, আমি আর কোনোদিন—

শীলা বলল—সুমি, ওঠ, তোর দেরী হয়ে যাবে।

মা ঝাড়া দিয়ে সুমিতা উঠে দাঁড়াল।

বলল—মাসীমাকে বলা হল না। তুই বরং—

শীলা বলল—হ্যাঁ, আমিই বলে দেব। মা ঠাকুরঘরে এখন।

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে শীলা বলল—মাকে শুধু দুঃখই দিলাম। এর চাইতে যদি আমি—

দুজনে সিঁড়ি দিয়ে নামল। সুমিতার মনে হল ওঠার সময় কিন্তু এতগুলো সিঁড়ি যেন ছিল না। কি করে যে এত উঁচুতে উঠেছিল, কে জানে।

দরজার কাছে গিয়ে শর্মিলা থমকে দাঁড়াল। সুমিত্রার কাঁধে হাত রেখে বলল—সুমি, শোন্, আমার যে ইংরেজীতে অনার্স ছিল। তোদের স্কুলে হয়তো অন্য কোথাও যদি—

কথাটা ও শেষ করতে পারল না। অসহায় দৃষ্টিতে চেয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত।

সুমিত্রা বলল—নিশ্চয় দেখব, শীলা।

ও বিশ্বাস কর। আমি, আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব।

শীলা ওর হাতটা মুঠোতে তুলে নিল।

হাসবার ম্লান হেসে বলল—মনে থাকে যেন। বড় উপকার—

আর শুনতে পারল না সুমিত্রা।

হনহন করে হাঁটতে শুরু করল ও।

মায়ের মুখটা আবার ওর মনে ভেসে উঠল। সেই করুণ কারুণ্য।

সুমিত্রার মনে হল মা কোনো একটা শীতল প্রলেপ নয়। আসলে মা যেন এক মৃত সত্তা। যেন বহুকাল আগেই মা পাথর হয়ে গেছে। তখন ফসিল হয়ে সংসারের এক কোণে জায়গা করে নিয়েছে।

সুমিত্রা বিড়বিড় করে বলল—হাঁ, সুখিনী মা আমার। তোমায় বাঁচাতে পারতাম। কিন্তু আমার মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে বেঁচে তুমিও তো সুখী হতে না, মা। সেটা হয় না। হয় না।

ততক্ষণে চক্কিল নম্বর বীম এসে গেছে।

'আরও একটি সন্তান চাওয়ার আগে

ভেবে দেখুন

যাঁটি আছে তাকে ঠিক মতো
লালন-পালন করতে
পারছেন কি না

আপনার মনের মত, ছোটবেলা থেকেই ছেলে পড়াশোনায় ভালো হ'ক। আপনি চান তার ব্যক্তিত্ব পুরো ক'রে তাকে মানুষ ক'রে তুলতে। কিন্তু এরমধ্যেই পিঠোপিঠি যদি আর একটি এসে পড়ে, সবদিক সামলে তা কঠিন হয়ে দাঁড়াতে পারে। তেমন অবস্থা যাতে না হয় তার ব্যবস্থা করাই কি ভালো নয়?

সারা দুনিয়ার কোটি কোটি দম্পতি তাই করছেন। সব দিক দিয়ে তৈরি না হওয়া পর্যন্ত পরিবারের কথা ভাবা তাঁরা ভাবতেই না। নিরোধের সাহায্যে আপনিও তা করতে পারেন। নিরোধ হ'ল, সারা বিশ্বে পুরুষদের সবচেয়ে প্রিয়, ব্যবহারে অনিরোধক। নিরাপদে ও সহজে ব্যবহার করা যায় ব'লে অনিরোধের জন্যে বহুকাল ধরে লোকে নিরোধ ব্যবহার ক'রে আসছে। আপনিও নিরোধ ব্যবহার করুন না?

সরকারী অর্থ সাহায্যে সর্বত্র 15 পয়সায় 3 টি নিরোধ পাওয়া যায়

আরেকটি সন্তান না চাওয়া পর্যন্ত ব্যবহার করুন

নিরোধ

সব সব লোকের মনের মতন, সহজে ব্যবহারযোগ্য ও নিরাপদ, ব্যবহারে অনিরোধক

মনোহারী দোকান, মুদীর দোকান, কেমিস্টের দোকান প্রভৃতি সর্বত্র পাওয়া যায়

ADVT 71/466

CENTRAL LIBRARY

প্রেক্ষাগৃহ

চিত্র-সমালোচনা

বাড়ী আছে, ঘর নেই

[illegible] কথা বলে বড়ো বাড়ী করবে এই সমস্যা [illegible] সমাধানের চেষ্টা করা হয়েছে। এই গৃহসমস্যাকে উপলক্ষ্য করে এবার পরিচালক [illegible] যার কয়েকটি দৃশ্য বাদ দিলে ছবিটি ভালো। এবং এই সেদিন থেকে [illegible] গৃহসমস্যাকে উপলক্ষ্য করে [illegible] সংলাপ লেখক মৃদুল দাশগুপ্ত [illegible] বেশী কিন্তু ফলাফল কাপালেকর [illegible] ছবি তৈরিতে দুইজন পরিচালক [illegible] বাস্তবধর্মী ও সহজ সিনেমা [illegible] ছবি তৈরিতে। কারণ থাকতে পারে, এই [illegible] বছর ১২৭০ সালের [illegible] এবং উনবিংশ শতাব্দীর শেষ [illegible] নাকি-কান্নাকে সফলভাবে [illegible] দেখানো। এবং এই এক সমস্যাকে সমাধান পরিবারিত [illegible] থেকে ছবির অন্তরালে নিয়ন্ত্রিত [illegible] করা হয়েছে বাড়ীর প্রোডাকশন নির্দেশিত, ভাবাচ্ছন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত এবং বাসু চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত ইন্সট্রুমেন্টাল রঞ্জিত পিয়ানো ধ্বনি ছবিটির চারপাশে।

মফঃস্বলের উদার [illegible] মধ্যে লালিত পালিত [illegible] মনস্তত্ত্বে প্রাণের ময়ূর [illegible] সর্বস্পর্শী ঘটনের [illegible] এক স্বামীই পরাবর্ত এক [illegible] বাড়ীর তিনতলার একটি ছোট্ট [illegible] বাড়ীর পার্টিশন আর বিছন [illegible] সমস্যা বলে বিবেচিত [illegible] কোয়ার্টার্স, যে ঘরের একটি [illegible] নেই এবং যে ঘরে [illegible] জলের কল এবং আরও [illegible] গেরস্থালী ছিলনা।

যে চক্রপাকে নব বিবাহিতের [illegible] কলঙ্কিত হয়েছে, তাতে [illegible] মাত্র উনিশ মিনিট [illegible] একটি নড়ে বসলেও ঐ [illegible] কথা বা কাজের সার্টিফিকেট [illegible] পেয়েছে, এমন প্রোডিউসার [illegible] বিশ্বাস হয়েছে, তার নাম [illegible] কাপালেকর। তাহলে [illegible] পরিচালকের [illegible] পাড়ি জমাতে [illegible] তাও [illegible] সুখবর। বিশেষ [illegible] সুখ এবং সান্ত্বনা [illegible] কথাটি [illegible] এখন এক [illegible] হয় নিয়ে এবং [illegible] পথে হটাৎ [illegible] সে [illegible] আবার [illegible] পরবে প্রায় [illegible] ঘটনা, [illegible] এমন [illegible] পড়ল [illegible] আষাঢ় [illegible] চক্রটা [illegible] দেখা [illegible] ওনকারের [illegible] বাড়ীর [illegible] নিয়ে [illegible] ঐশ্বর্য [illegible] ছোলবর [illegible] ছবি। এই [illegible] ঘরে [illegible] ছোলবর আলো [illegible] ঘিরে [illegible] ছোলবর [illegible] ঐশ্বর্য [illegible] বাড়ীর [illegible] এমন [illegible] ঘরের [illegible] ঘরে [illegible] ঘরে [illegible] ঘরে

অলাদা ঘরে। কয়েকদিনের মধ্যে বাসের বাপ-মা, দাদা-বৌদি কিংবদন্তী দেবরের অভিনয়ের সংবাদ আগেই পাঁইয়ে চলে গেল মালতীকে বাড়ীতে একলা রেখে। যাবার সময়ে বৌদি বলে গেল রাত্রে অফিস থেকে ফিরে এসে ওরাও যেন সিনেমায় যায়; তবে পরিবাস করে এও বলল, দুজন নিরিবিলি কাটানোর সুযোগ ত্যাগ করে সিনেমায় যাওয়া কি চলবে? আজ ঐ ফ্ল্যাটে অন্তত ঘণ্টা চারেকের জন্যে মালতী একা। সে সাজল, ভালো কাপড় পরল, গান গাইল এবং তার প্রিয়তমের আগমন পথ চেয়ে বসে রইল। কিন্তু স্ত্রীর ভালোবাসা কি করলে বেশী পাওয়া যায়, বন্ধুর কাছ থেকে পাওয়া সেই সংক্রান্ত উপদেশ মতো যখন সেইদিনই দেরী করে বাড়ী ফিরল এবং মালতী ওর প্রতীক্ষায় চার ঘণ্টা একা

রঙ্গনা বিশ্বরূপায় রাস্তার সার্কুলার রোডের মোড়ে (৫৫-৬৮৪৩)

নান্দীকার

২২শে জুলাই শনিবার ৬॥টায়

শের আফগান

২৩শে জুলাই রবিবার ৫টে ও ৯॥টায়

তিন পয়সার পালা

২৭শে জুলাই বৃহস্পতিবার ৬॥টায়

গঞ্জরী গ্রামের মঞ্জরী

নির্দেশনা : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

২৬শে জুলাই বুধবার মুক্ত অঙ্গনে ৭টায়

নাটকারের সন্ধানে ছ-টি চরিত্র

।। মুক্ত অঙ্গনে টিকিট পাওয়া যাচ্ছে ।।

স্টার থিয়েটার

শীতাতপনিয়ন্ত্রিত

৫৫-১১৩৯

আশাপূর্ণা দেবী রচিত

মঞ্জরী

পরিচালনা দেবনারায়ণ গুপ্ত

প্রযোজনা কমলেশ মৈত্র

সুরকার অনিল বসু

কণ্ঠে পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রতি বৃহস্পতিবার ও শনিবার ৬।। টায়

প্রতি রবি ও ছুটির দিন ৩ ও ৬॥টায়

বিশ্ব ভারতীর বিজ্ঞপ্তি-এর নকশা

কাটিয়েছে তুলে বন্ধুকে যখন প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে তখনই ফেরত নওয়া সকলে। আরও একবার বাড়ীর আর সকলের অনুপস্থিতির সুযোগ নিতে হল বৌদির ছোট্ট খান প্রভাব সমেতসহ অভ্যাগত আগমনের জন্যে। শেষ পর্যন্ত রাম ঠিক করল একদিন মালতীকে নিয়ে ও সবে বোম্বাই শহর বেড়াবে এবং চিলমহল কোনো হোটেলের একটি ঘর ভাড়া নিয়ে সুখের নিবিড় কিছুক্ষণের জন্যে একান্তে থাকবে। চিত্তাকর্ষক কর্ম ঠিকই চলছিল মালতীও এতদিন। তবুও জানতে ভালবাসা হয়ে উঠেছিল, বিশ্বাসের উপকূলবর্তী হোটেল ঘরের একান্ত সুখের মাত্রা যখন চরমে ওঠবার সম্ভাবনা সমুজ্জ্বল, ঠিক সেই সময়েই পড়ল বাধা। রামকে জন্য কোনো জরুরী মাল ব্যবসার পুরিল অফিসার ওকে খানায় নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। এবং যখন হোটেল কর্তৃপক্ষের কথায় পুলিশ অফিসার নিজের ভুল বুঝতে পেরে ওদের কাছ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করে বিদায় নিলেন, তখন ওদের সমস্ত উৎসাহ উদ্দীপনা নিভে গেছে। ভগ্নহৃদয় নিয়ে মালতী ও রাম বাড়ী ফিরে দেখল মালতীর জ্যেঠামশাই গোবীশঙ্করবাবু প্রকাণ্ড ভারতমহলের এক চিন্তায় কর্মরত ওদের সকলকে বিদ্যমান দেখে উত্তেজিত হয়ে ঐ নরক থেকে মালতীকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবার জন্যে বদ্ধপরিকর প্রকাশ করছেন। এবং বাড়ীর কারুরই অনুরোধেরও কর্ণপাত করছেন না:—কিন্তু সবাই যখন যাবার জন্য সমুপস্থিত হল তখন মালতীর মন ফেরে এল; সকল অসুবিধা সত্ত্বেও সে তার ভালোবাসার নীড়কে ছেড়ে যেতে পারল না।

আগেই বলেছি, কাহিনীটিকে বিভিন্ন পরিস্থিতির মাধ্যমে এমনভাবে দর্শকদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে, যাতে কাহিনীটি সামান্য মাত্র অগ্রসর হবার পর থেকেই বোঝা যায় যে, নায়ক-নায়িকার মধ্যে যে গভীর হৃদ্যতাবোধ এবং পরস্পরের কাছে যেটুকু প্রাপ্য যোগ্য, সেই সংবাদটিকে বক্তব্যের কাছে পরিবেশন করা হয়েছে লঘু হাস্য পরিহাসের উপভোগ্যতার মাধ্যমে। বসন্ত পি কাজে লিখিত কাহিনীটি থেকে একটি সুসংবদ্ধ চিত্রনাট্য প্রস্তুত করেছেন রাম কেদার এবং তাতে উপভোগ্যভাবে সংলাপ ও গান যোজনা করেছেন পরিচালক বাসু চট্টোপাধ্যায় এবং গীতিকার অনন্দ বক্সী। ওদের সকলের প্রচেষ্টাকে সার্থকভাবে চিত্ররূপ দিয়েছেন চিত্রশিল্পী কে কে মহাজন, চিত্রসম্পাদক বাবলী চক্রবর্তী, সঙ্গীতানুরোধ আহমেদ, সঙ্গীত পরিচালক লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল এবং শব্দানুলেখক চট্টোপাধ্যায় সরকার। এই অতি বাস্তবধর্মী কাহিনীটি সম্বন্ধে একটি জিজ্ঞাস্য আছে। আমাদের এই কলকাতাতেও ঘরের অপ্রতুলতা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু তবু বিবাহের পর নবদম্পতির জন্যে পরিবারভুক্ত অন্য লোকেরা ত্যাগ স্বীকার করেও বসবাসের সব থেকে ভালো ঘর-খানি বা ঘরের সব থেকে নিভৃত অংশটি অন্তত হু-চার দিনের জন্যেও ছেড়ে দেয়। বোম্বাই শহরের বিরাট ফ্ল্যাটবাড়ীর এক কামরার বাসিন্দাদের মধ্যে কি সে ঔদার্য নেই?

'পিয়া-কা-ঘর' ছবিটির প্রত্যেক শিল্পীই আন্তরিকভাবে স্ব-অভিনয় করেছেন। তবে ওদের মধ্যে নায়িকা মালতী বেশে জয়া ভাদুড়ী ছবির প্রতিটি পর্যায়ে চরিত্রোচিত ভাবপ্রকাশে যে নৈপুণ্য দেখিয়েছেন, তা উচ্চ প্রশংসার যোগ্য। নায়ক রামের ভূমিকায় অনিল ধাওয়ানের প্রতিটি অভিব্যক্তিও সমুচিতভাবে প্রশংসনীয়। এঁদের পরেই বৌদি শোভার ভূমিকায় রাজিতা ঠাকুর এবং নায়কের পিতা গিরি-

শাবীলাল রূপে আগা বলকদৃষ্টিতে তাকাতে সমর্থ হয়েছেন। এছাড়া মুখরা, কেষ্ট মুখুজ্যে, সুলোচনা চট্টোপাধ্যায়, মিঃ টাটা পরাশরূপে, সুব্রত, সুরেশ চক্রবর্তী প্রভৃতি সকলেই যে সুঅভিনয় করেছেন, সে-কথা আগেই বলেছি।

ছবির চারখানি গানের মধ্যে তিন-খানিকে আবহসঙ্গীত রূপে ব্যবহার করে পরিচালক রসভঙ্গের পরিচয় দিয়েছেন। তার মধ্যে বক্তব্য অনুসারী কথাসহ হিসেবে ব্যবহৃত ইন্দ্রাণী চরিত্র গানখানি সর্বশ্রেষ্ঠ। নায়িকার মুখের দিকটায় যে হাত টেনে গানটির যবনিকা নামানো হয়েছে, তেমন ছবির প্রথম গান ইত্যাদি ভুল কৌশল হয়ে গেছে।

সবশেষে পরিচ্ছন্ন ছবি দেখার কারণ নিখুঁত আনন্দোপকরণ হিসেবে অনবদ্য।

ফিল্মস ডিভিশনের পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবিগুলি

১৯৭৯ সালের চলচ্চিত্র বিষয়ক পুরস্কার উৎসবে ফিল্মস ডিভিশনের যে ছখানি ছবি বিভিন্ন পর্যায়ে মোট পুরস্কার লাভ করেছে, একটি বিশেষ প্রদর্শনীতে সেগুলি কলকাতার বিশিষ্ট সাংবাদিক লেখকদের কাছে ফিল্মস ডিভিশনের কর্তারা আমাদের মনোজ্ঞ করেছেন। পাবলিসিটি সিনেমায় প্রদর্শনীর ক্রমঅনুসারে ছবিগুলির নাম :

(১) ভূটান, (২) উইংস অব ফাথার, (৩) ক্রিয়েশান ইন মোটান, (৪) এ ভিলেজ স্পাইলস, (৫) রেকলেসনেস এবং (৬) দিস মাই ল্যান্ড।

(১) বিশেষ রূপে নির্মিত এই প্রামাণ্য **'উইংস অব ফাথার'** ছবিখানি কেন্দ্রীয় সীমিত কর্তৃক গত সাতবছর ধরে চলচ্চিত্রে কোনোটিই পুরস্কারের উপযোগী বিবেচিত না হওয়ায় সর্বপ্রথম বিশু চলচ্চিত্রের পুরস্কৃত হয়েছে। সিনেমাস্কোপ প্রযোজিত এবং এম এম শর্মা পরিচালিত ৩১৮ মিটার দীর্ঘ এই রঙীন ছবিখানিতে কাশ্মীর সীমান্তবর্তী জনাড়ুমো হাজার হাজার গোলাপী ও কাশফুল নিয়ে যাওয়া সুসজ্জাতীয় আবহ (ল্যান্ডস্কেপ) বাঁধার

ছবির একটি দৃশ্যে নায়িকার ভূমিকায় ছবি বিশ্বাস এবং অপর্ণা সেন

সমারোহ হওয়া, কিছুদিন ধরে ভিন্ন পাড়া, ভিন্ন ফুটে বাস, রেস্তোরাঁ এবং বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে চায়ের আড্ডা প্রভৃতির দৃশ্যাবলী মনোজ্ঞ চিত্রায়ণগুণে দেখানো হয়েছে। ছবিতে সংলাপের প্রাধান্য নেই, নেপথ্য-কাহিনী এবং সংলাপের বিষয়বস্তুর গুণে এই ছবিটিই দর্শকদের কাছে সবচেয়ে বেশী উপভোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে।

(২) কিন্তু ভ্রমণের দৃষ্টিতে সব থেকে প্রশংসাযোগ্য খুশি হচ্ছে সমাযোজনের মাধ্যম হিসেবে নির্মম এই পর্বতময়

মঞ্চে বা পর্দায় নয়—জীবননাট্যে নায়িকার ভূমিকায়

অপর্ণা সেন

নায়িকার ভূমিকায়

শুভেন্দু / দীপ্তি রায় / অসিতবরণ / জহর রায় / গৌরী

নির্মাতা • পরিচালনা অরবিন্দ মুখার্জী

সংগীত রবীন চ্যাটার্জী / কাহিনী আশাপূর্ণা দেবী

চিত্রগুণ নিবেদিত / মিত্রালী পরিবেশিত

শুক্রবার ২১শে থেকে—রূপবাণী - ভারতী - অরুণা এবং অন্যত্র

অন্তর্ভুক্ত এবং শিক্ষামূলক ছবি হিসেবে পুরস্কৃত. মোহন বাধওয়ানি প্রযোজিত ও বীরেন দাস পরিচালিত 'রেকলেকশান' নামে রঙীন ছবিটি ভারতে ডাকযোগে চিঠিপত্র বিলি হওয়ার সময় থেকে শুরু করে আধুনিক কাল পর্যন্ত যেসব ডাক টিকিট ব্যবহৃত হয়েছে, তাদেরই বর্ণোজ্জ্বল চিত্রেতিহাস ৩১৮ মিটার দীর্ঘ এই ছবিটির মাধ্যমে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষকভাবে বিধৃত হয়েছে। সাগ্নিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত চিত্রনাট্যের সাহায্যে সৈলেন মুখোপাধ্যায় দৃষ্টিনন্দন নিয়ে প্রতিটি পর্বে তাবতমা ঘটিয়ে যে খণ্ড চিত্রগুলি গ্রথন করা হয়েছিল, তাদের মাঝে অঙ্কিত চিত্রের সমাবেশ ঘটিয়ে সম্পাদক সুকুমার কলাবৃক্ষের প্রকাশ করে তাদের সাজিয়েছেন এবং একটি পর্ব থেকে পরবর্তী পর্বে যাবার জন্যে কোথাও বা 'অপটিক্যালস', আবার কোথাও বা 'অ্যানিমেশন ক্যামেরা' কিংবা 'মিক্সিং' প্রভৃতির সুষ্ঠু ব্যবহার করেছেন। আবহ-সঙ্গীতের প্রয়োগ ছবিটিকে অধিকতর ঐশ্বর্যমণ্ডিত করে তুলেছে।

(৩) সংবাদমূলক তথ্যচিত্র হিসেবে ৯ রীল দীর্ঘ 'ভুটানের' ছবিটি অবশ্যই মূল্যবান হয়েছে। ভুটানের আদিম সংস্কৃতি, ধর্ম, দৈনন্দিন জীবনের আচার-ব্যবহার, পোশাক-পরিচ্ছদ থেকে শুরু করে সভ্যতার সঙ্গে-প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে তাদের জীবনযাত্রার পরিবর্তন, শিক্ষার আধুনিকীকরণ, শিল্পের বিস্তার, বিজ্ঞানের অগ্রগতি প্রভৃতি বিষয় অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপকভাবে দেখানো হয়েছে এই রঙীন ছবিটির মাধ্যমে। প্রসার পতি প্রযোজিত এবং কি এন মাইস পরি-চালিত এই ছবিখানি আমাদের প্রতিবেশী রাজ্য ভুটান সম্পর্কে একটি নিখুঁত তথ্য-চিত্র।

(৪) ব্যবসায় ক্ষেত্রে উল্লেখ প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ ছবি হিসেবে পুরস্কৃত হয়েছে হোম ভি সেবনা প্রযোজিত ও পরিচালিত প্রায় দেড় রীল দীর্ঘ (৪৩৫ মিটার) রঙীন ছবি 'ফিনিশিং ইন মেটাল'। পিতল, তামা প্রভৃতি ধাতুর সাহায্যে নানা প্রয়োজনীয় বস্তু ছাড়াও কত রকম সুন্দর সুন্দর শিল্প বস্তু সৃষ্টি হয় তারই এক অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক বিবরণ দেওয়া হয়েছে এই ছবিটির মাধ্যমে। কমলেশ বন্দ্যোপাধ্যায়কৃত ভাবসঙ্গীত ছবিটির একটি বিশেষ সম্পদ।

(৫) ব্যবসায় বহির্ভূত উন্নয়ন প্রকল্পের ছবি রূপে পুরস্কৃত হয়েছে এন এস থাপা রচিত ও প্রযোজিত ৩০০ মিটার দীর্ঘ রঙীন ছবি 'দিস মাই ল্যান্ড'। আমাদের এই বিশাল ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত কি অগ্রগতি হয়েছে, কত বৈচিত্র্যপূর্ণ এই ভারত, দেশাত্মবোধক হিন্দী, বাংলা, তামিল গুজরাটি, পাঞ্জাবী প্রভৃতি গানকে একের পর এক আবহসঙ্গীতরূপে ব্যবহার করে দৃশ্যের পর দৃশ্যের মাধ্যমে তাই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। গানগুলির প্রকাশে সঙ্গীত পরিচালক বিজয় রাঘব রাওয়ের কৃতিত্ব উচ্চ প্রশংসনীয়।

(৬) সামাজিক তথ্যমূলক ছবি হচ্ছে এস সুখদেব কৃত ৪৮০ মিটার দীর্ঘ সাদা-কালো চিত্র 'এ ভিলেজ আইজলস'। ছোট্ট নদী প্রকল্পের ফলাধার ও বাঁধগুলি গ্রামীণ জীবনে যে কি বিরাট পরিবর্তন এনেছে, তারই একটি উজ্জ্বল চিত্র লিপিবদ্ধ করেছেন চলচ্চিত্রকার সুখদেব এই ছবিটির মাধ্যমে।

—নান্দীকর

মঞ্চাভিনয়

সায়মের 'মুহ্যমান বাঙ' : আজকের নতুনতর নাট্যচর্চার দিনে নতুন দিক যে ধরনের নাট্যপ্রযোজনা মোটামুটি আমাদের চমকিত করছে তা হোল আবসার্ড নাটক। আপাতদৃষ্টিতে এই নাটকগুলোকে উদ্ভট বলে মনে হলেও গভীরতর চিন্তার দর্পণে এর মর্মসত্য প্রতিভাত হয়। সায়মের শিল্পীরা এই ধরনের একটি নাটক কয়েক-দিন আগে 'থিয়েটার সেন্টার' মঞ্চে পরি-বেশন করলেন। নাটকটির নাম হোল 'মুহ্যমান বাঙ'।

আজকের মধ্যবিত্ত তরুণ-তরুণীদের নানা আশা-নিরাশা কান্নাহাসির আবর্ত থেকেই এ-নাটক অগ্রগতির ছন্দ নিয়েছে। তাদের নানা সমস্যা এক-একটি রূপক ধরে নাট্যমুহূর্তে বিধৃত হয়েছে। নাটকের বাচ্চু, পাগলা, সুধীর, সোমনাথ, প্রদীপ, নৈবেদ্য, কল্যাণী, সীতেশদা সবাই আমাদের চেনা। এরা সবাই অন্ধকারের সীমাহীনতায় হতোদ্যম, কিন্তু সবাই বেরিয়ে আসতে চাইছে অন্ধকার ছিন্ন করে এক আলোকিত সকাল।

নাট্যকার রঞ্জন চট্টোপাধ্যায় নিজেই নাটকের প্রয়োগপরিকল্পনার দায়িত্ব নিয়ে-ছিলেন। বহু ক্ষেত্রে তিনি নতুনতর প্রয়োগ-রীতিকে ব্যবহার করেছেন। মঞ্চসজ্জায় ব্যবহারে রূপকধর্মী বক্তব্য প্রকাশ পেয়েছে। কয়েকটি কম্পোজিসন নিঃসন্দেহে নাট্য-নিদেশনার সূক্ষ্ম শৈল্পিক মানসের পরিচয় বহন করে।

প্রতিটি চরিত্রই হয়েছে সুঅভিনীত। অভিনয়ে ছিলেন বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়, সোমেন চট্টোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শম্ভু ভট্টাচার্য, প্রীতিনাথ চৌধুরী, উদয়ন মুখোপাধ্যায়, বিমল ঘোষ, মিহির লাহিড়ী, মৃগাঙ্ক চৌধুরী, সলিল ঘোষ, উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায় ও টুটুল চট্টোপাধ্যায়।

'বোধন' নিবেদিত 'শুভা' : রবীন্দ্র-নাথের অপরূপ ছোটগল্প 'শুভার একটি নিখুঁত নাট্যরূপ সেদিন পরিবেশিত হোল এক নতুনতর প্রাণময় ছন্দে। প্রকৃতির মমতাছোঁয়া এই গল্পের মর্মকথাকে আশ্চর্য নৈপুণ্যে মঞ্চের আলোর মূর্ত করে তুলতে পেরেছেন 'বোধনে'র শিল্পীরা। শুভা যেন প্রকৃতিরই কন্যা, প্রকৃতির প্রতিটি স্পন্দনে শুভাও যেন প্রাণের আবেগ খুঁজে পায়, মিশে যায় তার চঞ্চলতার প্রহরে। এই অপূর্ব তন্ময়তার গল্পকে নাট্যরূপে ভাষা দিয়েছেন পরিতোষকুমার ঘোষাল। মোটা-মুটিভাবে তিনি গল্পটির মর্ম স্পর্শ করতে পেরেছেন।

নাটকটির প্রয়োগপরিকল্পনা নিঃ-সন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে। এ-ব্যাপারে অপূর্ব বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিষ্ঠা সত্যি উল্লেখ করার মতো। 'শুভার ভূমিকায় সুন্দর অভিনয় করেন পাপিয়া চট্টোপাধ্যায়। অন্যান্য চরিত্রে ছিলেন শৈল চট্টোপাধ্যায়, অলোক গুপ্ত, বিনয় রায়, মাঃ শান্তনু, অপূর্ব বন্দ্যোপাধ্যায়, স্কাদেশ ধর।

আলোকসম্পাত ও নেপথ্যসঙ্গীত নাটকের মূল মেজাজের সঙ্গে ঠিক সমতা রাখতে পারেনি মনে হয়।

"বিষাইছে বায়ু" নাট্যাভিনয়

সেন্ট্রাল টেলিগ্রাফ অফিস পার্ক কান্টনার রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভ্য ও সভ্যা-বৃন্দ কর্তৃক শ্রীঅমিয় মুখোপাধ্যায় রচিত "বিষাইছে বায়ু" নাটকটি আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে টেলিগ্রাফ ইনস্টিটিউট মঞ্চে অভিনীত হবে। নাটকটি পরিচালনা কর-ছেন সর্বশ্রী সমু চট্টোপাধ্যায় ও প্রণব রায়। অভিনয়াংশে আছেন শিবনাথ মুখোপাধ্যায়, সাধু চট্টোপাধ্যায়, প্রণব রায়, সুধাংশু মণ্ডল, সুনীল চট্টোপাধ্যায়, কানাই বন্দ্যো-পাধ্যায় ও শ্রীমতী কল্পনা মিত্র।

সিরাজদ্দৌল্লা মঞ্চাভিনয়

গত ২৮শে জুন রূপনা রঙ্গমঞ্চে শ্রীশোভন সাধুখাঁর পরিচালনায় নবলোকের প্রথম প্রযোজনা সিরাজদ্দৌল্লা অভিনীত হল। বিভিন্ন চরিত্রে সনৎ ঘোষ, বটকৃষ্ণ নাহা, বলরাম দাস, কার্তিক সাধুখাঁ, দীপালি [illegible] নিজ নিজ চরিত্রে দক্ষতা দেখিয়েছেন। স্ত্রী চরিত্রে মন্দিরা ঘোষ দরদ দিয়ে অভিনয় করেছেন। শোভন সাধুখাঁ পরিচালনায় ও ওয়াটস-এর চরিত্রাভিনয়ে দক্ষতা দেখিয়ে-ছেন।

সাগর সেনের পরিচালনায়

রবিরশ্মির

শ্রাবণ-সন্ধ্যা

আজই রবিবার • সন্ধ্যা ৬টায়

রবীন্দ্রসদনে

অংশ গ্রহণ করছেন

হেমন্ত মুখোপাধ্যায় • সুচিত্রা মিত্র

চিন্ময় চট্টোপাধ্যায় • নীলিমা সেন

সাগর সেন • সুমিত্রা সেন

এবং

রবিরশ্মির নবীন শিল্পীবৃন্দ

টিকিট—১০৲। ৫৲। ৩৲। ২৲

পাওয়া যাবে মেলোডি • ফ্রেন্ডস •

স্টেরাস ব্যানার্জী

গি—১২

অন্তর্ভুক্ত এবং শিক্ষামূলক ছবি হিসেবে পুরস্কৃত. মোহন বাগডাঙার প্রবোধিত ও বীরেন বাগ পরিচালিত 'মেকেনেকগান' নামে রঙীন ছবিটি জারো ডাকযোগে চিঠিপত্র বিলি হওয়ার সময় থেকে শুরু করে আধুনিক কাল পর্যন্ত যেসব ডাক টিকিট ব্যবহৃত হয়েছে, তাদেরই বর্ণোজ্জ্বল চিত্রোচ্ছ্বাস ৩১৮ মিটার দীর্ঘ এই ছবিটির মাধ্যমে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষকভাবে বিধৃত হয়েছে। সাগর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত চিত্রনাট্যে সাহায্যে শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে প্রতিটি ষ্টাম্প ব্যবহারের ইতিহাস যে সব চিত্রমালায় গ্রথন করা হয়েছিল, তাদের মাঝে অধিকতর চিত্তাকর্ষক সমাবেশ ঘটিয়ে সম্পাদক সুক্ষ্ম রসবোধের প্রকাশ করে তাদের সাজিয়েছেন এবং একটি দৃশ্য থেকে পরবর্তী দৃশ্যে যাবার জন্য কোথাও বা 'অপটিক্যালস', তথায় কোথাও বা 'অ্যানিমেশন ক্যামেরা' কিংবা 'মিক্সিং' প্রভৃতির সুষ্ঠু ব্যবহার করেছেন। আবহ-সঙ্গীতের প্রয়োগ ছবিটিকে অধিকতর ঐশ্বর্যময় করে তুলেছে।

(৩) সংবাদমূলক তথ্যচিত্র হিসেবে ৯ রীল দীর্ঘ 'ভূটান' ছবিটি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। ভূটানের জনিম সংস্কৃতি, ধর্ম, দৈনন্দিন জীবনের আচার-ব্যবহার, পোষাক-পরিচ্ছদ থেকে শুরু করে মহাযানে যন্ত্র-প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে তাদের জীবনযাত্রার পরিবর্তন, শিক্ষার অগ্রগতিকরণ নিয়ে কিভাবে বিজ্ঞানের অগ্রগতি প্রভাব বিস্তার করেছে এই রঙীন ছবিটির মাধ্যমে। প্রকাশ পতি প্রযোজিত এবং পি এন সাইন পরি-চালিত এই ছবিখানি আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভূটান সম্পর্কে একটি নিখুঁত তথ্য-চিত্র।

(৪) বাংলার বাইরে উৎপল প্রযোজক ছবি রূপে পুরস্কৃত হয়েছে এন এস থাপা রচিত ও প্রযোজিত ৩০০ মিটার দীর্ঘ রঙীন ছবি 'মেরা ঘাই লাভ'। আমাদের এই বিশাল ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত যে অগ্রগতি হয়েছে, কত বৈচিত্র্যপূর্ণ এই ভারত, বোঝাবার জন্য হিন্দী, বাংলা, তামিল গুজরাটি, পাঞ্জাবী প্রভৃতি ভাষাকে একের পর এক যবনিকাপাতরূপে ব্যবহার করে দৃশ্যের পর দৃশ্যের মাধ্যমে তাই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ভাষাহীন প্রয়োগে সঙ্গীত পরিচালক বিভব রাহুর বাওরের কৃতিত্ব উচ্চ প্রশংসনীয়।

(৫) নাগরিক তথ্যমূলক ছবি হচ্ছে এস সুখদেব কৃত ৪৮০ মিটার দীর্ঘ সাদা-কালো চিত্র 'এ ডিসেন্ট অ্যাইডিয়া'। ছোট্ট নদী প্রকল্পের জলাধার ও বাঁধগুলি গ্রামীণ জীবনে যে কি বিরাট পরিবর্তন এনেছে, তাই হোট উজ্জ্বল চিত্র বিশ্লেষণে চিত্রকর সুখদেব এই ছবিটির মাধ্যমে।

—নান্দীকর

মঞ্চাভিনয়

সায়মের 'মুহ্যমান যাত্র' : আজকের নতুনতর মনচর্চার দিকে দৃষ্টি রেখে যে ধরনের নাট্যপ্রয়োজনা মোটামুটি আমাদের চমকিত করবে তা হোল আবসার্ড নাটক। আপাতদৃষ্টিতে এই নাটকগুলোকে উদ্ভট বলে মনে হলেও গভীরতর চিন্তার দর্পণে এর মর্মকথা প্রতিভাত হয়। সায়মের শিল্পীরা এই ধরনের একটি নাটক কয়েক-দিন আগে থিয়েটার সেন্টার মঞ্চে পরি-বেশন করেছেন। নাটকটির নাম হোল 'মুহ্যমান যাত্র'।

আজকের মধ্যবিত্ত তরুণ-তরুণীদের নানা আশা-নিরাশা কামনাবাসনার আবর্ত থেকেই এ-নাটক অঙ্কুরিত হয়ে নিয়েছে। তাদের নানা সমস্যা এক-একটি রূপক ধরে নাট্যায়িত হয়েছে। নাটকের বাচ্চু, পাগলা, সুধীর, লোচনাথ, প্রদীপ, দৈবাল, কল্যাণী, সীতেশদা সবাই আমাদের চেনা। এরা সবাই অন্ধকারের সীমাহীনতায় মগ্নচৈতন্য, কিন্তু সবাই বেরিয়ে আসতে চাইছে অন্ধকার ছিন্ন করে এক আলোকিত সন্ধানে।

নাট্যকার রাজা চট্টোপাধ্যায় নিজেই নাটকের প্রয়োগপরিকল্পনার দায়িত্ব নিয়ে-ছিলেন। বহু ক্ষেত্রে তিনি নতুনতর প্রয়োগ-রীতিকে ব্যবহার করেছেন। মঞ্চসজ্জার ব্যবহারে রূপকল্পী বক্তব্য প্রকাশ পেয়েছে। কয়েকটি কম্পোজিশন নিঃসন্দেহে নাট্য-নির্দেশনার সূক্ষ্ম শৈল্পিক মানসের পরিচয় বহন করে।

প্রতিটি চরিত্রই হয়েছে সুঅভিনীত। অভিনয়ে ছিলেন বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়, সোমেন চট্টোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শম্ভু ভট্টাচার্য, প্রীতিনাথ চৌধুরী, উৎপল মুখোপাধ্যায়, বিমল ঘোষ, মিহির লাহিড়ী, মৃগাঙ্ক চৌধুরী, সলিল ঘোষ, উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায় ও টুটুল চট্টোপাধ্যায়।

'বোধন' নিবেদিত 'শুভা' : রবীন্দ্র-নাথের অপরূপ ছোটগল্প 'শুভা'য় একটি নিখুঁত নাট্যরূপ সেদিন পরিবেশিত হোল এক নতুনতর প্রাণময় ছন্দে। প্রকৃতির মমতাছোঁয়া এই গল্পের মর্মকথাকে আশ্চর্য নৈপুণ্যে মঞ্চের আলোর মুক্ত করে তুলতে পেরেছেন 'বোধনে'র শিল্পীরা। শুভা যেন প্রকৃতিরই কন্যা, প্রকৃতির প্রতিটি স্পন্দনে শুভাও যেন প্রাণের আবেগ খুঁজে পায়, মিলে যায় তার চাঞ্চল্যের প্রহরে। এই অপূর্ব হৃদয়হরণ গল্পকে নাট্যরূপে ভরা দিয়েছেন পরিচালকুমার ঘোষাল। মোটা-মুটিভাবে তিনি গল্পটির মর্ম স্পর্শ করতে পেরেছেন।

নাটকটির প্রয়োগপরিকল্পনা নিঃ-সন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে। এ-ব্যাপারে অপূর্ব বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিষ্ঠা সত্যি উল্লেখ করার মতো। শুভার ভূমিকায় সুন্দর অভিনয় করেন পাপিয়া চট্টোপাধ্যায়। অন্যান্য চরিত্রে ছিলেন শৈল চট্টোপাধ্যায়, অলোক গুপ্ত, বিনয় রায়, মাঃ শান্তনু, অপূর্ব বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বপন দত্ত।

আলোকসম্পাত ও নেপথ্যসঙ্গীত নাটকের মূল মেজাজের সঙ্গে ঠিক সমতা রাখতে পারেনি মনে হয়।

'বিবাহের বাত্র' নাট্যাভিনয় : সেন্ট্রাল টেলিগ্রাফ অফিস পাবলিক কাউন্টার রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভ্য ও সভ্যা-বৃন্দ কর্তৃক শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় রচিত 'বিবাহের বাত্র' নাটকটি আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে টেলিগ্রাফ ইনস্টিটিউট মঞ্চে অভিনীত হবে। নাটকটি পরিচালনা করছেন সর্বশ্রী সাধু চট্টোপাধ্যায় ও প্রণব রায়। অভিনয়াংশে আছেন দিবানাথ মুখোপাধ্যায়, সাধু চট্টোপাধ্যায়, প্রণব রায়, সুধাংশু মণ্ডল, সুনীল চট্টোপাধ্যায়, কানাই বন্দ্যো-পাধ্যায় ও শ্রীমতী কল্পনা মিত্র।

সিরাজদ্দৌল্লা অভিনয় : গত ২৮শে জুন রূপনা রঙ্গমঞ্চে শ্রীশোভন সাধুখাঁ পরিচালনায় মঞ্চলোকের প্রথম অবদান সিরাজদ্দৌল্লা অভিনীত হল। বিভিন্ন চরিত্রে সনৎ ঘোষ, ঘটক সাহা, বলরাম দাস, কার্তিক সাধুখাঁ, দীপালি [illegible] নিজ নিজ চরিত্রে দক্ষতা দেখিয়েছেন। [illegible] স্থায়ী চরিত্রে মণিয়া ঘোষ অভিনয় দিয়ে অভিনয় করেছেন। শোভন সাধুখাঁ পরিচালনায় ও ওয়াটস-এর চরিত্রাভিনয়ে দক্ষতা দেখিয়ে-ছেন।

সাগর সেনের পরিচালনায়

রবিবাসরিক

শ্রাবণ-সন্ধ্যা

আগামী রবিবার • সন্ধ্যা ৬টায়

রবীন্দ্রসদনে

অংশ গ্রহণ করছেন

হেমন্ত মুখোপাধ্যায় • সুচিত্রা মিত্র

চিন্ময় চট্টোপাধ্যায় • নীলিমা সেন

সাগর সেন • সুমিত্রা সেন

এবং

রবীন্দ্রসদনের নবীন শিল্পীবৃন্দ

টিকিট—১০৲। ৭৲। ৫৲। ৩৲। ২৲

পাওয়া যাবে সেনকো • ওয়েলকো •

ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েটস

বি—১২

দের সরকারী পেনসনের ব্যবস্থা করতে হবে। ২। আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রে শিল্পী-সংসদের অনুষ্ঠান প্রচারের সুযোগ দিতে হবে, যে সম্মান-দক্ষিণা পাওয়া যাবে, সেই অর্থ দুস্থ শিল্পীদের জন্য ব্যয় করতে হবে। ৩। চলচ্চিত্র ও পেশাদার নাটকের ক্ষেত্রে নবীন প্রতিভাদের সুযোগ দিতে হবে। ৪। চলচ্চিত্র-উপদেষ্টা পর্ষদ ও সেন্সার বোর্ডে শিল্পী-সংসদের প্রতিনিধির দাবী করা হচ্ছে। ৫। বঙ্গবঙ্গাব্দের শতবর্ষপূর্তি বর্ষে জাতীয় মূল্যমানের জন্য সরকারের নিকট দাবী জানানো হচ্ছে। ৬। ক্রীড়ার ক্ষেত্রে শিল্পী-সংসদের সভ্যদের উৎসাহ দেবার ও প্রয়োজনার্থে ময়দানের নিকট ভূখণ্ডের জন্যে আবেদন করা হবে, উক্ত ভূখণ্ডে শিল্পী-সংসদের নিজস্ব ক্রীড়া-গৃহ প্রতিষ্ঠিত করা হবে। ৭। অশ্লীল ও অপকৃষ্টিমূলক বেশী বিদেশী চলচ্চিত্র প্রদর্শন বন্ধ করতে হবে। ৮। সংস্কৃতি জগতের একজন পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রীর দাবী বর্তমান সরকারের নিকট জানানো হবে। ৯। বর্তমানে চলচ্চিত্রের বর্ধিত প্রমোদকরের ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত জনসাধারণ ও চলচ্চিত্র শিল্পের জন্যই ২-২০ টাকা টিকিট পর্যন্ত বর্ধিত প্রমোদকর যাতে বর্ধিত না করা হয় সেজন্য পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন করা হচ্ছে। এই সভায় শিল্পী-সংসদের নতুন কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হয় সভাপতি : শ্রীউত্তমকুমার চট্টোপাধ্যায়, সহ-সম্পাদক সর্বশ্রী বিকাশ রায়, অমলাশঙ্কর, সতীনাথ মুখার্জি, তরুণ রায়, স্বপনকুমার মুখার্জি। সম্পাদক শ্রীঅর্ধেন্দু মুখার্জি। সাংস্কৃতিক সম্পাদক শ্রীভূপেন রায়। সহ-সম্পাদক শ্রীশ্যামল মিত্র ও শ্রীঅনিল চ্যাটার্জি। কোষাধ্যক্ষ শ্রীসুধীর রায়। কার্যকরী সমিতি সর্বশ্রী বিকাশ মুখার্জি, অসীমকুমার সরকার, অধীর বাগচী, গুপী বে, অজিত মিত্র নির্মল ঘোষ, শিপ্রা মিত্র, জয়শ্রী সেন সীতা দেবী। সভ্যের সম্পাদক সর্বশ্রী প্রফুল্ল রায় ও ইন্দু বসু। জন-সংযোগ সচিব শ্রীপঞ্চানন।

ইস্ট ইণ্ডিয়া মোশান পিক্চার অ্যাসোসিয়েশনের প্রযোজক শাখার চেয়ারম্যান, বিমল দে গেল শুক্রবার, ১৬ জুলাই এক সাংবাদিক বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা স্থাপন ও ২৫ লক্ষ টাকা পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নয়নকল্পে ব্যয় করবার ঘোষণাকে স্বাগত জানাবার সঙ্গে সঙ্গে সন্দেহ প্রকাশ করে বলেন ওইটুকু জন্যে আমাদের চলচ্চিত্র শিল্পের কতটুকুই বা উন্নতি সাধিত হবার সম্ভাবনা। তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গের ৩৮০টি চিত্রগৃহের জায়গায় মাত্র ৫০টিতে বাংলা ছবি দেখানো হয়। যাতে প্রতিটি চিত্রগৃহেই কিছু না কিছু বাংলা ছবি দেখাতে বাধ্য হয়, সে ব্যবস্থা না করলে বাংলা ছবির আয় বাড়বার পথ কোথায়? এবং সেও করতে হবে চিত্রগৃহগুলির মূল্যবৃদ্ধির কথা বাদ দিয়ে আয় বাড়াবার ব্যবস্থা করে। এছাড়াও সেন্সার ভিত্তিক প্রদর্শনী ব্যবস্থা, পশ্চিমবঙ্গের জন্যে একটি ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশন গঠন, বাংলাভাষার ছবির প্রযোজকদের এককালীন সাহায্যদান বা প্রমোদকর প্রত্যর্পণ, স্টুডিও এবং ল্যাবোরেটরীগুলিকে উন্নয়নের জন্যে এককালীন সাহায্যদান, বাংলা ছবির অধিকতর মূল্য সম্ভব করবার জন্যে আরও মূর্তিচিত্রগৃহের ব্যবস্থা করা অত্যাবশ্যক। যদি কোনো চিত্রগৃহের মালিক লোকসানের অজুহাতে তাঁর চিত্রগৃহ বন্ধ করতে চান, সেই চিত্রগৃহের পরিচালনভার সরকারকে গ্রহণ করতে হবে। শ্রীদে বলেন, আমোদকরের টাকা বাদ দিয়ে টিকিট বিক্রয়লব্ধ অর্থের ৭৫ ভাগ পান প্রদর্শক এবং বাকী ২৫ ভাগ পান পরিবেশক ও প্রযোজক যুগ্মভাবে। তিনি আরও বলেন, আজ বাংলা ছবির মান যদি নিম্নগামী হয়ে থাকে, তার যথার্থ কারণ কি, তা অনুসন্ধান করে দেখতে হবে। প্রতিযোগিতার বাজার জন্যে কোনো কোনো ছবিতে কারাকে কলা প্রভৃতি দেখানো হচ্ছে, এটা আমাদের চলচ্চিত্র জগতের অসততারই চিহ্ন।

ডঃ জেমস কি হ্যাচ সেদিন আমেরিকান লাইব্রেরীতে মাত্র আটদিনের চেষ্টায় মোট তেরোটি ছেলেমেয়েকে দিয়ে 'ইয়েস, ইয়েস, ইয়েস ইয়েস' নামে যে নাটাসৃষ্টিতে সক্ষম করে তুলেছেন, তারই একটি নিদর্শন দিলেন। প্রথমে অভিনয়ের অভ্যাসের জন্যে যে-সব ব্যায়াম করা প্রয়োজন, যেভাবে আঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে এলিয়ে দিতে হয় তাদের বশে রাখবার জন্যে, তারই কিছু পরিচয় দিলেন উৎসাহী ছেলেমেয়েদের সাহায্যে। পরে 'বাবা' নামে একটি ছেলের জন্ম থেকে শুরু তার ওপর বাপ-মার প্রভাব, তার শিক্ষা, প্রতিদিন জনতার সংস্পর্শে তার নতুনতর শিক্ষা, তার বুদ্ধি খোলার চেষ্টা, তার প্রথম প্রেম সাধুসঙ্গ, তার বিয়ে তার বিদ্যা-বিজ্ঞানায় যোগদান, স্ত্রীজাত, সাংসারিক দুঃখ, প্রভৃতির পর তার আকস্মিকভাবে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু পর্যন্ত সমস্ত অভিনয়ের মারফত দেখানো হল। অভিনয়-কৌশলে সবচেয়ে 'এবং ইন্টারভিউ' নাটকের একটি বিস্ময়কর সাদৃশ্য লক্ষ্য করা গেল।

থিয়েটার কমপেকশন—২৮শে জুলাই মিনার্ভা থিয়েটার কমপেকশন-এর পক্ষ প্রযোজনা শৈলেশ গুহ নিয়োগীর 'উত্তাল-তরঙ্গ'। নির্দেশনায় ও অভিনয়ে থাকছেন শ্যামল রায়চৌধুরী। সঙ্গীত পরিচালনায় শ্রীকালীনাথ।

গীতালি সঙ্গীত প্রতিযোগিতার ফলাফল

পঞ্চমবর্ষ গীতালি সঙ্গীত প্রতিযোগিতার 'ক' থেকে 'ঙ' পর্যন্ত সকল বিভাগের ও বিষয়ের কেবলমাত্র প্রথম স্থানাধিকারীদের নাম এখানে উল্লিখিত হল :

ভূপেন : দেবশ্রী মুখার্জি, রীণা চ্যাটার্জি, লীলা রায়চৌধুরী। ধামার : লীলা রায়-চৌধুরী, খেয়াল : মধুমিতা বসু, অজন্তা মিত্র, কল্যাণী দাসগুপ্ত, রীণা চ্যাটার্জি, তপতি পাণ্ডা, রত্না বসু। ধ্রুপদ : দেবীকা চৌধুরী। রাগপ্রধান : মধুমিতা বসু, মিতা চ্যাটার্জি, গৌরী সরকার, স্বপ্না ভট্টাচার্য, ভজন : শ্রাবণী দে, মিতা চ্যাটার্জি, ইন্দ্রাণী মিত্র, আলো সেন, শ্যামা সংগীত : শুভ্রা মজুমদার, চিত্রিতা গাঙ্গুলী, নবনীতা লাহিড়ী, আলো সেন, প্রাচীন বাংলাগান : মধুমিতা বসু, সোনালী দত্ত, পাপিয়া চৌধুরী, পলি ভট্টাচার্য, দেশাত্মবোধক : সুজাতা বর্মন, পলি ভট্টাচার্য, লোকসঙ্গীত : মধুমিতা বসু, মিতা চ্যাটার্জি, নবনীতা লাহিড়ী, স্বপ্না ভট্টাচার্য, আরতি ঘোষ, আধুনিক : শর্মিষ্ঠা প্রামানিক, মিতা চ্যাটার্জি রত্না চ্যাটার্জি, রীণা চ্যাটার্জি, শ্রমিষ্ঠা গুহ, বন্দনা রক্ষিত, রবিনকুমার দাস, গীত : মধুমিতা দাস, জয়শ্রী গুহ, রবীন্দ্রসঙ্গীত : মধুমিতা দাস, মিতা চ্যাটার্জি, শুক্লা মিত্র, রীণা চ্যাটার্জি, সমর চ্যাটার্জি, স্বপ্না চক্রবর্তী, পার্বতী সেন, প্রথাগত চক্রবর্তী, দেবীকা চৌধুরী, নজরুল : মধুমিতা বসু, মিতা চ্যাটার্জি, নবনীতা লাহিড়ী, রীণা চ্যাটার্জি, সুবিমল ঘোষ, প্রবীর গাঙ্গুলী, দেবীকা চৌধুরী, পাশ্চাত্য : শর্মিষ্ঠা পাল, কথক : মণিকা বসু, কেকা পাণ্ডা, ভারতনাট্যম : মণিকা বসু, কেকা পাণ্ডা, ভরতনাট্যম : মনোজিৎ মাইতি ও কল্যাণ-কুমার সেন।

১৮৭২—নতুন নাটক : রঙ্গমঞ্চের শত-বর্ষপূর্তি উপলক্ষে দক্ষিণ কলিকাতার প্রখ্যাত নাট্যসংস্থা 'রঙ্গসভা নতুন নাটক '১৮৭২' মঞ্চস্থ করবেন ঠিক করেছেন। এটি রচনা করেছেন প্রখ্যাত নাট্যকার মন্মথ রায়। শীঘ্রই নাটকটি মঞ্চস্থ হবে।

অরোরার 'দুরন্ত জয়' মুক্তি প্রতীক্ষায়।

বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের সবচেয়ে প্রাচীনতম প্রযোজক ও পরিবেশক প্রতিষ্ঠান অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন প্রাঃ লিঃ-এর নতুন সৃষ্টিতলী ও আলোকের ছবি 'দুরন্ত জয়'-এর চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনার কাজ সম্প্রতি শেষ হয়েছে। ছবিটি বর্তমানে মুক্তি প্রতীক্ষায়। 'আমি মন্ত্রী হলে' খ্যাতে নাট্যকার সুনীল চক্রবর্তীর কাহিনী অবলম্বনে ছবিটির চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনা করেছেন—প্রবীণ চিত্র পরিচালক অর্ধেন্দু মুখার্জী। রবীন চ্যাটার্জী ছবিটির সুরকার। নেপথ্যে কণ্ঠদান করেছেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, আরতি মুখোপাধ্যায়, অনুপ ঘোষাল, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

চরিত্রচিত্রণে আছেন—ভাস্কর চৌধুরী, নবাগতা বৈশালী চ্যাটার্জী, বিকাশ রায়, নির্মলকুমার, সুব্রতা চ্যাটার্জি, সমিত বিশ্বাস, জহর রায়, আনন্দ মুখার্জী, নবাগতা কাকলি রায়, শিখা ভট্টাচার্য, রবীন ঘোষাল, সজল ঘটক, সীতা মুখার্জী, রবীন ঘোষাল, পরিমল সেন, শিশির মিত্র, শিবু মজুমদার ও বিশু দে।

চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনা করেছেন যথাক্রমে আশু বসু ও বিশ্বনাথ মিত্র।

ভ্রম সংশোধন

১১শ সংখ্যায় প্রকাশিত সিসিলি ডে লুইস প্রবন্ধকারের নাম রঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের স্থলে রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় হবে।

খেলাধুলা

দর্শক

ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া

তৃতীয় টেস্ট ক্রিকেট খেলা

ইংল্যান্ডের অধিনায়ক মে ইলিংওয়ার্থ টসে জয়ী হন। এই নিয়ে তিনি উপর্যুপরি ৮বার টসে জয়ী হলেন। টসে জিতে তিনি অস্ট্রেলিয়াকে প্রথম ব্যাট করার দান ছেড়ে দেন। এখানে উল্লেখ্য, টসে জেতার পর অস্ট্রেলিয়াকে প্রথম ব্যাট করতে দেখা দিয়েছিলেন ইংল্যান্ডের অধিনায়ক টেড ডেক্সটার ১৯৬৪ সালে লর্ডস মাঠের দ্বিতীয় টেস্টে। সেই খেলা শেষ পর্যন্ত অমীমাংসিত থেকে যায়। বর্তমানের ৩য় টেস্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়াকে প্রথম ব্যাট করতে দিয়ে অধিনায়ক ইলিংওয়ার্থ যে সুবিধা আশা করেছিলেন তা শেষ পর্যন্ত তাঁর কপালে জোটেনি। ভেবেছিলেন সবুজ পিচ দলের দুই ফাস্ট বোলার—জন স্নো এবং পিটার লেভারের সহায়ক হবে।

অস্ট্রেলিয়ার ১ম ইনিংসের রান লাঞ্চের সময় ছিল ৮৮ (১ উইকেটে) এবং চা-পানের সময় ১১৬ (৩ উইকেটে)। প্রথম দিনের খেলায় অস্ট্রেলিয়ার ১ম ইনিংসের ৬টা উইকেট পড়ে ২৪৯ রান দাঁড়ায়। ওপেনিং ব্যাটসম্যান কিথ স্ট্যাকপোল একাই ১১৪ রান তুলে দলকে বিপদমুক্ত করেন। তিনি তাঁর ৪৬ রানের মাথায় দুবার আউট হওয়া থেকে খুব জোর বেঁচে যান। প্রথমবার তাঁর ক্যাচ ফেলে দেন উইকেট-রক্ষক এ্যালান নট এবং দ্বিতীয়বার পিটার পারফিট। স্ট্যাকপোল শেষ পর্যন্ত পিটার পারফিটের হাতেই ধরা পড়ে আউট হয়েছিলেন। প্রথমদিনের খেলায় ইংল্যান্ডের স্পিন বোলার জন স্নো ৬৫ রানে ৩টে উইকেট পান। অস্ট্রেলিয়াকে প্রথম ব্যাট করার দান ছেড়ে দিয়ে অধিনায়ক রে ইলিংওয়ার্থ যে খুব ভুল করেননি তা খেলার এক সময় দর্শকরা স্বীকার করেছিলেন। অস্ট্রেলিয়ার এই সঙ্কটকালে স্ট্যাকপোল গড়ের সঙ্গে না খেললে খেলার গতি ইংল্যান্ডের অনুকূলে ঘুরে যেত।

দ্বিতীয় দিনে লাঞ্চের আগে অস্ট্রেলিয়ার ১ম ইনিংস ৩১৫ রানের মাথায় শেষ হয়। এই দিনের খেলায় অস্ট্রেলিয়া তার শেষ ৪ উইকেটের বিনিময়ে ৬৬ রান যোগ করেছিল। পিটার পারফিট অস্ট্রেলিয়ার ১ম ইনিংসে পাঁচটা 'ক্যাচ' ধরেন। টেস্টের এক ইনিংসে ইংল্যান্ডের খেলোয়াড়দের পক্ষে (উইকেট কিপার বাদে) পাঁচটা 'ক্যাচ' ধরার নজির আর মাত্র একটা আছে।

ইংল্যান্ড ১ম ইনিংসের খেলায় বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি। ডেনিস লিলি চা-পান বিরতির ঠিক আগের ওভারের শেষ বলে লাকহার্স্টকে এল-বি-ডব্লিউ করেন। চা-পানের সময় ইংল্যান্ডের রান দাঁড়ায় ৫১ (১ উইকেটে)। দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে ইংল্যান্ডের ৪টে উইকেট পড়ে ১১৭ রান দাঁড়ায়। বহু ম্যাসির মারাত্মক বোলিংয়ে ইংল্যান্ডের খেলোয়াড়রা কোণঠাসা হয়ে খেলেছিলেন।

তৃতীয় দিনে লাঞ্চের পরবর্তী ২৫ মিনিটে ইংল্যান্ডের ১ম ইনিংস মাত্র ১৪৯ রানের মাথায় শেষ হলে অস্ট্রেলিয়া ১২৬ রানে এগিয়ে যায়। ইংল্যান্ডের শেষ ৬টা উইকেটে মাত্র ৭২ রান যোগ হয়েছিল। অস্ট্রেলিয়ার লিলি ৩৫ রানে ৪টে এবং ম্যাসি ৪০ রানে ৪টে উইকেট পান। অস্ট্রেলিয়ার অনুকূলে খেলার গতি ঘুরিয়েছিলেন বব ম্যাসি। তৃতীয় দিনের খেলায় তিনি প্রথম ১০টা বল দিয়ে ইংল্যান্ডের ৩টে উইকেট পেয়েছিলেন।

অস্ট্রেলিয়া ১২৬ রানে এগিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে খেলতে নামে এবং দুটো উইকেটের বিনিময়ে ১৫৭ রান সংগ্রহ করে। তৃতীয় দিনের খেলার শেষে দেখা গেল অস্ট্রেলিয়া ২৮৩ রানে এগিয়েছে এবং হাতে জমা আছে দ্বিতীয় ইনিংসের ৮টা উইকেট।

ইংল্যান্ডের ১ম ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ার উইকেটকিপার রডনি মার্শ 'ক্যাচ' ধরে পাঁচজন খেলোয়াড়কে আউট করেন। প্রথম টেস্টের ২য় ইনিংসেও তিনি পাঁচটা 'ক্যাচ' ধরেছিলেন। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ১৯৭২ সালের টেস্ট সিরিজে মার্শ এপর্যন্ত ১৬ জনকে আউট করেছেন।

চতুর্থ দিনে অস্ট্রেলিয়া ২য় ইনিংসের ৩২৯ রানের (৪ উইকেটে) মাথায় খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। ৩য় উইকেটের জুটিতে গ্রেগ চ্যাপেল (৭২ রান) এবং রস এডওয়ার্ডস (নট আউট ১৭০ রান) দলের ১৯৮ রান সংগ্রহ করে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট ক্রিজ মাঠে অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে ৩য় উইকেট জুটির রেকর্ড রান করেন। টেস্ট ক্রিজ মাঠে অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে ৩য় উইকেট জুটির পূর্বের রেকর্ড রান ছিল ৭২ (জন ব্রাডম্যান এবং স্ট্যান ম্যাকেব (১৯৩৮)। রস এডওয়ার্ডস ১৭০ রান তুলে শেষ পর্যন্ত অপরাজিত থাকেন।

জয়লাভের প্রয়োজনীয় ৪৫১ রান তুলতে ইংল্যান্ড ২য় ইনিংসে খেলতে নামে এবং ১ উইকেট খুইয়ে ১১১ রান সংগ্রহ করে। চতুর্থ দিনের খেলার শেষে দেখা গেল খেলায় জয়লাভ করতে ইংল্যান্ডের আরও ৩৪১ রানের দরকার। এদিকে তাদের হাতে জমা পুরো একদিনের খেলার সময় এবং ১টা উইকেট।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

অস্ট্রেলিয়া : ৩১৫ রান (স্ট্যাকপোল ১১৪ এবং গ্রেগ ৫৪ রান। স্নো ১২ রানে ৫ এবং গ্রিগ ৮৮ রানে ২ উইকেট)

ও ৩২৯ রান (৪ উইকেটে ডিক্লেঃ এড-ওয়ার্ডস নট আউট ১৭০, কি চ্যাপেল ৭২ এবং আরান চ্যাপেল ৫০ রান। স্নো ১৪ রানে ৩ উইকেট)।

ইংল্যান্ড : ১৪৯ রান (এডরিচ ৩৭ রান। লিলি ৩৫ রানে ৪ এবং ম্যাসী ৪০ রানে ৪ উইকেট)

ও ১১১ রান (১ উইকেটে। লাকহার্স্ট নট আউট ৬০ রান)।

ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫.৫০	দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনী
ভক্টর হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়	৮.০০	রবীন্দ্র-শিল্পতত্ত্ব
	৪.৭৫	ভারতদূত রবীন্দ্রনাথ
শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	০.৭৫	ঘরিবাদ আধুনিকতা ও আনন্দবাদীমালা
শার্ঙ্গদেব (সুরেশচন্দ্র বন্দ্যো-পাধ্যায় অনূদিত)	১৮.০০	সঙ্গীতরত্নাকর
শ্রীসত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার	০.০০	রবীন্দ্রনাথ ও ভারতবিদ্যা
ভক্টর শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য	৫.০০	পদাবলীর রূপসৌন্দর্য ও রুচির রবীন্দ্রনাথ
গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫.০০	সঙ্গীতচন্দ্রিকা
রবীন্দ্ররচনার উৎপত্তিসন্ধান	১২.০০	রবীন্দ্র-অনুসন্ধিৎসা
শ্রীবারুক্ষ সেনন	২৫.০০	ইণ্ডিয়ান ক্লাসিকাল ডান্সেস্
ভক্টর ধীরেন্দ্র দেবনাথ	৬.০০	রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে বুদ্ধ
ভক্টর মানস রায়চৌধুরী	১৫.০০	স্টাডিজ ইন্ আর্টিস্টিক রিলেটীভিটি
ভক্টর অমিতাভ মুখোপাধ্যায়	১৬.৫০	রিফর্ম এণ্ড রিঅ্যাকশনারেসন্ ইন্ বেঙ্গল
ভক্টর দীপককুমার বড়ুয়া	০৭.৫০	এনালিটিকাল স্টাডি অফ কোর বিজনাস
ভক্টর সরোজকুমার দাস	০.০০	টেগোর এণ্ড দি পেরেনিয়াল প্রব্লেম অফ রিয়ালিটি

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। ৬/৪ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা ৭
পরিবেশক : জিজ্ঞাসা। ১এ কলেজ রো ও ১০০এ রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা

ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের লীগের খেলায় ইস্টবেঙ্গলের [illegible] গোল দেওয়ার পর। ইস্টবেঙ্গল ২—০ গোলে জয়ী হয়

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ

গত সপ্তাহে জুলাই ১৩—১৫। প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগের যে ১২টি খেলা হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত ফলাফল : জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি ১১ এবং ড্র ১।

বহস্পতি লীগ তালিকার প্রথম তিনটি স্থানের অবস্থা এইরকম দাঁড়িয়েছে : ১ম মোহনবাগান ১৫টি খেলায় ৩০ পয়েন্ট ২য় ইস্টবেঙ্গল ১৩টি খেলায় ২১ পয়েন্ট এবং ৩য় মহমেডান স্পোর্টিং—১৩টি খেলায় ২৮ পয়েন্ট। তবে লীগ চ্যাম্পিয়ন-শিপের লড়াইয়ে এখনো দু'বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ান ইস্টবেঙ্গল ক্লাবই এগিয়ে আছে। তারা মোহনবাগান এবং মহমেডান স্পোর্টিংয়ের থেকে দুটো ম্যাচ কম খেলে মোহনবাগানের থেকে মাত্র ২ পয়েন্ট পিছনে আছে, অপরদিকে মহমেডান স্পোর্টিংয়ের থেকে ১ পয়েন্ট বেশী সংগ্রহ করেছে। গত শনিবারের গুরুত্বপূর্ণ খেলায় ইস্টবেঙ্গল ২—০ গোলে নিকট প্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগানকে হারিয়ে লীগ চ্যাম্পিয়নশিপ পাওয়ার পথ অনেক পরিষ্কার করে নিয়েছে। লীগ চ্যাম্পিয়নশিপের লড়াইয়ে ইস্টবেঙ্গল দল হবে দুটি প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগান এবং মহমেডান স্পোর্টিংয়ের মনোবল ভেঙ্গে দিয়েছে।

অর্জুন পুরস্কার

অল ইণ্ডিয়া স্পোর্টস কাউন্সিলের সুপারিশ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন ক্রমে ১৯৭০ এবং ১৯৭১ সালের বিভিন্ন খেলাধূলায় অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য ৮জন মহিলা সমেত মোট ২৫ জন খেলোয়াড় অর্জুন পুরস্কার লাভ করেছেন। এই ২৫ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে বাংলার দুজন ফুটবল প্লেয়ার্স—নঈম এবং চন্দ্রশেখর প্রসাদ আছেন। তাছাড়া নামের তালিকায় মিউনিখ অলিম্পিকগামী এই ৭ জন আছেন : অজিতপাল সিং এবং পেণ্ডমল কৃষ্ণমূর্তি (হকি) মহিন্দর সিং গিল এবং এডওয়ার্ড সিকুইরা (অ্যাথলেটিক্স), সুরেশ কুমার (বক্সিং) এম ভেনু বক্সিং), হেক্টররাজন (ক্রিকেট), চন্দ্রশেখর প্রসাদ (ফুটবল) পি কৃষ্ণমূর্তি (হকি), কুমারী অঞ্জলি সুখরাম দেবব (সাঁতার), মহাবীর সিং (সুটিং), কুমারী ডেঁটি চাঙমান (টেবিল টেনিস), ভানুমল্ল সিং (সাঁতার) এবং শ্যামলাল সাহুওয়ালা (ভারোত্তোলন)।

শেষ সংবাদ

ওভাল মাঠে ইংলণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার তৃতীয় টেস্ট ক্রিকেট খেলা অমীমাংসিত-ভাবে শেষ হয়েছে। শেষ দিন ইংলণ্ডের ২য় ইনিংসের সংক্ষিপ্ত স্কোর : ২১০ রান (৬ উইকেটে)। ডাকহার্থ ১৬, ডেনিস কম্পটন ৫৪ আউট ৫০ এবং গ্রেগ নট আউট ৩৬ রান। লিলি ৪০ রানে ২ উইকেট।

১৯৭০ সালের পুরস্কার বিজয়ী

মীনলোচনসিং পিল (অ্যাথলেটিক্স), শ্রীমতী সরস্বতী হালদার (বাডমিন্টন), মাধবাস মুণ্ডোসির (বাস্কেটবল), মাইকেল ফেরেরা (ক্রিকেট), কালাল আমাপাও পিটকায়া (বেল বাডমিন্টন), দিলীপ সাওকার (ফুটবল), কে কে নঈমুদ্দিন (ফুটবল), অজিতপাল সিং (হকি), সুরেশ চন্দ্রবাবাও পাবার (খো-খো), কি জগন্নাথ (টেবিল টেনিস), সুরেশ কুমার (বক্সিং), মেঃ কর্ণেল সোনার জামসেদ কণ্ট্রাকটর (নৌচালনা), এবং অরুণকুমার লাহা (ভারোত্তোলন)।

১৯৭১ সালের পুরস্কার বিজয়ী

এডওয়ার্ড সিকুইরা (অ্যাথলেটিক্স), কুমারী পেণ্ডা মুর্তি (বাডমিন্টন), মনমোহন সিং (বাস্কেটবল), এম ভেনু (বক্সিং), হেক্টররাজন (ক্রিকেট), চন্দ্রশেখর প্রসাদ (ফুটবল), পি কৃষ্ণমূর্তি (হকি), কুমারী অঞ্জলি সুখরাম দেবব (খো-খো), মহাবীর সিং (সুটিং), কুমারী ডেঁটি চাঙমান (টেবিল টেনিস), ভানুমল্ল সিং (সাঁতার) এবং শ্যামলাল সাহুওয়ালা (ভারোত্তোলন)।

অমৃত পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিঃ এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও ৬৫।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৮ হইতে প্রকাশিত।

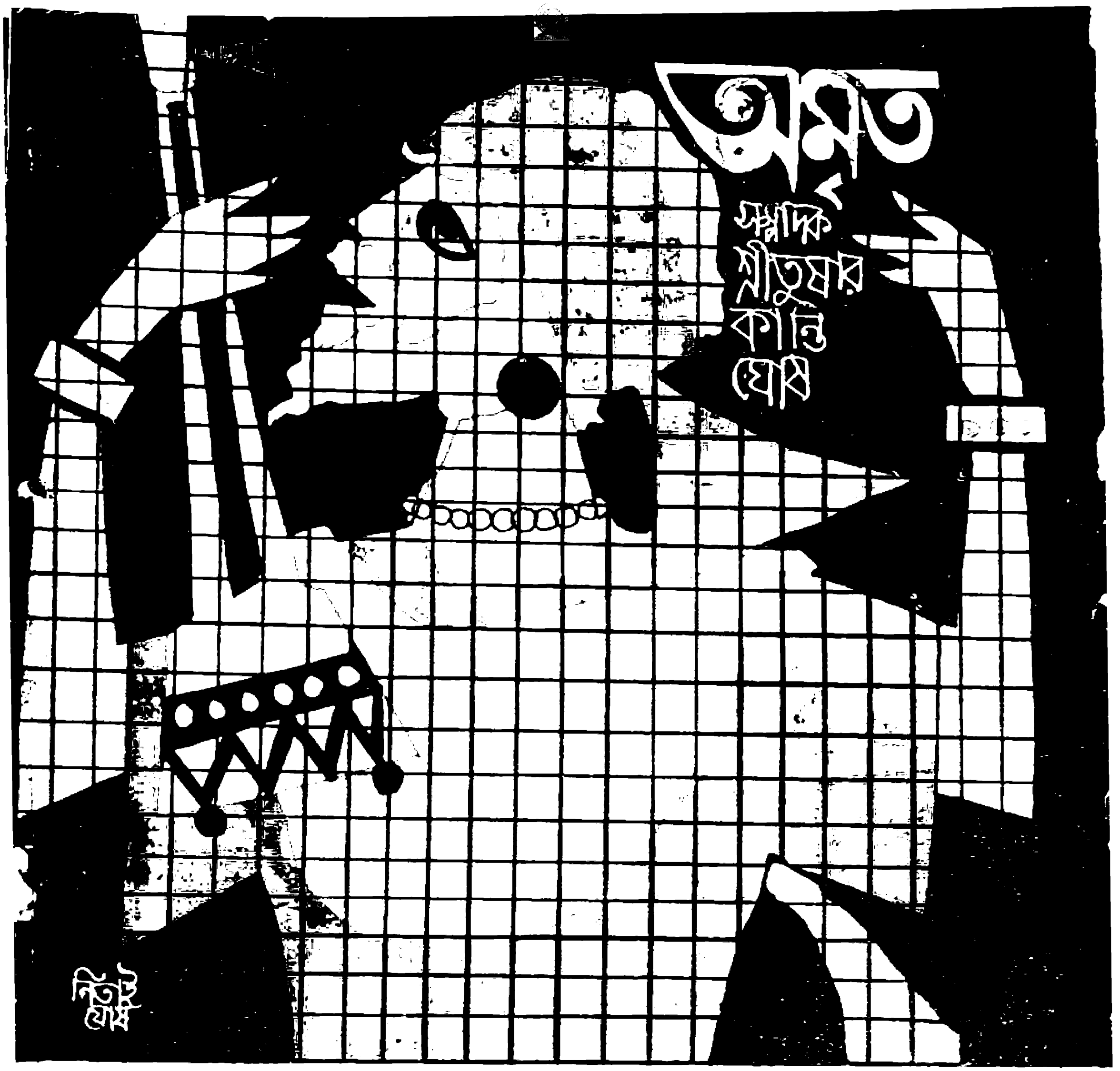

[১১ বর্ষ ১ খণ্ড ১৩ সংখ্যা] শুক্রবার, ১২ শ্রাবণ, ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ মূল্য : ১ পয়সা শুধু ২ পয়সা, ফ্রেট ৭১ পয়সা

আরও একটি সন্তান চাওয়ার আগে
ভেবে দেখুন

খোকা আছে তাকে ঠিক মতো
লালন-পালন করতে
পারছেন কি না

[illegible] [illegible] [illegible] [

ডেট কাপড় ধোয়ার কেক ডিটারজেন্ট শক্তিতে ভরপুর

ডেট ডিটারজেন্ট কাপড় ধোয়ার কেক

সাবানের তুলনায় ৫০% বেশী কাপড় অনেক বেশী সাদা ক'রে ধোয়।

–তা সে যে ধরণের জলই হোক।

Hindi HPMA 4/10 500

আরও একটি সন্তান চাওয়ার আগে ভেবে দেখুন

যেটি আছে তাকে ঠিক মতো লালন-পালন করতে পারছেন কি না

আপনার মনের সাধ, ছোটবেলা থেকেই ছেলে পড়াশোনায় ভালো হোক। আপনি চান তার সব চাহিদা পূরণ করে তাকে মানুষ করে তুলতে। কিন্তু এখনই পিঠোপিঠি যদি আর একটি এসে পড়ে, সবদিক সামলে তা কঠিন হয়ে দাঁড়াতে পারে। তেমন অবস্থা যাতে না হয় তার ব্যবস্থা করাই কি ভালো নয়?

সারা দুনিয়ায় কোটি কোটি দম্পতি তাই করছেন। সব দিক দিয়ে তৈরি না হওয়া পর্যন্ত সন্তানটির দায় তাঁরা চাপাচ্ছেন না। নিরোধের সাহায্যে আপনিও তা করতে পারেন। নিরোধ হল, সারা বিশ্বে পুরুষদের ব্যবহার্য, বয়সের জন্মনিরোধক। নিরাপদে ও সহজে ব্যবহার করা যায় বলে জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্যে বহুকাল ধরে সেরা নিরোধ এখনও রয়ে গেছে। আপনিও নিরোধ ব্যবহার করুন না?

সরকারী অর্থ সাহায্যে সর্বত্র 15 পয়সায় 3 টি নিরোধ পাওয়া যায়

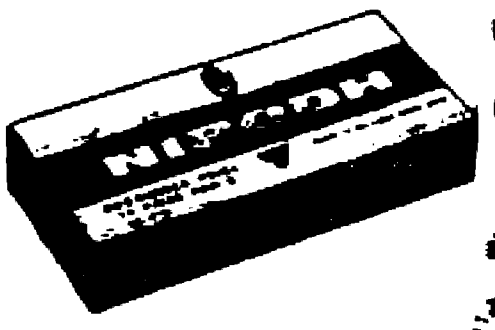

আরেকটি সন্তান না চাওয়া পর্যন্ত ব্যবহার করুন

নিরোধ

davp 71460

সেরা সেরা সৌখিন মনের মতন, সস্তায় বাহারী মোড়কে ও নির্ভরযোগ্য, বয়সের জন্মনিরোধক

মনোহারী দোকান, মুদীর দোকান, কেমিস্টের দোকান প্রভৃতি সর্বত্র পাওয়া যায়

CENTRAL LIBRARY

১২শ বর্ষ
১ম খণ্ড

অমৃত

১৩ সংখ্যা
মূল্য—৫০ পয়সা
গুল্ক—২ পয়সা
মোট ৫২ পয়সা

Friday 28th July 1972 শুক্রবার, ১২ শ্রাবণ, ১৩৭৯ .52 Paise

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
১০৫২	একনজরে		—শ্রীপ্রত্যক্ষদর্শী
১০৫৩	সম্পাদকীয়		
১০৫৪	মৃত্যুঞ্জয়ী বীর		—শ্রীবৃষাবকান্তি ঘোষ
১০৫৬	পটভূমি		—শ্রীদেবব্রত
১০৫৭	ব্যঙ্গচিত্র		-শ্রীঅনল
১০৫৮	দেশেবিদেশে		-শ্রীপুণ্ডরীক
১০৬১	রক্তদান হত্যা	(গল্প)	—শ্রীশিবশম্ভু পাল
১০৬৬	রামমোহনের বিচার		—শ্রীসুবীরকিশোর দাশগুপ্ত
১০৭৩	পূর্বপুরুষ	(উপন্যাস)	—শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র
১০৭৮	পরম্পর	(কবিতা)	—শ্রীজগন্নাথ চক্রবর্তী
১০৭৮	মানুষের জন্য	(কবিতা)	—শ্রীজয় সেন
১০৭৮	পাহারায় কেউ নেই	(কবিতা)	—শ্রীঅরুণ চক্রবর্তী
১০৭৯	সাহিত্য ও সংস্কৃতি		—শ্রীঅচ্যুতানন্দ
১০৮২	পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ব্যাঙ্কের ভূমিকা		—শ্রীসমর দত্ত
১০৮৫	দুঃখেসুখে বাঁচা	(উপন্যাস)	—শ্রীনির্মল সরকার
১০৮৯	সোনার বাঙলা		—শ্রীশিপ্রা চালিহা
১০৯২	গদর বিপ্লবের গোড়ার কথা		—শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী
১০৯৪	সবারে আমি নমি	(স্মৃতিচারণ)	-শ্রীকানন দেবী
১০৯৯	অমৃতপুরের যাত্রী	(উপন্যাস)	—শ্রীমৃত্যুঞ্জয় মাইতি
১১০৪	গোরক্ষনাথের পূজা ও গান		- শ্রীসুনীল পাল
১১০৭	আশ্রয়	(গল্প)	—শ্রীসুনীল চৌধুরী
১১১১	মাওর কবিতা		—শ্রীনবকুমার ঘোষাল
১১১২	অপমান		—শ্রীপ্রমীলা
১১১৩	সরলতা ভুলিনি		—শ্রীঅঞ্জলি চৌধুরী
১১১৫	ওওয়াং-এর গোম্পা		—শ্রীসুমিত সান্যাল
১১১৭	প্রেক্ষাগৃহ		—শ্রীনান্দীকর -
১১২৪	জলসা		—শ্রীচিত্রাশদা
১১২৭	খেলাধুলা		—শ্রীদর্শক

প্রচ্ছদ : শ্রীপ্রদীপ দাস

অসামান্য লেখকের অসাধারণ রচনা

: বনবালার :

মকর

৭৲

একটি মেয়ে মনোরঞ্জনের দিকে ফিরে বলল... মেয়েটির নাম চাঁপা। কমলা ও মণিদার পিতৃকুল কনকপুরে। ময়ূরাক্ষী নদীর কূলে কূলে...মনে ছোঁয়া লাগা এক রাতে যখন মণিদা জিজ্ঞাসা করেন একদিন প্রাণের কাছে আসবে ? মনোরঞ্জন উত্তর দিয়েছিল...মালতি সোজা বাথরুমে চলে গেল এবং স্নান সেরে যখন মালতি বলতে বলতে সারদা বাড়ির মধ্যে এসে পড়ল। মালতি বেরিয়ে এসে বহু বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর সঙ্গে তাঁদের আলাপ। আনন্দস্বামী কে এই সন্ন্যাসী ? প্রকাশিত হয়েছে—পড়ুন-পড়ান।

অমরেন্দ্র ঘাসের : ঐতিহাসিক উপন্যাস

বেলোয়ারী বিলাস

১০৲

বৈপায়নের : ঐতিহাসিক উপন্যাস

রক্তাক্ত গৌড় ১০৲

রক্তস্নাতা মধুমতী

১০৲

শ্রীনবকুমারের : ঐতিহাসিক

মণিহারা চিতোর

১০৲

অমরেন্দ্র ঘাসের : আধুনিক উপন্যাস

তিতিক্ষা ১০৲

রূপশংকরের : আধুনিক উপন্যাস

মীনাক্ষী মন ৭৲

জনমেজয়ের : রহস্য উপন্যাস

মায়াবী মোহিনী

৫৲

শ্রীরূপকের : ঐতিহাসিক

নটীর নাম শবনম

৫৲

অঞ্জলি প্রকাশনী

২-ই নবীন কুণ্ডু লেন. কলি-৯

দশম সংস্করণ বাহির হইল !

জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ প্রকাশিত

COMMON WORDS

॥ অসংখ্য ছবির সাহায্যে শব্দজ্ঞানের সঙ্গে বস্তুবোধের ব্যবস্থাসহ ছোটদের জন্য অভিনব সচিত্র ইংরেজি-বাংলা অভিধান ॥

দাম : দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা

॥ জেনারেল বুকস ॥ এ-৬৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২

এক নজরে

অস্ত্রসংবরণের জন্য :

রাষ্ট্রসংঘের এক সমীক্ষক কমিটির হিসাবে পৃথিবী, সারা বিশ্বে প্রতি বছর সামরিক প্রয়োজনে ব্যয় হয় বিশ হাজার কোটি ডলার, অর্থাৎ ১ লক্ষ ৪৬ হাজার কোটি টাকা। ঐ টাকায় অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য সামরিক সরঞ্জাম নির্মাণ ছাড়াও ২ কোটি ৩০ লক্ষ সৈন্যের ভরণপোষণের ব্যবস্থা হয়।

সারা বিশ্বের ঐ সামরিক ব্যয় আফ্রিকা, দক্ষিণ এশিয়া ও দূরপ্রাচ্যের ১৩০ কোটি লোকের মোট আয়ের চেয়েও বেশি। সারা পৃথিবীর সকল দেশের যা মোট উৎপাদন তার ৬·৫ শতাংশ ব্যয় হয় সামরিক প্রয়োজনে, যেখানে শিক্ষার জন্য ব্যয় হয় মোট উৎপাদনের ২·৫ শতাংশ। পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র সামরিক অস্ত্রের মারণ ও বিধ্বংসী শক্তি বৃদ্ধির গবেষণায় মোট ব্যয় করে আড়াই হাজার কোটি ডলার, অর্থাৎ ১৮,২৫০ কোটি টাকা। অথচ চিকিৎসা সম্পর্কিত গবেষণায় ব্যয় হয় ২,২২০ কোটি টাকা।

অবশ্য সামরিক প্রয়োজনে যে বিপুল অর্থ ব্যয় হয় সারা পৃথিবীতে, তার পাঁচ ভাগের চার ভাগ ব্যয় করে পৃথিবীর ছয়টি দেশ—যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট ইউনিয়ন, ফ্রান্স, ব্রটেন, চীন ও পশ্চিম জার্মানি। মোট যে টাকা ব্যয় হয় তার অর্ধেক ব্যয় ২ কোটি ৩০ লক্ষ সৈন্যের ভরণপোষণে, এবং অপর অর্ধেক অস্ত্রনির্মাণে ও সামরিক গবেষণায়। সৈন্যদের সংখ্যা আরও বেশির লোক অস্ত্র-নির্মাণ, পোষাকপরিচ্ছদ নির্মাণ প্রভৃতি সামরিক প্রয়োজনে কর্মরত তাদের মোট সংখ্যা প্রায় ৫ কোটি, যা প্রায় ফ্রান্সের জনসংখ্যার সমান। পাঁচটি পরমাণু অস্ত্রধর দেশ যে পরমাণু বোমার পাহাড় গড়ে তুলেছে, বিশেষজ্ঞদের হিসাবমতে, সেটা সারা পৃথিবীর সাড়ে তিনশ কোটি লোকের মাথাপিছু ১৫ টন টি-এন-টির সমান।

সারা পৃথিবীতে সামরিক প্রয়োজনে যে অর্থব্যয় হয় তার সবটা যদি এক বছরের জন্যও শিক্ষার উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হত, তবে পৃথিবীতে কেউ নিরক্ষর থাকতো না, অপর এক বছরের ব্যয় দিয়ে সারা পৃথিবীর সব শিল্প সম্ভাবনা যথাযথ কাজে লাগিয়ে পৃথিবীকে বাস্তবের অভিশাপমুক্ত করা সম্ভব হত। কিন্তু এ সবই মিথ্যা কল্পনা, কারণ সামরিক শক্তিতে দুর্বল হওয়ার ঝুঁকি কোন দেশই নিতে রাজি নয়। সামরিক প্রস্তুতির সমর্থনে আর একটি যে যুক্তি দেখানো হয় তা হল, ঐ প্রস্তুতিকার প্রস্তুতিকে ভিত্তি করে যে শিল্প গড়ে উঠেছে এবং পাঁচ কোটি মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে তার অর্থনৈতিক গুরুত্বও সামান্য নয়। কিন্তু এ যুক্তি অর্থহীন, কারণ ঐ টাকা দিয়ে যে সব কল্যাণমূলক শিল্প গড়ে উঠতে পারে তাতে শুধু ঐ পাঁচ কোটি নয় আরও বহু কোটি মানুষকে প্রকৃত উৎপাদনমূলক কাজে নিয়োগ করা সম্ভব।

হত্যার বিভিন্ন রূপ : পূর্ব আফ্রিকার দেশ মালাবারে ৩১ জন নরনারী ও শিশুকে হত্যার অপরাধে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হাস্টিল বছরের এক যুবক, ওয়েজা লাইনি কাওইসা, ফাঁসিতে ঝোলার আগে যে স্বীকারোক্তি করে গেছে তা ঐ রাজ্যের সর্বত্র নারুণ চাঞ্চল্য ও আতঙ্ক সৃষ্টি করা ছাড়াও সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিশজনেরও বেশি লোকের জীবন অনিশ্চিত করে তুলেছে।

হত্যার ঘটনাগুলি ঘটে ১৯৬৬ সালের নভেম্বর থেকে ১৯৭০ সালের মার্চ মাসের মধ্যে, এবং বেশুলি ঘটে রাজধানী ব্লান্টায়ার ও তার সমীপবর্তী বিভিন্ন পল্লীতে। শিশু, বৃদ্ধ, নরনারী সকলেই ঐ হত্যাকারীদের আক্রমণের লক্ষ্য ছিল, আর খুব কম ক্ষেত্রেই হত্যার পেছনে কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যেতো। সেকারণে আতঙ্কটা বিশেষ কোন শ্রেণী বা গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে সারা রাজ্যের মানুষকে আতঙ্কগ্রস্ত করে এবং কোন হত্যাই কিনারা হচ্ছে না বলে সকলেই সরকারকে দুষতে থাকে।

কাওইসা ফাঁসিতে যাওয়ার আগে স্বীকার করে গেছে যে, শুধু একটিমাত্র কারণেই সে ও তার সঙ্গীরা একের পর এক মানুষ খুন করে। তারা ভাড়াটে খুনে, প্রতি খুনের জন্য তারা মাথাপিছু ৩৫ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় সাড়ে ছ'শ টাকা করে পেতো। আর যারা তাদের ঐ টাকা দিতো তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল যেকোন আতঙ্ক ছড়িয়ে সরকারকে জনচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করা। সে আরও বলে যে, সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর ও বিভিন্ন বয়সের ছোট বড় দশ লোককে হত্যা করার বন্দোবস্ত তারা নিয়েছিল কিন্তু একটিমাত্র হত্যাকাণ্ডের পরই তারা ধরা পড়ে যায়। কাওইসা জানায় যে, সে সবকটি হত্যাকাণ্ডেই সাথেই জড়িত ছিল।

কাওইসার স্বীকারোক্তির উপর ভিত্তি করে যে সিত্তজনেরও বেশি লোককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদের মধ্যে আছেন ঐ রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী মোজিলি কুনকুমাজি এবং বিশিষ্ট ব্যবসায়ী রোগি চিরওয়া, যিনি রাজনৈতিক কারণে বহু বছর দক্ষিণ আফ্রিকায় বাস করছেন। ডঃ হেস্টিংস ব্যাণ্ডার সরকারকে জনচক্ষে হেয় ও অহেতুক প্রতিপন্ন করতে তাঁরা রাজ্যব্যাপী মানুষ খুনের এক ভয়ংকর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন—এই অভিযোগ কাওইসার স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে তাদের বিরুদ্ধে আনা হয়েছে। যে বিশজন এখন আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে চরম দণ্ডের প্রতীক্ষায় দিন গুনছেন তাদের মধ্যে আছেন ক্যাবিনেট পর্যায়ের মন্ত্রী দুজন, পার্লামেণ্টের সদস্য একজন, রাজনৈতিক দলের জনৈক নেতা ও পদাধিকারী ব্যবসায়ী। তাঁরা অবশ্য সকলেই নিজেদের নির্দোষ বলেছেন এবং কাওইসা কথিত ষড়যন্ত্রের কথা অস্বীকার করেছেন। কিন্তু তাঁদের বিরুদ্ধে যে পারিপার্শ্বিক প্রমাণ এখন পর্যন্ত বড় হয়ে দেখা দিয়েছে তা হল এই যে, কাওইসার ফাঁসি ও তাদের গ্রেপ্তারের পর গত এক বছরে সারা মালাবি রাজ্যে দুহাজারেরও বেশি হত্যাকাণ্ড আর একটিও ঘটেনি।

খুড়োর দেশ : আমাদের প্রতিবেশী দেশ বর্মার সমাজ-জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল পরস্পরের প্রতি সম্বোধনে সম্পর্কের নৈকট্য প্রকাশ করা। পাশ্চাত্য দুনিয়ায় যে মিস্টার, মাদমোয়াজেল, হের, সিনর প্রভৃতি শব্দগুলি ব্যক্তিবিশেষের নামের আগে ব্যবহৃত হয় তার কোন প্রতিশব্দ বর্মার ভাষায় নেই। বর্মার বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের মধ্যে পুরুষ মাত্রই 'খুড়ো' এবং নারীরা 'খুড়ি'। বর্মাসংঘের প্রাক্তন সেক্রেটারি-জেনারেল উ থান্ট, বর্মার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী উ নু প্রকৃত অর্থে খুড়ো থান্ট, খুড়ো নু। এইভাবে বর্মার সব বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিই 'উ' অর্থাৎ খুড়ো এবং তার স্ত্রীলিঙ্গ হল 'দ' (ডি-এ-উর্ধ্বগিউ)। বর্মার মধ্যবয়স্কা যে কোন নারীই 'দ' অর্থাৎ খুড়ি নামে সম্বোধিত। মোটামুটিভাবে বিশ বছর বয়সের ব্যবধান হলে সব বয়স্কনিম্ন বয়োজ্যেষ্ঠদের 'উ' বা 'দ' নামে সম্বোধন করে। কিন্তু বয়সের ব্যবধান আরও বেশি হলে খুড়ো হয়ে যান জাঠা, যার স্ত্রী প্রতিশব্দ হল যাগী এবং স্ত্রীলিঙ্গে কী দ'।

খুড়ো, জাঠা, মেসো মাসী অবশ্য আমাদের দেশেও ব্যাপকভাবে প্রচলিত সম্বোধনের শব্দ। কিন্তু সেই সঙ্গে 'শ্রী' শব্দটিও প্রচলিত, এবং লিখনে বা ভাষণে কারও উল্লেখ করতে গেলে আমরা শ্রীরায় বা শ্রীমুখোপাধ্যায় বলে থাকি। কিন্তু বর্মার রীতি এদেশে প্রচলিত থাকলে আমরা বলতাম খুল্লা রায় বা জাঠা মুখোপাধ্যায়। সুতরাং, সারা পৃথিবীর মানুষ তাদের অজ্ঞাতেই রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিবকে বহুর দশেক ধরে 'খুড়ো' নামে সম্বোধন করে এসেছেন, এবং প্রাক্তন রাষ্ট্রনেতা থান্টের ক্ষেত্রে সে সম্বোধন যে যথোপযুক্ত ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

—প্রত্যক্ষদর্শী

সম্পাদকীয়

জয় বাংলার পর জয় সিন্ধু

এটা প্রত্যাশিতই ছিল যে, পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠি বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর নিজেদের সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠবে। ভাষার সঙ্গে জাতীয়তার প্রশ্নও জড়িত। পাকিস্তান চেয়েছিল ধর্মকেই জাতীয়তার ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার করতে। ভাষা, সংস্কৃতি ও ভৌগোলিক সান্নিধ্যের কোনো গুরুত্ব তাদের কাছে ছিল না। অর্থনৈতিক শোষণই ছিল তাদের শাসকশ্রেণীর লক্ষ্য। তার পরিণতিতে বাংলাদেশের মাটিতে ঘটল আগ্নেয়গিরির সিস্ফোরণ। তারই প্রতিক্রিয়ায় অবশিষ্ট পাকিস্তান আজ কম্পমান। জয় বাংলার পর শোনা যাচ্ছে নতুন স্লোগান জয় সিন্ধু অর্থাৎ জয় সিন্ধু।

সিন্ধু, পাঞ্জাব, বালুচিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ নিয়ে এখনকার পাকিস্তান গঠিত। পাকিস্তানী শাসকরা এই প্রদেশগুলোর অস্তিত্ব বিলোপ করে এক ইউনিট গঠন করেছিল। তার ফলে বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠির নিজস্ব সত্তা বলে কিছু ছিল না। উর্দুভাষাকে পাকিস্তানের সরকারী ভাষা করে অন্য সব ভাষাকে দাবিয়ে রাখা হয়েছিল। উর্দুর মারফতে পাঞ্জাবীরা এবং ভারতত্যাগী উদ্বাস্তুরাই পাকিস্তানে বেশ জাঁকিয়ে বসেছিল। কিন্তু ইতিহাসের দিনবদল হয়। পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ এখন বুঝতে শিখেছে যে, এতকাল কিভাবে ধর্মের ধাপ্পা দিয়ে এবং ভারত-বিরোধিতা জাইয়ে রেখে তাদের স্বার্থ নষ্ট করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধেই শুরু হয়েছে প্রতিবাদ। প্রেসিডেন্ট ভুট্টোর নিজের প্রদেশ সিন্ধু থেকেই তার সূত্রপাত।

সিন্ধু প্রাদেশিক আইনসভা জুলাইয়ের ৭ তারিখ একটি বিল পাশ করে সিন্ধীকেই একমাত্র সরকারী ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এতে উর্দুভাষীরা মহা খাপ্পা। ভারত থেকে আগত উর্দুভাষীরা সিন্ধুপ্রদেশে বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। করাচী শহরের শতকরা ৪০ ভাগই নয়া সিন্ধীরা উর্দুভাষী উদ্বাস্তু। সিন্ধুর অন্যান্য শহরেও এদের প্রাধান্য বেশ। তার ফলে সিন্ধীরা দীর্ঘকাল ধরে উপেক্ষিত ও অবহেলিত। তাদের ভাষারও কোনো স্বীকৃতি ছিল না। অথচ সিন্ধী একটি উন্নত ভাষা এবং সিন্ধী সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যও সর্বত্র স্বীকৃত। সিন্ধীভাষার এই স্বীকৃতিতে আপত্তি জানিয়েছে উর্দুভাষীরা। এতকাল তারা যে সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে আসছিল সিন্ধী সরকারী ভাষা হলে তা থাকবে না বলেই এই আপত্তি। প্রেসিডেন্ট ভুট্টো প্রথমে সিন্ধীভাষার আন্দোলনকে ভালো চোখে দেখেন নি। পাকিস্তানকে দুর্বল করার ষড়যন্ত্র হিসেবেই একে তিনি প্রথমে গণ্য করেছিলেন। কিন্তু পরে জনমতের চাপে তাঁকে এই প্রস্তাব মেনে নিতে হয়েছে তিনি উর্দুভাষীদের ১২ বৎসর সময় দিয়েছেন সিন্ধীভাষা শিখে নেবার জন্য। এই বারো বৎসর উর্দুভাষীদের বিরুদ্ধে চাকরী ইত্যাদি ব্যাপারে কোনোরূপ বৈষম্যমূলক আচরণ করা হবে না বলে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন। এই প্রতিশ্রুতি আইনে লিপিবদ্ধ করা হবে। কিন্তু তাতেও উর্দুভাষীরা শান্ত হয় নি। বিক্ষোভ চলছে।

ভাষার জন্য এই আন্দোলন সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমান বলেছেন যে, সিন্ধীভাষার দাবীকে তিনি এবং বাংলাদেশের মানুষ সমর্থন করেন। বাঙালীরাও ভাষার জন্যই প্রথম সংগ্রাম শুরু করেছিল। পরে তাই স্বাধীনতা আন্দোলনের রূপ নেয়। পাকিস্তানের শাসকরা যদি বাংলাদেশের ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না থাকেন তাহলে সিন্ধুর আন্দোলন পাকিস্তানের ধ্বংস ডেকে আনবে। সিন্ধুর নেতা শ্রী জি এম সৈয়দ তো পরিষ্কার ভাষায় বলে দিয়েছেন যে, সিন্ধীদের পৃথক জাতি হিসাবে স্বীকৃতি না দিলে তারা পাকিস্তানে থাকবে না। তিনি দেখিয়েছেন যে, উর্দু পাকিস্তানের কোনো প্রদেশেরই ভাষা নয়। সিন্ধী, পাঞ্জাবী, পুস্তু ও বালুচিই পাকিস্তানের ভাষা। এদের মাথা অধিকার খর্ব করে উর্দু চাপিয়ে দেবার কোনো যৌক্তিকতা থাকতে পারে না। পাকিস্তানের নেতারা গিয়েছিলেন ভারত থেকে এবং উর্দু ছিল তাঁদের জবান। উর্দুর জন্য পাকিস্তান তার পূর্ব অংশকে হারিয়েছে। সেই উর্দুই আবার অবশিষ্ট পাকিস্তানের বিপদ ডেকে আনছে। অদূরদর্শী নেতৃত্ব একটি দেশের কি সর্বনাশ করতে পারে পাকিস্তান তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

মৃত্যু জয়ী বীর

তুষারকান্তি ঘোষ

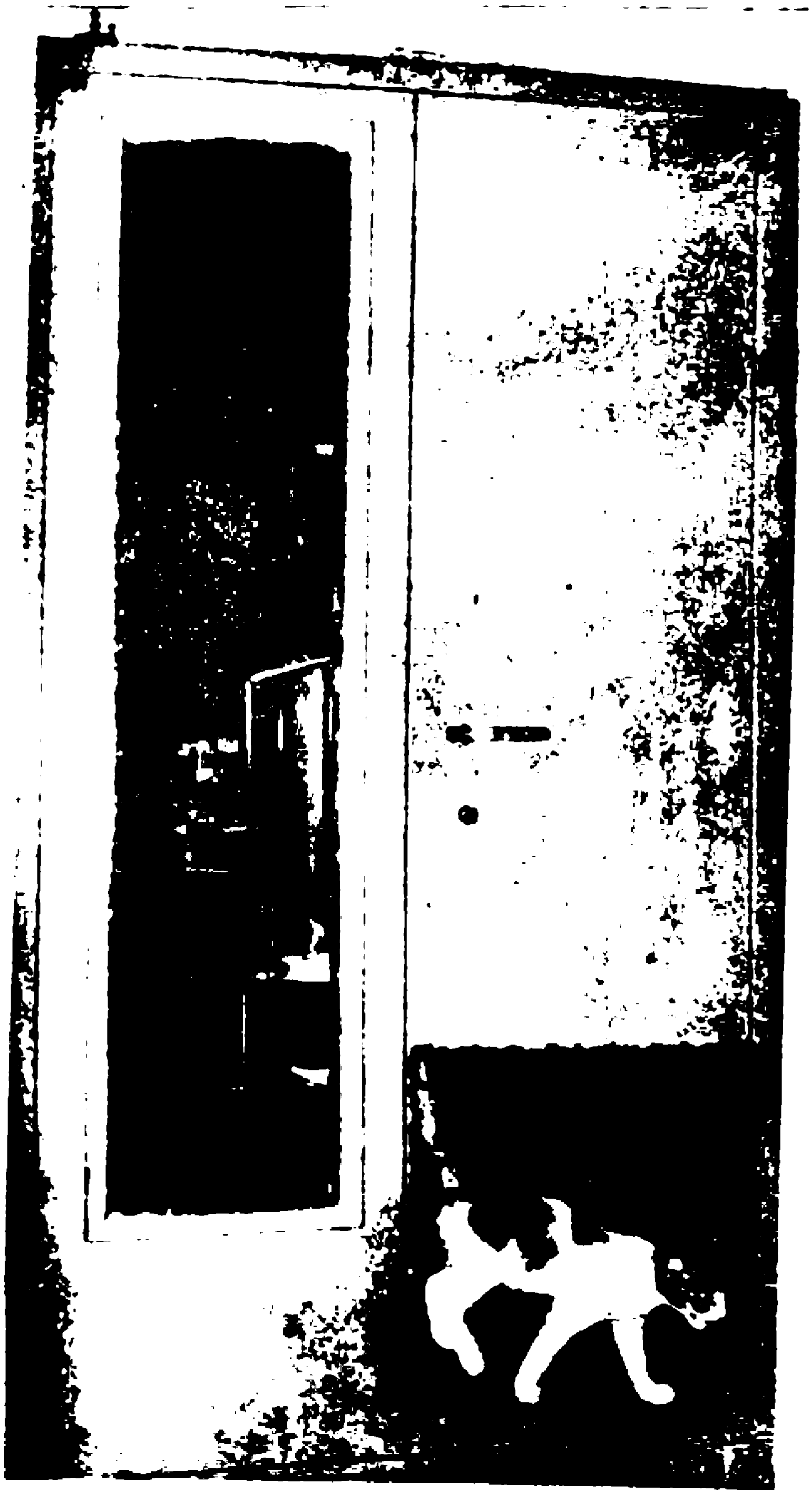

ভাঙ্গা বেড়ালের প্রাণশক্তি কি অন্য প্রাণী-দের চেয়ে বেশী? সম্প্রতি জয়ার সংসারে একটি ঘটনা ঘটেছে যা থেকে জয়ার মনে হয় যে, বেড়াল যে অবস্থায় পড়লে বেঁচে থাকতে পারে সে অবস্থায় অন্য প্রাণী মরে নিশ্চয়।

এবার ব্যাপারটা বলছি। জয়ার স্বামী সঞ্জয়ের বেতনটা ছাড়া সময় এলাহাবাদেই থাকেন পরশের সময় কলকাতায় কিছুদিন অন্য থাকেন এবং ছাত্র একমাস পড়া থেকে এলাহাবাদে ফিরে আসেন।

এবারেও তাঁর নিয়ম অনুসারে এলাহাবাদ যাবার দিন স্থির হয়েছিল ১৮ই জুলাই। বেশ কিছুদিনের জন্যে কলকাতা ছেড়ে যাচ্ছেন বলে তাঁর জিনিসপত্রগুলো ভাল করে গুছিয়ে রাখছিলেন। তাঁর শোবার ঘরে রয়েছে বড় খোলবজের জন্য-একটি আছে। এই সুযোগ ভাল করে গোছগাছ করে জয়া প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো আলাদা করে রেখে দিন ঘরের একপাশে বসে সব কিছু ঠিক করে গোছাচ্ছিলেন তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে একটি বেড়ালের বাচ্চা একটা আলমারির মধ্যে ঢুকে কাপড় জামার মধ্যে লুকিয়ে থাকে। বিকেল পাঁচটার সময় আলমারির ভেতরে বেড়াল ঢোকেনি বুঝতে না পেরে তিনি আলমারির চাবি বন্ধ করেন এবং সন্ধ্যে-বেলা ঘরে তালা এলাহাবাদ রওনা হয়ে যান। সেই রাত্রে আমি যখন সেই ঘরে এক ঘুমোচ্ছিলুম তখন চারি নয়া নয়া বেড়ালের ছিঁড়ে খুঁড়ে শব্দ শুনেছিলুম। কোন বেড়ালটা কোথা থেকে ঢুকছে সে আমি খুঁজে পাইনি তখন এখন জয়ার বাড়ীতে অনেকগুলো বেড়াল

হয়েছে। ডাকবাংলো বাড়ীতে বহুকালের কুকুর আছে কিন্তু ইন্দুরের অত্যাচারে উদ্যানের চারা বেড়াল খুঁজে-ছিলাম। এই ডাকা বেড়ালটির জন্য আমরা কয়েক দিনের মধ্যেই সে ইন্দুরের নাম ধাম ঠিকানা ছাড়ালো। কিন্তু মুস্কিল হল এই যে সে কোথা থেকে একটা নতুন বেড়াল ধরে নিয়ে এল। তার আসা মাত্র এখন আমাদের বাড়ীতে যে বেড়ালরা রয়েছে তারা ভয়ে নিজেদেরই চিনতে পারে না। এখন প্রায় সব সময় সব ঘরেই বেড়ালের হেঁড়া ফোঁড়া হয়ে ঘোরা যায়। তাছাড়া আমি নিজেই দুঃখিত যে এই বাচ্চাটা আমাদের বেড়ালের বেড়ার ফোকর দিয়ে ঢুকতে পারে। তার পরের বাচ্চাও অবশ্য ১২টি ইন্দুরই সেই রকম ভাবে মারা মারা পালিয়েছে। কিন্তু কোথা থেকে কুকুরটা প্রতি বছরই বাচ্চা পাঠিয়ে দেয়, তা বুঝতে পারি না। তার পরের বাচ্চাও অবশ্য ১২টি ইন্দুরই সেই রকম ভাবে

পটভূমি

পশ্চিম বাংলার প্রশাসন ঢেলে সাজানো হবে, মুখ্যমন্ত্রীর এই সাম্প্রতিক ঘোষণার পর যে এই ধরনের একটা গোলমাল পাকিয়ে উঠবে তা বোধ হয় অনেকেই আঁচ করতে পারেন নি। প্রশাসন বলতে এখানে অবশ্য প্রধানত জেলা প্রশাসনকেই বোঝানো হচ্ছে, কারণ মুখ্যমন্ত্রীর পয়েন্টটা প্রথমে ঐ দিকেই দিয়ে পড়েছে। লাল দীঘির পাশে লাল বাড়ির মধ্যে নজর দেবার যে রীতিমতো প্রয়োজন আছে তা অনেকের মতো সিদ্ধার্থবাবুও নিশ্চয়ই জানেন। সত্যি কথা বলতে কি, রাজ্যের শাসন ব্যবস্থার গলদের অধিকাংশেরই উৎস ঐ লাল বাড়িই। প্রশাসনিক সংস্কারের কোনো কাজ যেখানেই শুরু হোক না কেন, তা শেষ পর্যন্ত মহাকরণে এসে থামতে বাধ্য। তবু যে সিদ্ধার্থবাবুর নজর প্রথমে জেলা প্রশাসনের ওপর গিয়ে পড়েছে তার কারণ আছে।

সিদ্ধার্থবাবু আগে এই রাজ্যের মন্ত্রী ছিলেন, বিরোধী দলের নেতাও ছিলেন, পরে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে পশ্চিমবঙ্গে নিযুক্ত মুখ্যপাত্র নিযুক্ত হয়েছিলেন। কলকাতায় প্রশাসনের কাজ কিভাবে চলে সে-সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ধারণা তাঁর ঐ সময়েই হয়। কিন্তু জেলা প্রশাসন সম্পর্কে গভীরভাবে জানার যে-সুযোগ এবার তিনি পেয়েছেন আগে তা পান নি। জেলা প্রশাসন সম্পর্কে তাঁর চোখ বিশেষভাবে খুলে দিয়েছে সাম্প্রতিক খরা। এই খরার সময় তিনি দেখলেন যে, রাজ্য সরকারের, বিশেষভাবে তাঁর নিজের উদ্যোগ, টাকাকড়ির ব্যবস্থা, মালপত্র প্রভৃতি সব ঠিকমতো থাকা সত্ত্বেও খরার সমস্যা ঠিকমতো মোকাবিলা করা গেল না। মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুরে অনাহারে মৃত্যু নিয়ে যে-বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের রিপোর্ট পাওয়ার পর তা হয়ত চাপা পড়বে। কিন্তু মৃত্যু ঘটুক আর না-ঘটুক, খরার মোকাবিলা সম্পর্কে বাইরের সমালোচনা শুধু তাঁ অরবিন্দ নয়, চব্বিশ পরগণার আর এক মন্ত্রীর কাছ থেকেও শোনা গেছে। তিনি বলেছেন যে, খরা এল, খরা গেল, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হলো না।

এই রকম একটা জীবন-মরণ সমস্যায় জেলা প্রশাসনের ব্যর্থতা যদি সরকারকে উদ্বিগ্ন করে তুলে থাকে তবে তা নিশ্চয়ই অস্বাভাবিক নয়। ঐ প্রশাসনকে কী করে ঢেলে সাজানো যায় তার পথ বাংলাবার জন্য মুখ্যমন্ত্রী একটি জেলা প্রশাসন সংস্কার কমিটিও গঠন করেছেন। তবে যে-ধরনের কমিটি গঠিত হলে জেলা প্রশাসনের গলদগুলি ভালোভাবে ধরা পড়ত ঠিক সেই ধরনের কমিটি গঠিত হয় নি। ঐ কমিটি একরকম আমলাদেরই ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমলারা নিজেরাই যদি নিজেদের রোগ নির্ণয় করতে পারেন এবং রোগ নিরাময়ের পথ খুঁজে বার করতে পারেন তবে যে খুব ভালো হয় তা ঠিক, কিন্তু তা কতো দূরে সম্ভব হবে বলা মুস্কিল।

ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের এক বৈঠকও ডাকেন। উদ্দেশ্য ছিল, জেলার জেলায় উন্নয়নের কাজ কিভাবে ত্বরান্বিত করা যায় সে-সম্বন্ধে আলোচনা করা। আসল সমস্যার কথা যতোটা আলোচনা হয়ে থাকুক না কেন, ঐ বৈঠকে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের উদ্বেগের প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়ালো, কিভাবে নিজেদের সঙ্কুচিত ক্ষমতা বাড়ানো যায়। প্রশাসন সংস্কার নিয়ে যে-গোলমাল পাকিয়ে উঠেছে এই সঙ্কুচিত ক্ষমতা বিস্তারের চেষ্টাকে কেন্দ্র করে।

• • •

আপনি হয়ত ভাবতে পারেন, জেলা ম্যাজিস্ট্রেটই তো এ-দেশের সবচেয়ে ক্ষমতাবান অফিসার। তিনি গোটা জেলার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। অনেক জেলাতেই তিনি একাধারে বিচারবিভাগীয় এবং শাসন বিভাগীয় ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের আক্ষেপ থেকে মনে হয়, তাঁদের হাতে যথেষ্ট ক্ষমতা নেই। আর যে ক্ষমতা নেই বলেই তাঁরা গণ্ডগোল। সেই জন্যই উন্নয়নের কাজ হতে পারছে না। নামেই তাঁরা জেলার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। আসলে জেলার অনেক সরকারী অফিসারের ওপর তাঁদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। জেলার পূর্ত বিভাগের এঞ্জিনিয়ার রয়েছেন, রয়েছেন চিকিৎসা বিভাগের চিকিৎসক। তাঁরা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের থোড়াই কেয়ার করেন। কারণ তাঁদের ওপর খবরদারির ক্ষমতা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নেই। সেই ক্ষমতা রয়েছে তাঁদের দপ্তরের কর্তাদের, যাঁদের অধিষ্ঠান রাইটার্স বিল্ডিংসে। ফলে জেলার যদি কোনো রাস্তা বা সেতু তৈরি হয় তা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জানতে পারেন না, স্বাস্থ্য কেন্দ্রও তৈরি হয় তাঁর অগোচরে। এই অবস্থায় কেমন করেই বা তিনি গোটা জেলার উন্নয়নের কাজ তদারক করতে পারেন? সুতরাং তাঁকে আরো ক্ষমতা দেওয়া হোক। বিশেষ করে এঞ্জিনিয়ারদের নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা যদি তাঁকে না-দেওয়া হয় তবে উন্নয়নের কাজের বিশেষ অগ্রগতি হতে পারবে না। আর এই নিয়ন্ত্রণের সবচেয়ে সহজ উপায় হলো এঞ্জিনিয়ারদের 'কন্ট্রোলিং অথরিটি' কন্ট্রোলার রেভেনিউ' (সি-সি-আর)। সেইসব ক্ষমতা আবার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে দেওয়া হোক।

জেলা শাসকদের এই দাবির কথা শুনে সরকারী এঞ্জিনিয়ররা ক্ষেপে উঠেছেন। তাঁরা বলছেন, এই ধরনের কথাবার্তা বলে জেলাশাসকেরা এই কথাই প্রমাণ করতে চাইছেন যে, উন্নয়নের কাজে প্রধান বাধা হলেন এঞ্জিনিয়াররা। এই যখন জেলাশাসকদের মনোভাব তখন তাঁরা নিশ্চয়ই প্রথম সুযোগেই সি-সি-আরে এঞ্জিনিয়ারদের সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য লিখে বসবেন। ফলে এঞ্জিনিয়ারদের চাকরির নিয়েই হয়ত টানাটানি পড়বে।

• • •

এমনিতে মনে হতে পারে, জেলা শাসকেরা যা বলছেন তা তো ঠিকই। গোটা জেলার সব সরকারী অফিসারকে নিয়ন্ত্রণ করতে না-পারলে তাঁরা উন্নয়নের কাজের তদারকি করবেন কী করে? বিশেষত ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত এঞ্জিনিয়ারদের সি-সি-আর লেখার ক্ষমতা তো তাঁদের ছিলই। প্রফুল্ল সেন মশায়ের আমলেই এই নিয়ম বাতিল হয়। সুতরাং জেলাশাসকেরা তো তাঁদের পুরোনো ক্ষমতাই আবার ফিরে চাইছেন, এটা নতুন কোনো দাবি নয়।

এখন দেখা যাক, জেলাশাসকদের বক্তব্যের মধ্যে কোনো ফাঁক আছে কিনা। একথা ঠিক, সরকারী এঞ্জিনিয়ারদের ওপর জেলাশাসকদের কোনো সরাসরি নিয়ন্ত্রণ নেই। কিন্তু তার মানে কি এই যে, এঞ্জিনিয়াররা তাঁদের স্বরাজ্যে সবেসব? মোটেই তা নয়। নানা ব্যাপারেই তাঁদের জেলাশাসকদের স্বার্থস্থ হতে হয়। কোনো কাজের জন্যে যদি জমি দখল করার দরকার হয় তবে জেলাশাসকের সহায়তা ছাড়া তা কী করে সম্ভব হয়? এমন কি, জেলার মধ্যে কোনো জায়গায় কোনো একটি প্রকল্প গড়ে উঠবে, তাও জেলাশাসকের সহায়তা ছাড়া স্থির হতে পারে না। কারণ, এই সম্পর্কে প্রতি জেলায় যে কমিটি আছে জেলাশাসক তার অন্যতম সদস্য।

তা ছাড়া আরো কথা আছে। প্রতি জেলায় একটি করে উন্নয়ন কমিটি রয়েছে। জেলাশাসকই তার চেয়ারম্যান। প্রতি মাসে এই কমিটির বৈঠক হওয়ার কথা। যদি সেই বৈঠক নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়, তবে জেলাশাসকেরা উন্নয়নের কাজ সম্পর্কে কোনো খোঁজখবর পান না, এই অভিযোগ ঠিক টিকবে কী করে? যদি এই অভিযোগ জেলাশাসকেরা তোলেন তবে এই কথাই ধরে নিতে হয় যে, ঐ কমিটির

বৈঠক ঠিকমতো হয় না, অথবা হলেও তাতে কোনো কাজ হয় না। এঞ্জিনিয়ারদের নিয়ন্ত্রণ করাই যদি প্রধান সমস্যা হয় তবে ঐ কমিটি হতে তার বেশ একটা ধ্বংসাত্মক হাতিয়ার হতে পারে।

সুতরাং এই নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নটা খুলোয় ঘষে তুলে কাদের ঢেলে এক্সপ্রেস লড়াই বলে একটা কথা চালু হয়েছে সেটা খুব মিথ্যা নয়। এই লড়াই যে নতুন তা-ও নয়। অনেকদিন ধরেই এই লড়াই চলছে। আই-এ-এস অফিসাররা চান ডাক্তার-এঞ্জিনিয়ারদের ওপর আরো ক্ষমতার ক্ষমতা। ওদিকে ডাক্তার-এঞ্জিনিয়াররা আগল আই-এ-এস অফিসারদের কব্জা থেকে ছিনিয়ে আনতে চান। এঁদের অনেক দিনের দাবি অন্তত সেচ বিদ্যুৎ, পূর্ত প্রভৃতি বিভাগের সেক্রেটারির পদ এঞ্জিনিয়ারদের দেওয়া হোক। তেমনই চিকিৎসা বিভাগের সেক্রেটারিয়েটের দায়িত্ব দেওয়া হোক কোনো চিকিৎসককে। এই বিশেষজ্ঞ সেক্রেটারিদের অধীনে দপ্তরের কাজ আরো ভালোভাবে চলবে। এসব সেক্রেটারির পদে আই-এ-এস অফিসারদের তুলে নেওয়ার অধিকারও। এই আই এ এস অফিসারদের সমর্থকরা এসব পদে, কিংবা কোনো টেকনিক্যাল দপ্তরের কাজকর্ম সম্পর্কে তাঁদের তেমন জ্ঞান থাকে না। কেন কাজ দরকার হয় টেকনোক্রাটদের এই দাবির পিছনে মোটা যুক্তিই থাক, সরকার কিন্তু এই দাবি এখনও মেনে নেয়নি বলে শোনা যায়। এর কারণ, আই এ এস অফিসারদের ক্ষমতা খুব কম নয়।

কিন্তু এই সব তর্ক-বিতর্কের মধ্যে প্রকৃত ব্যাপারটাই হারিয়ে যাচ্ছে। আসল এই বিবাদ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের আগ্রহটাও দেখা যাচ্ছে না। কারণ এই ধনতন্ত্র টিকে থাকার মধ্যেই যার উপকার সংস্কারের সব উদ্যোগ সমাধান করে এবং একটু জোরালো প্রতিক্রিয়াতেই কাত হয়ে পড়ে যাবে। তার কাছে কারা হবে প্রকৃত প্রস্তাবে দায়িত্বে থাকবেন, এবং তাঁদের কাজের পশ্চিমবাংলায় উন্নয়নের কাজ কতো এগুবে।

এই ধরনের বিবাদের সমাধান করে সাধারণ মানুষের কোন সমস্যার মূল গ্রন্থিটাকেই কাটা যাচ্ছে না। সেই গ্রন্থিটা হলো এই প্রশাসন ব্যবস্থার কাঠামোই উপনিবেশিক কায়েমী স্বার্থের উপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য তৈরি করা হয়েছিল। বিদেশী শাসকরা একটা উপনিবেশকে তাদের কাঁচামাল সংগ্রহের বাজার করার জন্য যে ধরনের প্রশাসন চালু করেছিল সেই ব্যবস্থা কিছুটা রদবদল করে আজও চালু রয়েছে। আমাদের দেশের শাসকশ্রেণীর স্বার্থে এই ব্যবস্থা কিছুটা রদবদল করা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু মূল কাঠামোটা একই রয়ে গেছে। এই কাঠামোর মধ্যে সাধারণ মানুষের কোনো স্থান নেই। তাই তাদের সমস্যা নিয়ে তাদের মাথাব্যথাও নেই। তাই এই ব্যবস্থার সংস্কার নিয়ে তাদের কোনো আগ্রহও নেই। এই ব্যবস্থার সংস্কার করে কিছু সুফল পাওয়া যাবে এমন আশা করাও বৃথা। এই ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করে একটা নতুন ব্যবস্থা গড়ে তোলার দাবি তুলে সেই দাবি আদায়ের জন্য সংগ্রাম করতে চাইছে যে বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলি তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সংগ্রাম করার কথা কোনো রাজনৈতিক দলই ভাবছে না। কিন্তু এই ব্যবস্থার সংস্কার করে কিছু সুফল পাওয়া যাবে এমন আশা করাও বৃথা। এই ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করে একটা নতুন ব্যবস্থা গড়ে তোলার দাবি তুলে সেই দাবি আদায়ের জন্য সংগ্রাম করতে চাইছে যে বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলি তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সংগ্রাম করার কথা কোনো রাজনৈতিক দলই ভাবছে না। কিন্তু

২২।৮।৭২

—দেবব্রত

CENTRAL LIBRARY

কলকাতার প্রবীণ সাহিত্য কুমারেশ প্রসাদের সম্মানার্থে আয়োজিত বিশেষ শ্রীবৃদ্ধিকল্পে তোষ এবং প্রবীণ প্রতিটি বিশেষ সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন।

দেশে বিদেশে

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তাঁর মন্ত্রিসভায় কিছু রদবদল করবেন, এমন গুঞ্জন বেশ কয়েকদিন যাবৎ শোনা যাচ্ছিল। এই রটনা নেহাৎ অকারণ ছিল না। মন্ত্রিসভায় বেশ কয়েকটি আসন শূন্য ছিল। গত কয়েক মাসের মধ্যে ভারত সরকারের একজন ক্যাবিনেট মন্ত্রী ও তিনজন রাষ্ট্রমন্ত্রী দীর্ঘ ছুটি বা রাজধানীছাড়া গেছেন মন্ত্রিমণ্ডলের গুরুত্ব করতে। শিক্ষা দপ্তরে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের, পেট্রোলিয়াম ও রসায়ন দপ্তরে পি সি সেঠীর, শিল্প উন্নয়ন দপ্তরে ধনরাম ওঝার এবং তথ্য ও বেতার দপ্তরে শ্রীমতী নান্দনী সতপথীর স্থান শূন্য ছিল। প্রধানমন্ত্রী অবশ্য বরাবরই এই স্থানগুলি শূন্য রাখতে পারলেন না বলে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা মনে করছিলেন। তাঁরা এটাও অনুমান করছিলেন যে, এই শূন্য স্থানগুলি পূরণের সুযোগে প্রধানমন্ত্রী তাঁর মন্ত্রিসভাকে ঢেলে সাজাতে পারেন। তাতে কিছু পুরনো মুখকে বিদায় নিতে হতে পারে এবং তাঁদের জায়গায় কিছু নতুন মুখ দেখা যেতে পারে।

সংসদের বর্ষা অধিবেশনের প্রাক্কালে মন্ত্রিসভার কিছু রদবদলের কথা ঘোষণা করা হয় বটে, তবে ঘটা বড় রকমের নাড়চাড় হবে বলে কোন কোন মহল থেকে অনুমান করা হয়েছিল ততটা নাড়াচাড়া আদৌ পড়ল না।

প্রধানত, আঁতারের কল্পনাপ্রবণ কোন কোন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকের এই অনুমান মিথ্যা হয়ে গেল যে, শ্রীমতী গান্ধী তাঁর প্রবীণ সহকর্মীদেরও কারও কারও দপ্তর বা আসন বদল করে তাঁদের পদোন্নতি দেবেন। প্রতিরক্ষামন্ত্রী জগজীবন রাম, অর্থমন্ত্রী চ্যবন, খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী ফকরুদ্দিন আলি আহমেদ প্রভৃতি যে কয় জনের নামেই বহুল আলোচনা হয়েছিল। অথচ কত ঘটনাই না হয়েছিল এই মন্ত্রীদের ঘিরে। এমনকি রাষ্ট্রপতির নামও এইসব রটনার সঙ্গে জড়ান হয়েছিল। রাজধানীর গিন্নিরা গুজব রটাচ্ছিলেন, বিনিময়ে তাঁর পদত্যাগ করছেন, বিনিময়ে তাঁর পদে প্রধানমন্ত্রী বসা হচ্ছে এবং রাষ্ট্রপতি ভবনে গিয়ে অধিষ্ঠিত হচ্ছেন জগজীবন রাম—এমন কথাও শোনা গিয়েছিল। রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে প্রবল প্রতিবাদ আসার পর অবশ্য এই রটনা বন্ধ হয়েছিল। অন্য যেসব রটনা চলছিল সেগুলির মধ্যে ছিল:—স্বরণ সিং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আসছেন এবং শ্রীমতী গান্ধী নিজে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ভার নিচ্ছেন, চ্যবনকে অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে সরান হচ্ছে অথবা কৃষিমন্ত্রী বিভাগকে সঙ্কুচিত করে ঐ মন্ত্রণালয়ের পুরনো স্থান করা হচ্ছে।

তাছাড়া আরও সংবাদ ছিল, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী মোটেই সন্তুষ্ট নন এবং সেই কারণে তিনি অর্থনৈতিক মন্ত্রণালয়গুলির পুনর্গঠন করতে চাইছেন এবং পুনর্গঠিত মন্ত্রণালয়গুলিতে নতুন লোক এনে বসাবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু যেটুকু রদবদলের কথা শনিবার ঘোষণা করা হয়েছে তার মধ্যে এসব কোন কিছুই নেই।

আরও এক ধরনের রটনা শোনা গিয়েছিল। যাঁরা এই রটনা করেছিলেন তাঁরা বোঝাতে চাইছিলেন, শ্রীমতী গান্ধী তাঁর মন্ত্রিসভার ভিতর বামপন্থী ঝোঁক বজায়

চাইছেন এবং সেই উদ্দেশ্যে তিনি কমবেশী কিছু মন্ত্রীকে বাদ দেবেন। যাঁরা এই কথা বলছিলেন তাঁরা শ্রীমতী নন্দিনী শতপথীর দিল্লি থেকে ভুবনেশ্বরে যাওয়ার মধ্যে তাঁদের সংবাদের সত্যতা দেখতে পাচ্ছিলেন। তাঁদের সংবাদ যদি সত্য হত তাহলে কোম্পানি বিষয়ক দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী কে কি রঘুরাম রোড বাতিলের ঘোষণা পড়তেন। কিন্তু তা তিনি পড়েন নি।

শ্রীমতী গান্ধী দুজন মন্ত্রীকে বিদায় দিয়ে নতুন দুজনকে মন্ত্রী করলেন এবং সি সুব্রহ্মণ্যমকে ঠাইনাড়া করলেন, মাত্র এটুকু ছাড়া বলতে গেলে মন্ত্রিসভায় হাতই দেন নি।

নতুন মন্ত্রীদের মধ্যে দুর্গাপ্রসাদ ধরকে অবশ্য পুরোপুরি নতুন বলা চলে না। শ্রীধর ভারত সরকারের পররাষ্ট্র নীতি প্রণয়ন কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতকে ইদানীং যে আন্তর্জাতিক কূটনীতির লড়াই লড়তে হয়েছে তাতে শ্রীধর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। মন্ত্রিসভার সদস্য না হয়েও তিনি প্রায় মন্ত্রীর মর্যাদা নিয়েই কাজ করছিলেন। তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে মন্ত্রিসভায় নেওয়া হল বলে, এক্ষেত্রে বলতে অসুবিধা ছিল না। কিন্তু তবু তাঁকে যে শ্রীসুব্রহ্মণ্যমের জায়গায় পরিকল্পনা মন্ত্রীর পদ দেওয়া হবে, এটা সম্ভবত অনেকেরই হিসেবের বাইরে ছিল। যেসময়ে নতুন পাঁচসালা পরিকল্পনা তৈরি হচ্ছে সেসময়ে প্রধানমন্ত্রী নিশ্চয়ই নিতান্ত অকারণে দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী বদলান নি। হয়ত, পঞ্চম পাঁচসালা পরিকল্পনাকে একটা নতুন চেহারা দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়েই শ্রীমতী গান্ধী এই সময়ে দপ্তরে নতুন মন্ত্রী আনলেন। পরবর্তী পরিকল্পনাটির ওপর অনেক কিছুই নির্ভর করছে। "গরীবী হঠাও" কর্মসূচী বাস্তবে পরিণত করার ব্যাপারে কংগ্রেস কতটা আন্তরিক সম্ভবত তার চূড়ান্ত পরীক্ষা হয়ে যাবে ঐ পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে। আশা এই যে, দুর্গাপ্রসাদ ধরের নেতৃত্বে আমাদের পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী ও নতুন গতিবেগ সঞ্চারিত হবে।

তৃতীয়ত আসছে রাজধানীর রাজনীতিতে নবাগত। ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্তকরণের আগে তিনি ছিলেন সিণ্ডিকেট ব্যাঙ্কের কর্তা। ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্তকরণের পর তিনি ধাপে ধাপে জীবনবীমা কর্পোরেশনের চেয়ারম্যানের পদ পর্যন্ত উঠেছিলেন। গত মার্চ মাসে তিনি ঐ পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে রাজ্যসভার সদস্য হন। তখন থেকেই বাজারে এরকম একটা প্রচার ছিল যে, প্রধানমন্ত্রী তাঁকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় নিয়ে এসে কোন অর্থনৈতিক মন্ত্রণালয়ের ভার দিতে চান। তারপর গত এপ্রিল মাসে রাজ্যসভার ভূপেশ গুপ্ত শ্রীপাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন, ন্যাশনাল সিণ্ডিকেট ব্যাঙ্কের কাস্টোডিয়ান হিসাবে তিনি ব্যাঙ্কের একটি বাড়ি জলের দামে তার ভাইকে কিনিয়ে দিয়েছেন। শ্রীপাই ও তাঁর ভাই, উভয়ই এই অভিযোগ অস্বীকার করেন। কিন্তু যে কারণেই হোক, তখন থেকে শ্রীপাইয়ের নামটা যেন একটু চাপা পড়ে যায়। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তিনি রাজ্যসভায় এলেন। কিন্তু কোন অর্থনৈতিক মন্ত্রণালয়ে তাঁর স্থান হল না। তিনি এলেন রেলওয়ে মন্ত্রণালয়ে কে হনুমন্তাইয়ার জায়গায়, তিনি শ্রীপাইয়ের মতই মহীশূর থেকে নির্বাচিত সদস্য।

শ্রীহনুমন্তাইয়াকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে বিদায় দেওয়া সহজ হয় নি। সংবাদেই দেখা যাচ্ছে, তিনি ও তাঁর সমর্থকেরা শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়েছিলেন। দিল্লির "প্যাট্রিয়ট" পত্রিকার খবরে প্রকাশ, প্রধানমন্ত্রী তাঁকে পদত্যাগ করতে বলেছেন, একথা যখন তাঁকে জানান হয় তখন তিনি রীতিমত ক্রোধ প্রকাশ করে বলেন, "আমি নিক্কালিগাপ্পা নয়, আমাকে এভাবে সরান চলবে না।" তিনি নাকি এই হুমকিও দিয়েছিলেন যে, তাঁকে বিদায় দেওয়া হলে তিনি অন্য দলে যোগ দেবেন। (শ্রীহনুমন্তাইয়া অবশ্য এই সংবাদ অস্বীকার করেছেন।) মহীশূর বিধানসভার হনুমন্তাইয়ার যেসব সমর্থক আছেন তাঁরা শ্রীহনুমন্তাইয়ার মন্ত্রিত্ব বজায় রাখার জন্য মহীশূরের মুখ্যমন্ত্রীর মারফত দিল্লির উপর চাপ দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু মহীশূরের মুখ্যমন্ত্রী দেবরাজ তাতে সম্মত না হওয়ায় সেই চেষ্টা সফল হয় নি। শ্রীহনুমন্তাইয়ার সঙ্গে রেলওয়ে উচ্চ পদাধিকারীদের অনেকের বনিবনা হচ্ছিল না। তাঁর ব্যবহার ভাল নয় বলে রেলওয়ে কর্মীদের কোন কোন নেতার অভিযোগ ছিল। পার্লামেন্টের কিছু সদস্যেরও একই ধরনের ক্ষোভ ছিল। রেলওয়ে বোর্ডের চেয়ারম্যানের সঙ্গে তাঁর কলহকে তিনি যেভাবে একটা প্রকাশ্য কেলেঙ্কারিতে পরিণত করেছিলেন তাতে সেসময়ে প্রধানমন্ত্রী নিজেও রীতিমত অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন বলে প্রকাশ। শ্রীহনুমন্তাইয়ার এসব ঘটনা অজানা থাকার কথা নয়। তিনি যখন দেখলেন, তাঁকে পদত্যাগ করতেই হবে, এমনকি তিনি পদত্যাগ করতে রাজি না হলে প্রধানমন্ত্রী গোটা মন্ত্রিসভা ভেঙে দিয়ে নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করতেও প্রস্তুত তখন তিনি আত্মসমর্পণ করলেন। পদত্যাগপত্র দাখিল করার আগে তিনি প্রধানমন্ত্রীকে শুধু একটি অনুরোধ করলেন। তাঁর আবেদন, বাঙ্গালোরে যাওয়ার জন্য তিনি আগে থেকেই দিনক্ষণ ঠিক করে রেখেছিলেন, তাঁকে সেখানে রেলওয়ে মন্ত্রী হিসেবে যেতে দেওয়া হোক। প্রধানমন্ত্রী তাঁর সেই প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন এই শর্তে যে তাঁকে বাঙ্গালোরে রওনা হওয়ার আগেই পদত্যাগপত্র দিয়ে যেতে হবে, তবে তিনি সেখানে গিয়ে পৌঁছবার আগে প্রধানমন্ত্রী সেই পদত্যাগপত্র রাষ্ট্রপতির কাছে পেশ করলেন। এই শর্ত পূরণ করতে হল বলেই শ্রীমতী গান্ধীর মন্ত্রিসভার রদবদলের কথা ঘোষণা করতে দিন দুয়েক দেরি হয়ে গেল।

শ্রীহনুমন্তাইয়ার মত আরও একজন ক্যাবিনেট মন্ত্রীকে বিদায় নিয়ে যেতে হল। তিনি হচ্ছেন আসাম থেকে নির্বাচিত মইনুল হক চৌধুরি। তিনি এক সময়ে শ্রীমতী গান্ধীর বিশেষ প্রিয়পাত্র বলে পরিচিত ছিলেন। আসাম থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে তাঁকে সরাসরি কেন্দ্রের পর্যটনের মন্ত্রী করায় অনেকেই বিস্মিত হয়েছিলেন। কিন্তু যে কারণেই হোক ইদানীংকালে তিনি প্রধানমন্ত্রীর আস্থা অনেকখানি হারিয়েছিলেন। রাজধানীর রাজনৈতিক মহলের মতে হক, শিল্পোন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী হিসেবে তিনি সন্তোষজনক কাজ দেখাতে পারেন নি বলে প্রধানমন্ত্রী তাঁর সম্পর্কে হতাশ হয়েছেন। তাছাড়া, আসামের কংগ্রেস নেতারাও তাঁর প্রতি বিরূপ। তাঁর ওপর আসার প্রজা-সভায় ভূপেশ গুপ্ত হক সম্পর্কে যে অভিযোগ এনেছিলেন তাতে তাঁর রাজনৈতিক ভাগ্যাকাশ কতকটা মেঘাচ্ছন্ন হয়েছে। ভূপেশ গুপ্ত অভিযোগ করেছিলেন, চৌধুরি সাহেব নির্বাচনী তহবিল থেকে বাইশ হাজার টাকা সরিয়ে সেটা তাঁর নিজস্ব খরচের জন্য হিসেবে দেখিয়েছেন। শিল্পোন্নয়ন দপ্তর থেকে তাঁকে সরিয়ে যে জায়গায় যে শ্রীসুব্রহ্মণ্যমের মত একজন অভিজ্ঞ, প্রবীণ মন্ত্রীকে আনা হল তাতেই প্রমাণিত হল যে, প্রধানমন্ত্রী ঐ দপ্তরের কাজের ওপর অনেক বেশি গুরুত্ব দিতে চান।

যে দুজন মন্ত্রী রাজধানীর স্বর্গ থেকে ভ্রষ্ট হলেন তাঁদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এখন প্রশ্ন উঠেছে। সংবাদে প্রকাশ যে, শ্রীহনুমন্তাইয়াকে রাজ্যপালের পদ ও মইনুল হক চৌধুরিকে রাষ্ট্রদূতের পদ নিতে বলা হয়েছে। শ্রীহনুমন্তাইয়া জানিয়েছেন, তিনি রাজ্যপালের পদ নেবেন না, পার্লামেন্টের সদস্য হিসেবেই কাজ করবেন। তিনি মনে করেন, রাজ্যপালের পদ গ্রহণ করার মানে হচ্ছে যে জনগণ তাঁকে নির্বাচিত করেছেন তাঁদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা, কেননা,

রেডিয়েন্ট ফটো সার্ভিস

ফটো সামগ্রীর জন্য

৮/১, হসপিটাল স্ট্রীট, কলি-১৩
ফোন: ২৪-৫৮২৮

রাজপাল হিসেবে জনগণের সেবা করার কোন সুযোগ নেই। চৌধরি সাহেব কি করবেন সেটা এখনই বোঝা যাচ্ছে না। তাপাতত তিনি অবশ্য অবকাশ যাপনের জন্যে হানপাতালে আশ্রয় নিয়েছেন।

• • •

ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের বরফ গলা শুরু হতে না হতেই অন্য প্রতিবেশীর সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের ঐতিহ্যের সম্ভাবনার বিষয়ে আলোচনা চলছে। সিংহলের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী সিরিমাভো বন্দরনায়ক সম্প্রতি দিল্লিতে সফর করতে গিয়ে সেখান থেকে ভারতের জন্য একটি বার্তা নিয়ে এসেছেন এবং সেটি তিনি যথাসময়ে নয়াদিল্লিস্থিত সিংহলী রাষ্ট্রদূতের মারফত শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন. বি বি সি থেকে সম্প্রতি এইরকম একটি সংবাদ প্রচার করে। তারপর থেকেই এই বিষয়ে নতুন করে জল্পনা-কল্পনা চলতে থাকে। নয়াদিল্লি ও কলম্বো, উভয় রাজধানী থেকেই এই সংবাদ অস্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু তাতে বিষয়টি নিয়ে চর্চা বন্ধ হয় নি। তার একটি কারণ হল, রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা লক্ষ্য করেছেন, সম্প্রতি পোল্যান্ড, সোভিয়েট ইউনিয়ন, চেকোস্লোভাকিয়া, ইরান প্রভৃতি দেশ ভারতীয় ও চীনা রাষ্ট্রদূতদের মধ্যে ও উভয় দূতাবাসের অন্যান্য অফিসারদের মধ্যে মেলামেশা লক্ষণীয়ভাবে বেড়ে গেছে এবং এইসব আপ্যায়নের একটা ছন্দোবদ্ধতা দেখা যাচ্ছে যা বহুদিন লক্ষ্য করা যায় নি। হরকং থেকে একাধিক ভারতীয় সংবাদপত্র প্রতিনিধি যে খবর পাঠিয়েছেন তাতে দেখা যাচ্ছে, চীন ও ভারতের মধ্যে সহজতর সম্পর্ক গড়ে তোলার পথে সাংঘাতিক প্রশ্নটি যে বাধার সৃষ্টি করেছিল সেই বাধাটি চীন এখন সরিয়ে ফেলতে চাইছে। তাদের এই আগ্রহ ফেব্রুয়ারির জন্য তারা আগামী সেপ্টেম্বর মাসে পিকিংয়ে দ্বিতীয় আফ্রো-এশীয় টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে ভারতকে আমন্ত্রণ জানাতে পারে। তবে, ভারতীয় সাংবাদিকরা লিখছেন, চীন আশা করে যে, চীনের সঙ্গে সম্পর্ক সহজ করার পথে প্রথম পদক্ষেপ নেবে ভারতবর্ষ। পিকিং থেকে ভারতই আগে রাষ্ট্রদূত ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিল। এখন ভারত যদি আবার পিকিংয়ে রাষ্ট্রদূত পাঠায় তাহলে চীনও সাড়া দেবে এবং দুই পক্ষের সংলাপ আরম্ভ হতে কোন বাধা থাকবে না।

• • •

ইতিমধ্যে, প্রত্যাশা অনুসারেই, পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ সিমলা চুক্তি অনুমোদন করেছেন এবং সেই অনুমোদনের আনুষ্ঠানিক ইসলামাবাদ থেকে সুইস দূতাবাসের মারফত নয়াদিল্লিতে এসে পৌঁছেছে। উভয় দেশের সম্পর্কের ঊর্ধ্বতন কিন্তু লক্ষণ ইতিমধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। গত বছর জানুয়ারি মাসে একটি ভারতীয় বিমান ছিনতাই করে পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা এবং তারপর এক দেশের ওপর দিয়ে অন্য দেশের বিমান চলাচল বাতিল করা সম্পর্কে আন্তর্জাতিক আদালতে ও আন্তর্জাতিক বিমান চলাচল সংস্থাতে যে অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগ পেশের করা হয়েছিল সেগুলি প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। ভারতের রাষ্ট্রপতি গিরি আগামীকাল থেকে তেরো দিনের সফরে পাকিস্তানের আমন্ত্রণে সেদেশের আনুষ্ঠানিক দিয়ে উড়ে এসেছেন। পাঞ্জাবের সীমান্তের ওপর দিয়ে কয়েকটি ফ্লাইস খুলে দেওয়ার অনুরোধ রক্ষা করে পাকিস্তান পাঞ্জাবের কয়েকটি অঞ্চলকে বন্যার হাত থেকে রক্ষা করেছে।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দিল্লির সরকারি মহল এটাও লক্ষ্য করেছেন যে, সিমলা চুক্তির সমর্থনে প্রেসিডেন্ট ভুট্টো পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে যে দীর্ঘ বিবৃতি দিয়েছেন তার কোন কোন অংশ এই চুক্তি পালনের সহায়ক নয়। যেমন, তিনি কাশ্মীরের জনগণকে "আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার" জোরদার করার জন্য সংগ্রাম করতে আহ্বান জানিয়েছেন এবং তাদের সেই সংগ্রামে পাকিস্তানের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তাছাড়া, তিনি কাশ্মীর প্রসঙ্গটিকে যে আবার রাষ্ট্রসংঘে নিয়ে যাওয়ার আশাও ছাড়েন নি সেকথা ভুট্টো জাতীয় পরিষদে বলেছেন।

ভুট্টোর এই বক্তৃতা প্রসঙ্গে দিল্লির সরকারি মুখপাত্র খুব সতর্ক ও সংযত প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে বলেছেন, সিমলা চুক্তি মেনে চলা না হলে আগামী সেপ্টেম্বর মাসে যে দ্বিতীয় পাক-ভারত শীর্ষ বৈঠক হওয়ার কথা আছে তা শেষ পর্যন্ত নাও হতে পারে।

ফ্রান্সের এক জায়গায় সম্প্রতি একটি নীলকরা লরির ভিতর থেকে সংগঠিত দাস ব্যবসায়ের চাঞ্চল্যকর কাহিনী উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। লরিটি রোম থেকে আসছিল। পথে সেটি পুলিস হয়ে পড়ে। পুলিশ সন্দিগ্ধ হয়ে লরিটি খুলে তার মধ্যে ৫৯ জন আফ্রিকানকে দেখতে পায়। এই আফ্রিকানরা কদাকারভাবে ছটফট করছিল এবং গন্ধ বন্ধ হয়ে হাঁসফাঁস করছিল। ইতালির পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানা যায় যে, এই আফ্রিকানরা হচ্ছে একটি আন্তর্জাতিক দাসব্যবসায়ী চক্রের "পণ্য"। মালি, আইভরি কোস্ট, সেনিগল প্রভৃতি দেশের দরিদ্র অঞ্চল থেকে এই আফ্রিকান-দের নিয়ে আসা হয় ফ্রান্সে কারিক শ্রমের কাজ করার জন্য। সীমান্তে যাতে তারা ধরা না পড়ে সেজন্য বন্ধ গাড়ীর ভিতর পুরে তাদের রোম থেকে ফ্রান্সে চালান দেওয়া হয়। রোমে অবতরণ করে এমন ৬৮ জন আফ্রিকানকে পাওয়া গেছে যারা চালানে অন্তর্ভুক্ত ছিল।

২২-৪-৭২ —পুষ্করাক্ষ

বাংলা ভাষায় একমাত্র মাসিক পত্রিকা

রাজ জ্যোতিষী

সম্পাদক—শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্তী

আসন্ন সংখ্যায় বিশেষ বিচার—জ্যোতিষের চোখে সোনাচাঁদা কেন জাতিস্মর? জ্যোতিষশাস্ত্র অনুরাগী ও বিদ্যার্থীদের নানান প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও কৌতূহলের সদুত্তর এর মধ্যে পাবেন। মাসিক মূল্য—১ টাঃ ৫০ পঃ।

সর্বসাধারণের জন্য শ্রীদুর্গাদেব গোস্বামীর গবেষণামূলক দুঃসাহসিক গ্রন্থ

(অষ্টাদশ মহাপুরাণের আলোচনাসহ মুখবন্ধ)

"মন্বন্তরাদির ভোগভারতে রাশিচক্রের প্রভাব ও ফলাফল বিচার"

মূল্য—বারো টাকা

প্রকাশক—জ্যোতিষ বার্তালয়

১/২এ, শরৎচন্দ্র মুখার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা—৪

বিঃ দ্রঃ—গ্রাহক ও এজেন্টরা যোগাযোগ করুন।

রবীন্দ্রনৃত্য

শিবশম্ভু পাল

আমাদের পাশের বাড়িতে এক ভদ্রলোক নতুন ভাড়া এসেছেন। আসতে যেতে প্রায়ই তাঁর চেহারা আমার চোখে পড়ে। বলিষ্ঠ চোখে পড়বার মতো কী আছে এঁর, মাঝে পাঁচফুট চারইঞ্চির ভুঁড়ি-গজানো ধাতানী অ্যাকসেসারিজমার্কা চেহারা। কথাবার্তা হয়নি, এই হিরিল পেরোনো বয়সে উপযাচক হয়ে আলাপ করা আর পোষায় না; অথচ এই গল্পের মু-একটা জায়গায় বিশেষত একটা মুরুব্বিগোছ সম্বোধনে তাঁকে আমি ব্যবহার না করে পারছি না। সুতরাং একটা নাম দিয়ে তাঁকে চিহ্নিত করা দরকার। হ্যাঁ, নিরাপদ বটে। কী করব, টোরিলিন-ব্রেসরে ঝাড়ে পাওডারের আলাটে মুখ; মুখে, স্টেথেসকোপ হাতে সকাল সাড়ে নটায় বাসস্টপে দাঁড়ানো যে মূর্তি, সাড়িতে আমার নজর কেই ফোকাস করে, এদিকে ফোন তোলে, কিংবা মুদি আর অন্য, হাতি-হাতি-পা-পা বলবার সময় আড়চোখে দেখেছেও। ধান কনসের হাত একটা আসেই নাম দিয়ে ফোলে নীলাপদটাই শুধু পদবিহীনের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এল। প্রথম দেখাই নাম অবশ্য অনায়াসেই জানা যায় জানতেও পেরেছি, কিন্তু এটা যখন গল্প, তখন এইরকমই থাক। তাই হোক আমি এই কাহিনীনাম (অবশ্য সাংবিধানিক) নিরাপদর মতোই চালিয়ে যাচ্ছিলুম। অর্থাৎ বাড়ি-অফিস - বন্ধুদের - রবীন্দ্রসংগীত - কফি-হাউস মিঠুন-নীলিমা-রেকারিং। কিন্তু হঠাৎ এই চেনাটা বেশ জমাট হয়ে গেল। অবশ্য এটার ব্যাপারে ভাড়ার দোষ নেই।

সরস্বতী পুজোর দিন সন্ধেবেলায় একটা জায়গায় গাইব, আমার জনৈক বন্ধু আমার গান গাইবার জন্যে নিয়ে গিয়েছিল।

[illegible] ছোটা অনেকেই ছিল, আশেপাশের বাড়ি থেকে সব এসেছিল। এরেবারে সামনে বসে ছোট্ট ছেলের কোলে বেমানান বড়ো একটা [illegible] মেয়ে—হবেনা পাঁচবছর বয়স, সে যেন [illegible] কী ব্যাপার, এ নিয়ে মাথা ঘামানোর মতো তাদের [illegible] গোল—বসে পড়ল। তখন এক সময় আস্তে এসে [illegible] বসে একটা গান ধরলেন। খুব একটা যাকারচাক, গান নয় সেটা, রবীন্দ্রসংগীতের বাঁধিত ছোটা না হয়ে ও চাঁদ চোখের জলে গাইবার কথা তেউ বলে না ও বলেওছিল, আর তখনই স্পষ্ট করে বোঝাতে। বা, বেশ মজা আছে তো মুখবদলানো! গোল ধরনের মুখ আমার তেমন ভালো লাগে না, কিন্তু পাঞ্জাবি মেয়েদের মতো চোখা নাক গালের টোল মেয়েটির মুখখানাকে একটা বিশেষত্ব দিয়ে গড়ে তুলেছে। [illegible] তবুও ফ্যাশন চাউনির ছোবড়া টুকরোতে [illegible] আড়াল নামিয়ে, যেহেতু প্রায় আমার [illegible] গেলাম। কম সুযোগ সুবিধা ছিল বলতে পারলে [illegible] কিন্তু ছিল না। সন্ধ্যা এক-[illegible] বিদায় [illegible] বরং বলা ভালো তেমন জমাতে পারেনি। [illegible] পরে পাইতে পারবে—। অবশ্য পরে এই কথাটুকু পূরবী, অর্থাৎ মুখখানার [illegible] বেশ ভরা 'ছল, বিনয়ের বাড়াবাড়ি' বাস ট্রাম্প করেছিল ডিরেক্টরিদার বাসে বসে।

বুঝতেই পারছেন, সন্ধ্যবতী পুরোর সেই সন্ধ্যা থেকে ডিরেক্টরিদা মেমোরিয়ালের এই সন্ধ্যার অন্তর্বর্তী সময় টুকু কিছু কম সময় নির্মিতিলাম। সংক্ষিপ্ত ঘটনাক্রম এই রকম: পার্কের বাড়ি, সেখান থেকে ওর সঙ্গীত জ্ঞানের সঙ্গে অনুষ্ঠানিক-তার আলাপ পরিচয় স্বাভাবিক নিয়মেই পার্কে ঢুকবি সাঁঝ ওকে বাড়িতে নিমন্ত্রণ, পূরবীর মায়ের সঙ্গে বলতে গেলে একসঙ্গে বাড়িতেই আলাপ পরিচয় নিয়েছি। তারপর চেহারার মধ্যে একটা গোলগাল ভাব আছে, কথাবার্তায় ইচ্ছে করেই [illegible] সেরেছি বাড়ির অভিভাবক [illegible] দেখি [illegible] সবাইকে খুশি করে আমার সুবিধেই হয়েছে। পূরবীকে প্রথম দিন ট্রামে ফেরার সময় একা পেয়ে ওর [illegible] ভাবে ওকে মনে উপলব্ধি নিতে সময় নিয়েছিলাম। তারপর একদিন [illegible] যাওয়া, সেও হোলো মাস, ইতি করেই চলে গেছে, সেরেই। এরিকম সুযোগ ও সময়ের সেই সঙ্গে অনুপলব্ধিতে বিদ্ধ হচ্ছে। মাঝা-মেয়েরা চালচ্যুত যেন ও ছেলে মেয়েছে। এ পোড়া দেশে ভালোবাসাবাসির ক্ষেত্রে সোনার সঙ্গে আর যখন মেয়ের অভিভাবক ভাড়া প্রেমটা গজাতে পারে—এই ধরে নিই

[illegible] ছেলে কতদূরে মাথা চুলকে [illegible] চাকরির [illegible] ঘোরাফেরা [illegible] [illegible] [illegible]

'ছেড়ো না।' বৃন্দাবনের কথের কামাই করে দেহকর্ম পাশে বসে ওকে বলেছিলুম। ইতিমধ্যে অন্তত বাঁট ছেড়ে-চোদ্দ বছরের পাকা ছেলে সময় জিগেস করেছে, চারজন কালমর্ডওলা বিয়ে করেছে। বলেছিলুম, 'ভালোই তো। বেশ বড়লোকের ঘরে পড়বে। ভদ্রলোকের নিশ্চয়ই টাক আছে। বছর পুরতে না পুরতেই কোলে বাচ্চা, গলায় হাঁস, ঘাড়ে ছাঁস, বেশ চওড়া হয়ে পড়বে। কিন্তু—'

'বাঁটা রাখো। তোমাদের সামনের বাড়ির পূর্ণিমার খবর জানো তো?'

জানতুম। বিয়ের একমাস পরেই পূর্ণিমাকে ওর শ্বশুরবাড়ির লোকেরা ফেরৎ দিয়ে গেছে। স্ত্রীভাগ্যে যেন জানাজানি হয়ে গিয়েছিল পাড়ার টেইলনাই দোকানের ছোকরাটির সঙ্গে ওর বিবাহপূর্ব প্রণয়ের কাহিনী। বলেছিলুম, 'তুমি কী বলতে চাইছ?'

'মাস্টার কে আর জানে না আমাদের ব্যাপার।'

'ও।'

'মাস্টার বাড়িতে গলগ্রহ হয়ে থাকার চেয়ে গলায় দড়ি দিয়ে মরে যাওয়া ঢের ভালো। তুই গিয়ে বলো অমরেশ স্বশুরে-বাড়ীতে স্থানাভাবনি দিতে পারে। তুমি কিছু করো।'

'রেজিস্ট্রেশনটা তাহলে ফেলে দি, কী বলো?' বস্তুত নীলিমার কথাগুলো শুনে নিজের সেই সময়কার পলাতক মনো-বৃত্তিটাকে একরকম গালাগালি করেই মনে হচ্ছিল। তাই এই উত্তর দিতে আমি বাধ্য হয়েছিলুম। অথচ আমিও অবশ্যই বলা কী বলব, মুখ বেরোয়। চুপচাপ পড়তুম, রোজগার বাড়াতে এই। এছাড়া মাঠ, মাঠের সেন্টিমেন্ট, যদি মোজা বরফা ছেঁড়ে দেন, জোগাড় রাঁড়ার, ওর তরফ থেকেও সেই একই মন্ত্রণা—ইত্যাকার ভাবনায় আমি বেশ কাহিল, হয়ে একটা ফাঁড়ি নিয়েছিলুম। বিয়েটা করেই ফেললুম। যতখানি আশঙ্কা করেছিলুম ততখানি আর হোল ভই। রেজিস্ট্রেশনের প্রায় একবছর পর, লোকজন খাইয়ে, সামাজিক মতে আমাদের বিয়ে হোল। খরচপাতি বলা বাহুল্য, শাবাই দিয়েছিলেন। নীলিমা ঘরে এল।

এবং দিনের পর দিন থাকতে থাকতে যা হয়, ওর কিছু কিছু দোষ আমার চোখে পড়তে লাগলো। নীলিমার হাসিতে দাঁত আর দাঁড় ছাড়া কিছু যেন দেখতে পাচ্ছি না, পড়াশুনোটা কেন যে চালিয়ে গেল না, বাড়িতে থাকলেই যে বিয়ের মতো থাকতে হবে তার কী মানে আছে—এইসব ব্যাপার কখনো ঘুণাক্ষরেও আমার বেশ বিরক্ত করতো। অবশ্য এই ভাবনাগুলোকে চেপেই রাখতুম, কেননা চেপে যাওয়াটাই কর্তব্য। 'কর্তব্য' শব্দটার মতো এত চমৎকার শব্দ আর পেলুম না। ঐ একটি শব্দই আমার হাতে, নিঃশ্বাস, অভাব অর্থাৎ গোটা বাঁচাটাকেই নিরাপদ করে তুলছে। নিরাপদ দড়ের নাম এই সূত্রে চট করে এসে গেল। যাবেই। যাই হোক না কেন, নীলিমা আমার স্ত্রী এবং লোহার খাট একখানাই। সমস্ত নিশ্চয়তা ঐ খাটে শুয়ে বেড সুইচ টিপে অন্ধকারে চাদরে মুখ ঢেকে দিয়ে ঘুম-না-আসা পর্যন্ত ওকে প্রায় রাত্রিই আমার অঙ্গ লাবণ্যের সমারোহের প্রশংসা দিতুম। সুতরাং কর্তব্য পালন করে চলছিলুম। তারপর বছর দেড়েক হোল মিতুন এল।

মিতুন কিন্তু আমার কাছে যেন আরাম-প্রদ একটা অনুভূতি এনে দিয়েছিল। এই টুকটুকে আঙুল দিয়ে ভীষণ অভিনিবেশ সহকারে নিষ্পাপ নীল চোখের কুতকুতে কালো তারা দুটোকে নাকের ডগার দিকে নামিয়ে টাঁয়া করে আমার নাক পরখ করছাকে, চশমা ধরে টানবে, 'টিকটিটিকু' বললেই খুকখুকে আলোর দিকে তর্জনী বাড়িয়ে 'উইজ-ড-ও' বলে একটা অদ্ভুত আওয়াজ করে উঠবে, তুলনাই হয় না। এক-একটা মেয়ের অপ্রতিরোধ্য প্রধানা নীলিমা যেন ঝাপসা হয়ে গেল; ওর দিকে মন দেওয়ার মতো খিদে-তেষ্টা আর তখন ছিল না। হয় বাজে-ভয়ে; অনেকদিন পর, হয়তো টানা দশ-পনের দিন নীলিমার দিকে পিঠ ফিরিয়ে শুয়েছি, এক একা চোঁ-চোঁ করে মোটা মাডেলের খালি, গ্লাস ভোর করে দিয়েছি, তারপর হুঁয়ে একদিন মনে হোত, মনে পড়লো: নীলিমা। হয়তো সবটাই কর্তব্য নয়, এর মধ্যে মিশে যায় সক্ষ্ম স্মৃতির একটা ঘণা, অর্থাৎ আবার সেই নীলিমা, কোলের কাছ, আমাদের বাড়ি, দোতলার সিঁড়ি সেলফস্থ পার্টাও এর মধ্যে ঢুকে পড়ে কখন যেন।

হেমন্তের উঁচুতে সব ঠুলো ভোঁ। অবশ্য নীলিমাকেন্দ্রিক ব্যাপার আমার কিছুই এসে যাচ্ছিল না, এইসব নিয়ে মাথা ঘামাতে চাইতুম না অনুচিত, অন্যায় বোধে। তাছাড়া মিতুন। আলাই ছিলুম: ছিপ সব ওলোট-পালট হয়ে গেল। পুরস্কার প্রভুর আর ছাদের উৎসাহে চুরিচাটি খোয়াতুম। পূরবীরা এরদিন আমাদের বাড়ি নিয়ে এসেছিলুম। নিয়ে এসেছিলুম—একচেও বড় কথা, নিয়ে আসতে যে ওকে প্রবি এই বিশেষ ক্ষমতা আমি তখন ওকে দেখে-ছিলুম। ক্ষমতা হচ্ছে কিছু একটা নিমাত, সৃষ্টি। সৃষ্টি করার আমার হাতটা ছেলে পূরবীকে, আর পূরবীর ভেতর থেকে সম্ভবত আমাকে। সুতরাং আমার আর পূরবীর মধ্যে যে ধরনের সম্পর্কটা গড়ে তার ছ-একটা উদাহরণ পেশ করছি।

এক।। গান আমার ছেলে হাজার গুণে ভালো গাইতে পারে অস্বীকারের। পূরবী কিন্তু এসব তুলনামূলক বিচারের ধারে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পূর্ববাংলার গল্প

"শিলাইদহে পদ্মার...বোটে ছিলাম আমি একলা...বোট বাঁধা থাকত পদ্মার বুকে।...পোস্টমাস্টার গল্প শুনিয়ে যেত গ্রামের সুখ দুঃখ ঘটনা এবং তার নিজের সংকট সমস্যা নিয়ে, বোষ্টমী এসে আশ্চর্য লাঘবে যেত তার রহস্যময় জীবনবৃত্তান্ত বর্ণনা করে। বোট ভাসিয়ে চলে যেতুম পদ্মা থেকে পাবনার কোলের ইছামতীতে, ইছামতী থেকে যমুনে, হুড়োসাগরে, চলন-বিলে, আত্রাইয়ে, নাগর-নদীতে, যমুনা পেরিয়ে সাজাদপুরের খাল বেয়ে সাজাদপুরে।...আমার গল্পগুচ্ছের কতক গল্প জমেছে আমার গ্রাম-গ্রামান্তরের পথে ফেরা এই নিবিচ্ছ অভিজ্ঞতার ভূমিকায়।" —রবীন্দ্রনাথ

যৌবনে জমিদারি তত্ত্বাবধানের ভার নিয়ে বাংলাদেশের গ্রামী অঞ্চলের জীবনযাত্রার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে পরিচয় তা ওই সময়ে রচিত তাঁর কোনো কোনো গল্পের উৎস। সেই রকম বারোটি গল্পের এই সংকলন। মূল্য সাত টাকা।

বিশ্বভারতী

১০ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা-৬

কাছেই যেত না, যেরকম ভঙ্গীতে আমার ঈষৎ ছোঁয়াতে গাল হাত রেখে আমার গাল শুনতো তাতে আমার বেশ অহঙ্কার বোধ হোত।

'আপনি কেন গান শিখছেন না, ও বলতো, 'শিখলে কিন্তু ভালো শিখতে হোত না আপনাকে।'

পরিচয়ের প্রাথমিক পরেই আমার রাবীন্দ্রিকপটুতার কথা ওকে বলেছিলুম। বলেছিলুম, 'শিখিনি, শিখতে চাইও না। ইচ্ছে করেই।'

'ওরা কেন?'

'শিখে তো অনেকেই যাইতে পারে, ওতে আর ক্রেডিট কোথায়? আমি না শিখেই গাইছি, এবং খুব একটা খারাপ গাইনা, তার প্রমাণ তুমি আমার জন্য। তা এর একটা বিশেষ আছে, নয় কি? সেটা নষ্ট করতে চাই না।'

'উঃ, কী অহঙ্কার রে বাবা, বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যায় না।' পূরবী দম করে বলে ফেলেছিল। সাধারণতঃ 'সভ্য' কথা উচ্চারণ করেছিল ও, না ভেবেই।

'হুঁ।। আপনি কাল আসেননি; অথচ আপনার জন্যে বন্ধুদের সঙ্গে সিনেমা যাইনে, জানেন?'

'কী করে জানব', জানলার ধারে বসে একটা দেয়ালগাছের দিকে কাঁকা চাউনি মেলে জবাব দিয়েছিলুম—এটা আমার অভ্যাস, টপ করে মেয়েদের দিকে সোজাসুজি তাকাতে পারি না। একটু সঙ্কুচিত জানি হৃষ্টিটা, হয়তো এতে নিজেকে সহজ করে মনে হয়, সেইভাবে জবাব দিয়েছিলুম, 'আমার না আসা আর তোমার সিনেমা না যাওয়ার মধ্যে আমি তো কোন সম্পর্ক খুঁজে পাচ্ছি না। অবশ্য জানলে আসতে তোমা জরুরি হতনা।'

'অবশ্য কারণটা ছাড়া আপনি তো কিছুই জানেন না।'

'মানে? আর কিছু নয়? গান?'

'অন্য, গানের কথা আর বলবেন না। গান গাইতে জানা আর গান জানা এক জিনিস নয়। এই নমুনার আছাবাক।'

'সেটাও তো একটা ক্রাইট। কখনো আরম্ভ যায়তে পারে বলো তো?'

'কেউ দিতে পারে না একে আপনি ছাড়া! উঃ, এত বাজে কথা বলেন না!'

'আজের কথা বলা তো এ জন্মে ছোল না। (নকল দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

'মানে!'

ওর ভাঁসমত নাজাস মুখ দেখে হৈরি অবাবটা, না দিয়ে ছুটুরে জিলুম কথার ঝোড়। বিছুন আর চাঁদিমারা গোটা অন্তত বটো সদা চিন্ট বাড়ির এনেছিলুম, সেগুলো পকেট থেকে বার করে বললুম, 'মানে হচ্ছে এই।'

ভাবগুলো দেখে নিশ্চয়ই ছেলেছিল, নীলিমা বলতে এখানে পূরবীকেই বোঝাচ্ছে। নইলে উত্তরে ও অমন্তব্য একটা উচ্চারণ করে নীচু নেমে গিয়েছিল কেন?

এ এই সমস্ত বন্ধুবান্ধবি সারাক্ষণ পূরবী আমাকে একটা বিরাট ধাঁধাসদৃশ করে তুলেছিল। ধরতেছুলে অনুযোগটাই আমার লোপ পেয়ে গিয়েছিল। একটা তোঁয়া, পাল্টে নিজেকে আমার চোখে রেখেছিল, আমার সাবজেক্ট ভালো জানা-জানাকে যেন খুঁজে পেতে চেয়েছিল। পূরবী আমাকে টেনে, তুলেছিল সেই অসাড় অক্ষাংশ হুমেরুসদৃশ থেকে। জন হোল, জানাশোনা-ইনিতার আর এক নাম হবে, নিশ্চেতনা—তেও পূরবীর পাশে নীলিমাকে ভেবে রেখে কেমনযে, নীলিমা, চায়, তারও আর এক নাম ধনেস।

ফলে যা হবার তাই হোল। নীলিমা বাদা দিল। ওর দোষ নেই, কিন্তু আমি তা শুনতে আদৌ রাজি নই। দোষ আমারও নেই। সরলতা যেখানে খেখানে কাজ করে, সেখানে পূরবীদের বাড়িতে, সেখানেই; কিন্তু কখনো নীলিমাকে কোন ফাঁকেই পূরবী সরাতে কোন কিছু বলিনি। তবু ও সব কেন গেছে। একদিন খুব একটা অদ্ভুত সেকারণে—চেনাশোনা লোকের বাসস্থান উপরে এড়ালোক জনেই—আমরা দুজন পাশাপাশি ছাটছি, সেখানেই, সব নথে, নীলিমার মুখোমুখি পড়ে গেলুম। ও চুপচাপ ওর কী দরকার কে জানে। কীলিন নীলিমার দাদা এবং আমার অভিভাবক। সেদিনই বুঝে গেছি হয়ে গেল।

অনাদিন অনিদ্রা আমাদের সংসারকে পরিষ্কার করে তুলেছিল। বেচারি মিতুন। এই সব ঝগড়াঝাঁটি দেখে দেখে কেমন যেন ভাই-ভাই হয়ে থাকতো। মনোযোগটা ওর কাছ থেকে সরে গিয়ে অনেক অনেকখানি পড়লো, বাঁচা ভালো। অর্থাৎ আমি ওকে খুশি করতে শুরু করলুম। সন্দেহ আর অবিশ্বাস ওর চোখে দাউদাউ করতো। সংসারে। কীলিন ওর লোনকে যা বলেছিল,—নিশ্চয়ই বলে-ছিল—ও প্রায়ই অনিতার বাড়ি যাওয়ার জন্যে বায়না করতো। তা স্বাভাবিকভাবে বন্ধুদের দেখলুম, একটা ফর্সা মেয়ের সঙ্গে—এর বেশী আর কী, হয়তো বড়জোর, মেয়েটাকে চিনিস তুই?'—কিন্তু নীলিমার কাছে এতো একটা বাঁধাধরা লাইন। লাইনের পর লাইন, পাতার পর পাতা সংসার আর সন্তানের ছবি লিখে গেছে, খুশি হোলেনি, শুনিয়েছে। কী সংক্রামিত স্বাভা ছোট। আমি প্রতিবাদ করতুম, পরে এর একদলের দল, হাজারবার বলতে শোনার পর ধরে চড়ুৎ করে মাথার উঠে যেতে। সজোরে ওর গালে মিতুনের সামনেই, চড় মেরে ওকে লুটিয়ে ফেলতুম মেঝের।

এসবের ফলে আমার যে একজন অন্তরঙ্গ বন্ধুকে পেয়েছিলুম। তারা আমার বিপক্ষে রায় দিয়েছিল। জোর গলায় এই একখানি মনোভাবকেও সহ্য করবে না, পূরবীকে ছুঁড়ে ফেলে দে। এসব বিশেষ, বেখেয়ালে সৌঁছিয়া এসব হাড়' বোকে ডিভোর্স করতে পারবি? পূরবীকে বিয়ে করতে পারবি?' তারা বলতো, 'তাছাড়া ফ্যাক্টরিতের ভয় নেই? টাকা দিয়ে পারবি সেসব বন্ধ করতে? হয় নীলিমা সুইসাইড করবে, এসব স্ত্রীটি প্রসঙ্গের নয় টাকা ঢেকে, খুনি-পুলিসের হাঙ্গামা চাপা দিতে পারবি না। জেল?'

কথাগুলির সারবত্তা অস্বীকার করি না। পূরবীকে নিয়ে ঘর বাঁধা করতে পারি। একদিন না একদিন ওর বিয়ে হবেই। তখন? তখনকার কথা তখন—এই ভাবে নিজেকে বুঝিয়ে প্রশ্নটাকে সম্পূর্ণ সামাচাপা দিয়ে ওর বাড়ির দিকে পা বাড়াতুম সন্ধেবেলা। কিন্তু আশ্চর্য ইলানীং পূরবীর ব্যবহারও কেমন যেন পালটে গেছে। গগন কি কিছু ওকে বলেছে? হয়তো। প্রায় দিনই ওকে বাড়িতে পেতুম না, পেলেও কথাবার্তা তেমন বলতো না, দু'একটা আটপৌরে কথা বলাবলির পর নীচে নেমে যেত, গানের কথা তো তোলাই না। একদিন দেখলুম গগনের সঙ্গে বসে বেশ হো-হো করে হাসছে পূরবী, হাতিতে চলছে বিবিধভারতী। আমি ঘরে ঢুকতেই পূরবী উঠতে করে নিয়ে গেল। চুপচাপ একটা ধাক্কা মারলো আমার গালে।' গগনকে জিগ্যেস করলুম, 'এর মানে?'

মানে পূরবী আহম্মুক। সেদিনই তো তোকে বললুম—'

'কিন্তু কী এমন হোল যে ও এইভাবে —তুই কি কিছু বলেছিস ওকে?'

'বলিনি। তবে একদিন হয়তো বলতেও পারি। কিন্তু ওর এই যে আটিচুড দেখলুম তাতে বোধহয় এমনিতেই ওর চৈতন্যোদয় হয়ে গেছে। তাছাড়া এ বাড়িতেও তোর অবস্থা সুবিধের নয়। ওর মা এই ব্যাপার-টাকে একদম নিতে পারে নি। এক-আধ দিন আসতে পারতিস কিন্তু তুই একটা সাস্টাকির মতো রোজনার আসতে শুরু করে দিলি। আমার অবস্থাটা ভাব একবার।' গগন তোকে আমায় বলে মাঝিল। 'পূরবী একদিন একবার এসেছিল গগনকে ডাকতে। আমি ওকে ডাকলুম : 'পূরবী শোন।'

'কি বলুন।'

রেডিওটা বন্ধ করে নিজেই দিকে চোখ স্থির করে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমার এইভাবে আমাকে অপমান করবার মানে?'

পূরবী চুপ করে রইল।

আমি 'প্রশ্নটা আবার একইভাবে রাখলুম। গগন কলম নিয়ে ছিনিমিনি কাটছিল। এবারও পূরবী নিরুত্তর: সেকেণ্ডটা টাইমপিসের শব্দ। ঘরের আধো আলো। ভাবি পূরবীর কাছ থেকে কিছু শুনতে চাই। কিন্তু ও মুখ গুঁজিয়ে রইল। তারপর আমাকে উপেক্ষার চুড়ান্ত

উঠিয়ে সেখান থেকে ঠেলে ফেলে দিয়ে ও পথ থেকে চলে গেল।

কারণ রহস্যময় অথবা স্বাভাবিক যাই হোক না কেন পূরবী যা করলো তাতে নীলিমার ইচ্ছেই শেষ পর্যন্ত সম্মানিত হোল। পূরবীর বাড়ি যাওয়া বন্ধ করলুম। মাগো অপমানে ওকে মা মুখি বলতে পারতুম নীলিমার চেয়েও তীব্র ভাষায়। সুযোগ পাইনি। ফলে ছটফট করছিলুম। কিন্তু ওদের বাড়ি যাওয়া বন্ধ করে দিলুম।

'এই তো চাই,' গগন বলেছিল 'এই সংযমটাই তো দরকার।'

মেট্রোর পাশে কাফে-ডি-মনিকোয় বসে বসে আমাদের কথাবার্তা চলছিল। এর আগে আমি শূন্যস্থানে, অহিংস থেকে বেরিয়ে, এদিক ওদিক ঘুরছিলুম। লোকজন, বিশেষ-সাহিত্য, বন্ধুবান্ধব অর্থহীন; পূরবী—ওর এতখানি স্পর্ধা, কী ওর আছে রূপ ছাড়া, তাইবা কী এমন, পথেঘাটে ওর চেয়ে অনেক বেশি সুন্দরী দেখা যায়। না, মেয়েদের মুখ আর দেখতে ইচ্ছে করে না, মুখ দেখলেই ভালোবাসার টানে পৌঁছিয়ে যেতে হয় শয্যাতে, পূরবীর ঘরে। না, মুখ না, শরীর, চেহারা, যৌবন। ধাঁধিয়ে দেয় চোখ, বোধ স্মৃতি, সত্তা, ঝাঁঝিয়ে দেয় দেহ থেকে মন, দৃষ্টি থেকে তাবৎ কলকাতার উজ্জ্বলতা। জগৎ ছাড়া কিছু নেই; অন্ধকার ছাড়া কিছু নেই, রাত্রি ছাড়া কিছু নেই; শুধু চেয়ে দেখ, বুঁদ হও, ডুবে যাও জগতের অন্ধকারে; কে বলে শূন্যস্থান, মিথ্যে কথা; ভিড়ের ফাঁক দিয়ে ঐতো একটা গোলাপি শাড়ি দেখ; কাটাও ভিড় সরাও, এগোও। এগোচ্ছিলুম। এমন সময় গগন পাকড়াও করলো। তারপর চা খেতে খেতে আমার পূরবী-সংক্রান্ত সংযম অনুমোদন করলো। উপদেশ দিল সমাজ, ঐতিহ্য, স্বাধীনতার সীমারেখা সম্বন্ধে। চায়ের পয়সা গগনই দিয়েছিল। সুতরাং উপদেশগুলো চায়ের সঙ্গেই গিলতে হয়েছিল।

নীলিমা যোগ্য হয়ে গেছে। একদিন ভালো করে ওকে দেখলুম। ব্লাউজের হাতা-দুটো ঢলঢলে হয়ে গেছে; পিঠের শিরদাঁড়া আগে ঢোকানো থাকতো, দুপাশে নরম মসৃণ মাংস উপচে পড়তো, এখন শিরদাঁড়া ফুটে উঠেছে। ভালো করে খায় না, ঘুমোয় না, মিতুলকে নিয়ে টানাপোড়েনও কম নয়। সারাদিন আমি তো বাড়ি থাকি না। মায়া হোল। সেদিন রাত্রে ওকে কাছে টেনে আদর করতে ইচ্ছে করলো।

'আমার গায়ে তুমি হাত দেবে না, আলাকে সরিয়ে দিয়েছিল ও, ওই হাতে তুমি একটা নষ্ট মেয়েছেলেকে ছুঁয়েছিলে। এখনও ছোঁও।'

'নষ্ট মেয়ে বলছ কেন?' বোকামির ভঙ্গিতে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করেছিলুম।

'বলব না! বৌ রয়েছে, মেয়ে রয়েছে যার, তাকে নিয়ে চলাচলি—ওর তো ওই পেশা।' নীলিমার ক্রোধ ওর সুন্দর দুরু দুটোকে বিশ্রীভাবে কুঁচকে একটা কুটিলতাকে আকার দিল। আমি ধৈর্য হারালুম না তা সত্ত্বেও।

'নীলিমা, প্লিজ, ওসব বোল না। তোমার আর আমার মধ্যে কোন থার্ড পার্সন আনতে চাই না। ওর কথা বাদ দাও।'

'বাদ আমি দেব কেন, তুমিই দাও! আর থার্ড পার্সনের কথা বলছ? মিথ্যে কথা। আমি বিশ্বাস করি না। তুমি মিথ্যেবাদী।' কাঁদছিল।

'একটা মেয়ের সঙ্গে পালাপাশি হাঁটলে কি, গল্প করলে ভালোবাসা হয়, তুমি ভালো?' নীলিমাকেও প্রবোধ দেওয়া আমি জরুরি বোধ করছিলুম। অনেক অনেকদিন পর, মনে হোল, আমার নিজের বলতে নীলিমা ছাড়া কে আছে। সেদিন ওকে প্রবোধ দিতে গিয়ে যা যা বলেছি তার সবই শতভাগ সত্য নয়, হতে পারেও না, এবং সব কথাই যে ও বিশ্বাস করেছিল তাও নয়; কিন্তু সব ছাড়িয়ে, সেই রাত্রে—এবং আরও অনেক রাত গেছে এ ধরনের কথায়—আমাদের অনুভাবের সুরটাই প্রচ্ছন্ন ছিল। অনুভাবের সেই সঙ্গে বুদ্ধিমত্তাও কাজ করছিল বৈ-কি। বুদ্ধি, কেননা সব কথাই সত্য বলতে পারিনি এবং অনুভাবের আন্তরিকতা এই সমস্ত অনিবার্য ও সুচিন্তিত মিথ্যের মধ্যে চারিয়ে দেবার জন্যে কোন পাথরই ছুঁড়তে বাকি রাখিনি। হ্যাঁ, এর মধ্যে একটা কথা জানাতে ভুল গেছি পূরবীকে একদিন নিউমার্কেট থেকে বেরুতে দেখেছিলুম সঙ্গে বেশ লম্বা স্মার্ট চেহারার একটা ছোকরা। এই তথ্যে সাদা যে ভাষ্যটা যোগ করেছিলুম নীলিমাকে শোনানোর জন্যে তা এই: 'নীলিমা তুমি ঠিকই বলেছিলে, পূরবী অত্যন্ত বাজে টাইপের মেয়ে।'

এই সিদ্ধান্তটা আমার পক্ষে খুব প্রয়োজন ছিল। প্রয়োজন নীলিমার স্বার্থে, মিতুলের স্বার্থে আর এদের সুখ বাঁচাতে গিয়ে আমারও স্বার্থে। পূরবীকে সারাতে দিতেই হবে। নীলিমা চেয়েছিল। এতদিন পর আজ আমিও তাই চাইছি। যে বিচ্ছেদ অসম্ভব কল্পনাতীত ছিল, বড় সহজেই তা নিষ্পন্ন হোল। পূরবীকে ধন্যবাদ। শুধু পাবলিসিটি শেষে একটা ধারালো নৃশংসতা ছোরা হয়ে আমার ভবনায় ধরা দিল। এই ছোরাতেই ওর সম্পূর্ণ অস্তিত্বকে একে আমূল বিদ্ধ করলুম। সেই ছোরা যা ওর মানহানি অথবা ওর ব্যবহার থেকে তাতে আমার সিদ্ধান্ত: বিচ্ছেদ, অর্থাৎ সেই সুসংস্থ বিচ্ছিন্নতা, মানে পূরবী, তার অত্যন্ত বাজে টাইপের মেয়ে। 'বিচ্ছেদ' শব্দের অর্থ তোমাকে পাশকা করে ভাবা। বড় ভালো পদার্থটা লিখেছিল সুদীন। ঠিক কথা। তবে শুধু ভাবা নয় এর সপক্ষে জোরালো যুক্তিও খাড়া করতে হবে: কী করেছিল ওর আমাকে? কী করতে পারতো ও আমার নিয়ে? কিছু না। শুধু আমাকে ওর একটা মজার উপকরণ পর্যবসিত করা, আমাকে অবলম্বন করে নিজের যৌবনটাকে বাসন্তী অহঙ্কারে আমার সামনে হাজির করা, হয়তো ওই ছোকরাটির সঙ্গে এই নিয়ে হাসাহাসি করা। আমি ঠিকমত করে মনে মনে ঐ বিশ্লেষণে করার সময় পাচ্ছিলুম না। মহাশয় আপনি কি জানেন, এই মেয়েছেলেটি কে? মাই ডার্লিং টাইপের চার বিচ্ছেদ হয়ে এই সপ্তদশ পাকিস্তানি —ইয়েস পূরবী সি ইজ এ স্ট্রেঞ্জার, মেয়েটা।

মায়া গেল। ছবিটার তলা থেকে ভালোবাসা কেড়ে খেয়ে যুক্তির লাল রক্ত তা মুছে নিল। নিষ্ঠুর নির্মম স্বার্থপর। তার একেবারে পরিষ্কার হওয়া দরকার হয়ে পড়েছে। তারপর ফিরব একটা কোলা ব্যাঙ্কের কাছে, নিরাপদ দূরত্ব রাখতে হবে।

আমাদের প্রকাশিত কয়েকখানি শ্রেষ্ঠ পুস্তক

শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত
- ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ৭.০০
- শ্রীশ্রীসারদা দেবী ৫.০০
- শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ ৩.০০

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য
- বাংলার লোকসাহিত্য ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম খণ্ড (প্রতি খণ্ড) ১৮.০০
- মহাকবি শ্রীমধুসূদন ৩.০০

ডঃ রমেশ দাশ
- বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি ৬.০০

অরিন্দম চক্রবর্তী
- লেনিন রুশমহাবিপ্লব ও বাংলা সংবাদ সাহিত্য ৫.০০

DR SUDHANSHU BHATTACHARYYA, D.Litt
- Evolution of the Political Philosophy of Mahatma Gandhi 35.00
- Selections from V.I. Lenin & J.V. Stalin on National Colonial Question ৫.৫০

নীহার দে সরকার
- রবীন্দ্র-স্মৃতি ৩.০০

ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত
- বিবেকানন্দ স্মৃতি ৮.০০

অমর গুহ
- মেতাজীর স্বপ্ন ও সাধনা ৫.০০
- উত্তরাপথ ৩.০০

গোপীনাথ হালদার
- বাংলা সাহিত্যে ওরিয়েন্টালিজমের ভূমিকা ডঃ অমলেন্দু দে সম্পাদিত ১৫.০০
- ঈশ্বরগুপ্ত-রচিত কবিজীবনী ১৮.০০

রামমোহনের বিচার

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

একটি চাবি দিয়ে যেমন সমস্ত তালা খোলা যায় না তেমনই একই মানদণ্ডে সব মানুষের বিচার হয় না। বিশেষত রাম-মোহনের মতো বহু স্তর-ও-মাত্রা-বিশিষ্ট বিরাট ও জটিল পুরুষের বেলায় বিচারের মানদণ্ড বারেবারেই পাল্টে নিতে হবে। আমার বক্তব্য স্পষ্ট হবে একটি দৃষ্টান্ত দিলে। বেদান্ত চর্চার মতো ধারাকে রাম-মোহনই বাংলায় পুনরুজ্জীবিত করেন। অথচ যখন কোম্পানী সরকার বেদান্ত শিক্ষার কলেজ খোলার পরিকল্পনা করল তখন আবার তিনিই তার বিরোধিতা করেন। যদি একটিমাত্র মানদণ্ডে তাঁর আচরণকে বিচার করতে চাই তাহলে দেখব, এখানে তাঁর প্রচুর নিঃসন্দেহ স্ববিরোধিতা ও অসঙ্গতিতে লাঞ্ছিত।

এবার মানদণ্ডটি পাল্টে দেখা যাক যে, রামমোহনের ওই দু রকম আচরণের কোনও ব্যাখ্যা পাওয়া যায় কিনা। ধর্ম হলো ব্যক্তিগত বিশ্বাস আর চর্চার বিষয়, অন্য পক্ষে রাষ্ট্র হলো বহুতর বিশ্বাসসম্বলিত জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষা করার জন্যে প্রতিষ্ঠান। তাহলে হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্ম-গ্রন্থ চর্চার জন্যে কলেজ কেন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবে? সম্প্রদায় বিশেষের ধর্মগ্রন্থ চর্চার কলেজ ওই বিশেষ সম্প্রদায়ের কোনও ব্যক্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্র তা পারে না এইটেই ছিল রামমোহনের ওই আপত্তির ভিতরের যুক্তি। মুশকিল হচ্ছে, সবাই সব বোঝে না। ধর্ম ও রাষ্ট্র দুটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জিনিস, দুটির এক্তিয়ারও দুটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এলাকার। সেকুলারিজমের এই মূল কথাটা এখনও অনেকে বোঝে না, তখনকার কালে তো আরও কেউ বুঝত না। সুতরাং যেমন বুদ্ধি বড়ালাট সাহেবের বোঝবার ছিল তেমন বুদ্ধিই রামমোহন দিয়েছেন।

আসল কথা হলো, বহু দিকের বহু পরিকল্পনা মস্তিষ্কের আলাদা আলাদা দেরাজে আলাদা আলাদা তালা-চাবিতে গুছিয়ে রেখেছিলেন রামমোহন। সেজন্যে আমাদেরকেও তাঁর পরিকল্পনাগুলি আলাদা আলাদাভাবে বেছে বের করে, সেগুলোর নির্ভুল টেরী করে এমনভাবে গুছিয়ে রাখতে হবে যাতে তাঁর বিচিত্র ও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের একটা পুরো ছবি সকলের চোখেই খুব স্পষ্ট মূর্ত পায়।

কিন্তু ছবিটাকে পরিষ্কার করতে গিয়ে প্রথমেই একটা সমস্যার সম্মুখীন হই। সমস্যাটা হলো এই : রামমোহনের সঙ্গে আধুনিক ভারতবর্ষের সম্পর্কটাকে কোন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করব? শুনে হয়তে অনেকে অবাক হবেন, কেননা সকলেই জানেন, রামমোহন আধুনিক ভারতবর্ষের জনক। তার মানে তাঁর সঙ্গে দেশের সম্পর্কটা অনেকখানি পিতাপুত্রের সম্পর্ক, তিনি হলেন জনক আর আধুনিক ভারত তাঁর ভাব-সন্তান।

এখানে উচ্ছ্বাস ও ভাবাবেগ থেকে মুক্ত হয়ে আমাদের চিন্তা করা উচিত যে, ওই-ভাবে জনক-সন্তানের সম্পর্ক নির্ধারণ করলে সত্যিই রামমোহনের জন্মা ও বৈশিষ্ট্য বা তাঁর সম্বন্ধে কোনও সুস্পষ্ট ও যথার্থ ধারণা আমরা লাভ করি কিনা। তেমন ধারণা লাভ করতে হলে জানা চাই যে আধুনিক ভারতবর্ষ কাকে বলে: আধুনিক মানে এখনকার কাল বোঝায়, নাকি এখনকার কালের কতকগুলি বৈশিষ্ট্যকে বোঝায়? আবার বৈশিষ্ট্যের প্রতি মনোযোগ দিলে আরও গোল বাধে: এখানে বৈশিষ্ট্য বলতে শুধু চলতি বৈশিষ্ট্যকে বোঝাবে, না এমন কোনও বৈশিষ্ট্যকে বোঝাবে যা আগেকার কালেও ছিল, তবে আগেকার কালে তা ছিল অপ্রধান রূপে, ছাই-চাপা আগুনের মতো?

এসব গোলমেলে ব্যাপার এড়াবার একটা সহজ পথ আছে। যদি বলি, আগে স্বামী মারা গেলে স্ত্রীকেও মারা হতো বা মরতে হতো, তার মানে আগে সহমরণ প্রথা ছিল, এখন নেই কিম্বা আগে বিজ্ঞান শেখার কোনও ব্যবস্থা ছিল না, এখন আছে, সুতরাং সহমরণ প্রথার অভাব, বিজ্ঞান শেখার ব্যবস্থা ইত্যাদি আধুনিক জিনিস এবং এই জিনিসগুলি প্রবর্তনের পেছনে রাম-মোহনের অবদানই প্রধান তাহলে ব্যাপারটা অনেক সহজ হয়ে যায় নাকি? কিন্তু আগেকার কালের সঙ্গে এখনকার কালের এরকম প্রতিতুলনা করার একটা সমস্যা আছে। সেই সমস্যাটা বোঝার জন্যে সহমরণ প্রথার উপরেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যাক। এই প্রথা আগেকার কালেও পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই ছিল না, এখনও নেই, এর থেকে কি সত্যিই কিছু প্রমাণিত হয়? না, অনাধুনিকতা বা আধুনিকতা কোনটাই এই ব্যাপারে প্রমাণিত হয় না।

অথচ আমরা অনেক সময়ই বিশিষ্ট ব্যক্তির মূল্যায়ন করার সময় তাঁর জীবনের কতকগুলি ঘটনার আগে উল্লেখ করি, তারপরে বলি যে সেগুলো তাঁর আধুনিক-তার সাধনা। কিন্তু উল্লিখিত ঘটনাটা যে আধুনিকতারই একটা অঙ্গ বা লক্ষণ তা প্রমাণ করা হলো না। এই পদ্ধতিকে বলতে পারি ব্যক্তি বিশেষের জীবনীর মাপ অনুসারে আধুনিকতাকে মাপ খাইয়ে নেওয়া। অর্থাৎ আগের থেকেই ব্যক্তিকে আমরা আধুনিকতার পরিমাপ হিসেবে ধরে নিই এবং পরে তাঁর আচরণগুলিকে ব্যাখ্যা করি আধুনিকতার পথে উল্লেখ-যোগ্য অবদান হিসেবে। এতে আমরা ব্যক্তি-বিশেষের আচরণ দিয়ে আধুনিকতার সংজ্ঞা নির্ধারণ করি।

উল্লিখিত পদ্ধতির প্রধান সুবিধা এই যে, এতে আলোচনাকারীকে বেশী পরিশ্রম করতে হয় না। রামমোহনের মূল্যায়ন করার সময় এই পদ্ধতির প্রয়োগ কি রকম হতে পারে? তাঁর একখানি জীবনী হাতের কাছে রেখে তার থেকে তাঁর জীবনের কতকগুলি কাজের একটা তালিকা প্রস্তুত করে নেব আগে, তারপর সেই কাজ-গুলোকে তাঁর আধুনিকতার সাক্ষ্য বলে ঘোষণা করব এবং সেই সাক্ষ্যগুলোকে ঐতিহাসিকের মতো তথ্যভিত্তিতে এ সবই তাঁর আধুনিকতার জাজ্বল্য প্রমাণ বলে দাবী করব। এটা হলো ব্যক্তির মানদণ্ডে আধুনিকতার পরিমাপ।

উল্টো পদ্ধতি হলো আধুনিকতার মানদণ্ডে ব্যক্তির মূল্যায়ন। এতে আগেই পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিতে হবে যে আলোচনাকারীর মতে আধুনিকতা জিনিসটা কি- এবং তারপর সেই মানদণ্ডে আলোচ্য ব্যক্তির বিভিন্ন আচরণ, বক্তব্য ও চিন্তা কতটুকু বা কতখানি ধোপে টেকে তার বিচার করতে হবে।

এই পদ্ধতির প্রধান অসুবিধা হলো, আধু-নিকতার সমাক সংজ্ঞা নির্ধারণ করা। সে-সংজ্ঞা এমন হওয়া চাই যা বাংলার বেলায় যতটা খাটবে মহারাষ্ট্রের বেলাতেও ততটাই খাটবে, মহারাষ্ট্রের বেলায় যতটা খাটবে উটালীর বেলাতেও ততটাই খাটবে, জার্মানীর বেলাতেও ততটাই খাটবে, কিংবা ফ্রান্স বা ইংলণ্ডের বেলাতেও ততটাই খাটবে, আবার রাশিয়া বা চীনের বেলাতেও তা হওয়া চাই সমান সত্য। সমস্ত কাল ও সমস্ত দেশের বেলাতেই যা আধুনিক তার সংজ্ঞা নির্ধারণ করা সোজা নয়।

সাধারণভাবে আধুনিক বলতে আমরা বুঝি এমন জিনিস যা আগে ছিল না। যদি কেউ বলেন যে, ভারতবর্ষের আধুনিক-তার সংজ্ঞায় ইংরেজী ভাষার প্রচলন একটা

বাচ্চার পেট সুস্থ থাকে কিসে?

বেঙ্গল কেমিক্যালের

গ্রাইপ মিক্সচার-এ!

কখনো কখনো দেখা যায় মায়ের ভালবাসাই যথেষ্ট নয়। যখন বদ হজম ও পেটের যন্ত্রণায় বাচ্চা কান্নায় ভেঙে পড়ে, অস্বস্তির জন্য রাতের পর রাত কেঁদে কাটায়, অথবা প্রথম দাঁত ওঠার সময় বাচ্চাটি মোটেই আরাম পায় না···তখন আপনার বাচ্চাকে গ্রাইপ মিক্সচার খাইয়ে দেখুন তার মুখে কেমন হাসি ফুটে উঠেছে। ডাক্তাররা গ্রাইপ মিক্সচার খাওয়ার বলেন—এতে এমন সব উপাদান আছে, যাতে খুব সহজেই কাজ হয়। ব্যথা ও অস্বস্তি দ্রুত দূর হয়। হজম করতে সাহায্য করে। ক্ষিদে বাড়িয়ে দেয়। গ্রাইপ মিক্সচার দিয়ে আপনার বাচ্চার যত্ন নিন।

বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা • বোম্বাই • কানপুর
দিল্লী • মাদ্রাজ • পাটনা • গুলপুর

আধুনিকতা। এই দুটোর সংজ্ঞাতে বলা হয় যে কতকগুলি বিশেষ ব্যবহারযোগ্য বস্তুর উপরেই আধুনিকতা নির্ভরশীল, তার কোনও অন্তর্নিহিত মানবিক ভিত্তি নেই।

এরকমভাবে আধুনিকতার আরও অনেকগুলো সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু কোনও সংজ্ঞা দিয়েই আধুনিকতার সমগ্র স্বরূপকে ধরা যায় বলে মনে হয় না। তাই সংজ্ঞা দেওয়ার চাইতে আধুনিকতার লক্ষণগুলোকে তালিকাবদ্ধ করার চেষ্টাই বাস্তব-ধর্মসঙ্গত।

এই লক্ষণগুলো খুঁজে খুঁজে বের করার সময় তিনটি কথা মনে রাখতে হবে: প্রথমত, লক্ষণগুলো হবে এমন যা আগে ছিল না, যা ঐতিহ্যের থেকে স্বতন্ত্র, যা রক্ষণশীলের ধারার অন্তর্গত নয়, যা সংযোজনের ধারার অন্তর্গত, দ্বিতীয়ত, উপরন্তু সেগুলো হওয়া চাই সম্পূর্ণরূপে মানুষের জীবনের উপরে নির্ভরশীল, এবং, তৃতীয়ত সেগুলোর সঙ্গে মানুষের ভালো-মন্দের বা মূল্যবোধের প্রশ্ন অবশ্যই সম্বন্ধযুক্ত হওয়া চাই।

এবার আধুনিকতার কয়েকটি প্রধান লক্ষণ খুঁজে বের করা যাক।

প্রথম লক্ষণ, পরলোকের চাইতে ইহ-লোকের, অলৌকিক জীবনের চাইতে লৌকিক জীবনের গুরুত্ব বৃদ্ধি। আগের কালের মানুষ, এমন কি প্রাচ্যের সম্প্রদায়ও, সাধারণভাবে মৃত্যুর পরে কি হবে না-হবে তা নিয়েই বেশী চিন্তিত ছিল; যে উচ্চ সম্প্রদায় ভোগবিলাসে জীবন কাটাত তারাও নীতিগতভাবে বিশ্বাস ও প্রচার করত ইহ-লোকের কর্তব্যকর্ম হলো পরলোকের জন্য পথের সন্ধান করা। আধুনিক জীবনে পার-লৌকিক ও অলৌকিক চিন্তা একেবারে দূর না হলেও ইহলৌকিক ও লৌকিক চিন্তার জন্য নীতিগতভাবে স্বীকৃত হলো—মানুষ অন্যায়ভাবে দাবী করল যে মানুষের আগেই, মর্ত্য জীবনেই তার আনন্দ ও প্রসাদ, সাধ্য ও সুখ, সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্য চাই।

দ্বিতীয় লক্ষণ হলো, মানুষ হিসেবে মানুষের পরিচয় ও সেই পরিচয়ের জন্যে মর্যাদাবোধের উদ্ভব। আগে মানুষের পরিচয় ছিল তার জন্ম বংশ সম্প্রদায় বর্ণ জাতি ইত্যাদির উপর নির্ভরশীল অর্থাৎ সমাজে তার স্থান নির্ধারিত হতো তার এমন সব পরিচয় নিয়ে যার উপরে মানুষের কোনও হাত থাকত না—একবার কোনও বিশেষ বংশের বা বর্ণের ঘরে জন্মালে তার মৃত্যু পর্যন্ত সে-পরিচয় অক্ষয়-অনড় অটল হয়ে তার গায়ে সেঁটে থাকত, নিম্ন বর্ণের ঘরে জন্মালে শাস্ত্রপাঠের অধিকার সে পেত না, মন্দিরে ঢোকাও নিষিদ্ধ ছিল তার জন্য শাস্ত্রানুসৃত সম্ভ্রান্ত ঘরে জন্মাল তাকে, ছেলে আসবার জন্য উপেক্ষা করা ছাড়া সন্তানের জন্য বাপ মায়ের কিছুই করণীয় থাকত না, সন্তানেরও সে রকম। আধুনিককালে মানুষের অপরিবর্তনীয় পরিচয়ের স্থান নিল মানুষের বিকাশ-শীল পরিচয়। এতে দেখা গেল মানুষ নিজের প্রয়াস ও প্রযত্ন নতুন নতুন দিকে তার ব্যক্তিসত্তাকে চালনা করতে পারে, শুদ্র হতে পারে ব্রাহ্মণের চাইতে বেশী বিদ্বান, দরিদ্র ব্রাহ্মণ বংশে জন্মেও স্থাপত্য-প্রতিভার বলে একজন হতে পারে অসামান্য ধনিক। এসবের থেকে দেখা গেল যে মানুষ নিজের প্রবৃত্তি ও পরিবেশকে বহুলে পরিমাণে পরিবর্তিত করতে পারে, গড়ে তুলতে পারে আপন অস্তিত্বের পরিপোষক রূপ, আকাঙ্ক্ষা ও কল্পনার টানে জন্ম-পরিচয়কে অতিক্রম করে প্রতিষ্ঠা করতে পারে তার সম্পূর্ণ একান্ত নিজস্ব পরিচয়। এটা হলো মানুষের ব্যক্তি-পরিচয় অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তির, প্রত্যেক স্ব-এর প্রতি-ষ্ঠিত্বের পরিচয়।

ব্যক্তি-স্বাধীনতা হলো আধুনিকতার তৃতীয় লক্ষণ। আপাতদৃষ্টিতে যা-ই বলে হোক, নিছক দৃষ্টিতে ব্যক্তি-পরিচয় আর ব্যক্তি-স্বাধীনতা একই ধারণাকে বোঝায় না। যেমন ফরাসি সংস্কারের অনাতম পরিণাম গঙ্গা নদী তেমনই দ্বিতীয় লক্ষণটির অন্যতম পরিণাম তৃতীয় লক্ষণটি। যদি ব্যক্তি হিসেবে আমি যা ভাবি ও তা-ই আর সেও তা-ই হয় তাহলে তুমি যা বলবে আমি তা চোখ-কান বুজে সত্য বলে মেনে নেব না, আমার মতো আমি বিচার করে দেখব কোনটা বেঠিক কোনটা সঠিক, কোনটা মিথ্যা কোনটা সত্য, কোনটা বর্জন করব আর কোনটা করব গ্রহণ। ব্যক্তির বিকশিত বিবেকবুদ্ধিতে পরীক্ষা ও বিচারের পরে প্রাপ্ত সত্যকে নিজের জীবনে পালন করার, গ্রহণ করার যে-অধিকার তাকে বলব ব্যক্তি-স্বাধীনতা। এর সঙ্গে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-ভঙ্গীর সম্পর্ক এতই অন্তরঙ্গ যে দুটোকে আলাদা করাই কঠিন, কেননা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীরও তাৎপর্য একই : নিজের সামর্থ্য নিয়ে স্বাধীনভাবে সত্যকে খুঁজে বের করার যে-নীতি তাকেই বলি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর বদলে অনেক সময় যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী কথাটাও ব্যবহৃত হয়।

ব্যক্তির স্বাধীনতার সঙ্গে আর্থিক স্বাবলম্বিতার প্রশ্নটি অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। সরাসরি জিজ্ঞাসা করলে জানা যায় যে সকলেই এই স্বাধীনতার কম-বেশী সমর্থক, কিন্তু খুঁটিয়ে দেখলেই বোঝা যায়, এখানে ভাবের ঘরে চুরির মাত্রা অত্যধিক, কেননা কার্যক্ষেত্রে ব্যক্তির স্বাধীনতার পথে বাধা দুস্তর। জীবন-ধারণের জন্য, ভরণপোষণের জন্য অর্থনীতির কতকগুলি স্থূল কারণে যাকে কর্তার উপরে নির্ভর করতে হয় তাকে কর্তার মর্জি বুঝে, মন জুগিয়ে, প্রসাদ কুড়িয়ে চলতেই হয়, সেখানে সেই পর-নির্ভরশীল ব্যক্তিটি নিজের স্বাধীন মত অনুসারে বুক ফুলিয়ে চলতে গেলে তার ভরণ-পোষণ না-ও পেতে পারে, আত্মরক্ষাও হারাতে পারে তার গোটা অস্তিত্বই বিপন্ন হতে পারে। আমাদের অধিকাংশ পরিবারে ছেলেদের অবস্থার দিকে তাকালেই আর্থিক স্বাবলম্বিতার গুরুত্ব বোঝা যায়। আর্থিক স্বাবলম্বিতাই হলো ব্যক্তির স্বাধীনতার প্রথম ও প্রধান রক্ষাকবচ। প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে আর্থিক স্বাবলম্বিতা চাওয়া আধুনিকতার চতুর্থ লক্ষণ।

এই চতুর্থ লক্ষণটির প্রকাশ ঘটে কোন-খানে? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে জানা চাই যে একজন-দুজন ব্যক্তির আর্থিক স্বাবলম্বিতার প্রকাশ আমাদের আদৌ নয়। প্রত্যেক ব্যক্তির সম্বন্ধিতাতে যে-জন বা যে-রূপকে জনসাধারণ বলে তার বেলাতে আর্থিক স্বাবলম্বিতার প্রকাশের ক্ষেত্রটিই আমাদের মূল অভিপ্রেত। তথাৎ আমরা জানতে চাইছি যে জনসাধারণের বেলাতে ব্যক্তি-স্বাধীনতার আদর্শ স্বীকৃত হলো কি হলো না তা যাচাই করা হবে কিসের ভিত্তিতে? সেই ভিত্তিটা হলো রাজনীতি। কাকে বলে রাজনীতি? জনসাধারণের জীবন সম্পর্কিত বিষয় ও সমস্যাগুলোর প্রতি মনোযোগ। আগেকার কালে রাজনীতি কিন্তু একথা সত্যি বটে 'কস্তু সেকালে রাজনীতি নিয়ে পথে ঘাটে ও রাজকর্মচারীদের সাধারণত মাথা ঘামাত। আধুনিকতার পঞ্চম লক্ষণ হলো নিজের জীবনের সঙ্গে ওতঃপ্রোত ও অত্যাবশ্যকীয়ভাবে জড়িত বিষয়গুলোতে তথা রাজনীতিতে জন-সাধারণেরই সচেতন হয়ে ওঠা।

ইংরেজীতে যাকে এনপ্যাথি বলে তাকে বাংলায় বলতে পারি আত্মসম্প্রসারণক্ষমতা এবং এইটে আধুনিকতার ষষ্ঠ লক্ষণ। প্রকৃতপক্ষে এইটে হলো (প্রথম লক্ষণে বর্ণিত) ইহলৌকিক জীবনের স্তরে (দ্বিতীয় লক্ষণে বর্ণিত) বিকাশশীল ব্যক্তিসত্তার, (চতুর্থ লক্ষণে বর্ণিত) স্বাবলম্বিতাতে সুরক্ষিত (তৃতীয় লক্ষণে বর্ণিত) নিজের স্বাধীন অস্তিত্বের (পঞ্চম লক্ষণে উল্লিখিত) জনসাধারণের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করার ক্ষমতা। এতে এক ব্যক্তি নিজস্ব পরিচয়ের গণ্ডি লঙ্ঘন করে অপর কোনও ব্যক্তির পরিচয়ের ভিতরে ঢুকে যেমনভাবে মিশে যেতে পারে। দৃষ্টান্ত দিলে ব্যাপারটা বোঝা সহজ হবে। যদি প্রশ্ন করি, তোমাকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী করলে কি করবে? তাহলে তিন রকম উত্তর পেতে পারি—আমি কখনও তা হব না তা নিয়ে মাথা ঘামাই না, অথবা, মিলিটারী নামিয়ে সব কটাকেবাছাই টিট করে দেব বা এরকম কিছু, অথবা, এমন কোনও উত্তর যা প্রধানমন্ত্রীর বর্তমান কল্পনার সঙ্গে ভালোভাবে মেলে। প্রথম উত্তর থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে উত্তর-দাতা নিজের পরিচয়ের গণ্ডি ছেড়ে বেরোতে রাজি নয়, দ্বিতীয় উত্তরদাতা অবশ্য বেরোবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু তার কল্পনা এমনই উদ্ভট যে বাস্তবের সীমা ছাড়িয়ে গেছে কিম্বা বাস্তবের দিক আদৌ ঘায়ই নি, তৃতীয় উত্তর থেকে বোঝা যায় যে উত্তরদাতা সহজেই নিজেকে প্রধানমন্ত্রীর স্থানে নিজেকে কল্পনা করতে পেরেছে, নিজেকে প্রসারিত করেছে প্রধানমন্ত্রীর-

পরিচয়ের সঙ্গে, এবং হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে। শেষের কবিতার নায়ক বলেছে, সব অবস্থার জন্যে প্রস্তুত থাকার নামই সভ্যতা। তলিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে ওইটে আসলে সভ্যতার নয়, আধুনিকতারই একটি অত্যাবশ্যকীয় লক্ষণ — প্রধানমন্ত্রীর অবস্থার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে, আবার বিদেশে গিয়ে বিদেশী খাওয়া-দাওয়া আচার-প্রথা অবহাওয়ার সব কিছুর জন্যেই প্রস্তুত থাকতে হবে এবং এই প্রস্তুত থাকার জন্যেই চাই আত্মসম্প্রসারণক্ষমতা, সকলের সঙ্গে নিজেকে সমান করার ক্ষমতা।

এভাবে আধুনিকতার বহু লক্ষণ একে একে নির্দেশ করতে পারি। কিন্তু আমার ইচ্ছা হলো আধুনিকতার সমস্ত লক্ষণগুলোর তালিকা তৈরী করা নয়, রামমোহনের বিচার করার কি কি পদ্ধতি আমরা গ্রহণ করতে পারি সে সম্বন্ধে খানিকটা পরিষ্কার ধারণা অর্জন করা। ওই উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে উল্লিখিত দু-টি লক্ষণই যথেষ্ট। এখন দেখা যাক যে লক্ষণগুলোর সঙ্গে রামমোহনের বিভিন্ন ভাবনা-ধারণা কতখানি মেলে। মনে রাখা ভাল যে ঘটনার কোনও স্বয়ংসম্পূর্ণ মূল্য আধুনিকতার বিচারে নেই। রামমোহন বেদান্ত প্রচার করলেন অথবা রামমোহন সহমরণ প্রথা নিবারণ করলেন এসব ঘটনা সত্যি কি মিথ্যে তা নিয়ে তর্ক তুললে অবশ্য আধুনিকতার সঙ্গে রামমোহনের সম্পর্ক নির্ধারণ করা যাবে না। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে মধুসূদন সরস্বতীর মতো বৈদান্তিক রামমোহনের অনেক আগেই বাংলায় জন্মেছেন, তাঁর সম্বন্ধে বলা হয়, মধুসূদন সরস্বতী যা জানেন না বিদ্যার দেবী সরস্বতীও তা জানেন না। কিন্তু আধুনিকতার সঙ্গে মধুসূদনের নাম যোগ করার কথা কারও মাথাতেই আসে নি। কেননা, বেদান্তের চর্চা করা—শুধু এই ঘটনাটি আধুনিকতার সঙ্গে কোনমতেই সম্পৃক্ত নয়। তাহলে কি সেই জিনিস যার সঙ্গে আধুনিকতার সম্পর্ক এমন যে তাকে বাদ দিলে আধুনিকতাই পাতলুন জলের মতো এলিয়ে-গড়িয়ে-ছড়িয়ে পড়ে যায়? সেই জিনিস হলো ঘটনার পেছনে যেসব নীতি ও সূত্র যেসব আদর্শ ও কল্পনা কাজ করে সে সবের সমষ্টিগত ভাবসত্ত্ব। সুতরাং আমরা আগে ঘটনার উল্লেখ করব, তারপর তার আদর্শগত ভিত্তির সন্ধান করব।

আধুনিকতার প্রথম লক্ষণটির সঙ্গে রামমোহনের জীবনের অসংখ্য ঘটনারই খুব গভীর মিল আছে, সেই ঘটনাগুলোর মধ্যে শুধু একটি ঘটনারই এখানে উল্লেখ করব। সেই ঘটনাটি হলো বেদান্ত শিক্ষার জন্যে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে কলেজ প্রতিষ্ঠার কিছুদিন পর ১৮২৩ খৃস্টাব্দে লর্ড আমহার্স্টকে লেখা রামমোহনের চিঠি—যেটিতে তিনি বিজ্ঞান শিক্ষার জন্যে কলেজ প্রতিষ্ঠায় সরকারী উদ্যোগ দাবী করেছিলেন। বিজ্ঞান কি শিক্ষা দেয়? ইহলৌকিক জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার, ওই জীবন ও জগতের স্বরূপ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হওয়ার শিক্ষা দেয়। তার মানে বিজ্ঞান শিক্ষার তাৎপর্য হলো ইহলোক ও লৌকিক জীবনের সত্তা সম্বন্ধে গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা করা। ঘটনার পেছনে এই তাৎপর্যটাই বড়ো কথা।

এবার দ্বিতীয় লক্ষণটির প্রতি মনোযোগ দিই। এর সঙ্গেও রামমোহনের জীবনের অসংখ্য ঘটনার নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান—যেমন জন্মসূত্রে তিনি যাদেরকে আত্মীয়স্বজন হিসেবে পেয়েছিলেন তাদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ক্রমে হৃদ্য হতে হতে ক্রমশ ছিন্নই হয়ে যায়, যাঁদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে তাঁরা সকলেই তাঁর নিজের সৃষ্ট স্বজন; তাঁর বিপুল সম্পত্তিও তিনি নিজের বুদ্ধি ও শ্রম দিয়েই উপার্জন করেছিলেন অর্থাৎ তাঁর স্বজন-সম্পদ সবই তাঁর বিকশিত ব্যক্তিত্বের উপার্জন। আর একটি ঘটনার উল্লেখ করি : রামমোহন বেদান্তের বাংলা অনুবাদ করে সেগুলো বিলিও করেন। এইটে খুবই নতুন ব্যাপার, অন্যান্য ধর্ম-সংস্কারকরা সব সাধারণের জন্যে ধর্মগ্রন্থের উপর বাধাই এতদিন ধার্য করে এসেছেন, কিন্তু রামমোহনই সর্বপ্রথম সর্বজনবোধ্য ভাষায় ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ করে দিলেন। কোনও নতুন বাধা না দিয়ে, মোটামুটি শব্দকোষের বাধনেই পুনরাবৃত্তি করে তিনি কেন শাস্ত্রগুলি বাংলা ও ইংরেজীতে অনুবাদ করলেন? তার মানে তিনি চাইলেন যে সকলে সংস্কৃত শাস্ত্রগুলিই পড়ুক, নিজেরা পড়ুক, নিজেরা ব্যাখ্যা করুক, নিজেরা বিচার করুক। কিন্তু আমি ব্যাখ্যা করার ও বিচার করার কে? আমি কি মনি-ঋষি, আমি কি ঈশ্বরের আগে জন্মেছি, আমি কি সরস্বতীর বিশেষ আশীর্বাদে ধন্য, আমি কি মহাবিশ্বের রহস্যের সন্ধানী? এসব কিছুই আমি নই, তবু আমি বেদান্ত পড়ব, বেদান্ত নিয়ে সবার অধিকারী কেননা আমি যে শাস্ত্র বা প্রতিষ্ঠানিক এইটাই আমার সবচাইতে মহিমান্বিত পরিচয়।

ব্যক্তি-পরিচয়ের অধিকারে আমি না হয় বেদান্ত পড়লাম, বিচার করলাম, কিন্তু যাঁরা দেখি যে এ-জিনিস তখন উপযুক্ত নয়, তাহলেও কি আমি এই শাস্ত্র মেনে চলতে বাধ্য থাকব? বাধ্যতার প্রশ্নটা এলে বিচারের প্রশ্ন অনর্থক এবং যখন রামমোহন বিচারের প্রশ্নটি নীরবে উপস্থাপন করেছেন তখন বুঝতে হবে বাধ্যতার প্রশ্নটিকে তিনি নীরবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি নিশ্চয় ওর দেখেছিলেন যে, নিরঙ্কুশ ঈশ্বরের উপাসনাই তাঁর পক্ষে গ্রহণীয়, কেননা তা উচ্চতর মানসিকতার উপযুক্ত। তাঁর মানে যে ব্যক্তি বিচারের পরে অন্যরূপ সিদ্ধান্তে পৌঁছবেন তাঁর অন্যরূপ উপাসনা করার স্বাধীনতা আছে। প্রথম দিকে রামমোহন এই স্বাধীনতা স্বীকার করেন নি, কিন্তু ব্যক্তি-পরিচয়ের মূল্য যতই বুঝতে থাকলেন ততই ব্যক্তি-স্বাধীনতার মূল্যও মানতে থাকলেন। এই স্বাধীনতার ভিত্তিতে ব্যক্তি কোনটা দর্শন, কোনটা গ্রহণ করবে সেটার উপরে সমাজের চোখ রাঙানি অন্যায়ত, সেটার ভালো কাউকে পীড়ন করা, হীন করা, অসুবিধায় ফেলা তার কাঙ্ক্ষিত কাজে বাধা দেওয়া ইত্যাদি হলো ব্যক্তি-স্বাধীনতার উপরে খবরদারী—এখানে অনুশাসন আচার ঐতিহ্য প্রথা প্রভৃতির চাইতে ব্যক্তির স্বাধীনতাই বড়ো।

কিন্তু স্বাধীনভাবে চলতে চাইলেই মানুষ চলতে পারে না। মনে করা যাক, স্ত্রী যে-রূপে ঈশ্বরের উপাসনা করতে চায়, স্বামী সে-রূপে করতে চায় না। এমন

বেনারসী শাড়ী
ইস্তিয়ান সিল্ক হাউস
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা

অবস্থায় কোন্ স্বামী বলবে স্ত্রীকে, তুমি তোমার মতো করো, আমি আমার মতো করি? বরং এখানে বলা হয়, আমার মতে না চললে তুমি তোমারে খুশীমতো জায়গায় যাও, আমার বাড়িতে এসব চলবে না। স্ত্রী জানে যে তার যাওয়ার জায়গা নেই, তার এমন কোনও অবলম্বন নেই যে, স্বাধীনভাবে চলে সে তার আত্মত্ব রক্ষা করবে। তার স্বাধীনভাবে চলার ইচ্ছেটাকে তাই সে গলা টিপে মারে। রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ', শরৎচন্দ্রের 'পল্লী সমাজ', 'হৈমন্তী' প্রভৃতি উপন্যাসে ও ছোটগল্পে নারীর স্বাধীনতার সঙ্গে জড়িত আর্থিক স্বাবলম্বিতার প্রশ্ন কখনও প্রত্যক্ষ কখনও প্রচ্ছন্নরূপে উপস্থিত। পারিবারিক জীবনে নারীর স্বাধীনতা পদে পদে লঙ্ঘিত হয় প্রধানত এই কারণে যে, সে আর্থিক ব্যাপারে পুরুষের কাছে সম্পূর্ণ অধীন। তেমনই সামাজিক জীবনে রামমোহন দেখেছিলেন যে, কৃষক হলো জমিদারের কাছে সম্পূর্ণ অধীন। আগেকার আমলে জমিদারের বাড়িতে জামাই এলে জামাইকে আদর-আপ্যায়ন করার খরচও চাষীদের দিতে হতো, একে বলত জামাই-কর। জমিদারের বাড়িতে পুজো হবে, তার জন্যে কর দিতে হবে প্রজাকে। একালে যাকে আমরা চাঁদা বলি, সেকালে তা সাধারণত জমিদারেরাই আদায় করত, তাকে চাঁদার বদলে বলত কর। চাঁদার বেলায় জবরদস্তি থাকলেও করের বেলায় কোনও জবরদস্তি ছিল না। জমিদার মহাশয়রা এসব কর কেমন করে আদায় করছেন, তার পরিচয় রবীন্দ্রনাথের রচনাতে সুলভ; এ প্রসঙ্গে মীর মশারফ হোসেনের লেখা 'জমীদার দর্পণ' নাটকটি এক অসামান্য দলিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমালোচনায় রামমোহন বলেছেন যে, আগে চাষের অধিকার থেকে চাষীকে বঞ্চিত করার ক্ষমতা জমিদারের ছিল না, কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জীবনধারণের জন্যে চাষের বা পরিশ্রমের সুযোগ থেকেও চাষীকে বঞ্চিত করার ক্ষমতা জমিদারকে দেওয়া হয়। যে-কৃষক খাটবার সুযোগের জন্যেও জমিদারের উপর নির্ভরশীল, সে কখনও নিজের স্বাধীন মতামতে চলতে পারে না, তার কাছে ব্যক্তির স্বাধীনতা একটা নির্মম রসিকতা।

১৮২২ খৃস্টাব্দে দায়ভাগ-প্রণেতা জীমূতবাহনের কঠোর সমালোচনা করে রামমোহন দাবি করলেন যে, নারীকে সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার দিতে হবে। যদি মেয়েদের একটি কোনও নিজস্ব অবলম্বন থাকে, তাহলে তারা স্বাধীন মতে চলার খানিকটা সাহস পাবে, তার আত্মত্ব এটুকু জোর থাকবে মনে যে, স্বামী যদি স্বাধীন মতামতের অপরাধে তাকে তাড়িয়ে দেয় তাহলে সে চট করে না-খেয়ে মরবে না। তেমনই ১৮৩১ খৃস্টাব্দে রামমোহন হাউস অব কমন্সে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সংশোধন করে কৃষককে জমিতে চিরস্বত্ব দেওয়ার দাবি তুললেন। কৃষক যদি বোঝে যে স্বাধীন মতামতে চলার অপরাধে জমিদার তাকে জমি থেকে উৎখাত করতে পারবে না, তাহলে অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে তো পারবেই না, তাহলে সে স্বাধীন মতামতে চলার জোর পাবে। মুখে ব্যক্তির স্বাধীনতা চাইলেই হয় না, সে স্বাধীনতা হাতে সম্যক রূপে বাস্তবে পরিস্ফুট হয়, তার জন্যে বাস্তব অবস্থা বা অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমালোচনা বঙ্কিমচন্দ্রও করেছেন, কিন্তু তিনি সেখানে এটাকে 'ভুল' বলেছেন, রামমোহন সেখানে এটাকে 'অবিচার' বলেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে এই ভুল বহুদিন ধরে চলে এসেছে বলে তার সংশোধন সম্ভব নয়; পক্ষান্তরে রামমোহনের মতে একটা অবিচার সংশোধনের পক্ষে কোনও বিলম্বই যথেষ্ট বিলম্ব নয়।

লক্ষণীয় যে শুধু মেয়েদের বেলায় আর চাষীদের বেলায় আর্থিক স্বাবলম্বিতার দাবিতে রামমোহন সোচ্চার, পরিবারের বা সমাজের কাঠামোয় আরও যেসব মানুষ আছে, তাদের কথা আলাদাভাবে তিনি বলেন নি। তাহলে কি ধরে নেব যে, অন্যান্যদের জন্যে ব্যক্তি-স্বাধীনতার রক্ষাকবচ প্রয়োজনীয় নয় বলে তিনি মনে করেন? একটু নিখুঁতভাবে চিন্তা করলেই বোঝা যায় যে, এখানে রামমোহন ব্যক্তি-স্বাধীনতার প্রথম ও প্রধান শর্তটির অন্তর্নিহিত সূত্রটিকে শুধু ধরিয়ে দিয়েছেন, দেশভেদে, কালভেদে এই সূত্রের পরিবর্তন হয় না। পারিবারিক জীবনে ও সামাজিক জীবনে যারা সবচাইতে বেশি পরাধীন, তাদেরকেই সর্বাগ্রে আর্থিক স্বাবলম্বিতা দিতে হবে, তাহলেই অপেক্ষাকৃত কম পরাধীনরাও আর্থিক স্বাবলম্বিতা পাবে। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার সামাজিক জীবনে যে-সূত্র খাটে তা বিংশ শতাব্দীর স্বাধীন ভারতেও খাটে আবার একই সূত্র একালের যে-কোনও উন্নত দেশের বেলাতেও খাটে, কিন্তু তখন শুধু 'কৃষকের বদলে 'শ্রমিক' শব্দটি বসিয়ে নিতে হবে। এখানেই রামমোহনের ধীশক্তির পেছনে নিহিত সত্যটির যাথার্থ্য।

অন্তর্নিহিত সূত্রের প্রসঙ্গ থেকে অন্য ধারে আসা এক ঘটনার প্রসঙ্গে। ১৮২৩ খৃস্টাব্দে প্রেস অর্ডিন্যান্স জারি চালু করা হয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বিলোপ করে। এই আইনের প্রতিবাদে রামমোহন লেখেন যে, শাসিতরা নিজেদের অভাব-অভিযোগের কথা প্রকাশ ও সরকারের সমালোচনা সংবাদপত্রের মাধ্যমেই করতে পারে, সুতরাং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বিলোপ করলে জনসাধারণের মতামত জানবার উপায়টি ধ্বংস করা হয়। সরকারের কাজকর্মে জনসাধারণ কণ্ঠক্ষেপ করতে পারে —এই ধারণার ভিত্তি কোন্‌খানে? জনসাধারণের জীবন-সম্পর্কিত বিষয় ও সমস্যাবলী সম্বন্ধে যে চেতনাকে আগে চিহ্নিত করেছি রাজনৈতিক চেতনা বলে, সেইটেই হলো ওই ধারণার ভিত্তি। জনসাধারণের একজন হিসেবে রামমোহন উদ্ঘাটিত ভিত্তির উপরে নিজেই দাঁড়িয়ে এই দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন যে, শুধু তিনি কেন, জনসাধারণের একজন হিসেবে যে-কেউই ওই ভিত্তির উপরে দাঁড়াবার অধিকারী। তার মানে এখানে রাজনীতিতে অংশ নেওয়ার অধিকার উৎসাধিত হলো জনসাধারণের ব্যক্তি-স্বাধীনতা সম্পর্কিত ধারণার থেকে। সোজা বাংলায় কথাটাকে সাজালে কী দাঁড়ায়? প্রত্যেক ব্যক্তিরই যে নিজের স্বাধীনতা বলে একটা স্বাধীনতা আছে সেইটেই প্রমাণিত হয় রাজনৈতিক ব্যাপারে তার মতামত প্রকাশের অধিকার থেকে। যেখানে দেখা যায় যে জনসাধারণের সে-অধিকার নেই, সেখানে ব্যক্তির স্বাধীনতা নেই। তবে মনে রাখা উচিত যে, জনসাধারণের ওই অধিকারের পরিমাণ কতটুকু বা কতখানি, তার সীমানা কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত, সে প্রশ্ন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ১৮৩৭ খৃস্টাব্দে জুরী বিলের প্রসঙ্গে রামমোহন ওই প্রশ্নটিও তুলেছেন : দেশবাসীর মনোভাব ও ভালোমন্দের প্রতি উপেক্ষা করে, দেশবাসীর আকাঙ্ক্ষা, প্রয়োজন-বোধ ও পরামর্শ বিবেচনা না করে কোনও রাজা বা শাসক কোনও আইন দেশবাসীর ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে পারে না। অর্থাৎ জনসাধারণের স্বার্থ দিয়েই শাসকের শক্তি সীমাবদ্ধ—এখানে জনসাধারণের সার্বিক স্বার্থই হলো সর্বকিছুর শেষ কথা।

কথায় কথায় আমরা জনসাধারণের কথায় চলে এসেছি। কিন্তু জনসাধারণ কাকে বলে? ভারতীয় জনসাধারণ বলতে বর্তমান ভারতে বসবাসকারী প্রত্যেক ব্যক্তির সমষ্টিগত একটা সত্তা। কিন্তু 'ভারতীয়' বিশেষণটি বাদ দিলে জনসাধারণের অর্থ বিশ্ব জুড়ে সম্প্রসারিত হয় নাকি? এই প্রসঙ্গে রামমোহনের জীবনের বহু ঘটনার ও বহু অবিস্মরণীয় উক্তির উল্লেখ করার লোভ সামলানো খুবই কঠিন। এখানে মাত্র কয়েকটির উল্লেখ করি। ১৮২১ খৃস্টাব্দে একদিন রামমোহনের নিমন্ত্রণ ছিল ক্যালকাটা জার্নাল-এর সম্পাদক বাকিংহামের বাড়িতে, এঁদেরকে সেদিনই খবর এল, নেপলসের স্বৈরাচারী রাজার ও তাঁর পবিত্র খ্রিস্টধর্মের সৈন্যবাহিনীর শক্তিশালিত আক্রমণে সেখানকার গণ-অভ্যুত্থান ব্যর্থ হয়েছে। এই খবরে রামমোহন এত শোকার্ত হলেন যে, বন্ধুর বাড়িতে নিমন্ত্রণ বাতিল করে চিঠি পাঠালেন, নেপলসবাসীদের উদ্দেশ্য তাঁর নিজেরই উদ্দেশ্য এবং তাদের শত্রু তাঁরও শত্রু। এখানে নেপলসবাসীদের সঙ্গে তিনি নিজেকে কতখানি মনাত্ম করেছেন সেইটে লক্ষণীয়। আবার ১৮২০ খৃস্টাব্দে দক্ষিণ আমেরিকার স্পেনীয় উপনিবেশের স্বাধীনতা পাওয়ার খবরে রামমোহন সমস্ত বাড়ি আলো দিয়ে সাজালেন। এতে কোনও ভদ্রলোক কটাক্ষ করে টিপ্পনি কাটলে রামমোহন জবাবে বললেন, স্বার্থ বা ধর্ম ভাষা দিয়ে বিভিন্ন হলেও তাঁরই মতো মানুষের সুখ-দুঃখে তিনি নির্বিকার থাকতে পারেন না। অন্যের সঙ্গে একাত্ম-বোধের এতটা ক্ষমতা ছিল বলেই ১৮৩১ খৃস্টাব্দে

ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টে রিফর্ম বিল নিয়ে বিতর্ক উঠলে তাঁর একবারও মনে হয়নি যে, এটা ইংরেজদের একান্ত নিজস্ব সমস্যা, তাই স্পষ্ট ভাষায় লেখেন যে শুধু জনসাধারণের স্বার্থে নয়, জনসাধারণের সর্বনাশ করে যে-মুষ্টিমেয় কয়েকজন নিজেদের পকেট ভারী করছে, তাদের হাতে একটা জাতি শিকার হয়ে থাকতে পারে না। একই সময়ে ফ্রান্সের পররাষ্ট্র দপ্তরের সচিবের কাছে তিনি জাতিতে জাতিতে সদ্ভাব ও মৈত্রী জাগাবার উদ্দেশ্যে একটি জাতি-সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দেন, তাতে তিনি বলেন যে, সমস্ত মানবজাতি একটি বিশাল পরিবার। এগুলোর থেকে রামমোহনের অকুণ্ঠনীয় আত্মসম্প্রসারণ-ক্ষমতা অমোঘ রূপেই প্রকাশিত হয়। নিজের দেশের বঞ্চিত ও শোষিত নারী বা কৃষকের সঙ্গে নিজেকে তিনি সমান করে-ছিলেন তো বটেই, তাছাড়াও কত দূর-দেশবাসী, অন্য ভাষাভাষী, অন্য ধর্মাবলম্বীর সঙ্গে নিজেকে প্রসারিত করেছিলেন, তাদের আত্মীয়তে আর, তাদের উল্লাসে উল্লসিত হয়েছিলেন, সেইটেই এখানে . অনুধাবনার বিষয়।

বলা বাহুল্য, এভাবে আধুনিকতার মূল লক্ষণগুলোর তালিকার সঙ্গে মিলিয়ে রামমোহনের জীবন ও রচনার থেকে দৃষ্টান্তের সংখ্যা আরও অনেক বিস্তৃত ও বিশদ করা যায়। তা করার প্রয়োজন নেই, কেননা আমার অভিপ্রায় হলো রামমোহনের মতো ব্যক্তির মূল্যায়ন করার কয়েকটি পদ্ধতির ইঙ্গিত দেওয়া। প্রথমে বলেছি, রামমোহনের জীবনী অনুসারে আধুনিক-তার ধারণাগুলোকে গড়ে তোলার পদ্ধতির কথা, পরে আধুনিকতার লক্ষণগুলো অনুসারে রামমোহনের জীবনের আদর্শ-গুলি বা তাঁর জীবনসাধনাকে পরিমাপ করার পদ্ধতির কথা বলেছি।

আরও দুটি পদ্ধতি সর্বজনজ্ঞাত : একটি স্থানগত বিচারের, অন্যটি কালগত বিচারের পদ্ধতি। এখানে স্থানগত মানে যে ভৌগোলিক আর কালগত মানে যে ঐতিহাসিক, সেইটে সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু এই দুটি পদ্ধতি শুনতে যত সরল, প্রয়োগের বেলায় তা নয়, কেননা তখন দেখা যায় যে, পদ্ধতি দুটির স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা খুবই কঠিন, একটি প্রশ্নের অনুষঙ্গে আরও অনেক প্রশ্ন মাথা তুলে দাঁড়ায়।

প্রথমে স্থানগত বিচারের কথা বলি। কারও কারও বিচার হয় একটি ছোট জায়গার পরিপ্রেক্ষিতে, কারও হয় আর একটু বড়ো জায়গার পরিপ্রেক্ষিতে, কারও হয় আরও বড়ো বা গোটা পৃথিবীর পরি-প্রেক্ষিতে। বাংলার বাঘ আশুতোষের কথাই ধরা যাক : সন্তবত তিনিই বিশ্বের প্রথম ছাত্র-আন্দোলনের নেতা, কিন্তু তাঁর যেটা বিশেষ মূল্য সেটা সাধারণভাবে বাংলার ভৌগোলিক সীমানাতেই আবদ্ধ। সাহিত্যি-কের মূল্য অধিকাংশ সময়েই বহুলাংশে ভৌগোলিক, যেমন ঈশ্বর গুপ্ত কিংবা দীনবন্ধু মিত্রের মূল্য, কিন্তু আধুনিক ভারতীয় কথাসাহিত্যের প্রথম কারুরূপে বঙ্কিমচন্দ্র সমগ্র ভারতেই সম্মানিত। পক্ষান্তরে সাহিত্যিকের পরিচয়েই রবীন্দ্র-নাথ বিশ্ববিখ্যাত। গোপালকৃষ্ণ গোখলে, বালগঙ্গাধর তিলক প্রভৃতির নাম রাজ-নীতিবিদ হিসেবে মহারাষ্ট্রের বাইরে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে পরিচিত, কিন্তু জাতীয়তা-বাদী আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে যাঁরা প্রথম প্রাণ দিয়েছিলেন সেই বাসুদেও বলবন্ত ফাদকে, দামোদর চাপেকার প্রভৃতির খ্যাতি প্রাদেশিক গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ থেকেছে। আবার গান্ধী, সুভাষচন্দ্র, জবাহরলাল প্রভৃতির নাম গোটা বিশ্বের কাছে পরিচিত।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, ব্যক্তির ভৌগোলিক পরিচয়ের তিনটি বিভাগ থাকা সম্ভব : অঞ্চল বা প্রদেশভিত্তিক, দেশভিত্তিক, আর, বিশ্বভিত্তিক। এই তিনটি বিভাগ অনুসারে রামমোহনের মূল্যায়ন করা যেতে পারে।

জ্ঞানচর্চার বাহন হিসেবে বাংলা গদ্যের ব্যাপক প্রয়োগ রামমোহন প্রথম করেছেন বলেই তাঁকে বাংলা গদ্যের জনক বলি। কিন্তু বাংলা গদ্যের উদ্ভবের যে তাৎপর্য তা বাংলার বাইরে হয় নগণ্য নতুবা মূল্য-হীন। আর একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় : বাংলার উচ্চাঙ্গ বা শাস্ত্রীয় সংগীতের চর্চা ধনিক সম্প্রদায়ের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল, তারাই ছিল ওই সংগীতের শ্রোতা ও পৃষ্ঠপোষক, সংগীত-শিল্পীরাও যে জীবনযাপন করত তার সঙ্গে সাধারণ-মানুষের জীবনের মিল বা যোগাযোগ ছিল না এই উচ্চাঙ্গ সংগীতকে ধনীর বিলাস-মহলের বন্দীত্ব থেকে মুক্তি দিলেন রামমোহন, বাংলাভাষায় শাস্ত্রীয় রাগরাগিণী অনুসারে গান রচনা করলেন, এসব সংগীতের শিল্পী ও অভিপ্রেত শ্রোতা উভয়েই খেটে-খাওয়া সাধারণ মানুষ বা তাদেরই সমপর্যায়ভুক্ত। এ-দুটি ক্ষেত্রে রাম-মোহনের যে-অবদান বাংলার ভৌগোলিক সীমানার মধ্যেই তার মূল্য, বাংলার বাইরে তার মূল্য বোঝা যাবে না। রামমোহনের এরকম আরও বহু অবদানের তাৎপর্য ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের পক্ষে গুরুত্ব-হীন, কিন্তু বাংলাতে সে-সবের অসীম গুরুত্ব।

আবার রাজনৈতিক চেতনার জনদাতা ও রাজনৈতিক অধিকারের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে রামমোহনের যে-তাৎপর্য একান্ত-রূপেই তা সর্বভারতীয়। এর যথার্থ তাৎ-পর্য বোঝার জন্যে ইতিহাসের দিকে একটু দৃষ্টিক্ষেপ করা দরকার। আমরা যাদেরকে ভারতীয় বলি, তাদের অধিকাংশই একদা গণ্য হতো বিদেশী বলে, এরকম বহু বিভেদাগত জনধারা মিলে-মিশে গঠিত হয়েছে একালের ভারতীয় জনসাধারণ। ভারতীয় বর্ষ গণনার হিসাবকে অকাট্য বলি নটে, কিন্তু শকরাও ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমানার বাইরে থেকেই এদেশে এসেছিল এবং প্রথমদিকে তারা বিদেশী আক্রমণকারী হিসেবে তৎকালীন ভারতীয়দের প্রচণ্ড সামরিক বাধার সম্মুখীন হয়েছিল। তারপর একটা যুগ এল যখন বিদেশীরা আসতে শুরু করল নিজেদের লিপিবদ্ধ সহজ সুস্থ ধর্মনিয়ে, এদের মধ্যে তুর্কী আরবী ইরানী আফ-গানী নানা জাতির মানুষ ছিল বটে, কিন্তু ধর্মীয় সমতার জন্যে এদের সবাইকেই চিহ্নিত করা হলো মুসলমান বলে। কাল-ক্রমে মুসলমানরাও ভারতবর্ষে বসবাস করতে করতে ভারতীয় হলো। ভারতীয় সংস্কৃতি পরিণত হলো হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতির যোগফলে। হাউস অব কমন্সে রামমোহন যে-সাক্ষ্য দিয়েছিলেন তাতে দেখা যায়, ভারতীয় বলতে যে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কেই বোঝায় আর ভারতীয় সংস্কৃতি বলতেও যে হিন্দু-সংস্কৃতি ও মুসলিম সংস্কৃতি দুরকম সংস্কৃতিকেই বোঝায় এই ধারণাটা তাঁর কাছে খুবই স্পষ্ট ছিল, এবং ভারতীয় বলতে যাতে শুধু হিন্দু না বোঝায়, সে-বিষয়েও তিনি ছিলেন সর্বদা সতর্ক। হিন্দু যুগের মতোই মুসলিম যুগও সম্পূর্ণরূপে

প্রকাশিত হল

বর্ষপঞ্জী ১৩৭৯

(২৬শ সংস্করণ)

দেশ বিদেশের সকল তথ্যে পূর্ণ বাংলা ভাষায় একমাত্র 'ইয়ার বুক'

গত ২৬ বছর ধরে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। গুণ আছে বলেই বর্ষপঞ্জী এই দীর্ঘকাল ধরে সকলের সমাদর লাভ করছে। চলতি দুনিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখতে হলে বর্ষপঞ্জী চাই-ই। এই সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ : ঃ—পশ্চিমবঙ্গ ও অন্যান্য রাজ্যে সাম্প্রতিক নির্বাচনের যাবতীয় তথ্য, ১৯৭১ সালের সেন্সাস, পঃ বঙ্গের সকল মন্ত্রীর পরিচয় এবং

॥ বাংলাদেশ সম্পর্কে বৃহৎ তথ্যবহুল বিভাগ ॥

দৃঢ় বোর্ড বাঁধাই, ৮০৮ পৃষ্ঠা, মূল্য ৮ টাকা, ডাকমাশুল স্বতন্ত্র

এডভান্সসহ এখনি আপনার অর্ডার পাঠান

প্রকাশক : এস, আর সেনগুপ্ত অ্যান্ড কোম্পানি

৩৫ ঐ, গোয়াবাগান লেন, কলিকাতা-৬ । ফোন : ৩৫-৪৭১৭

ভারতবর্ষের স্বাধীনতার কাল। মুঘল আমলের কথাই ধরা যাক। বিদেশী হিসেবেই বাবর এসেছিলেন ও ভারতবর্ষে শক্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন—এক পুরুষে কারও পক্ষে পুরোপুরি স্বদেশী বনে যাওয়া সম্ভব নয়—এই অনুমানের উপর ভিত্তি করে একথাও বলা যায় যে, তাঁর বংশধরদের সম্বন্ধে ভারতীয় কথাটি প্রয়োগ করা যায় বটে, কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে যায় না, তিনি বিদেশী বাদশাহরূপেই জীবন কাটিয়েছিলেন। তার মানে বাবরের আমলকে বিদেশী শাসনের আমল বলে অনায়াসে মেনে নেওয়া যায়। লক্ষণীয় যে সেই সাক্ষাৎ একজন বিদেশী কর্তৃক শাসনের সময়ও রাষ্ট্রীয় শক্তির কেন্দ্র ছিল ভারতবর্ষের মাটিতেই। ব্রিটিশদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার আগে পর্যন্ত বরাবরই এখানকার ভৌগোলিক সীমানার মধ্যেই রাষ্ট্রীয় শক্তি বিধৃত থেকেছে। কিন্তু কোম্পানীর শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই রাষ্ট্রীয় শক্তির কেন্দ্রটি স্থানান্তরিত হলো ইংলণ্ডে। বিভিন্ন সূত্রে যেসব শিক্ষিত ইংরেজরা ভারতবর্ষে এসেছিলেন, তাঁদের কেউ কেউ এখান থেকেই সংবাদপত্র প্রকাশ করতে শুরু করেছিলেন। সেসব সংবাদপত্রের কোন কোনটিতে কোম্পানী শাসনের সমালোচনাও প্রকাশিত হতো। তখন ইংলণ্ডে অবস্থিত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলী ওইরকম সমালোচনার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে এই যুক্তিতে যে, ভারতবর্ষে বসবাসকারী যেসব ইংরেজ ভারতবর্ষ থেকে প্রকাশিত ইংরেজী সংবাদপত্রে সরকারের সমালোচনাতে রত, তারা বুঝতে পারছেন না যে, রাষ্ট্রীয় নীতিগুলো নির্ধারণ করা হয় ইংলণ্ড থেকে, সুতরাং ইংলণ্ড থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলিতে ওইরকম সমালোচনা করা যেতে পারে, এবং ভারতীয় সংবাদপত্রে তা করা অন্যায়। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় শক্তির কেন্দ্র যে ভারতবর্ষের মাটি থেকে ইংলণ্ডের মাটিতে স্থানান্তরিত হয়েছে—এ-সত্যটাকে তলিয়ে দেখা দরকার। এর ফলে ভারতীয় জীবনে এক অভূতপূর্ব শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে। রামমোহন সেই শূন্যতাকে পূরণ করলেন ভারতবর্ষে রাজনৈতিক চেতনা সৃষ্টি করে। তিনি যে রাজনৈতিক চেতনা সৃষ্টি করলেন, তার তাৎপর্য বাংলাকে ছাপিয়ে গেল, তা ছড়িয়ে পড়ল গোটা ভারতবর্ষে, কিন্তু ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমানাকে ছাপিয়ে তো গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ল না। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে শাসনতান্ত্রিক আদর্শে রাজনৈতিক চেতনাকে প্রকাশ করার যে-ধারা তিনি প্রবর্তন করেন মূলত তা-ই অসিদ্ধিসহভাবে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অনুসৃত হলো। এখানে রামমোহনের যে-অবদান আর তাৎপর্য নির্ণীত হবে গোটা ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতেই—শুধু বাংলার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর বিচার করতে গেলে সে-অবদানকে যেমন খাটো করা হবে, তেমনই বিরাট বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে তা বিচারের চেষ্টাও হাস্যকর হয়ে দাঁড়াবে।

রামমোহনের কাজ ও চিন্তার থেকে এরকম দৃষ্টান্তই সবচাইতে বেশি, যেগুলোর তাৎপর্য সমস্ত ভারতবর্ষের পক্ষেই বিচার্য। হাউস অব কমন্সের কাছে তিনি আইন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে যেমন মতামত দেন ও সমালোচনা করেন, তার সাকুল্য তাৎপর্যই সর্বভারতীয়। তাঁর সে-বিশ্লেষণের মধ্যে একটি ধারণা পুনঃ পুনঃ আবৃত্ত হয়েছে—ভারতের এক এক অঞ্চলের জন্যে এক এক রকম আইন বিচারের পথে যেমন বাধা ও সমস্যা সৃষ্টি করে, তেমনই কি ইয়োরোপের, কি ভারতবর্ষের বংশোদ্ভূত, কি হিন্দু বা ইসলাম বা খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী, এসব বিবেচনাও নীতিবিরুদ্ধ—ভারতবর্ষের সমস্ত অঞ্চলের জন্যে এবং ভারতবর্ষে বসবাসকারী সমস্ত মানুষের জন্যেই চাই সমতাযুক্ত ও সংগতিপূর্ণ আইন। আবার বিজ্ঞান শিক্ষার আহ্বায়করূপেও আমরা রামমোহনকে দেখতে পাই। বিজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্যের কথা আগে বলেছি। কিন্তু উদ্দেশ্য আর আদর্শ এক জিনিস নয়। এক কথায় বিজ্ঞান শিক্ষার আদর্শ কী? উত্তর—পড়ে-পাওয়া সত্যকে নির্বিচারে গ্রহণ না করে নিজের বিদ্যাবুদ্ধি দিয়ে বিচার করে বর্জন বা গ্রহণ করা। পরবর্তীকালে এরূপ শিক্ষার জয়গান করে প্রমথ চৌধুরী বলেছেন যে, পড়ে-পাওয়া চৌদ্দ আনার চাইতেও নিজের-রোজগার-করা দু আনার মূল্য বেশি। যে-ভারতবর্ষ গুরুবাদী শিক্ষার আদর্শে আচ্ছন্ন, সেখানে রামমোহন বৈজ্ঞানিক শিক্ষার আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। সর্বভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে মূল্যায়ন এরকম আরও বহু রামমোহনের অবদানের উল্লেখ করা যায়। এসব ক্ষেত্রেই রামমোহন আধুনিক ভারতবর্ষের যথার্থ জনক। প্রসঙ্গত আর একটি দৃষ্টান্ত নিষ্প্রয়োজন। পরবর্তীকালে মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে, দাদাভাই নৌরজি ও বিশেষত রমেশচন্দ্র দত্ত যে-ইকনমিক ডেভলপমেন্ট থিয়োরী বা দেশীয় সম্পদের বহিঃস্রাবের তত্ত্ব বিশদরূপে উপস্থাপন করেন তার গুরুত্ব রামমোহনই আবিষ্কার করেন।

ভারতবর্ষের সম্পদ বাইরে চলে যাচ্ছিল এটা যেমন সত্যি, তেমনই রামমোহনের অবদানগুলির কোন-কোনটির তাৎপর্যও বাইরের পৃথিবীর পক্ষে সত্যি। এর স্বপক্ষে পরোক্ষ প্রমাণ হলো, যে-স্পেনীয় বোরবঁ রাজবংশের সংবিধান বলে পরিচিত তা উৎসর্গ করা হয় রামমোহনের উদ্দেশে। যেকালে এক দেশ থেকে আর-এক দেশে যাতায়াত করা ছিল দুঃসাধ্য ও দুঃসাহসিক সেই তখনকার দিনে তাঁর আচরণ ও রচনাবলীর তাৎপর্য এতই দূরপ্রসারী হয় যে তাতে হাজার হাজার মাইল দূরবিস্তৃত নিপীড়িত মানবতার এক অংশ পেয়েছিল গভীর প্রেরণা এবং স্বাধীনতাকামীদের যে-উৎসর্গ প্রকৃতপক্ষে রামমোহনের থেকে পাওয়া প্রেরণারই স্বীকৃতি। পৃথিবীর যে-প্রান্তেরই অধিবাসী হোক না কেন, যার মুখ্য পরিচয় মানুষ হিসেবে মহিমান্বিত, তারই অধিকার রয়েছে স্বাধীনতা ও স্বাবলম্বিতায়—এই ভাবসত্যের মূল্য সমগ্র বিশ্বেই সমান। ধর্ম, ভাষা ও সুরঙ্গ নিয়ে বিচ্ছিন্ন হলেও যারা স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে মুক্তির সংগ্রামে ব্যাপৃত, তারা শেষপর্যন্ত জয়ী হবেই—রামমোহনের এই ঘোষণার অন্তর্নিহিত সত্য কোনও বিশেষ দেশের ভৌগোলিক সীমানায় আবদ্ধ থাকতে পারে না, তা সমস্ত বিশ্বের তাবৎ স্বাধীনতা-সংগ্রামীদেরই পরম প্রেরণা। আন্তর্জাতিক মৈত্রী, সদ্ভাব ও শান্তি রক্ষার জন্যে রামমোহন কংগ্রেস অব নেশনস বা জাতি-মহাসভা সংগঠনের যে-পরিকল্পনা করেন, তারও তাৎপর্য একান্তরূপেই বিশ্বভিত্তিক। শক্তিমানদের পদলেহনকারীর ধারণা জন্মায় যে, সমস্ত উচ্চ ও উদার চিন্তাগুলো শক্তিমানদের দেশ থেকে এদেশে আমদানি হয়েছে। এপ্রসঙ্গে রামমোহন ও ইংলণ্ডের যুক্তিবাদী দার্শনিক জন স্টুয়ার্ট মিলের অবস্থান খুবই কৌতূহলোদ্দীপক—ভারতবর্ষের এক অন্ধকারাচ্ছন্ন পর্বে বাংলার এক অজ পাড়াগাঁয়ে রামমোহনের জন্ম আর মিলের জন্ম, ইংলণ্ডের সবচাইতে আলোকোজ্জ্বল পর্বে দুনিয়ার এক নম্বর মহানগরীতে অর্থাৎ মিল যেমন অস্বাভাবিক ভৌগোলিক সুবিধার অধিকারী ছিলেন তেমনই রামমোহন ছিলেন বিপরীত প্রতিবেশে পর্যুদস্ত। কিন্তু নারীর মুক্তি প্রসঙ্গে মিল-এর রচনায় এমন যুক্তির দেখা মেলে না যার পূর্বচ্ছায়া একই প্রসঙ্গে রামমোহনের রচনায় নেই; প্রতিনিধিস্থলীয় সরকারের প্রসঙ্গে দুজনের রচনায় শুধু ভাবগত সাদৃশ্যই চোখে পড়ে না, তার সঙ্গে বহু স্থলেই শব্দগত, এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে ভাষাগত, সাদৃশ্যও চোখে পড়ে। ঐতিহাসিক দলিল-দস্তাবেজের অভাবে প্রমাণ করা কঠিন যে মিল কোনও ভাবে রামমোহনের ভাবধারায় প্রত্যক্ষ রূপে প্রভাবিত হয়েছিলেন কিনা, তবে এইটে তো স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে নারীর মুক্তি আর শাসকের ক্ষমতার সীমার প্রসঙ্গে রামমোহনের ধারণাগুলির তাৎপর্য ইংলণ্ডের পক্ষেও মূল্যবান। এসব ক্ষেত্রে রামমোহনের বিচার শুধু ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে সম্ভব নয়, তাঁর অবদানের মূল্যায়ন এখানে করতে হবে সমগ্র বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে।

এই যেমন গেল স্থানগত বা ভৌগোলিক মানদণ্ডে বিচারের পদ্ধতি তেমনই আছে কালগত বা ঐতিহাসিক মানদণ্ডে বিচারের পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে ইতিহাসে কোন ব্যক্তির স্থান কোন ব্যক্তির অপেক্ষা আগে বা পরে সে প্রশ্নটা ঘুরে ফিরে আসে এবং এজন্যে এতে বিচার্য ব্যক্তির স্থান কোন কোন ক্ষেত্রে সবার প্রথমে অথবা বহুকালের ব্যবধানে নির্ণয় করা যায় সেইটে খোঁজার দিকে ঝোঁক বেশি পড়ে। একটা দৃষ্টান্ত দিই। ধর্মীয় সত্য যে শুধুই হৃদয়োপলব্ধির বস্তু নয়, বিচারপ্রবণ মননও

বা কৃষ্টি নিয়েও অনুধাবন করার বস্তু এই ধারণার প্রথম অসংকোচ প্রকাশ দেখি বুদ্ধদেবের জীবনে. তারপরের প্রায় সওয়া দু হাজার বছর ধরে চলল অনুশাসন, আইন-বিধান, প্রথা ইত্যাদি মেনে অথবা ঐকান্তিক ভক্তির পথে ধর্ম-সাধনার সুদীর্ঘ পর্যায়. আমার রামমোহনে এসে ধর্ম-সাধনা লাভ করল যুক্তি-বাদিতার ভিত্তি। এখানে ভালো-মন্দের প্রশ্ন তোলা অনর্থক. সে-প্রশ্ন ওঠে আধুনিকতার মানদণ্ডে বিচার করার সময়. কিন্তু ঐতিহাসিক মানদণ্ডে ব্যক্তির তুলনা-মূলক বা আপেক্ষিক স্থান নির্দেশ করাটাই বড়ো কথা।

অবিরাম বিকাশশীল মানবিকতার অধিকারী মানুষের সম্বন্ধে ধারণা অথবা মানুষকে জাত-কুল-সম্প্রদায় ইত্যাদির থেকে নিরপেক্ষরূপে, নিতান্তই মানুষ-রূপে, একেবারে মর্ত্যের মানুষরূপে মূল্য দেওয়ার কোনও ধারা ভারতবর্ষে আগে ছিল না, মানুষ তথা ব্যক্তি সম্পর্কিত এক অভিনব মূল্যবোধের প্রবক্তা ও প্রবর্তক রামমোহন। দিব্য প্রতিভার অধিকারীদের রচনা বলে যা এতকাল মূল্য পেয়ে এসেছে সেগুলির যথার্থ বিচারের অধিকারী প্রত্যেক ব্যক্তিই—এই প্রতীতির জন্মদাতাও রামমোহন। সুস্থ মানুষ হিসেবেই যে আমি অসামান্য মূল্য ও মর্যাদার অধিকারী —একথা রামমোহনের আগে কেউ আমাকে বলেননি। আমি প্রজা হলেও মানুষ হিসেবে আমি রাজার সমান। আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে নইলে দেশের রাজার সঙ্গে মিলব কী সূত্রে? উন্নিখিত সূত্রে আমরা মানে জন-সাধারণ রাজনীতিতে অংশ নেওয়ার যতটাই অধিকারী যতটা রাজার. ঠিক ততটাই অধিকারী। হাজার হাজার বছর ধরে আমরা ইহকালের ও পরকালের বহু লঘু-গুরু বিষয়ে গভীর চেতনার পরিচয় দিয়ে এসেছি, কিন্তু শক্তি-সমষ্টি বা জনসাধারণের জীবনসম্পৃক্ত প্রত্যক্ষ বিষয়গুলিতে চেতনার অর্থাৎ রাজনৈতিক চেতনার পরিচয় দিইনি —জনসাধারণের জন্যে রাজনৈতিক চেতনা রামমোহনই সর্বপ্রথম ভারতীয় ইতিহাসে জাগালেন।

কিন্তু সমস্ত ঐতিহাসিক ঘটনা বা অবদানেরই আবার দুরকম তাৎপর্য থাকে : একটা তাৎক্ষণিক তাৎপর্য, অন্যটি হলো তাৎক্ষণিক ও দীর্ঘকালীন বা চিরন্তন তাৎপর্যের সমন্বয়ে গঠিত তাৎপর্য। প্রথম তাৎপর্যের স্থান শুধু ঐতিহাসিক বর্ণনার পুঁথির পাতায় নিষ্প্রাণ অক্ষরে, সেখানেই একটা নির্দিষ্ট সময়ের গণ্ডিতে নিঃশেষিত হয় তার সার্থকতা অর্থাৎ সেই অবদানে পরবর্তী প্রজন্মগুলির আর কোনও প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু অন্য বা দ্বিতীয় তাৎপর্যে বিকৃত অবদানের স্থান নির্ধারিত হয় ইতিহাসের প্রবহমান ধারায়, সেই ধারায় নতুন নতুন প্রয়োজন মেটাবার সামর্থ্য থাকে, যেমন অবদানের অতীত থেকে ভবিষ্যতের দিকে তার অবিরাম গতি এবং পরবর্তী প্রজন্মগুলি জ্ঞাতসারে হোক বা অজ্ঞাতসারে হোক সেই অবদানগুলিকে ক্রমাগত বিনিয়োগ করতে থাকে তাদের বিকাশশীল পরিবর্তমান জীবনচর্যাতে।

বলা বাহুল্য ইতিহাসে নতিস্বীকার আমরা জানিই, তবু যে সতীদাহ নামক হিন্দু সামাজিক প্রথাটি নিবারণের জন্য রাম-মোহনের আগে আরও অনেকে সচেষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু সে-সবই ছিল বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত প্রয়াস—এমনকি শ্রীরামপুরের মিশনারীরাও যে উদ্যোগ নিয়েছিলেন তা বিশেষ এলাকায় বিশেষ অন্তেবাসীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এই সত্যটি মনে রাখলে বুঝতে পারব যে, সতী-দাহ নিবারণে রামমোহনের অনন্যতা কোথায়। কোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের মতো রামমোহন সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে অভিমত দিয়েই নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকেননি, তিনি এগিয়ে এসেছিলেন জনসাধারণের মানসে উক্ত প্রথার বিরুদ্ধে অভিমত গড়ে তোলার জন্য আন্দোলন সংগঠনে। সতীদাহের বিরোধী-দের মধ্যে তাঁর স্থান সকলের আগে নয়, কিন্তু তিনি ওই প্রথার বিরোধী আন্দোলনের প্রথম সংগঠক বটে।

দৃঢ় অর্থে সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে রামমোহন আন্দোলন শুরু করেন ১৮১৮ খৃস্টাব্দে এবং তাঁরই আন্দোলনের ফলে ১৮২৯ খৃস্টাব্দে লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক মানবে খুন করার সমপর্যায়ভুক্ত অপরাধ হিসেবে এই প্রথা আইনত সম্পূর্ণ বিলোপ করেন। অতএব আন্দোলনটির আয়ুষ্কাল হলো দশ বছর। এর পরে সতীদাহের ঘটনা এতই কমে যায় যে, তা স্বতন্ত্র উল্লেখ করার দরকার নেই। রক্ষণশীল হিন্দুরা ওই আইনের প্রত্যাহার করার জন্যে ইংলণ্ডে আবেদন করলে রামমোহন আবার সক্রিয় হয়ে ওঠেন সাময়িকভাবে, কিন্তু রক্ষণশীল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করার জন্যে এবার তাঁকে কোনই বেগ পেতে হয়নি। আপাতদৃষ্টিতে রামমোহন যতগুলি আন্দোলন শুরু করে-ছিলেন তার মধ্যে সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনটিই সবচাইতে সার্থক, কেননা এখানে তাঁর উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপেই সিদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে যে, যখন থেকে সতীদাহ প্রথা আইনত নিষিদ্ধ হলো তখন থেকে এই আন্দোলনের তাৎপর্যও নিঃশেষ হয়ে গেল, সমস্ত ব্যাপারটাই হয়ে উঠল ইতিহাসের পাতার নিবন্ধ সমাজ সংস্কার আন্দোলনের এক চমকপ্রদ নিদর্শন। পরের প্রজন্মগুলি ক্রমশ সতীদাহ প্রথাটির কথাই বিস্মৃত হতে থাকল—কিন্তু এটা শুধু বিস্মৃতির কথা নয়, কেননা বিলুপ্ত প্রথার সম্বন্ধে কৌতূহলের নিবারণই হলো সংগত ঘটনা। ভারতীয় সংস্কৃতির পক্ষে অত্যন্ত কলঙ্ক-জনক একটা ব্যাপারকে কে আর বাঁচিয়ে রাখতে চায়?

সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনের উদ্দেশ্য-সিদ্ধিই একে এখনকার বা একালের জনসাধারণের কাছে তাৎপর্যহীন, অনাবশ্যক, সম্পূর্ণ জীবনে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক. যুগ, কীর্তিদক্ষ ইতিহাসের জীবন্তপ্রতিবীদের বিতর্কের বিষয়ে পরিণত করেছে। কিন্তু উদ্দেশ্য-সিদ্ধির সঙ্গে আন্দোলনের গভীর পার্থক্য বিদ্যমান। সতীদাহ নিবারণের উদ্দেশ্যে রামমোহন নারী-মুক্তির যে আন্দোলন উপস্থাপন করেছিলেন সেই আন্দোলনের কোনও মূল্যহ্রাস হয়েছে কিনা সেটাই বিচার্য বিষয়।

এমনই একটি আদর্শ বা সূত্রের কথা এখানে বলা যায়। মূলত সম্পত্তি-ঘটিত বা সম্পত্তির সঙ্গে জড়িত বহুকালের বহু-বিধ অভ্যাস, আচার, সংস্কার ইত্যাদির ফলেই নারীর স্থান নির্ধারিত হয়েছে পুরুষের পেছনে, কিন্তু ব্যক্তির বিকাশের উপযোগী বা অনুকূল পরিবেশ পেলে নারী মননের ক্ষেত্রে ও নান্দনিক সম্পাদনের ক্ষেত্রে পুরুষের সমকক্ষতা অর্জন করতে পারে, কেননা মানসিক ক্ষমতা ও সামাজিক যোগ্যতা নারী ও পুরুষ দুজনেরই সমান। এবিষয়ে রামমোহন ও জন স্টুয়ার্ট মিলের বক্তব্য ও যুক্তির মধ্যে বিস্ময়কর সাদৃশ্যের কথা আগেই বলেছি। এখানে প্রসঙ্গ থাকে যে, নারীর মূল্য ও মর্যাদার প্রসঙ্গে রাম-মোহনের স্থান নিশ্চিতভাবেই মিল সাহেবের আগে, তদুপরি আজ যখন ইস্কুল-কলেজের পরীক্ষার ক্ষেত্র থেকে রাজনৈতিক নেতৃত্বের ক্ষেত্র পর্যন্ত নারীর মূল্য ও মর্যাদা সেই কাদম্বিনী গাঙ্গোপাধ্যায়ের আমল থেকে ইন্দিরা গান্ধীর আমল পর্যন্ত বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে এসেছে তখন রামমোহন কর্তৃক প্রস্তাবিত সূত্র কতখানি অধিকতর তাৎপর্যময় হয়ে উঠছে। এসঙ্গে আরও লক্ষণীয় যে বহুলের বিপরীত প্রমাণ সত্ত্বেও নারীর প্রতি পুরুষের সাধারণ মনোভাব আজও হেয়সূচক। আশা করা যায় যে, এই মনোভাব ভবিষ্যতের কোনও একদিন অধিকাংশের মন থেকে দূর হবে, কিন্তু যতদিন না তা হচ্ছে ততদিন নারীর অধিকার ও স্বাধীনতা সম্বন্ধে রামমোহনের ধারণাগুলির মূল্য পূর্ণমাত্রায় বজায় থাকবে এবং ততদিন, আমরা হয়তো বা না-জেনেই, রামমোহন-কল্পিত প্রবর্তক ও নিবর্তক চরিত্র দুটির মতো তর্ক আর তর্কের সময় ওই দুটি চরিত্রের বক্তব্যেরই পুনরাবৃত্তি করে যাব।

তাৎক্ষণিক তাৎপর্যের আর একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। ১৮২৩ খৃস্টাব্দে লর্ড আমহার্স্টের কাছে যে রকম শিক্ষার জন্য রামমোহন চিঠি লিখেছিলেন সে-রকম শিক্ষার ব্যবস্থা তাঁর জীবদ্দশাতে সম্পন্ন হয়নি বটে, কিন্তু অন্তত আস্তে আস্তে তা সম্পন্ন হয়েছে—এই শিক্ষাকে সরলীকৃত করে সাধা-রণত ইংরেজী শিক্ষা বলা হয়, যদিও

সে-সময় শিক্ষা তখন পর্যন্ত যেন ইংলণ্ডেই পুরোপুরি চালু হয়নি। এতে কোনও সন্দেহ নেই যে, উনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় তথা ভারতবর্ষে যে জাগরণ হয় তা বিশেষ-ভাবে ইংরেজী শিক্ষারই সুফল, এবং এজন্যে ইংরেজী শিক্ষার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা অসীম। কিন্তু আমাদের পরিস্থিতিকে যদি গভীরভাবে বিশ্লেষণ করি তাহলে বুঝব যে ওই শিক্ষা আমাদের সমস্ত জাতিক উন্নতিসাধনের পক্ষে আর পর্যাপ্ত নয়, বরং ওই শিক্ষার সঙ্গে জড়িত নানাবিধ সংকট আমাদের সমাজ-জীবনে ক্রমশই দুর্লক্ষ্য হিসেবে পরিস্ফুট হচ্ছে। এখন যে-রকম শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিচ্ছে আজ, আর যা-ই বলা যাক, কোন-মতেই ইংরেজী শিক্ষা বলা যাবে না। মোটা-মুটিভাবে তথাকথিত ইংরেজী শিক্ষার পক্ষে নতুন ফসলে আমাদের সমাজ-জীবনকে যতখানি সমৃদ্ধ করা সম্ভব ছিল ততখানি করেছে এবং এই ফসলের কাল হিসেবে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্ন থেকে বিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্ন পর্যন্ত এরূপ বছরের আলাদা চিহ্নিত করতে পারি। সুতরাং উল্লিখিত শিক্ষাকে আমাদের জন্যে রাম-মোহনের যে-অবদান তা তাৎপর্যও উল্লিখিত সময়ের সীমানাতেই আবদ্ধ। সতীদাহ প্রথা নিবারণের সঙ্গে তথাকথিত ইংরেজী শিক্ষার আমাদের পার্থক্য এই যে প্রথমোক্ত বিষয়ে রামমোহনের অবদানের মূল্য দশ বছরের হিসেবে আর শেষোক্ত বিষয়ে একই মূল্য একশ বছরের হিসেবে নির্ণীত হবে।

কিন্তু রামমোহন যে-রকম শিক্ষা প্রবর্তনে উদ্যোগী হয়েছিলেন তার বাইরের লক্ষণগুলোকে উপেক্ষা করে ভিতরের বৈশিষ্ট্যকে খুঁজতে গেলে কী দেখি? এই শিক্ষার ভিতরের কথা হলো ব্যক্তি তার নিজের বুদ্ধি বিবেচনা ও সন্ধানবৃত্তিকে প্রয়োগ করে সত্য অর্জন করবে। এখানে এসে পড়ছে ব্যক্তির সম্বন্ধে এক নতুন ধারণা ও সেই ধারণা অনুসারে ব্যক্তির নতুন অধিকারের প্রশ্ন। শুনলে যদিও মনে হয় যে, ব্যক্তির অধিকার আর ব্যক্তিগত অধিকার একই জিনিস তবু এ-দুটি একই জিনিস তো নয়ই, উপরন্তু পরস্পর-বিরোধী। একটু খুলে বলি। ব্যক্তিগত অধিকারের সঙ্গে অনিবার্যভাবে মিশে থাকে বংশগত, জাতি-গত, কুলগত প্রভৃতি জন্মের সূত্রে পাওয়া কতকগুলি অধিকার—যেমন ব্রাহ্মণ বংশে জন্মালে উপবীত ধারণের যে অধিকার জন্মায় তা ব্যক্তিগত অধিকার কিংবা কোনও বিশেষ বংশে জন্মালে ভূসম্পত্তি রাখার যে-অধিকার জন্মায় সেইটেই ব্যক্তিগত অধিকার এবং অধিকাংশ সময়েই ব্যক্তিগত অধিকারকে রক্ষা করা হয় দেশে প্রচলিত আইন দিয়ে। ভারতীয় সংবিধানের পঞ্চ-বিংশতিতম সংশোধনের ভিতর দিয়ে ব্যক্তি-গত বা আইনসম্মত অধিকারের সঙ্গে ব্যক্তির যে সামাজিক অধিকারের স্বরূপটি স্পষ্ট হয়েছে—এই সংশোধনের যাঁরা বিরোধী তাঁরা মনে করেন যে এটা ব্যক্তিগত অধিকারে হস্তক্ষেপ, পক্ষান্তরে এই সংশোধনের সমর্থকরা মনে করেন যে ব্যক্তির বা ব্যক্তিসমষ্টির অধিকার দিয়ে ব্যক্তি-বিশেষের ভূসম্পত্তির সীমা বেঁধে দেওয়া সামাজিক ন্যায়বিচার-সম্মত। রামমোহনের চিন্তাপ্রণালীর যুক্তিসম্মত পরিণাম হলো এই যে ব্যক্তির মূল্যায়নে ও ব্যক্তির অধিকার নির্ধারণে কুল-জাতি-বর্ণ-সম্প্রদায়, সে সম্প্রদায় বংশে জন্মেছে কি জন্মায়নি, সে পুরী কি পুরুষ ইত্যাদির বিবেচনা অসিদ্ধ। একথা ঠিক যে ব্যক্তির যে-রূপকে রাম-মোহন আমাদের সামনে উপস্থিত করে-ছিলেন বাস্তবে তার স্বীকৃতি বা প্রতিফলন এখনও খুবই নগণ্য, কিন্তু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়, সেই ধারণাকেই আমরা আস্তে আস্তে স্বীকার করে নিচ্ছি, সেজন্যেই সংশোধন করছি সংবিধানেরও। যতদিন না ভারতীয় জীবনে ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদা পূর্ণরূপে স্বীকৃত হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত ব্যক্তির সম্বন্ধীয় ধারণাতে রামমোহনের অবদানের তাৎপর্যও থেকে যাবে সমান অম্লান। সে যে কতদিন তা আমরা কেউ বলতে পারিনে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, রামমোহনের ভাব-সঙ্কটগুলির এক প্রান্ত হয়ে গেছে অতীতের বিষয়, কিন্তু আর এক প্রান্ত আমাদের চেতনাতে এখনও জীবন্ত, এখনও সক্রিয়, এবং নিশ্চিতভাবে সেগুলো সমান জীবন্ত ও সক্রিয় থাকবে ভবিষ্যতেও, তার মানে শেষোক্ত প্রান্তের তাৎপর্য শুধু তাৎক্ষণিক নয়, তা এতই দীর্ঘকালীন যে তাকে চির-কালীন বলাই সমীচীন। লক্ষণীয় যে চির-কালীন তাৎপর্যের ভাবসঙ্কটগুলিই সংখ্যায় অধিক।

সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে অথবা পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রচলনের জন্যে আন্দোলন যে রাম-মোহনই প্রথম শুরু করেন, এগুলো ঐতি-হাসিক তথ্যই শুধু নয়, রামমোহনের অসামান্যতার পরিচায়কও বটে; কিন্তু সে অসামান্যতার তাৎপর্যকে কতটুকু বা কত-খানি সেইটেই ঐতিহাসিকের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার্য। পক্ষান্তরে ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদা এবং জনসাধারণের ন্যায়সঙ্গত অধিকার সম্বন্ধে ভারতবর্ষে অশ্রুতপূর্ব প্রখর ধারণা-ধারণা রামমোহন আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠা করেন সেগুলোর ক্রমবিকাশ কতটুকু বা কতখানি এবং সেই অনুসারে রামমোহনের মহত্ত্ব ও গরিমা কী ভাবে নির্ধারণ করা হবে সেইটেও মূল্যায়ন করে দেখা আবশ্যক। রামমোহনের সমগ্র জীবন-সাধনার বিস্তারকে একটি বাক্যের নিমাসে প্রকাশ করতে চাইলে এ রকম দাঁড়ায় : ব্যক্তির স্বাধীনতা সম্পাদনে যার শুরু, জনসাধা-রণের বাস্তব জীবন-দর্শার সার্বিক উন্নয়নে তার সারা। বহু দূরে, বহু উচ্চে রাম-মোহন তাঁর লক্ষ্যকে স্থাপন করেছিলেন, সেই লক্ষ্য পৌঁছনোর পথও যেমন দুর্গম তেমনিই সুদীর্ঘ তাই সে লক্ষ্যকে জয় করে বিশ্ব করার সাফল্য প্রত্যাশা করাটাই সম্পূর্ণ অবাস্তব। তাঁর যেটুকু সাফল্য আমরা দেখতে পাই তা হলো জলে ভাসমান বরফ খণ্ডের উপরের ভগ্নাংশটুকু, নয়ভাগে একভাগ মাত্র, বাকি আট ভাগ জলের নিচেই আছে অর্থাৎ রামমোহনের বেশির ভাগ অবদানই আমাদের জন্যে আমাদের মধ্যে জীবন্ত ও সক্রিয়।

এখানে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে নানা পণ্ডিতে রামমোহনের বিচার চলতে পারে। তা না হলে সমস্ত ব্যাপারটা অন্ধের হস্তী প্রদর্শনের মতো সত্যমিথ্যার এক বিচিত্র সংমিশ্রণ হবে—প্রকৃত স্বরূপের সঙ্গে তার বৈসাদৃশ্যই বড়ো হয়ে যাবে। তবে এ প্রসঙ্গে একটি কথা সর্বদা মনে রাখা অত্যন্ত জরুরি। বেদান্তের মর্ম বোঝার জন্যে অন্যের ব্যাখ্যার চাইতে বেদান্ত স্বয়ং অধ্যয়নের উপরে তিনি বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন, বাইবেল নিয়ে যখন খৃস্টান মিশনারীদের সঙ্গে তাঁর তর্ক শুরু হলো তখন তিনি বাইবেলের ইংরেজী অনুবাদের উপরে নির্ভর করে তর্কে নামেননি, মূল বাইবেলে সত্যিই কী আছে তা স্বয়ং পরীক্ষা করার জন্যে হিব্রু ভাষা শিখে হিব্রুতে বাইবেল পড়ে তারপর অনুবাদ-পড়া মিশনারীদের সঙ্গে তর্কে নেমেছেন—তেমনই রামমোহনের সম্বন্ধে কোনও প্রকৃত ও যথার্থ মূল্যায়ন করতে হলে অন্যের ব্যাখ্যা ভাষ্য বা বর্ণনার উপরে নির্ভর না করে একেবারে রাম-মোহনেরই নিজস্ব মূল রচনা থেকে ব্যক্তিগ-তভাবে নেওয়া দরকার যে সত্যি সত্যিই তিনি কী চেয়েছিলেন, কী লিখেছিলেন, সত্যি সত্যিই কোন্ বিষয়ে তাঁর কী মতামত, কী বক্তব্য, কী প্রতিপাদ্য। দ্বিতীয় বা তৃতীয় ব্যক্তির মুখ বা লেখা থেকে রামমোহনের বক্তব্য না জেনে সরাসরি রামমোহনের মুখ বা লেখা থেকেই তাঁর সওয়াল-জবাব জেনে নিয়েই আমরা রামমোহনের বিচার করার যোগ্যতা অর্জন করতে পারি এবং রাম-মোহনের যে-কোনও বিচারের এটাই হলো প্রথম শর্ত।

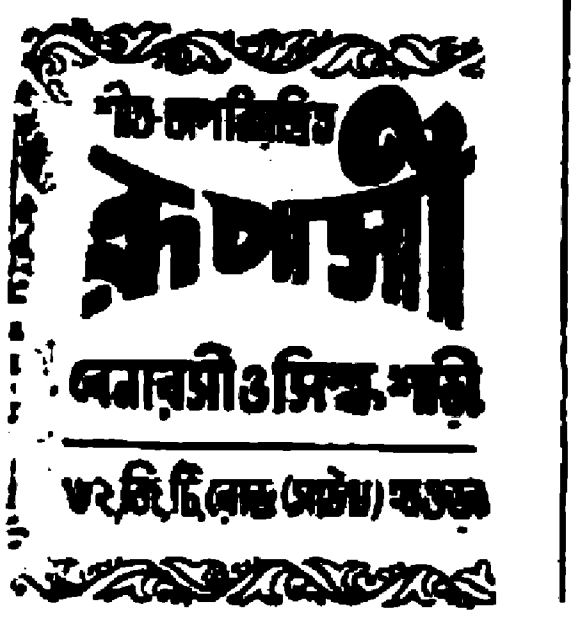

CENTRAL LIBRARY

প্রমুক্তি

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

॥ ২৮ ॥

পরের দিনই নতুন জায়গায় ডেরা নিয়ে বসল হেমন্ত। বাড়ি ঠিক যেখানে যা আছে সব বিক্রী করে দে। এ ছাড়াও জানাচার গহনাপত্র বিক্রী করতে শুরু করল। ঠিক পরের দিন না হলেও দিন-দুয়েকের মধ্যেই নিমাইকে ডাল ছেড়ে দিতে হয়েছিল। তবে জনপ্রা এক ঝাপাড়ু নয়—রাগের মাথায় যা বলেছিল—কাটি বিছানা বাসন-কোসন যা-যা ওদের দরকার ছাড়া আর সবই দিয়ে দিল হেমন্ত। মায় কাপড়-চোপড় রাখার একটা বড় তোরঙ্গ—বাসন-পত্র রাখার কাঠের বাক্স, আলনা সব। যাবার সময় মনিক প্রণাম করতে এসেছিল তাকে কিছু বলেনি, তবে সেই সময়ই বলে দিয়েছিল, ঐ ঝাপাড়ুনা না থামার সামনে আসে যেন, বারণ করে দিও। আমার ছেলেকের ঠিক নেই, আবার একটা ফৌজদারী করে বসল হয়ত মওকার সময়।"

সে সাহস এমনিও হত না—একবার শোনার পর তো হবেই না—ছোরের মতই চলে গিয়েছিল নিমাই একদিক ঘেঁষে, ঘাড় হেঁট করে।

যাবার সময় মণিকা ছেলেমেয়ে দুটোকে কোলে দিতে গিয়েছিল, হেমন্ত তাও নেয় নি, পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে রইল একেবারে।

এর পর একেবারেই বাড়ি খালি হয়ে গেল, শুধু কিসের ভরসায় থাকা। এভাবে থাকা উচিত নয়—কি নতুন, তা ছাড়া সে মুখচু মেয়েছেলে তার দারিয়জানের ওপরও ভরসা করা ঠিক হবে না বুঝে—ধনবাবুর ছেলেকে গিয়ে ধরল। সে তার জানা একটা বয়স্ক আর বেশ শক্ত সমর্থ দেখে দারোয়ান ঠিক করে দিল, বলল, যতদিন না আপনি যান, বাড়ি খালি করেন, ততদিন এরেই রেখে দিন। এর প্রাণ থাকতে আপনার কোন ভয় নেই। লোন্ড জেলার বাড়ি, যুদ্ধো হলে কি এম মুখিয়া একলও টলাতে চাইবে। ঐ দু-চারটে লোকের মাথা কেটে নিয়ে আসতে পারে। ওর হাতে লাঠি থাকতে পঞ্চাশ লোকের মিছিল নিয়ে বেটে এলেও ওর সঙ্গে এঁটে উঠবে না। মাস মাইনে যোগাচ্ছে তার জানো এ যেন সময় জান দিতে হবেই। একেই বাবুর বাইরে টহল দেবার পাঠানের ন' টাকা পাওনা হয়ে সেই ভাল।

বাড়ি ভাড়া সবই দ্রুত বিক্রী হয়ে গেল তিন চার মাসের মধ্যেই। কিন্তু হেমন্ত যেমন—ধৈর্য ধরে থাকলে সবগুলোই কিছু কিছু বেশী দাম পেত—কিন্তু কম ছাড়ল বলেই তাড়াতাড়ি বিক্রী হল। ধৈর্যই ওর নেই হেমন্তর। কলকাতা ছেড়ে চলে যাবে মনে হল—চারিদিক থেকে গালা টিপে ধরেছে। যত তাড়াতাড়ি এর এখানের পাট চুকিয়ে যেন পালাতে পারলে বাঁচে—এই রকম মনের ভাব তার। লোকসান হয় হোক, তার আর লাভই বা কি লোকসানই বা কি, দু-পাঁচ হাজার কম পেলে তার এমন কি ক্ষতি হবে—তার চেয়ে মনের শান্তির দাম ঢের বেশী।

সব বেচে দিল মানে অধিকাংশই। সামান্য কিছু সোনার গহনা ও কখানা গিনি হাতে রাখল। বিদেশে গিয়ে হাত থাকতে হয় একা—হঠাৎ কোন দরকার পড়তে পারে, ভাবী অসুখ-বিসুখ কিছু যদি হয়—তখন এগুলো কাজে লাগবে। সোনা ফেললে নাকি দুপুরে টাকা মেলে, আর কোন জিনিসের ধরলেই অত তাড়াতাড়ি টাকা পাওয়া যায় না। এছাড়া যা কিছু টাকা-বাড়ি জমি ফার্নিচার বাবদ পাওয়া গেল সব ব্যাঙ্কে জমা করে দিল। বলে দিল সুদের টাকাটা তাকে দুমাস অন্তর পাঠাতে। ধনুবাবুর ছেলের পরামর্শেই—সামান্য যা সেভাব কোম্পানীর কাগজ ছিল তাও ব্যাঙ্কেই জমা করে দিল। তারাই যাতে সুদ আদায় করে নিতে পারে।

ওর পরামর্শেই তিনটে নামক ভাগ করে নামল টাকাটা, নিজের, ধনবাবু-বাবাজীবন এবং ফোটনটি যাতে নিজের করে। ফোটনটি যাতে সাবালক হবার আগে ওটাকে নিয়ে চলে যাচ্ছে—কোন বাধক কখন টের পেয়ে বেঁকে বসতে পারে না। তবে এসব ঝাপাড়ে হেমন্তরও কিছু জ্ঞান-অভিজ্ঞতা হয়েছে এইদিনে—সুদ কম পাবে তেমনও ইন্সিওরীয়াল কোম্পানীই বেশি ভাল টাকা জমা করে দিল।...

এবার তল্পি গুটোবার পালা। আর নয়, এখানের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ করার সময় হল। শেষ বাড়িটা বেচেছিই হবার আগেই সে সারেনকে একটা টেলিগ্রাম করল—সে যেন ঐ অবধি এই নম্বরে এসে ওর সঙ্গে দেখা করে। সে ভাগ্যক্রমে সেই দিনই মুসলমানের ঈদ একটা বড় পর্ব পড়েছিল, দুদিন ছুটি—একদিন আগেই এসে পড়ল সুরেন।

"কী ব্যাপার পিসীমা, এমন জরুরী তলব? আমি তো হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসেছি, কেবল ভাবছি অসুখ-বিসুখ করেনি না কারে থাকে? হে ভগবান! কিন্তু এ কী! বাড়ির কি হাল? তৈজসপত্তর সব কোথায় গেল?—খালি বাড়ি ভাঁ-ভাঁ করছে। এ বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও উঠে যাচ্ছেন নাকি? সেই জন্যে খবর দিয়েছেন?... নিমাই-দাদা কোথায় গেল, তাদেরও তো দেখছি না—?"

"থোস বোস, বলছি। তুই এক নিঃশ্বেসে সব জিজ্ঞেস করে যাচ্ছিস—উত্তরটা দেবার অবসর না পেলে কেমন করে দেব? কিন্তু সারারাত জেগে এসেছিস, আগে কাপড়-চোপড় ছাড় মুখ-হাত ধো বলছি সব। আমার একটা ধানই পড়, কী আর হবে।

জনেক বেড়েছে দাদা, তার আর অকল্যাণ হবার ভয় নেই।'

তার পর, সুরেন স্নান-আহ্নিক সেরে জলখাবার খেয়ে সুস্থ হয়ে বসলে সব খুলে বলল হেমন্ত। ওর প্রস্তাব শুনে নিমাইয়ের প্রতিক্রিয়া—তাকে তাড়ানো, সব সেইজন্যেই সুরেনকে ডেকেছে সে। এবার এখানকার যা-কিছু সম্পত্তি বেচে দিয়ে, এখানের কারবার চুকিয়ে, পাট উঠিয়ে, চির-দিনের মতো কাশীবাসী হতে চায় সে। বিক্রী সব হয়ে গেছে, বালিগঞ্জের বাড়িটা বাকি ছিল, সেও বায়না হয়ে গেছে তারা সাত পুরুষে যা করবার সব করিয়েছে, সামনের পরশু রেজেস্ট্রি হলেই তার সব লাভ শেষ। এ-বাড়ি বিক্রী হয়ে গেছে গত মাসেই, তারা কটা দিন দয়া করে রেখেছে; তবে এবার ছেড়ে দিতেই হবে। সেই জন্যেই সুরেনকে এত জরুরী তলব পাঠাতে হয়েছে।

সুরেন এসব কিছুই জানত না। ইচ্ছে করেই হেমন্ত লেখেনি এসব। যে শান্তির জন্যই এখান থেকে সরে গেছে—তাকে আর উত্যক্ত করে লাভ কি?

সমস্ত শুনে সুরেন কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে বসে রইল। তার পর ঈষৎ একটু অনুযোগের সুরেই বলল 'এটা কেন করতে গেলেন পিসীমা। এ কি মানুষ পারে। সবে দুটো ছেলেমেয়ে হয়েছে, জন্মপর্যন্তি স্ত্রী, তাদের সেই কোন মুলুকে রেখে এখানে পড়ে থাকবে—একি সম্ভব? এ কেউই রাজি হত না। এ আপনার তাকে তাড়াবার জন্যেই মতলব করা।'

অনুযোগের সুরটা শেষ পর্যন্ত যেন তিরস্কারের সুরেই পরিণত হয়।

হেমন্ত অভিযোগটা মেনে নিল। বলল, 'তা যে একেবারে মিথ্যে তা বলতে পারি না। আসল কথা বৌটা ঐ রকম, নিজেরটার অবশ্য কিছু করার নেই, তাকে দোষ দেওয়া বৃথা—আমার যেন কেবলই মনে হতে লাগল, নিজের সংসারে নিজে ফোর হয়ে আছি—একা, নিঃসঙ্গ। এতগুলোকে নিয়ে করেছি, এত খরচ করছি, খাটছি, তবু আমার কেউ নেই। আমি একা।...এই-টেই সহ্য হল না বাবা। এতে যদি আমার অন্যায় হয়ে থাকে তো হয়েছে। তবে কি জানিস, নিজের যদি অমন নাতিস্কন্ন না হত, মুখের ওপর কথা না বলত—কি হাতে-পায়ে ধরে সময় চাইত—কি যদি আমার কথাটা বলত মিথ্যে করেও, যে তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারব না—তাহলে কি হত বলা যায় না। হয়ত আমিই মত বদলাতুম, কিম্বা হয়ত ওদেরই এ-বাড়িতে রেখে আমি একা কাশী চলে যেতুম। ওরও অদৃষ্টে দুঃখ আছে, গ্রহ বিরূপ—তাই অমন ভদ্রমতি হল।...তবে এ একরকম ভালই হল, বুঝলি? সে তার ছেলে বুঝেছে, বৌ ছেলে নিয়ে সংসার পেতেছে—এত চিন্তাই বা কি? এতদিন তো টানলুম, পয়সাও হাতে জমেছে কিছু নিশ্চয়।...আর সে যা হয় করবে। গতস্য শোচনা নাস্তি, যা হবার তো হয়েই গেছে।'

'হয়ে কি গেছেই ঠিক? আর ফেরানো যায় না।'

'না। ওর মনের চেহারাটা দেখতে পেরেছি। আর আমার সাধ নেই সংসারের বাবা। আমারও তো ঢের বয়স হল—আমার দিকটাও তো আমার ভাববার অধিকার আছে!'

'তা আমি এখন কি করতে পারি বলুন।'

সুরেনের কণ্ঠস্বরে যেন ঈষৎ একটু ঝঙ্কার আভাস।

হাসে হেমন্ত। বলে, 'ভয় নেই, নিমের বললে তোকে নিয়ে সংসার পাততে চাইব না। ভাল ঘোড়ার এক চাবুকে, তোকে আমি সেই এক দিনেই চিনে নিয়েছি।...আর সে লক্ষ থাকলে সব বেচে কিনে দিয়ে তোকে খবর দোব কেন, তাহলে তো সঙ্গে সঙ্গেই ডাকতুম!'

তারপর বলে, 'তা নয়। তোকে একটু সাহায্য করতে হবে বাবা। এই বোধহয় শেষ, আর তোকে বোধহয় বিরক্ত করতে হবে না। মনে তো হচ্ছে আর ফিরব না, যা হবার বাবা বিশ্বনাথের কাছেই হবে। আমাকে একটু গিয়ে থিতু করে দিয়ে আসবি শুধু। একা তো কখনও যাই নি কোথাও, কেউ না কেউ সঙ্গে গেছেই।... তারক যখন যায়, ডাক্তারবাবু পুরুত-ঠাকুরকে কিকে সঙ্গে দিয়েছিলেন। তাছাড়া এমনি বেড়াতে যাওয়া সে তবু এক রকম। এ ধর—সংসার ভেঙে নিয়ে চিরদিনের মত এখানের বাস উঠিয়ে যাওয়া, এই বয়সে আর একা যেতে ভরসা হয় না। হ্যাঙ্গামা ঝঞ্ঝাটও তো কম নয়। কলকাতা শহর দাঁদুড়ে বেড়াই চিরদিনই, আমাদের সে আমলে পালকী ছিল, বাইরাদের বলতুম অমুক জায়গায় যাবো—নিশ্চিন্ত, উদ্‌ বাইরারা তখনকার দিনের গুণ্ডা-বদমাইস কি চোর-ডাকাত ছিল না। একালে ট্যাকসী হয়েছে, একা ট্যাকসী চড়তেও অমিশা সাহস হয় না, তেমনি রিকশাও আছে যেখানে খুশি যাওয়া যায়। কাশী শুনেছি গুণ্ডার জায়গা—বড় ভয় করে।'

'তা ছেলেপুলে-সে দেশে যাচ্ছেন কেন তাহলে?' দুশ্চিন্তার মধ্যেও হেসে ফেলে সুরেন।

'বদমাইশও আছে, বাবাও আছেন।' হেমন্তও হেসে জবাব দেয়, 'তাছাড়া সবাই কি আর বদমাইশ গুণ্ডা, ভাল লোক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সন্ন্যাসী সাধক বিস্তর আছেন। আমার মতো অনাথা অবীনে বিধবাদের তো কথাই নেই। আমাদের তো ও-ই ভারগা বাবা! এমন তো হাজারে হাজারে ওখানে।'

তারপর একটু থেমে বলে, 'তোকে বলা এই জন্যে যে, বুদ্ধি-বিবেচনা আছে, আমার ঝোঁকটা পছন্দটাও জানিস। তুই তিন-চারটে দিন আগে চলে যা—কোথাও একটা হোটেল-মোটেলে থেকে—আমার জন্যে একটা বাড়ি কি ঘর খোঁজ। কোন ভদ্র-গৃহস্থের বাড়িতে একটু আলাদা বন্দো-বস্ত—এই হলেই ভাল হয়। একেবারে একা থাকতেও ভরসা হয় না, অথচ আবার কারও সঙ্গে পাশাপাশি গাওয়া-গাওয়িও থাকতে পারব না—এক জায়গাতেই জল-কল হয়ে হয়ত, তাই নিয়ে দিন-রাত খাচখাচানি, নোংরার দল যত, ছেলেপুলে থাকলে ক্যালব্যাল—সে আর এ বয়সে বরদাস্ত হবে না।...মানে, একটা বাড়ির দোতলা কি তেতলা নিয়ে রইলুম, অন্য অংশে বাড়িওলা কি অন্য ভাল ভাড়াটে রইল—এই রকম হলেই সবচেয়ে ভাল।...আর সেই সঙ্গে মা-গঙ্গার ধারে কাছে হয়—চট করে গিয়ে ডুব দিয়ে আসতে পারি কি জানালা ছাদ থেকে দর্শন হয়।...অনেকখানি ফরমাশ মনে হচ্ছে কিন্তু তা নয় রে, গোটা বাঙ্গালীটোলাটাই বলতে গেলে গঙ্গার ধারে, ওদিকেও শহরের ধার দিয়েই তো মা গেছেন—এমন বাড়ির অভাব হবে না।'

'তারপর? আপনি যাবেন কার সঙ্গে? আবার ফিরে এসে নিয়ে যেতে হবে তো?'

'উঁহু, সে এখন আমার যে দারোয়ান আছে—সুবে, গোণ্ড জেলায় বাড়ি, এদিকে ডাকাত শুনেছি কিন্তু খুব বিশ্বাসী, নজরও খুব চারদিকে।...মালপত্তর যা আলাদা যাবে তা বুক করিয়ে দেবে এখন, সে লোক আমার আছে। এই বাড়ি যে কিনেছে সে রেলেই কাজ করে—সে বলেছে আপনি নিশ্চিন্তমনে থাকুন—আমি বুক করিয়ে রসিদ এনে যাবার আগে পৌঁছে দেব।...তুই বাড়ি ঠিক করে টেলিগ্রাম করিস একখানা, আমি আর দারোয়ান এখান থেকে রওনা হয়ে যাবো, তুই ইস্টিশানে নামিয়ে নিস। যেটুকু গিয়েই দরকার হবে, বাকস একটা বিছানা, ঠাকুর আর রান্নার বাসন—এই শুধু সঙ্গে যাবে, মোট তিন-চারটে মাল, সে দারোয়ানই নিয়ে যেতে পারবে। ও ধনুবাবুর আমলের লোক, ওঁর কাছে যখন ঢুকি তখন কুড়ি-একুশ বছর বয়েস—ধনুবাবুর সঙ্গে ঘোরাই ওর কাজ ছিল বাইরে বাইরে।'

সুরেন তখনই কোন জবাব দিল না। কিছুক্ষণ চিন্তিত মুখে চুপ করে বসে রইল। বোধ হয় মনে মনে একটা হিসেব করে নিলে, তারপর বললে, 'এ যা বলছেন, যাওয়া-আসা, বাড়ি দেখা, আপনাকে বসিয়ে

হাওড়া কুষ্ঠকুটীর

সর্বপ্রকার সংক্রোম, বাতরক্ত এলাফাডা ফুলা একজিমা সোরায়াসিস ধ্বিত ক্ষতাদি আরোগ্যের জন্য সাক্ষাতে অথবা পত্র দ্বারা বিবরণ লউন। প্রাতঃস্মরণীয় : পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা কবিরাজ ১নং রামকৃষ্ণ লেন খুরট হাওড়া। শাখা : ৩৬ হারিসন রোড কলিকাতা—৯। ফোন : ৬৭-২০৫৯।

পিঠ করে আসা—অন্তত পনেরোটি দিনের ধাক্কা। বেশী তো কম নয়। এত দিন ছুটি তো পাবো না আমি। পাওনাও নেই, বছরে কটা দিনই বা ছুটি, এই কমাস আগে মায়ের কাজেই চলে গেছে, বেশীই নিতে হয়েছিল দু-একদিন। আর, ওসব কাপড়-কলের ব্যাপার, পাওনা থাকলেও অত দিন একটানা ছুটি দিত না। এমনিই ছুতো খুঁজছে অবিরত জবাব দেবার। আমি মজুমদারবাবুর গুড বিয়ে তাঁকে ঘুষ খাইয়ে ঠেকিয়ে নি। তাঁর একটা গাড়িদাত আছে। নিহাৎ মা-মারা গেছেন, তাঁর কাজ বলে কিছু বলতে পারে নি। এ বাজারে চাকরি গেলে আর কোথাও কাজ পাবো না।... ধীরুটা ঐ কাণ্ড করে বসে রইল, যা হোক তবু মাসে কুড়িটা-পঁচিশটা টাকাও দিত—সেতো বন্ধ হলই, বেরিয়েও কোথাও কাজ পাবে না। আমার যদি কাজ যায় এখন—ঐ এক গন্ধ রইল গায়ে, আমিও অন্য চাকরি পাবো না।'

'সে কি রে! ধীরু আবার কি করল? কৈ শুনি নি তো। ধীরু মানে তোর ছোট ভাই ধীরেন?'

একটু অপ্রতিভের হাসি হেসে সুরেন বললে, 'সে আপনাকে লেখা হয় নি বটে। এমনিই তো চিঠিই লিখি না বিশেষ—অত মনেও ছিল না। তাছাড়া এসব খবর লেখাও উচিত নয়, আপনার পেছনে টিকটিকি লেগে থাকত। এখন আমাদের সব চিঠি খুলে পড়ে।'

'কেন, কি করল কি?'

'আর বলেন কেন, চাকরি-বাকরি ছেড়ে—হঠাৎ খেয়াল হল নাইট ইস্কুল করবে, চরকা কাটা খদ্দর বোনা এই সব শেখাবে। মা মারা যাবার আগেই—মা মারা গেছেন তা বোধ হয় শোনেও নি—বলে আমি তো সরকারের বিরুদ্ধে কিছু করছি না, এসব সাফওয়ার্ড জায়গা, পশুর মতো জীবন-যাপন করে সব, না খেয়ে মরছে—না শিক্ষা না কিছু— শাব যেটুকু রাজাই শুষে নিচ্ছে—দু পায়ে থ্যাঁতলাচ্ছে এদের। এর বিহিত না করতে পারি চেষ্টাও করব না, তবে আর মানুষ কি?...এসব দেশ হলেও না হয় হত—ইংরেজের খাশ দখলে—ওখানে রাজার অনেক হাত পুলিশের ব্যাপারে, তিনি এসব প্রজা ক্ষেপানো, বিশেষ তাদের সচেতন করে নেওয়া নিজেদের অবস্থা সম্বন্ধে—ভাল চোখে দেখবেন কেন? তিনিই বোধ হয় কলকাঠি টিপে দিয়েছিলেন, কাছাকাছি একটা স্বদেশী ডাকাতি হতেই তার সঙ্গে ওকে জড়িয়ে সাক্ষী-সাবুদ এমনভাবে সাজালে—ওর সেই নাইট ইস্কুলের ছাত্রবাই সাক্ষী দিয়ে এল দু-তিনজন। কি করবে তাদেরও প্রাণের ভয় আছে তো?—প্রমাণ হয়ে গেল যে, ধীরু সে দলে ছিল, যদিও আসল ডাকাত একজনকেও ধরতে পারে নি নাকি, টাকা-পয়সাও রিকভার করতে পারে নি। তবে তাতে কিছু এসে গেল না, ধীরুর জেল হয়ে গেল দু বছর। এখনও সেই জেল খাটছে।

হেমন্ত স্তম্ভিত হয়ে বসে রইল অনেকক্ষণ। তারপর বলল, 'বলিস কি রে, তা বাড়ির কথা, মা-বাপ ভাইয়ের কথা ভাবল না একবার?'

'সে বলে তোমরা তো ভাবছই। সবাই যদি বাড়ির মার কথা ভাবে তো এ মার কথা ভাববে কে? দেশও তো মা। দেশের জন্যে, দেশের লোকের জন্যে সকলেরই কিছু কিছু ত্যাগ স্বীকার করা উচিত।'

বলে একটু হাসল সুরেন বিষণ্ণ-ম্লান হাসি। বলল, 'আমাদেরই কি আর ইচ্ছে করে না দেশের কাজে লাগতে? চোখের সামনে যেদিন দেখলুম মদের দোকানে পিকেটিং করছিল বলে পুলিশ রটো ছেলেকে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে খোয়া বার-করা রাস্তা দিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে—জামা ছিঁড়ে পিঠের চামড়া কেটে রক্তারক্তি, তার ওপর লাথি মারছে বুট সুদ্ধ—সেদিন কি আর রক্ত গরম হয় নি, ইচ্ছে হয় নি কি ছুটে গিয়ে ওদের পিস্তল কেড়ে নিয়ে ওদের গুলী করে মারি? কিন্তু মহাত্মাজীরও নিষেধ আছে, আর তা ছাড়া বড় কথা বাড়ো বাপ-মার কথা ভেবেই, তারা উপোস করে থাকবে হয়ত, হয়ত কেঁদে কেঁদেই প্রাণটা দেবে—আর সাহসে কুলোয় নি।'

শুনতে শুনতে হেমন্তর কঠিন শুষ্ক চোখও জলে ভরে এসেছিল। বলল, 'আহা, বাছারে!...দাদা জানে এসব ভাণ্ড?'

'জানে বৈকি। না বলে আর কত ঠেকে রাখব পিসীমা! জীবনে অনেক আঘাতই তো পেলেন, জীবনভোরই তো ভাগ্যের কাছে আঘাত খাচ্ছেন, একটা-দুটো বেশী-কমে কি এসে-যাবে?'

এর পর অনেকক্ষণ চুপ করে রইল দুজনেই। তারপর হেমন্ত আস্তে আস্তে বলল, 'শোন। তোকে চাকরির কথা নিয়ে যেতে বলব না, এটা ঠিক। সে আমার কপালে যা-ই থাক। তবে একথাও ভেবেছি, তোর ছুটির কথাও। আগে মনে পড়ে নি, একটা কথা হঠাৎই মনে পড়ে গেল কদিন আগে, এই তোকে চিঠি লিখব লিখব ভাবতে ভাবতেই। তোদের কলের যিনি বড়-কর্তা বা মালিক—চক্রবর্তী মশাইয়ের সঙ্গে আমাদের ও'র, মানে ডাক্তারবাবুর—পূর্ণ ডাক্তার আর কি—খুব জানাশুনো ছিল। উনি একবার কি একটা সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় নাকি ভদ্রলোকের স্ত্রীকে প্রাণপণে বাঁচিয়ে ছিলেন, দিন-রাত পাশে বসে থেকে, আহার নিদ্রা জ্ঞান না রেখে, সেই থেকেই খুব ভাব, বন্ধুত্বের মতো, মানে উনি পূর্ণবাবুকে খুব ভক্তি করতেন, দেবতার মতো দেখতেন। সেই সূত্রেই আমার সঙ্গেও জানাশুনো, আমার এখানে এসেছেনও কবার। তাছাড়া ও'র—মানে ডাক্তারবাবুর ভারী অসুখের সময় অনেকবার এসেছেন—আমি তো পাশেই বসে থাকতুম। আমার সঙ্গেও খুব জানাশুনো হয়ে গিয়েছিল। অনেকবার বলেছেন, আপনি যা করলেন, যা করছেন তার জন্যে আমরা সবাই কৃতজ্ঞ আপনার কাছে। ডাক্তারবাবু ভাল হয়ে উঠুন এবার আপনাকে নিয়ে যাব আমাদের ওখানে—নর্থের ওপর বাড়ি, দু দিন বিশ্রাম করবেন।...সে অবশ্য আর যাওয়া হয় নি, তবে আমার তো মনে হয় আমাকে ভোলেন নি একেবারে। আমি এই সঙ্গে ওঁকে একখানা চিঠি লিখে রেখেছি তাঁর নামে। চিঠিখানা নিয়ে গিয়ে তুই তাঁর হাতে দিস, যদি সামনে পর্যন্ত পৌঁছতে না পারিস তো কাউকে দিয়ে পাঠাস নয় তো ওখান থেকেই রেজেস্ট্রি করে ডাকে দিস। তাতে তোর নাম-ধাম সব দিয়ে দিয়েছি, দরকার হলে মন হলে নিজেই খুঁজে বার করবেন। ...আমার তো মনে হয় এ চিঠি চক্রবর্তী-মশাইয়ের কাছে পৌঁছলে তোর ছুটির অভাব হবে না, চাই কি চাকরীতেও কিছু উন্নতি হতে পারে। আমার নিজের ভাইপো আমার ওপর অভিমান করে ওখানে ঐ কাজ করছে, তা ছাড়া খুব আত্মসম্মান জ্ঞান, স্বাবলম্বী—সেই জন্যেই আরও, কিন্তু এ আর সংসার করা সম্ভব নয়, এই ভাবেই লিখেছি।'

সুরেন খানিকটা অবাক হয়ে চেয়ে রইল পিসীর মুখের দিকে, তারপর বললে, 'এসব আবার লিখতে গেলেন কেন? শুধু ছুটির কথা লিখলেই হত। কি মনে করবেন, ভাববেন হয়ত আমিই লিখিয়েছি!'

'তাতে কি তোর মাথা কাটা যাবে?' হেমন্ত এবার কেঁকে ওঠে, 'আ গেল যা! আমি তো তোর পিসী। লোকে চাকরীর জন্যে কত লোকের সুপারিশ ধরে—পিসীকে ধরলেই যত দোষ!'

'না তা নয়'—অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে সুরেন, বলে, 'আমি ভাবছি অন্য কথা। ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে গেলে বড়-বাবুটি খাপ্পা হয়ে থাকবেন—ওটুকু করবেন বাগে পেলেই। বার বার তো অত বড় লোকের কাছে যেতে পারব না।'

হেমন্ত শুধু বলে, 'দাখো না। আমার তো মনে হয় খুব সুবিধে করতে পারবে না কেউ আর। ভগবদ্বিশ্বাস বুড়ি নিজেকে মস্ত লাট-বেলাট ভাবে তা এর আগে তো এমন কথা বলি নি আর কখনও—জাঁকরমা স্বভাব এমন তো বলতে পারবি না!'

তারপর চোখে ও'র নিজস্ব বিশেষ কৌতুকের ভঙ্গী করে বলে, 'আজ এই দেখছিস পিসীকে অসহায় একা। একা চিরদিনই অবিশ্যি — তবু একদিন এই কথাটা হাড়েই টের পেয়েছে। আজ কি আর সে ক্ষমতার কিছুই নেই?'

আর কিছু বলে না সুরেন।

বুঝি যতই হোক, এই অসহায় মানুষকে এভাবে ত্যাগ করতে পারবে না সে।

(ক্রমশঃ)

পারস্পর ॥ জগন্নাথ চক্রবর্তী

তোমার জন্য আমিই দায়ী
আমার জন্য তুমি।

এই যে তুমি প্রেমের খেলায়
হার মানো, হার মানি,
এই যে আমি তোমার ছলা
সব জানি সব জানি,
এই যে তুমি আমায় ঠকাও
তোমার ঠকাই আমি—
সবের জন্য আমিই দায়ী
আমার জন্য তুমি।

মানুষের জন্য ॥ অজয় সেন

মগ্ন উপত্যকা ছেড়ে ঘন কুয়াশার গভীরে চলে যায় ম্লান মানুষেরা
আলো ঝলমলে জন্মদিন থেকেই মানুষের রুক্ষ, বিবর্ণ হাঁটাচলা
তাদের রঙিন বিস্মৃতি, নিজেদের দিকে তাকিয়ে থাকা একনাগাড়ে
আমাকে মাথা হেঁট করিয়ে রাখলো সমস্ত দুপুর—আজ;
একদিন বৃষ্টির মধ্যে আমি সারাক্ষণ ঘুরে বেড়িয়েছি সমস্ত কলকাতা
আড়ালে আবডালে দেখেছি
প্রতিটি মানুষের ফিসফিসানি ও সাবধানী অঙ্গভঙ্গি
শুনেছি সতর্ক পায়ের শব্দ, ছুটে যেতে গুপ্ত ঘাঁটির দিকে—যা ক্রমশই
নেবে গ্যাছে গুপ্তঘাঁটির গভীরের থেকে অন্য গভীরতায়;
অথচ বোঝে না মানুষ, প্রতিটি কানাগলির দুঃখ ঐ গভীরতারই জন্য।
বহুদিন নিশ্চুপ থেকেছি, উজ্জ্বল পোশাকে কত সন্ধ্যায় কেঁপে ওঠে
কলেজ স্ট্রীটের আনন্দফলক
তবুও, হে জীবন, কত অচেনা তুমি, কত নগ্ন তোমার হাত এবং পা
দুঃখী মানুষ সারাজীবন তাকিয়ে রইলো তোমার দিকে,—
আশ্চর্য, দুরন্ত দুশোর মতই অদৃশ্য রইলে চিরকাল;
আজ সারাদিন বুকের মধ্যে বাজলো মানুষের জন্যে ভালবাসা
কলকাতার পথে পথে রোদের দিনে আমি রোদের মধ্যে
কলকাতার আনাচে কানাচে বৃষ্টির দিনে
আমি বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়াই
শুধু এই দীনদুঃখী মানুষেরই জন্য।।

পাহারায় কেউ নেই ॥ অরুণ চক্রবর্তী

রাতে সবাই যখন ঘুমে অচেতন
আমি তখন বাইরে থেকে
বাড়িটাকে দেখি।
ঘুমন্ত মানুষ মানুষ কোলে,
বাড়িগুলো অন্ধকারে
কালো কালো পাহাড়ের মত দাঁড়িয়ে
উন্মুক্ত পৃথিবীর ময়দানে, অথচ
বাড়ির পাহারায় কেউ নেই,
স্বচ্ছন্দে নিশ্চিন্ত ঘুমে অচেতন সবাই।

শুধু আমি—আমিই দেখি
নিঃসঙ্গ ঐ বাড়িটাকে অন্ধকারে।।

CENTRAL LIBRARY

বিষ্ণু দে : একটি কাব্য আন্দোলনের ইতিহাস

বিষ্ণু দে এই বছর জ্ঞানপীঠ পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। বাঙালী কবির এই সম্মানে প্রতিটি বঙ্গভাষী সম্মানিত। বিষ্ণু দে বহু বিতর্কিত এবং সেই সঙ্গে বহু প্রশংসিত কবি। রবীন্দ্রনাথের পরবর্তীকালে যে বাঙালী কবির সর্বাধিক কবিতা বিদেশী ভাষায় অনূদিত হয়েছে তাঁর নাম বিষ্ণু দে। মৃত কবি জীবনানন্দ দাশ প্রসঙ্গে ইদানীং কিছু কিছু আলোচনা দেখা যায়, কিন্তু বোধহয় বিষ্ণু দে একমাত্র জীবিত কবি যাঁর কবিকৃতি এবং কবি-জীবন প্রসঙ্গে বিগত বর্ষে অন্ততঃ পাঁচ-ছখানি পত্রিকায় সুলিখিত এবং সুদীর্ঘ আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে। বিষ্ণু দে সম্পর্কে আগ্রহ আছে এক শ্রেণীর পাঠকের যেমন না-পড়েই প্রবল অনীহা আছে আরেক শ্রেণীর। এর মধ্যে পরম প্রশান্তিতে কবি বিষ্ণু দে প্রায় লোকলোচনের বাইরে বসে সাধনামগ্ন। অতিশয় শান্ত এবং সমাহিত এই কবির সম্মান লাভে তাই অনেকেই পুলকিত।

জীবনানন্দ দাশের মৃত্যুর পর বুদ্ধদেব বসু তাঁর কবিতা পত্রের জীবনানন্দ-স্মারক-সংখ্যার জীবনানন্দ প্রসঙ্গে রচিত একটি প্রবন্ধের প্রায় গোড়াতেই লিখেছিলেন তাঁর সম্পাদিত কল্লোলের সহধর্মী প্রগতি পত্রিকার কথা :—তিনি সেদিন প্রগতির লেখকদের কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন :

'প্রগতির নিয়মিত লেখকদের মধ্যে রীতিমতো বিখ্যাত ছিলেন একমাত্র নজরুল ইসলাম, আর অচিন্ত্যকুমার—যাঁর 'বেদে', 'টুটা-ফুটা' সবেমাত্র বেরিয়েছে—তাঁকেও বলা যায় সদ্য সমাগত। এই দু-জন ছাড়া অন্য সকলেই ছিলেন আসন্ন। অভ্যাসন্ন, উপকূলনিক, বৃহত্তর পাঠক সমাজের সঙ্গে অপরিচয়ের ব্যবধান তখনো ভেঙে যায় নি। আর এঁদের মধ্যে সম্পাদক দু'জনকে বাদ দিয়ে—যাঁদের রচনা সবচেয়ে প্রচুর পরিমাণে ছাপা হতো, তাঁদের নাম জীবনানন্দ দাশ ও বিষ্ণু দে।

বিষ্ণু দে প্রথম লেখা পাঠিয়েছিলেন 'দানল মিত্র' বা ঐ রকম কোনো ছদ্ম নামে, নিপুণ ছন্দের কোনো কবিতা। তারপর ছদ্মনামে ও বেনামে, গদ্যে ও পদ্যে, তাঁর অনেক লেখাই 'প্রগতির' পাতা উজ্জ্বল করেছিলো। তাঁর সাহিত্যজীবনের সেটা প্রথমতম অধ্যায়। লোকে তাঁর ছদ্মনামকেই বেনাম বলে ভুল করেছে; অনেকেই বিশ্বাস করছে না 'বিষ্ণু দে'র মতো সংক্ষিপ্ত সুশ্রাব্য নাম বাস্তব কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব।'

বুদ্ধদেব বসু যে অভ্যাসন্ন কবির কথা ১৩৩১-এ কবিতায় লিখেছেন তখন সেই কবির বয়স সতের কিম্বা আঠারো। তখনো তিনি 'শ্যামল মিত্র' না 'বিষ্ণু দে' কোনটি রাখবেন তা স্থির করতে পারেন নি। সেই সতের-আঠারো বয়সের কবি বিষ্ণু দে-র সঙ্গে একদা বর্তমান লেখকের অন্তরঙ্গ পরিচয় ছিল। সেই পরিচয়ের সূত্র তখনই মজে হয়েছিল এ কবি জনতার ভিড়ে হারিয়ে যাওয়ার নয়, জনতারই একজন তবু যেন বিশিষ্ট। শিল্পী এবং মিস্ত্রি তাঁর ব্যবহার অথচ তাঁর সেই বয়ঃসন্ধিকালেই ছিল অসামান্য দৃঢ়তা। বিষ্ণু দে ভর অবচ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কবি। সেই ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য তাঁকে দীর্ঘকাল সঞ্জীবিত রেখেছে এবং নানা ঝড়-ঝাপটায় তিনি বিপথচালিত না হয়ে স্বধর্মচ্যুত হন নি। অর্থাৎ যা তাঁর ভূমিকা ছিল সেই ভূমিকা থেকে সরে আসেন নি। এই কারণেই বিষ্ণু দে-র নামটির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে কয়েক দশকের কাব্য-আন্দোলনের ইতিহাস।

বিষ্ণু দে'র কাব্য-বিচারে কেউ কেউ তাঁকে মার্কসবাদী বলেছেন। জানি না এই লেবেল তাঁর নামের গায়ে সাঁটা কতখানি সঙ্গত হবে, বিষ্ণু দে মার্কসীয় দর্শনের সঙ্গে পরিচিত দীর্ঘদিন ধরে। তাঁর সমাজায়ত কবিসত্তার মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় মেটুকু আছে সে তাঁর সুগভীর মানবিকতা বোধেরই লক্ষণ। তিনি সমাজ সচেতন। এই ব্যক্তিনিরপেক্ষ মনোভঙ্গী তাঁকে এক সহজ অথচ অনিবার্য পথ নির্বাচনে সহায়তা করেছে।

নিরলস কাব্য-সাধনার ব্রতী বিষ্ণু দে কবিতার প্রকরণগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা পথে করেছেন প্রায় তাঁর কাব্য জীবনের সূত্রপাত থেকে। বাংলা কাব্যসাহিত্যের ধারাটির সঙ্গে তাঁর পরিচয় সুগভীর। তাঁর কবিমানস পরিণতি লাভ করেছে তাঁর কাব্য জীবনের প্রায় সূত্রপাতে। তাঁর রচিত মৌলিক কাব্য গ্রন্থের সংখ্যা চোদ্দ, অনূদিত বিদেশী কবিতা গ্রন্থ তিনটি। সেই সঙ্গে তিনি কয়েকটি প্রবন্ধ সংগ্রহ রচনা করেছেন। ইংরাজীতে অরবিন্দ-কাব্যের পাণ্ডুলিপির অনুবাদও তিনি করেছিলেন, শোনা যায়। বয়স এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকে না, প্রতিদিনে তাঁর পরিবর্তন, নিত্য-নূতন অভিজ্ঞতা। কবি বলেছেন—

'সতেই না ছনাই বয়স
জীবনের তবু পাত্র ওঠে ফিরে তাঁর বারো
বয়স
মত পরিণত বত ফিনকের অভিজ্ঞ সাহসে
তত তীক্ষ্ণ মানবিক সম্ভোগের বিগত
সন্ন্যাস।'

২১।১২।৭১ তারিখে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় পৌষ ১৩৭৮-র পরিচয় পত্রিকায় প্রকাশিত বিষ্ণু দে প্রসঙ্গে রচিত একটি প্রবন্ধের শেষাংশে যে কথা কটি লিখেছিলেন তা বর্তমান মুহূর্তে বিশেষভাবে বিবেচনাযোগ্য। তাই বাহুল্য হীরেন্দ্রনাথ ডিসেম্বর ১৯৭১-এ যে কথা কটি লিখেছিলেন সেই কথাগুলির আজ সমর্থন মিলেছে বহু, বিভিন্ন কণ্ঠে, সেই কারণে হীরেন্দ্রনাথের বক্তব্য আংশিক উদ্ধৃত করা সঙ্গত মনে করি :

'কিন্তু আমার ধারণা যে রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতার অপর শৃঙ্গের ছুঁয়ো যদি কাউকে দেখি তো তিনি হলেন বিষ্ণু দে।'

স্বর মন্দ্র, কণ্ঠ অন্তর্লোলিত, অথচ জীবনসত্যের সন্ধানে অবিরাম, বিশ্বরূপ ধ্যানে পুলকিত, চিন্তায় গভীর, চেতনায় স্বচ্ছ এই কবির কাব্যের খোঁজখবর যে সিন্ধির পরিচয় তা বাঙালী পাঠক মাত্রেরই গর্ব।

যুক্তি দিয়ে, তথ্য হাজির করে, সাহিত্য-বিচারের বিভিন্ন অভিজ্ঞানের উল্লেখ করে কবিপ্রতিভা বিশ্লেষণের সামর্থ্য বা সময়

আমার নেই। ...আমি শুধু এইটুকু বলে রাখতে চাই যে আমার মনে আলোর মত এসেছে উদ্ভাসিত হতে আমার শেষ কথা—বিশ্বে যে প্রেম ছড়িয়ে আছে তার প্রেম করি। এ নিয়ে বিসম্বাদের কোন স্থান নাই।

এরপর ১৬ই ফেব্রুয়ারি রবীন্দ্রনাথের কাছে বিশ্ব জ্ঞানপীঠ পুরস্কার-প্রাপ্তির সংবাদ। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য আর এভাবে সমাপ্তি হয়।

পুরস্কার যে কবিকের সম্মান বৃদ্ধি করে না একথা বার বার বলা হয়েছে, তবে পুরস্কার নিঃসন্দেহে একটা স্বীকৃতি। সেই দিক থেকে বিশ্ব মেলে এই পুরস্কার-প্রাপ্তি এক আনন্দ সংবাদ। পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখকের গ্রন্থ পাঠে পাঠকের একটা আগ্রহ সৃষ্টি হয় স্বাভাবিক। বিশ্ব মেলে কবি হিসাবে যদি বাঙালী পাঠক আজ পরিচয়াভিলাষ করতে পারে তাহলে প্রকৃত লাভ হবে সেই পাঠকসমাজের। আমাদের দেশের এক্ষেত্রে আগ্রহের উচ্ছ্বাস আছে এবং আবেগও। সেই উচ্ছ্বাস ও আবেগ আজকে মুহূর্তে, বিশ্ব মেলে তার ৪৫ বছর ব্যাপী সাহিত্যসাধনার গতি ও প্রকৃতির দিকে তাকালে স্পষ্ট সহজেই বোঝা যাবে যে বাংলা কবিতার সাধারণ পাঠের পিছনে এই মহৎ কবির কি অবিস্মরণীয় ভূমিকা।

বিশ্ব মে শুধু কবি নন, তিনি প্রাবন্ধিক, ছাত্রশিক্ষক ও চিত্রশিল্পিক। তাঁর কলা বিষয়ক আলোচনাগুলির মধ্যে চিত্র-সমালোচনার নতুন ভংগী লক্ষ্য করা যায়। বাংলার মত ইংরেজীতেও তাঁর কলম সমান স্বচ্ছন্দ পরিচালক।

সংক্ষিপ্ত এই আলোচনায় কবির সমস্ত রচনাবলীর পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। শুধু তাঁর কবিতা ও বিশ্ব মেলে তাঁর বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন আছে। সম্ভব হলে সেই আলোচনা করার বাসনা আছে।

আজ বিশ্ব মেলে বাঙালী পাঠক নতুন করে বিচার করুক। বিশ্ব মেলে সামগ্রিক রচনার মূল্যায়ন করুক এই আমাদের কামনা।

আজ পরিণত বয়সে পৌঁছেছেন কবি। শরীর ক্লান্ত, মন অবসন্ন। অনেক আগে লেখা 'উর্বশী ও আর্টেমিস' কাব্য গ্রন্থের 'আজ' কবিতাটির কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করছি :

'চিত্তের সাহস আজ শান্ত স্থির
বিশ্বব্রতী নীড়,
নখর থাবালি নেই,
লোহুলির দেহহীন আবেগ।
এ আলোতে আমি আছি,
আর আছে বিশ্ব মোর পাশে,
সে বিশ্ব আমারই মূর্তি—
নীড় ছাড়া সে মোর মনের।'

আজকালকার কবির স্বপ্নভঙ্গের বেদনাটুকু যেন আরো স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে।

—অজয়কৃষ্ণ

নতুনবই

বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ (১ম খণ্ড, শিক্ষা)—সত্যেন্দ্রনাথ সেন সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি। গোপাল হালদার প্রধান সম্পাদক। পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতির পক্ষে নীলরতন ধর কর্তৃক কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত। তিন খণ্ডে একত্রে সাতের টাকা।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশে ও বাঙ্গালীর ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ব্যক্তিপুরুষ। তাঁর ঘটনাবহুল জীবনের কর্মযোগের সঙ্গে দুটি মূল বিষয় যা সমাজ-মানসের উপর বৈপ্লবিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, তা হল তাঁর শিক্ষাবিস্তার ও সমাজ সংস্কার প্রচেষ্টা। তাঁর সাহিত্যচর্চা শিক্ষাবিস্তার পুরুষের অপরিহার্য অঙ্গরূপে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল।

'বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ'-র ১ম খণ্ড সেই 'শিক্ষা' দিয়ে আরম্ভ করেছেন সম্পাদকমণ্ডলী। এই প্রথম গ্রন্থিত হয়েছে বর্ণপরিচয় ১ম ও ২য় ভাগ, কথামালা, নীতিবোধ, চরিতাবলী, বোধোদয়, বাংলার ইতিহাস এবং আখ্যানমঞ্জরী ১ম ২য় ও ৩য় ভাগ দিয়ে। এতদ্ব্যতীত পরিশিষ্টের মধ্যে আছে ইংরেজীতে 'নোটস অন দি সাংস্কৃত কলেজ', বাংলাস্টাইনের রিপোর্টের বিষয়ে বিদ্যাসাগরের পত্র, শিক্ষা পরিষদের অনুজ্ঞা বিষয়ে বিদ্যাসাগরের পত্র এবং বিদ্যাসাগরের সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জী, রচনাপঞ্জী ও উনিশ শতকের বাংলার সংক্ষিপ্ত ঘটনাপঞ্জী। ঈশ্বরচন্দ্রের দুখানি বিভিন্ন বয়সের চিত্র, ১৮৪৭ খৃস্টাব্দে সংস্কৃত কলেজের একটি চিত্র এবং বিদ্যাসাগরের মাতা ভগবতী দেবী ও পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুখানি স্বতন্ত্র চিত্র এই খণ্ডের শোভাবর্ধন করেছে।

এই খণ্ডে মূল্যবান রচনা করেছেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি সত্যেন্দ্রনাথ সেন এবং জ্ঞানগর্ভ ভূমিকা রচনা করেছেন সম্পাদক গোপাল হালদার। সুধীর ভূমিকার মধ্যে অত্যন্ত বিজ্ঞতার সঙ্গে তিনি ঈশ্বরচন্দ্রের সর্বাঙ্গীন দিক ব্যাখ্যাত করেছেন। মুদ্রণ, কাগজ ও বাঁধাই রুচিসম্মত ও উচ্চাঙ্গের।

রবীন্দ্র সমীক্ষণ (সংকলন)—রবীন্দ্র-পরিষদ, পাটনা। গ্রন্থাগার প্রাঃ লিঃ, ১১-এ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে লোকপ্রিয় চক্রবর্তী কর্তৃক প্রকাশিত। [illegible]

[illegible] সংকলন সম্পাদকীয় নিবেদন [illegible] এটি ঐতিহ্যের সংকলন। প্রধানতঃ এই সংকলন গ্রন্থটি পাটনার সুধীন্দ্র পরিষদের উদ্যোগে রবীন্দ্র-ভবনে যে বক্তৃতামালার আয়োজন সম্পর্কে ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার করে গিয়েছিলেন, তা থেকেই উদ্ভূত। রবীন্দ্রনাথের সর্বতোমুখী প্রতিভার বহুবিধ দিক আলোচিত হয়েছে. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমানবিহারী মজুমদার, প্রমথনাথ বিশী, আশুতোষ ভট্টাচার্য, বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, জগদীশচন্দ্র বসু, উমা রায়, বাসন্তী চৌধুরী সত্যেন্দ্রনাথ গোষাল, মৃণালিনী দেবী, সিস্টার পুষ্প ও হরিহর মহাপাত্রের মূল্যবান কয়েকটি রচনার দ্বারা। এই সংকলনে ভূমিকা লিখেছেন অরুণাশংকর রায়। শিল্পী জ্ঞানরূপ চক্রবর্তী অঙ্কিত একটি বহুবর্ণের চিত্র গ্রন্থখানির শ্রীমণ্ডিত সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে।

সুধীরাগ (কবিতা)—সুধীর বেরা। সাহিত্য প্রাইভেট লিমিটেড, ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা ৯। সাড়ে চার টাকা।

সুধীর বেরা রাজনীতিবিদ এবং পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য। কিন্তু ইতিমধ্যে কবি হিসাবেও তিনি খ্যাতিলাভ করেছেন। আলোচ্য 'সুধীরাগ' নামক কাব্যগ্রন্থের পূর্বে তাঁর 'স্বপন' ও 'সাহানা' নামক আরও দুখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। সুধীরাগ-এর মধ্যে উনিশটি খণ্ডকবিতা আছে এবং অধিকাংশই দীর্ঘায়তন। কবিতাগুলির মধ্যে বেদনার সুর যেমন ধ্বনিত হয়েছে, তেমনি আশাবাদীর আনন্দ-উচ্ছ্বাসেও কবি মুখর। এই বেদনা ও আনন্দ মানুষের জীবন-চক্রের ঘিরেও যেমন দেখা দিয়েছে, তেমনি নিসর্গলীলার মধ্যেও প্রকট হয়েছে। কাব্যামোদীদের কাছে এই কাব্যগ্রন্থের সমাদর হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

শার্লট ব্রন্টি—এমিলি ব্রন্টি (জীবনী)। মঞ্জু আচার্য। প্রজ্ঞাবিকাশ, ৮৬।০৮বি, রফি আমেদ কিদোয়াই রোড, কলিকাতা ১৩, ছয় টাকা।

ঊনবিংশ শতকের মহিলা ঔপন্যাসিক হিসাবে শার্লট ব্রন্টি ও এমিলি ব্রন্টি দুই ইংরেজ ভগ্নীশ্বরের বিশেষ খ্যাতি ছিল। তাঁদের জীবন-কথা, রচনার বৈশিষ্ট্য ও রচিত উপন্যাসগুলির পরিচয় অত্যন্ত যত্নসহকারে বিশ্লেষিত হয়েছে বইখানির মধ্যে। সাহিত্যানুরাগী সাধারণ পাঠক-পাঠিকা ব্যতীত ইংরেজী সাহিত্যের ছাত্রছাত্রীরা এই গ্রন্থ থেকে যথেষ্ট উপকৃত হবেন। লেখিকা

শ্রীমতী আচার্যের লেখার ধরনটি ভারী সুন্দর। জীবন-কাহিনী অংশটি লেখার মধ্যে যেমন তাঁর নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি শার্লট ব্রন্টির উপন্যাস 'জেন আয়ার' ও এমিলি ব্রন্টির 'উয়েদারিং হাইটস্'-এর সংক্ষিপ্ত কাহিনী বিন্যাসের মধ্যেও পাওয়া যায় বিশেষ দক্ষতার নিদর্শন।

বঙ্গবন্ধু মুজিবর ও ভারতরত্ন ইন্দিরা (বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম)—মিলন দত্ত। বেঙ্গল পাবলিশার্স কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড, ২১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৯। দশ টাকা।

বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম ও মুক্তি সংগ্রামের প্রধান নেতা শেখ মুজিবর রহমানের উপর পশ্চিম বাংলায় অসংখ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ঐ সকল গ্রন্থের অধিকাংশই উচ্ছ্বাস-প্রণোদিত, ইতিহাস সেখানে আচ্ছন্ন। চিত্রসম্পদের দিক থেকে অনেক গ্রন্থ সমৃদ্ধ হলেও, সর্বাংগীণভাবে আলোচ্য গ্রন্থ যেমন ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ ঘটনাবহুল, তেমনি চিত্রসম্পদ ও সাজসজ্জায় অতুলনীয়। বিয়াল্লিশ পৃষ্ঠার হাফটোন চিত্র আছে গ্রন্থখানির মধ্যে এবং এই চিত্রগুলির মধ্যে এমন কয়েকখানি আছে, যা অন্যত্র কোথাও দৃষ্টিগোচর হয়েছে কিনা সন্দেহ। সাড়ে সাত কোটি মানুষের পূর্ব-পাকিস্তান কিভাবে গণ-প্রজাতন্ত্রী স্বাধীন বাংলাদেশে পরিণত হল, তার চাঞ্চল্যকর, রোমহর্ষণ ইতিবৃত্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবৃত হয়েছে এই গ্রন্থে।

কুমড়োপটাস—নগেন বসু, লোকায়ন সাহিত্য, ৭সি।৮২, সি আই টি বিল্ডিংস, কলকাতা-১০। তিন টাকা।

'কুমড়োপটাস' কিশোরদের জন্য লেখা। কিন্তু এই ছোট গ্রন্থটি সহজেই বড়দের মনকে ধরতে পারে। এক সময় বইটির জনপ্রিয়তা ছিল প্রবল। দীর্ঘকাল ছাপা ছিল না। মোট চারটি ছোটগল্পের সংস্করণ হল 'কুমড়োপটাস'। নামগল্পটি ছাড়া আর যে তিনটি গল্প—সেগুলি হল—'দুষ্টুমি', 'শিবাই পণ্ডিতের সমর যাত্রা' ও 'পটলের কীর্তি'। চারটি গল্পের মধ্যে 'কুমড়োপটাস' গল্পটিই আকারে বড়। বাস্তবিকপক্ষে অধুনা কিছু শিশুদের জন্য লিখিত গল্পে উদ্ভট কল্পনা, বৈজ্ঞানিক চিন্তার আনুষ্ঠানিক বিষয়, শিশুদের মনের সঙ্গে সঙ্গতিহীন ঘটনা যুক্ত করে গল্প লেখা হচ্ছে। শিশুদের মন ও কল্পনা সহজাত, স্বাভাবিক। গল্পগুলি যেমন তাদের স্বাভাবিক মানসিকতার অনুপন্থী হবে, তেমনি তাদের বিস্ময়, কল্পনা, জিজ্ঞাসা, তাদের বিচিত্র আশা-আকাঙ্ক্ষা ও মনের খেলাকে বাড়িয়ে দেবে, কল্পনার খেলার ক্ষেত্রকে করবে প্রসারিত। 'কুমড়োপটাস' গ্রন্থের গল্পগুলিতে আশ্চর্যভাবে দিক-গুলির পরিচয় আছে। 'কুমড়োপটাস' গল্পের জম্বুক, শম্বুক, ঢেঁপকি-বুড়ি, কুমড়োপটাস—এদের নিয়ে যে মজার জীবন ও মনের সংসার রচনা করেছেন লেখক, তা কৌতূহলী শিশুমনকে অনায়াসেই নিবিষ্ট করতে পারে। লেখকের ভাষা ও গদ্যরীতি শিশুমনের কৌতূহলকে ধরে রাখতে সক্ষম। শিশুসাহিত্যে এমন সাবলীল গদ্য নতুন করে পেলাম।

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

সমন্বয় (প্রথম সংখ্যা) — সম্পাদক : স্ফুলিঙ্গ সেন। ২৬৬, ডায়মণ্ড হারবার রোড, কলকাতা-৩৪।

পত্রিকাটির উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে :

: 'আজকের দিনে মানুষের জীবনের সাথে সাহিত্যের কোন সমন্বয় নেই। তাই মানুষের জীবন আর সাহিত্য—এই নিয়েই 'সমন্বয়'।' খুবই মহৎ উদ্দেশ্য। এ সংখ্যায় লিখেছেন পবিত্রকান্তি বসু, অমিতেশ রায়, সুজিত চৌধুরী, শিবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়, সমীর দাস, মণি ভট্টাচার্য, অনিমা বসু, স্ফুলিঙ্গ সেন এবং একটি ওড়িয়া গল্পের অনুবাদ করেছেন বসন্ত চক্রবর্তী।

রূপলেখা (বৈশাখ ১৩৭৯)—নীপালি দত্ত। ২৭বি শিকদার বাগান স্ট্রীট, কলকাতা ৪। পঞ্চাশ পয়সা।

পত্রিকাটির বয়স এত? দীর্ঘ উনিশ বছর প্রকাশের পর, বিশ বছরে পা দিয়েছে। কিন্তু চমকপ্রদ কোনো ঘটনা তৈরী করতে পারেনি। এ সংখ্যায় লিখেছেন শান্তশীল দাস, গোপাল ভৌমিক, নিখিলরঞ্জন চক্রবর্তী, পূর্ণেন্দু চক্রবর্তী, রামকৃষ্ণ চন্দ, কুমারেশ ঘোষ এবং আরো কয়েকজন।

কবিতা এবং কবিতা (তৃতীয় সংকলন)—সম্পাদক : শান্তিকুমার ঘোষ। ১৬/১ ফার্ণ রোড, কলকাতা ১৯। পঞ্চাশ পয়সা।

অনেক কবিতার সঙ্গে তিনটে গদ্যরচনা ও একটি কবিতানাটক ছাপা হয়েছে এই সংকলনে। বিশেষ করে, সুবন্ধু ভট্টাচার্যের 'ষাট দশকের কবি' শীর্ষক আলোচনাটি ভালো। কবিতা লিখেছেন রাধানাথ মণ্ডল, সুশান্ত ঘোষাল, তরুণ চক্রবর্তী, সুভাষ সমাদ্দার, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, সুশান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, সমীর রুদ্র, কার্ত্তিকচন্দ্র মিত্র, বিশ্বেশ্বর সামন্ত, সৌরভ ঘটক এবং আরো কয়েকজন।

সময়কাল (বৈশাখ ১৩৭৯)—সম্পাদক : বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। ৩৬, নেপাল সাহা লেন, হাওড়া—১। মূল্য : এক টাকা।

এ সংখ্যার দুটি উল্লেখযোগ্য গল্প লিখেছেন শিশির লাহিড়ী ও সুনীল হাজরা। কবিতাগুলিও মন্দ নয়। তবে ভালো লাগে শিপ্রা ঘোষ, চিন্ময় গুহঠাকুরতা ও শম্ভু রক্ষিতের কবিতা তিনটি। পত্রিকা প্রসঙ্গে সম্পাদক লিখেছেন : 'সময়কালকে অস্বীকার করা প্রগতিহীনতার লক্ষণ, পশ্চাদ্গতির প্রতীক। পুরানো, জীর্ণ ধ্যান-ধারণা ভেঙ্গে নতুন চিন্তা নতুন পথাতির প্রচেষ্টাই হল সমকালীন চিন্তা। এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী হয়ে সময়কালের প্রকাশ।' পত্রিকার প্রচ্ছদ ও অংগসজ্জা রুচিসম্মত। আবদুল মান্নান সৈয়দের ছোট গল্প : ধনুর্বান, ধনুর্ভঙ্গ' শীর্ষক প্রবন্ধটির পুনর্মুদ্রণ সময়োপযোগী হয়েছে।

জ্যোতের কড় : সম্পাদক : জীবন সরকার, বিশ্বনাথ ঘোষ ও কুমারেশ চক্রবর্তী। ৪, অলরেট কাস্ট লেন, কলকাতা ১৭। পঁচিশ পয়সা।

নজরুল জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত এই সংকলনে লিখেছেন অন্নদাশঙ্কর রায়, মানস রায়চৌধুরী, শিশির ভট্টাচার্য, শান্তি চট্টোপাধ্যায়, কুমারেশ চক্রবর্তী, জীবন সরকার এবং আরো অনেকে। নজরুল প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ, মোহিতলাল ও শৈলজানন্দের তিনটি রচনাংশের পুনর্মুদ্রণ সময়োপযোগী হয়েছে।

গোধূলি (কিশোর সংখ্যা) সম্পাদক : অশোক চট্টোপাধ্যায়। পোঃ গোন্দলপাড়া, চন্দন-নগর, হুগলী। পঞ্চাশ পয়সা।

মফস্বল শহর থেকে বেরুলেও পত্রিকাটি নিম্নমানের নয়। বেশ আন্তরিকতার সঙ্গেই পত্রিকাটি বের করেন কর্তৃপক্ষ। এ সংখ্যায় লিখেছেন বোম্বানা বিশ্বনাথন, জানব মৈত্র, অমল হালদার, সরোজকুমার চক্রবর্তী রাণু সমাদ্দার, কাজল রায়, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিল সমাদ্দার, অসীম বন্দ্যোপাধ্যায় ও অশোক চট্টোপাধ্যায়।

সপ্তদীপা (ত্রৈমাসিক : ৬ষ্ঠ বর্ষ : ১ম সংখ্যা '৭২)—সম্পাদক : রমেন দত্ত, জীবনময় দত্ত। এ।১২৬ কংকরবাগ কলোনী, পাটনা-১। এক টাকা।

প্রবাসী বাঙালীদের সাহিত্য পত্রিকাটির সবাংগে বল ও আন্তরিকতার ছাপ। নানান অসুবিধা ও প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও সাহিত্য-পিপাসু তরুণদের এই উদ্যম ও সাহিত্য-প্রীতি অভিনন্দনযোগ্য। মুদ্রণ পরিচ্ছন্নতায় মন টানে। বিষয়বৈচিত্র্যে সকল শ্রেণীর সাহিত্যপাঠকদের খুশী করবে। এ সংখ্যার বিশেষ উল্লেখ্য লেখা হল তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপ্রকাশিত রচনাটি : 'বাঙালী : ইতিহাসের পথ ধরে'। বাঙালী-প্রেমী পাঠকদের বিস্তর চিন্তার খোরাক এর মধ্যে আছে। সুবোধকুমার চক্রবর্তীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাতে উজ্জ্বল : 'সাহিত্যের ব্যবসা' নিবন্ধটি উল্লেখ করার মতো। এছাড়া ছাপা হয়েছে নানান কবিতা ও আলোচনা।

ছোটদের কাগজ (১২শ বর্ষ : ৬ষ্ঠ সংখ্যা : '৭২)—সম্পাদক : জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুণ্ডু। ১৯ ললিতমোহন ভট্টাচার্য স্ট্রীট, শ্রীরামপুর, হুগলী। পঞ্চাশ পয়সা।

ছোটদের কাগজে ছোটদের জন্যে লিখেছেন বড়োরা। ছোটদের কিছু লেখাও ছাপা হয়েছে। লেখাগুলি ছোটদের আনন্দের কিছু সং শিক্ষাও দেবে।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনারূপায়ণে ব্যাঙ্কের ভূমিকা

সমর দত্ত

ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে ১৯৪৭ খৃঃ ১৫ আগস্ট। এর পাঁচ বৎসরের মধ্যে স্বাধীন ভারতে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং বৈষয়িক উন্নতির উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত অর্থনীতির কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, স্বাধীনতার পূর্ববর্তী কাল থেকেই এদেশে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার চিন্তা এবং প্রস্তাবনার সূত্রপাত হয়। ১৯০৪ খৃঃ স্যার এম বিশ্বেশ্বরায় 'ভারতের পরিকল্পিত অর্থনীতি' নামক এক পুস্তকে পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করেন। ১৯০৮ খৃঃ জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর প্রচেষ্টায় ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা রচনার জন্য পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠিত হয়। যুদ্ধের ফলে এই কমিটির কাজ বিশেষ অগ্রসর হতে পারেনি। তবে কমিটির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক কে টি শাহের সম্পাদনায় কতকগুলি মূল্যবান রিপোর্ট প্রকাশিত হয়।

ভারত সরকার উদ্যমন পরিকল্পনা রচনার জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করে ১৯৪১ খৃঃ। পরে এই কমিটির স্থান অধিকার করে 'পুনর্গঠন কমিটি'। ১৯৪০ খৃঃ শেষের দিকে বোম্বাইয়ের বারজন শীর্ষস্থানীয় শিল্পপতি একটি অর্থনৈতিক পরিকল্পনা পেশ করে। এই পরিকল্পনাটি 'বম্বে পরিকল্পনা' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন শতকরা ১০০ এবং শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন শতকরা ৫০০ বৃদ্ধি করাই এই পরিকল্পনাটির মূল উদ্দেশ্য ছিল। ১৫ বৎসরের মধ্যে বাধ্য পিছু আয় বাড়ে শতকরা ১০০ টাকা বৃদ্ধি পায় সেটাও ছিল এই পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য। মানবেন্দ্রনাথ রায় তাঁর 'গণ পরিকল্পনার' কথা ঘোষণা করেন। ১৯৪১ খৃঃ স্যার আর্দেশীর দালালের পরিচালনায় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ গঠিত হয়। তৎকালীন প্রাদেশিক ও দেশীয় রাজ্যগুলির সরকারকে পরিকল্পনা বিভাগ গঠন ও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রচনার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। ১৯৪৬ খৃঃ ভারতবর্ষে জওহরলালের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে পরিকল্পনার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞের জন্য শ্রী-কে সি নিয়োগীর সভাপতিত্বে একটি উপদেষ্টা পরিকল্পনা বোর্ড গঠিত হয়। ১৯৪৮ খৃঃ ভারত সরকারের শিল্প নীতি ঘোষিত হয়। এই শিল্পনীতিতে জাতীয় পরিকল্পনা কমিশন গঠন ও মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা উল্লেখ করা হয়। ১৯৫০ খৃঃ ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়া কেন্দ্রের ১৯৫১ খৃঃ। ১৯৫২ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে চূড়ান্ত আকার প্রাপ্ত প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাটি ভারতীয় পার্লামেন্টের অনুমোদন লাভ করে। ইতিমধ্যে যে সমস্ত ছোট-খাটো উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রচলিত ছিল সেগুলিকে এই পরিকল্পনার সঙ্গে সন্নিবিষ্ট করে পরিকল্পনাটির সময় নির্দিষ্ট করা হয় ১৯৫১ খৃঃ ১লা এপ্রিল থেকে ১৯৫৬ খৃঃ ৩১শে মার্চ—এই পাঁচ বৎসর।

উল্লিখিত সময় অতিক্রান্ত হবার পর দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজে হাত দেওয়া হয়। ১৯৬১ সালের ৩১ মার্চ দ্বিতীয় পরিকল্পনার কার্যকাল শেষ হলে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রবর্তিত হয়। তৃতীয় পরিকল্পনার কাজ শেষ হবার পর পরিকল্পনা থেকে তিন বৎসর ছুটি (প্ল্যান হলিডে) গ্রহণ করা হয়। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজ ১৯৬৯-৭০ সালে সুরু হয়। বর্তমানে এই পরিকল্পনার কাজ চলছে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য ছিল (ক) যুদ্ধ ও দেশ বিভাগজনিত দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অসমতা দূর করা এবং (খ) উন্নয়নমূলক কর্মপদ্ধতির সাহায্যে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা ও জনসাধারণের জন্য পূর্ণতর বৈচিত্র্যময় জীবন যাপনের সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করা।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য ছিল (ক) উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করা, (খ) শিল্পের ব্যাপকতর ভিত্তি স্থাপন করা, (গ) কর্মসংস্থানের উপর গুরুত্ব অর্পণ করা এবং (ঘ) সমাজতান্ত্রিক পক্ষপাতের কার্যকর রূপ দেওয়া।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল (ক) পরিকল্পনাধীন সময়ে সংগৃহীত শতকরা ৫ অথবা তদূর্ধ্ব হারে জাতীয় আয় বৃদ্ধি করা। পরবর্তী পরিকল্পনাগুলিতে যাতে ঐ হার বজায় থাকে সেই পরিমাণ বিনিয়োগের ব্যবস্থা করা।

(খ) খাদ্যশস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করা এবং শিল্প ও রপ্তানি বাণিজ্যের প্রয়োজন মেটাবার জন্য অন্যান্য কৃষিজাত পণ্যোৎপাদন বৃদ্ধি করা।

(গ) আগামী ১০ বৎসরের মধ্যে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করা, যার ফলে অধিকতর শিল্পোন্নয়নের সকল উপকরণ দেশের অভ্যন্তরেই লাভ করা সম্ভব হয়। এই উদ্দেশ্যে ইস্পাত, রাসায়নিক পদার্থ, জ্বালানি ও বিদ্যুৎশক্তি এবং যন্ত্রপাতির উৎপাদন ক্ষমতা সম্প্রসারণ করা।

(ঘ) দেশের জনশক্তির সদ্ব্যবহার করা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সুবিধা ব্যাপকতর করা।

(ঙ) অর্থনৈতিক বৈষম্য যতদূর সম্ভব দূর করে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠনের পথে আরও এক ধাপ অগ্রসর হওয়া।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হল ভারতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্থায়িত্ব রক্ষা করে অধিকতর বৈষয়িক উন্নতির পথ প্রশস্ত করা। বৈদেশিক ঋণ থেকে দেশকে যতদূর সম্ভব মুক্ত করে আত্মনির্ভরশীল করে তোলাও এই পরিকল্পনাটির অন্যতম বিশেষ উদ্দেশ্য।

এই হল ভারতের পরিকল্পিত অর্থনীতির সংক্ষিপ্ত পরিচয়। এখন দেখা যাক, উল্লিখিত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির কার্যকর রূপায়নে এদেশের ব্যাঙ্কগুলি বিশেষ করে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি এতদিন কি ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এই প্রসঙ্গে একথা বলা প্রয়োজনীয় যে, প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে ভারতবর্ষের অন্যান্য ব্যবসায়ীদের মত ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীদেরও একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল মুনাফা অর্জন করা। ঐ যুগে ব্যাঙ্কিং পদ্ধতি অনুসরণেই এদেশে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। আমানতকারীদের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করে চড়া সুদে অর্থলগ্নী করাই ছিল প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে ব্যাঙ্ক ব্যবসায় প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু এ যুগে অর্থাৎ স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা চালাতে যা বোঝায় তা কেবল গতানুগতিক পদ্ধতিতে এই ব্যবসা পরিচালনা করে প্রভূত মুনাফা অর্জন করা নয়। এ যুগের ব্যাঙ্ক পরিচালনার বিশেষ উদ্দেশ্য দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য ব্যাঙ্কের ওপর প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে অর্পিত দায়িত্ব

পালন করা। এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে স্বাধীনতালাভের ভারতে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ এই ব্যবসাটিকে নতুন প্রণালীতে পরিচালনার জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠেছেন। সম্প্রতিকালে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির নীতিগত পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে। দেশের বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক বিশেষ করে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের মূল অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে ঋণ সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ করছে; পরিকল্পিত অর্থনীতির স্বার্থিক রূপায়ণের প্রয়োজনানুযায়ী অনুসারে ঋণ বন্টন করছে, ব্যাঙ্কশিল্প সম্প্রসারণের ব্যাপারে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে নানা বৈষম্য হ্রাস করবার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করছে এবং জেলাভিত্তিক ঋণদান পদ্ধতির ব্যাপারে সচেষ্ট হচ্ছে। এমনিভাবে নবীন ভারতের অর্থনৈতিক এবং বৈষয়িক উন্নতির উদ্দেশ্যে এদেশের ব্যাঙ্কগুলি নিজ নিজ কর্তব্য সমাধানে বদ্ধপরিকর হয়েছে। এই কর্তব্য সম্পাদনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবার পূর্বে ব্যাঙ্ক পরিচালনাঘটিত ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করে ব্যাঙ্ক ব্যবসার কাঠামো যাতে সুদৃঢ় করা যায় এবং দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে ব্যাঙ্কের কর্মধারা যাতে উন্নততর হয় সেই উদ্দেশ্যে ভারত সরকার একটি রূপান্তরকারী আইন প্রবর্তন করে। এই আইনটি ১৯৪৯ খৃঃ ব্যাঙ্কিং নিয়ন্ত্রণ আইন নামে পরিচিত। এই আইনটির মূল ধারাগুলি এইরূপ :—

(ক) ব্যাঙ্কিং কোম্পানীর সূত্র নির্ধারণ।

(খ) ব্যাঙ্ক হিসাবে গণ্য নয় এমন কোম্পানীগুলির অর্থলগ্নীর ব্যবস্থা নিষিদ্ধকরণ।

(গ) প্রচলিত ব্যাঙ্কগুলিকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে লাইসেন্স গ্রহণে বাধ্যকরণ।

(ঘ) ব্যাঙ্ক পরিচালনায় ন্যূনতম মূলধনের পরিমাণ নির্ধারণ।

(ঙ) তপশীলবহির্ভূত ব্যাঙ্কগুলিকে নির্দিষ্ট পরিমাণ নগদ টাকা সংরক্ষণে বাধ্যকরণ।

(চ) ব্যাঙ্কগুলির শাখা সম্প্রসারণের ব্যাপারে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণ।

(ছ) অনুমোদিত মূলধন বিনিয়োগের ব্যাপারে নির্দিষ্ট সীমা রক্ষার জন্য ব্যাঙ্কগুলিকে বাধ্যকরণ।

(জ) ভারতের বাইরের বিধিবদ্ধ ব্যাঙ্কগুলিকে এই আইনের গণ্ডীর মধ্যে অন্তর্ভুক্তকরণ।

(ঝ) ব্যাঙ্কগুলির ব্যবহারের জন্য বিশেষ ধরনের ব্যালেন্স সীটের প্রচলন এবং ব্যাঙ্কগুলির নিকট থেকে প্রয়োজনীয় রিটার্ণ আদায়ের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে ক্ষমতা দান।

(ঞ) ব্যাঙ্কগুলির বইপত্র এবং হিসাব-নিকাশ পরীক্ষার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে ক্ষমতা দান।

(ট) রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক ঋণদান সংক্রান্ত মোল নীতি নির্ধারণ এবং ব্যাঙ্কগুলি কর্তৃক ঐ নীতি অনুসরণ।

(ঠ) আমানতকারীদের স্বার্থের পরিপন্থী কর্মের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে প্রয়োজনমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর ক্ষমতা অর্পণ।

(ড) ব্যাঙ্কের কারবার গুটানো সম্বন্ধে নিয়ন্ত্রকরণ।

(ঢ) সঙ্কটকালীন অবস্থায় ব্যাঙ্কগুলিকে সাহায্য দানের ব্যাপারে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ওপর ক্ষমতা অর্পণ।

একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, এই আইনটির অনুকূলতায় ভারতের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির ভিত্তি সুদৃঢ় হয়েছে এবং সুনিয়ন্ত্রিতভাবে ব্যাঙ্কগুলির সম্প্রসারণ ঘটেছে। তথাপি বৃহৎ ব্যাঙ্কগুলির ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে আমানতকারীদের স্বার্থের ধারক ও বাহকদের মুনাফা অর্জন অব্যাহত থাকে। সেই জন্য কেবলমাত্র আলোচ্য আইনটি প্রবর্তন করেই ভারত সরকার ক্ষান্ত হয় নি। অর্থনৈতিক সুফল ব্যাপারে সরকারী আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য, জাতীয় অগ্রাধিকার ও লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনের জন্য এবং সর্বোপরি ভারতীয় সমাজতান্ত্রিক আদর্শের বাস্তব রূপায়ণের উদ্দেশ্যে সরকার ব্যাঙ্কশিল্পের রাষ্ট্রীয়করণ বিশেষ প্রয়োজনীয় মনে করে। তদনুসারে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ১৯৫৫ খৃঃ ১ জুলাই রাষ্ট্রায়ত্ত হয় এবং স্টেট ব্যাঙ্ক জন্মলাভ করে। এই নবজাত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক প্রসঙ্গে স্টেট ব্যাঙ্কের মুখপত্র 'মার্চেন্ট নিউজ-এ একটি বিশেষ সংবাদে বলা হয়:—

"The primary intention of this move was to extend banking facilities on a large scale, more particularly in the rural and semiurban areas and for diverse other public purposes, such as assistance to small-scale industries, co-operative and other development work which would stimulate economic expansion. The role of the State Bank of India has also been to set a pattern for the purposive and dynamic growth of banking in India and for taking up such developmental banking as may not prima-facie appear to be acceptable by traditional concepts."

জাতীয় অর্থনীতির উন্নয়নের উদ্দেশ্যে বিগত ১৪ বৎসর যাবৎ রাষ্ট্রায়ত্ত স্টেট ব্যাঙ্ক ভারতবর্ষের বড় বড় শহর ছাড়াও শহরতলী অঞ্চলে এবং গ্রাম ভারতের বিভিন্ন অংশে জনসাধারণের নিকট ব্যাঙ্ক শিল্পের সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে দিচ্ছে। এই ব্যাঙ্কটি বিগত ১৯৭০ খৃঃ ৫২ কোটি টাকার কৃষি ঋণ দেয়। কৃষিকর্ম সংক্রান্ত আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং সার-বীজ ক্রয় করবার জন্যও অর্থাগত পরিমাণ ঋণ মঞ্জুর করে। এই ঋণের বৃহত্তাংশ সমবায় ব্যাঙ্কের মাধ্যমে প্রদত্ত হয়। ১৯৬৮ খৃঃ এই ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ ছিল ৬২·৭ কোটি টাকা এবং এই ঋণ ক্রমশ বর্ধিত হয়ে ১৯৬৯ খৃঃ শেষে ১৮৪·১ কোটি টাকায় পরিণত হয়। এইভাবে স্টেট ব্যাঙ্কের কৃষি ঋণ শতকরা ১৯০·৬ বেড়ে যায়। ১৯৫৬ খৃঃ ফেব্রুয়ারিতে শিল্প ঋণ বাবদ স্টেট ব্যাঙ্ক প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ ছিল ১১ লক্ষ টাকা। ঐ টাকার পরিমাণ ক্রমশ বেড়ে ১৯৭০ খৃঃ শেষে ২০০ কোটি টাকার দাঁড়ায়। ১৯৬৯ খৃঃ ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নের জন্য একটি নতুন পরিকল্পনা প্রচলিত হয়। ফলে অধিকতর উদার ঋণ লাভের পথ উন্মুক্ত হয় এদের জন্যে। 'ওয়ার হাউসিং' পরিকল্পনা অনুসারে স্টেট ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ ১৯৫৬ খৃঃ শেষে ছিল ০·৮ কোটি টাকা। ঐ টাকা ক্রমশ বেড়ে ১৯৬৯ খৃঃ শেষে ৬·১ কোটি টাকায় পরিণত হয়। তাছাড়া এই ব্যাঙ্কটি বহির্বাণিজ্যের সমাক উন্নতির জন্য এবং দেশের সমবায় সংস্থাগুলির উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে যথেষ্ট পরিমাণ আর্থিক ঋণের যোগান দিচ্ছে। অপর দিকে রাষ্ট্রীয়করণের ১৪ বৎসরে এই প্রতিষ্ঠানে প্রায় ১২শ নতুন কার্যালয় স্থাপিত হয় এবং

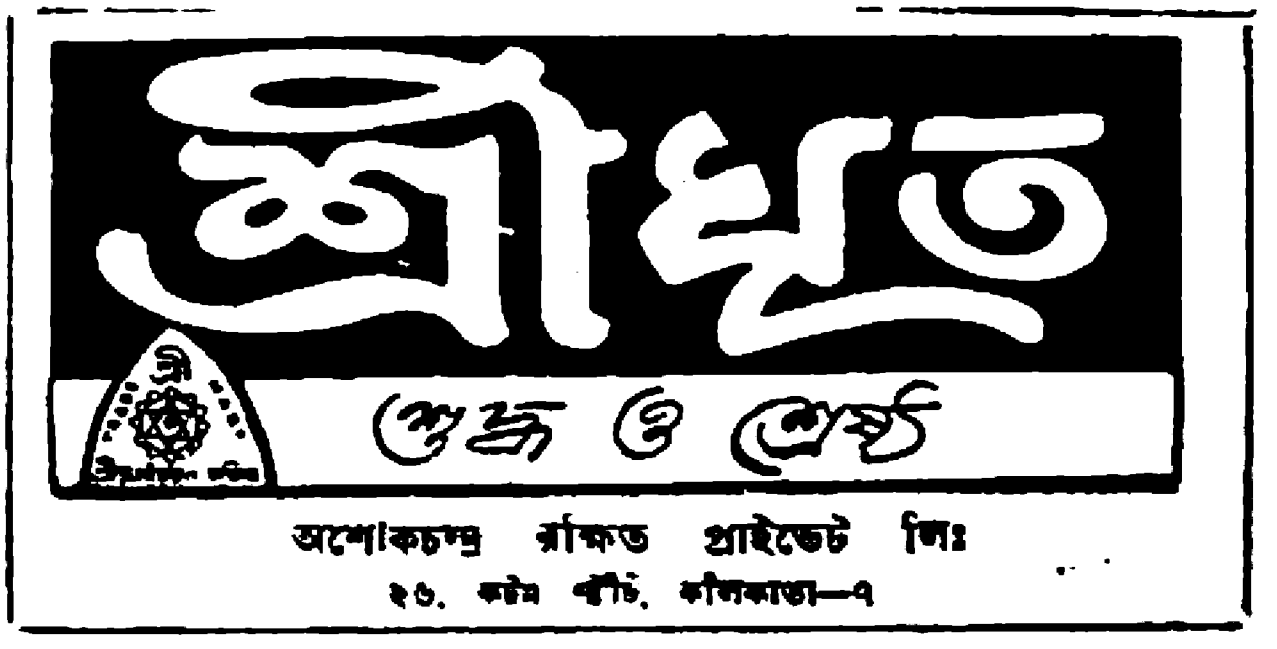

আনুমানিক ৩৫ হাজার থেকে ৪০ হাজার নতুন লোক প্রতিষ্ঠানটির বিভিন্ন কার্যালয়ে নিযুক্ত হয়।

স্টেট ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্ব-হতে এবং পরবর্তীকালে সরকারী উদ্যোগে বিভিন্ন অর্থনৈতিক সংস্থা স্থাপিত হয়। দেশের পরিকল্পিত অর্থনীতির রূপায়ণে এই সংস্থাগুলির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। এই সংস্থাগুলির মধ্যে ১৯৪৮ খৃঃ বিভিন্ন শিল্পোদ্যোগে মধ্য-মেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী অর্থদানের জন্য ইণ্ডাস্ট্রীয়াল ফীনান্স কর্পোরেশন গঠিত হয়। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মাঝারি এবং ছোট শিল্পগুলির অর্থনৈতিক সাহায্যের জন্য স্টেট ফীনান্সীয়াল কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। শিল্পোন্নয়নের ব্যাপারে ১৯৫৪ খৃঃ ন্যাশানাল ইণ্ডাস্ট্রীয়াল ডেভালপমেণ্ট কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ১৯৬০ খৃঃ থেকে এই প্রতিষ্ঠানটির ভূমিকা কেবলমাত্র পরামর্শ-দানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। ১৯৫৫ খৃঃ বিশ্বব্যাঙ্কের আনুকূল্যে ইণ্ডাস্ট্রীয়াল ক্রেডিট এণ্ড ইনভেস্টমেণ্ট কর্পোরেশন স্থাপিত হয়। এর উদ্দেশ্য ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে ঝুঁকি বহন করবার জন্য মূলধনের ব্যবস্থা করা। ১৯৫৫ খৃঃ প্রতিষ্ঠিত হয় ন্যাশানাল স্মল ইণ্ডাস্ট্রীজ কর্পোরেশন। এর অন্যতম উদ্দেশ্য বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি আমদানী করে দেশের ক্ষুদ্র শিল্পের উদ্যোক্তাদের সুবিধাজনক সর্তে বিক্রয় করা। ১৯৬২ খৃঃ একটি আমানত বীমা কর্পোরেশন গঠিত হয়। এই কর্পোরেশনের উদ্দেশ্য কোন ব্যাঙ্কের পতন ঘটলে বীমাকারী ব্যাঙ্কের আমানতকারীদের পাওনা মেটাবার জন্য বীমা তহবিল থেকে অর্থ যোগান দেওয়া। ১৯৬৪ খৃঃ ইণ্ডাস্ট্রীয়াল ডেভালপমেণ্ট ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। এর উদ্দেশ্য দেশের বিভিন্ন ব্যাঙ্ক এবং অর্থনৈতিক সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা, এগুলির অর্থনৈতিক অবস্থান উন্নতি সাধন করা এবং সামগ্রিক ভাবে দীর্ঘমেয়াদী শিল্প পরিকল্পনাগুলিকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া।

কৃষি ঋণের জন্য সমবায় ব্যাঙ্কগুলি ক্রমশঃ সম্প্রসারিত হচ্ছে। ১৯৬৩ খৃঃ এগ্রিকালচারাল রিফাইনান্স কর্পোরেশন সংগঠিত হয়। কৃষি এবং কৃষি সংক্রান্ত আনুষঙ্গিক বিষয়গুলির সার্বিক উন্নয়নের জন্য দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণের যোগান দেওয়াই এই কর্পোরেশনের মুখ্য উদ্দেশ্য। কেন্দ্রীয় জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক, রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক, ভূসম্পত্তি ব্যাঙ্ক এবং অনুমোদিত সমবায় সমিতিসমূহ কৃষি উন্নয়নের উদ্দেশ্যে যে ঋণ দেয় তার বিরুদ্ধে এই কর্পোরেশন পুনরায় অর্থনৈতিক দামন লাভের সুযোগ দেয়।

ভারত সরকার ১৯৬৯ খৃঃ ১৯ জুলাই পঞ্চাশ কোটি অথবা তদূর্ধ্ব আমানতের অধিকারী এইরূপ ১৪টি বড় বড় বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ককে একটি অর্ডিনান্স বলে রাষ্ট্রায়ত্ত করে নেয়। এই অর্ডিনান্সটি যথাসময়ে কিঞ্চিৎ সংশোধিত আকারে ব্যাঙ্কিং কোম্পানীজ (অ্যাকুইজিসন অ্যাণ্ড ট্রান্সফার অব আণ্ডারটেকিংস) আক্ট ১৯৭০ নামে একটি পূর্ণাঙ্গ আইনে পরিণত হয়। এই প্রসঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলেন যে, ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণের ফলে ভারতের বহু ঘোষিত পরিকল্পনা ও নীতি রূপায়ণের ক্ষেত্রে একটি নতুন এবং উজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে। প্রধান-মন্ত্রীর মতে এদেশে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের দিকেও ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণ একটি দৃঢ় পদক্ষেপ। এই রাষ্ট্রীয়করণের মূল উদ্দেশ্যগুলি এইরূপ—(ক) মুষ্টিমেয়ের নিয়ন্ত্রণ খর্ব করা। (২) কৃষি, শিল্প এবং রপ্তানি বাণিজ্যের জন্য অধিক পরিমাণ ঋণের ব্যবস্থা করা। (গ) ব্যাঙ্ক পরিচালনার মধ্যে পেশাগত দৃষ্টিভংগী সৃষ্টি করা। (ঘ) এক শ্রেণীর নতুন শিল্পোদ্যোক্তা সৃষ্টি করা। (ঙ) ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষণ ও চাকুরীর যুক্তিসঙ্গত শর্তাবলী রচনা করা।

রাষ্ট্রীয়করণের প্রথম বৎসরে অর্থাৎ ১৯৬৯ খৃঃ জুলাই মাস থেকে ১৯৭০ খৃঃ জুন মাস পর্যন্ত ১৪টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক কর্তৃক ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ১০৪৩টি নতুন শাখা কার্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৪টি ব্যাঙ্কের রাষ্ট্রীয়করণের সময়ে ব্যাঙ্কগুলি প্রদত্ত কৃষি ঋণের পরিমাণ ছিল ২৭ কোটি টাকা। রাষ্ট্রীয়করণের প্রথম বৎসরে এই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি ৫৪ কোটি টাকার নতুন ঋণের যোগান দেয়। রাষ্ট্রীয়করণের প্রথম বৎসরেই এই ব্যাঙ্কগুলি ক্ষুদ্র শিল্প খাতে ৫১ কোটি টাকার নতুন ঋণ মঞ্জুর করে। ফলে এই ঋণের পরিমাণ ১৯৭০ খৃঃ মার্চ মাসের শেষে ১৯১ কোটি টাকায় পরিণত হয়। তাছাড়া স্ব-নিযুক্ত কর্মীদের অর্থাৎ ট্যাক্সীচালক, ট্রাকচালক এবং বিভিন্ন প্রকার যানবাহন চালককে ১৭ কোটি টাকার নতুন ঋণ প্রদান করে। আমানত সংগ্রহের ব্যাপারেও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির অবস্থা আশাপ্রদ, কারণ উল্লিখিত বৎসরে সংগৃহীত আমানতের পরিমাণ ৩৮৭৪-৩ কোটি টাকা থেকে ৪৩৬০-৫ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। তবে আমানত সংগ্রহের ব্যাপারে এদেশের ব্যাঙ্ক-গুলির বিশেষ করে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির অনেক কিছু করণীয় আছে। বলা বাহুল্য সংগৃহীত আমানতই ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের প্রাণবায়ু।

যাই হোক আজ থেকে প্রায় বিশ বৎসর আগে ভারত সরকার যে পরিকল্পিত অর্থ-নীতির কর্মসূচী গ্রহণ করে দেশের পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনাগুলি সেই পরিকল্পিত অর্থনীতির প্রতিচ্ছবি। এই পরিকল্পনা-গুলির সার্থক রূপায়ণই এদেশের অর্থ-নৈতিক অগ্রগতির পরিচায়ক। ভারতের মত একটি গণতান্ত্রিক দেশে অর্থনৈতিক তথা বৈষয়িক উন্নয়ন প্রচেষ্টায় দেশীয় সরকার ব্যতীত বিভিন্ন অর্থনৈতিক সংস্থারও সক্রিয় ভূমিকা অপরিহার্য। সেইজন্য ভারতের পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির রূপায়ণে সর-কারী প্রচেষ্টার পরিপূরকরূপে এদেশের ব্যাঙ্কগুলি নিজ নিজ কর্তব্য সম্পন্ন করে চলেছে। একথা অনস্বীকার্য যে দেশোন্নয়নের কল্যাণকর কর্মে বিগত দুই দশকে ব্যাঙ্ক-গুলির ভূমিকা ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হয়েছে। সরকারী কর্ম-প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ব্যাঙ্কগুলি নিজস্ব কর্মক্ষেত্রের পরিধি যত বিস্তার করবে দেশের অর্থ-নৈতিক এবং বৈষয়িক উন্নতির পথ তত প্রশস্ত হবে।

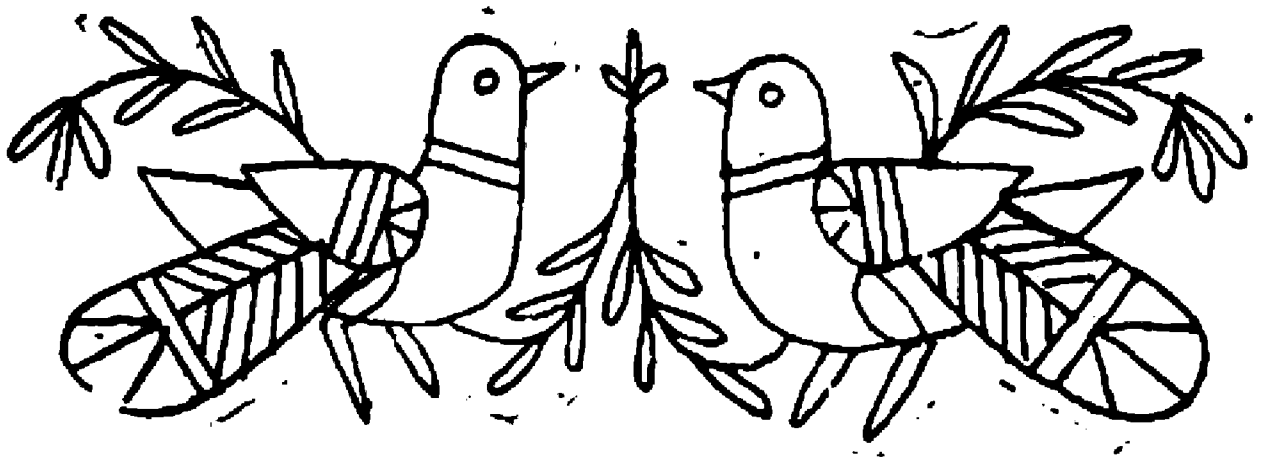

CENTRAL LIBRARY

দুঃখে সুখে বাঁচা

নিখিলচন্দ্র সরকার

বারান্দা দোরের রোদ এখন ঘরে এসে পড়েছে। ঘরের সবগুলো জানলাই খোলা। সানু গেল-ডোবক-বালিশ রোদে মেলে দিয়ে এক এক করে। মানু ভেতরে। শ্যাওটা আস্তো করে পোঁচিয়ে নিয়েছে, চুল শক্ত করে বেঁধে নিয়েছে। ঘর ঝাড়পোঁছ করছে সে। আজ সকালে আর বেরোয় নি মানু। উঠতে দেরি হয়েছিল, চা খেতে খেতে আরো বেলা হলো। রোদ্দুরে বেড়াতে ভাল লাগে না তার। তার চেয়ে ঘরের কাজকর্ম নিয়েই মত্ত হয়ে পড়েছে। নীলিমা দেবী জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কিরে, আজ বেরোলি না যে!'

'এত বেলায় কোথায় যাব আর। তার-চেয়ে বরং জামা-কাপড় সেদ্ধ করি, ঘরে বসে জমেছে, ঝাড়পোঁছ করি।' বলে মানু চাদর মশারি পাঞ্জাবি পৌঁজে, সারা স্যুটকেস থান কাপড় বিছানার চাদর, মশারী, বালিশের ওয়াড় সব এক সঙ্গে জড়ো করে সাবান গোলা দিয়ে সেদ্ধ বসাল। তারপর ঘর পরিষ্কারের কাজে হাত লাগিয়েছে। সানুর সঙ্গে তার কথা হয়ে গেছে দুজনই ভাগ ভাগ করে কাচবে।

সানু একটু বিরক্ত হয়েছে, বলল, 'এক-দিনে অত আচার কি দরকার ছিল রে?'

'দরকার ছিল মানে, এত মরশুম হয়েছে যে দেখা যায় না আর।'

'তাই বলে একসঙ্গে সব?' সানুকে সামান্য অপ্রসন্ন দেখাল।

'আমিও তো বারণ করেছিলাম, এত-গুলো একদিনে পারবি না, মেয়ের কানে গেল না কথা।'

'আধার একটা চুবড়ে আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না।'

'ও তো ওই রকমই, ধরবে না ধরবে না, ধরলে আবার সব নিয়ে পড়বে, শামলনো তখন দায়।'

এটা আবার বেশি বোঝা।' সানু অন্য-দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

'আমি না ধরলেও তো আধার হয় না দৌদি।' মানুও অসন্তুষ্টের গলায় বলল, 'অত কথায় কি দরকার, তোকে কাচতে হবে না, আমি একলাই পারবো।'

'আর বলিস না, আমার জ্বালা আছে সব।'

'জানিস তো জানিস, চুপ কর এবার।'

'আউলে নিলেই হয় না, সব কাজেরই একটা ধারা আছে।'

'বুঝেছি বুঝেছি, আর বলতে হবে না।' মানু ঘরের ঝুল পরিষ্কার করতে করতে একটু ঝাঁজের সঙ্গে বলল, 'সেই জন্যেই তো এই নোংরাও চোখে পড়ে না!' মানুর গলায় সামান্য উপহাস ছিল, সে হাসছিল।

'আর কথা বাড়াস না, ওর মরন ওকে করতে দে।' নীলিমা দেবী সানুর মুখের ওপর চোখ রেখে বললেন, 'আর একটা থালা নিয়ে আয়, আমি বারান্দায় বসছি।' নীলিমা দেবী বাটি, বাঁচা তরকারীর ঝুড়ি, আর একটা থালা নিয়ে এসে বারান্দার রোদে বসেছেন। সানুও থালা নিয়ে এলো। এসে মার পাশে বসে পড়েছে। ঝুড়ি থেকে গতকালের অর্ধেকটা লাউ তুলে নিলেন নীলিমা দেবী, খানিকটা টুকরো টুকরো করে সানুকে বললেন, 'যা জলে ফেলে নিয়ে আয়। এই কাঁচা লঙ্কাগুলো দিস।'

সানু উঠে গেল।

কটা সিম আলু বাঁচাকলা আউ আলা-আলা করে কেটে এক জায়গায় রাখলেন নীলিমা দেবী। পরিমাণটা একবার চোখে নিলেন হাত দিয়ে, পরে নিজের মনেই অস্ফুটে বললেন, 'এতেই হয়ে যাবে, আর লাগবে না।'

সানু ফিরে এসে আগের জায়গায় বসেছে, মার দিকে চেয়ে আস্তে করে শুধোয়, 'কি হবে, পুতো?' একটুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার জিজ্ঞেস করল, 'বাড়ি দেবে না এতে?'

'দেবো, না দিলে খাব হবে কেন?' নীলিমা দেবী হাসতে হাসতে মাথা নাড়া-লেন। তাঁর বাঁধাকপি পুটাছলেন বসে সানু করে। সানু মাথা নীচু করে কাজ-পটে যাচ্ছে।

একটু পরে সানু মার মুখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে বলল, 'এত তরকারী দিয়ে কি হবে!'

'অত কোথায় রে, নিমেষে এই একটু-খানি হয়ে যাবে।'

সানু হাসিমুখে বলল, 'আর কি কি হবে শুনি।'

'আবার কি, একটা ঘন্টো ভাল, বাঁধা-কপি আর বাজার থেকে মাছ টাছ আনলে ওদের জন্যে মাছের ঝোল এই তো!'

'আজ আর অতগুলো পদ না করলেও পারতে। একেই তো মনটা এই কাণ্ড করে বসে আছে।'

'অত আর কোথায়!'

'তুমি পারো!'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন নীলিমা দেবী। হঠাৎ কি যেন মনে পড়ে গেল তার, বললেন, 'আমারই কি আর ভাল লাগে কিছু, করতে হয় তাই।' নীলিমা দেবী সানুর দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ, বললেন, 'খোকা যে আমাকে কোথে এভাবে জ্বালাবে, স্বপ্নেও ভাবি নি, আমার কপাল-টাই খারাপ।' একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন তিনি। বুকটা ঠেলে ঠেলে কেমন ধড়ফড় করতে থাকে। খোকা কবে ফিরে আসবে তার কাছে? সানু পাঁচ দিনেই এই দুঃখটা ভুলে থাকতে চায়, পারেনা। মনে হলে সব কেমন গোলমাল হয়ে যায়। একটু একটু করে মন্ত করে তুলেছিলেন কি এইজন্যে? ও কি একবারও মার কথাটা ভাবেনা? এত কষ্ট যে আর সইতে পারেন না তিনি। বুকটা ফেটে যায়। মার যে কী অপরাধ করেই না তিনি ফেলেছিলেন! ভাবা এক-আধটা চিঠিও আসত এখন অন্তত না। অন্তরঙ্গকে জিজ্ঞেস করেও ও-ও কিছু পরি-ষ্কার করে বলতে পারে না। শুধু শুধু

দীপেনকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'তুই না খোকা, আমার হাতের রান্না না হলে খেতে পারিস না! খুব কাক করে না বলাতিস আমায়, তোমার হাতের পরোটা নিরামিষ পেলে আমার আর কিছুই চাই না, মাছ-মাংসও কেলে দিতে পারি।' ওসব কথা কি করে যে ভুলে গেলি তুই! এখন কি খাস? জীব তো জানি, খাওয়া নিয়ে কত খুঁত-খুঁতানি তোর! তোর পেটই ভরবে না। আহা রে, কত রোগা হয়ে গেছিস না? আমি যে আর পারছি না রে। জানিস খোকা, তোর জন্যে তেঁতুলের আচার করে রেখেছি, তাড়াতাড়ি ফিরে আয়।'

নীলিমা দেবী মুখ তুলে সানুর দিকে তাকালেন। তার চোখ ভরা, স্নাপসা হয়ে উঠেছে এই সাত-সকালেই! আঁচল দিয়ে চোখ পরিষ্কার করে নিতে নিতে একটু ভাঙা ভাঙা গলায় বললেন, 'এই খুরো আর বাঁধাকপিটা খোকা খুব ভালবাসত, কী যে ও খুশি হতো না!' আবার একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো তাঁর। তরকারী কুটা শেষ হয়েছে। ঝুড়ি থেকে বেছে বেছে ছোট ছোট আলু বের করে থালায় রাখলেন, সানুকে বললেন, 'এগুলো নিয়ে গিয়ে সেদ্ধ বসা। ডালটা ফেলে না যায় যেন।'

সানু কোন কথা বলল না; আলু এবং কড়াইয়ের তরকারী নিয়ে চলে গেল। তারও কষ্ট হচ্ছিল ভাইয়ের জন্যে। মার মুখে এসব কথা শুনলে তারও খারাপ লাগে। সে নিজেও যে এরই মধ্যে সব হারিয়ে এখানে আছে, তার জন্যেও মার বুকে অহরহ এক যন্ত্রণা; অন্য ভাইবোনে মিলেই যেন মাকে এক নিদারুণ কষ্টের আগুনের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। মার কথা ভেবে সানুও কখনো কখনো তার নিজের দুঃখকে জোর করে সরিয়ে রাখতে চেয়েছে, পারে নি। ভাবলেও গায়ে কাঁটা দেয়। সে কি এতই পাপ করেছিল যে, বিধাতা এভাবে তার সব কেড়ে নিলেন! এর চেয়ে তাকেও নিলেন না কেন! নিজেকে সান্ত্বনা দেওয়ার মতন আর কি থাকল তার।

নীলিমা দেবী বসে থাকলেন। তিনিও অন্যমনস্কের মতন চেয়ে রয়েছেন সামনের দিকে। দেখছেন আবার দেখছেনও না কিছু, এমন একটা আচ্ছন্ন ভাব। বেলা বাড়ছে একটু একটু করে। মিষ্টি ছায়াটা ক্রমে ক্রমে শুকিয়ে যাচ্ছে। বঁটিটা একপাশে সরিয়ে রেখেছেন। রোদের গা থেকে হিমের ভাবটা ক্রমে কমে গেছে। হবে আজকের এই সকালটাকে কেমন ম্লান ও বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল। তারই মতন দুঃখী কেন।

এমন সময় অতসী এলো। হাসি হাসি মুখ। কাছে এসে তাঁর সামনে বসে পড়েছে। নীলিমাদেবীর মুখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে শুধোয়, 'কি ভাবছেন এমন করে?'

নীলিমা দেবী, বড় করে একটা নিশ্বাস ফেলে ওর দিকে তাকালেন, ম্লান একটু হেসে বললেন, 'ভাবনার কি শেষ আছে মা।' পরে সস্নেহে গলায় স্বর বললেন, 'তোমারও দেখছি সর্দি লেগেছে, মনেও তাই।'

'ও সারবেই, ঠেকানো যাবে না।' অতসী হেসেছিল, একটু পরে বলল, 'আপনি তো বেরোনই না, সানুদিও বন্ধ করে দিয়েছে।'

'আমার তো বয়েস হয়েছে, হাঁটতে কষ্ট হয়; সানুটোও কেন দিন দিন কেমন হয়ে যাচ্ছে: ওর দিকে আমি ভাল করে তাকাতে পারি না মা, কী যে একটা হয়ে গেল!' নীলিমা দেবীর কণ্ঠস্বরটা কেমন ভিজে উঠেছে। আবার একটু অন্যমনস্ক দেখালো যেন।

অতসী চুপ করে থাকল খানিকক্ষণ। মাঝে মাঝে নাটকের মতন কেন এক-একটা ঘটনা ঘটে যায়। বিশ্বাস হয় না তবু, ঘটে। দু দুটো আঘাত! সওয়া যে কত কঠিন, অতসীও তা বোঝে। এতে তো অনেক কিছুই হয়ে যেতে পারত, এরপরও যে সানুর মাথা ঠিক রেখেছে' এমনটা তো নাও হতে পারত! এসব ভাবলেই কষ্ট বাড়ে, মন খারাপ হয়ে যায়। অতসী প্রসঙ্গটা অন্যদিকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে বলল, 'আজ তো মন্টুও বেরোয় নি।' ওর মুখে হাসি।

'ঘুম থেকেই দেরি করে উঠছে; আমি বলেছিলাম, রোদ উঠে গেছে বলে গেল না।'

'আর আমি ওর জন্যে বসে আছি।' অতসী মুখে টিপে হাসল।

'এদিকে আবার একগাদা কাচাকাচি নিয়ে পড়েছে।'

'ও বেশ কাজের আছে।'

'ওই, খেয়াল হলে করবে, না হলে ছাড়বেও না।' নীলিমা দেবী অতসীর মুখের দিকে চেয়ে হাসলেন একটু, বললেন, 'তোমার মাকে আসতে বলো একদিন। কথাটথা বললেও মনটা হালকা লাগে।'

'মা তো বলছিল আসবে।' অতসী পলকে নীলিমা দেবীকে একবার দেখে নিল, পরে বলল, 'মারও তো কথা বলার লোক নেই।' বলতে বলতে বাটি থেকে কড়াইশুঁটির ঝুড়ি খানা তুলে নিয়েছে সে, একটু সময় কি ভাবল, হেসে হেসে বলল, 'কুটবি হবে নাকি?'

'না—, বাঁধাকপিতে দেবো।' নীলিমা দেবীও মুখের দিকে চেয়ে হেসে ফেললেন, বললেন, 'তোমার বুঝি এর কুটুনি খুব পছন্দ?'

'হুঁ—।' অতসী ঘাড় কাত করে হাসে।

'কিছু আছে এর ভেতরেই একদিন, বড় খোকাও এসব তাজাতুজি খুব পছন্দ করে, কিন্তু খেতে পারে না: ওইজন্যে কিছু করাও হয় না।' নীলিমা দেবী সস্নেহ দৃষ্টিতে অতসীকে একটু সময় দেখে নিয়ে কের বললেন, 'সব এখন ভুলে যাচ্ছি মা। মানুষ তো ধারার ধারে কাছেই যে'ষে না, তাছাড়া বিয়ে হলে ও পরের ঘরে চলে যাবে। কাউকে যে শিখিয়ে যাবো তারও উপায় নেই।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নীলিমাদেবী কি ভেবে অন্যমনস্ক হলেন।

অতসী কি জবাব খুঁজে ঠিক বুঝতে পারল না। সলজ্জ ভঙ্গিতে বসে থাকল একটুক্ষণ। তিনি যে আসলে কি বোঝাতে চাইলেন, অতসীর কাছে তা স্পষ্ট নয়। তবু কথাটার মধ্যে অন্য এক সুর ছিল যেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে মুখ তুলে তাকাল, বলল, 'আসবার এসব তোমার কোন আগ্রহও নেই আমাদের।' বলে মৃদু, মৃদু হাসছিল।

'তা বললে হবে কেন মা, মুখের স্বাদটা তো আর পালটে যায়নি, যা ভাল, ভালই।' নীলিমা দেবী অন্যদিকে চোখ ফেরালেন, একটু পরে বললেন, 'বললে বিশ্বাস করবে না, শাশুড়ী আমার হাতে ধরে সব শিখিয়েছেন; না পারলে বকেছেন, কত রাগারাগি করতেন এ নিয়ে।'

'এখন আর এসব শোনা যায় না।'

'আগের জিনিস-টিনিসও তো নেই; সব কেমন বদলে গেছে।'

অতসী কি ভাবছিল যেন। একটু পরে বলল, 'একটা কথা ছিল।'

'বলো।' নীলিমা দেবী তাকালেন।

'আজ সন্ধেবেলা অনীশরা আর সানু আমাদের এখানে খাবে।' অতসী হঠাৎ কেমন একধরনের সংকোচ বোধ করতে লাগল, মৃদু হেসে ধীরে ধীরে বলল, 'রান্নাবান্না বলে দিয়েছে।'

'কি ব্যাপার!'

'কিছুই নয়, এমনি।'

'উহুঁ—, একটা কিছু আছে।' নীলিমা দেবী হাসছিলেন।

'না না, এমনিই।' কি একটা ভেবে নিয়ে হাসিমুখে বলল, 'মরশুমী হবে তো তাই।'

'তোমার অনীশরা কিন্তু আবার মসলা-টসলার রান্না খেতে পারে না।'

'আমরাও তাই, রান্নাবান্না নিজেও তো পেটের রোগী।' অল্প সময় চুপ করে থাকল অতসী, পরে বলল, 'সানু কি করছে দেখে আসি।' অতসী উঠে পড়েছে।

নীলিমা দেবী আরো খানিকক্ষণ বসে থাকলেন। অতসীকে তাঁর খুব ভাল লাগে। মেয়েটার স্বভাব বড় ঠাণ্ডা প্রকৃতির, সরল, কথা বলে আস্তে আস্তে, মুখে হাসি। নীলিমা দেবীর হঠাৎ কেন যেন মনে হলো এখনও তিনি পরোপরির সংসারটা গুছোতে পারেন নি। বয়েস হয়েছে, শোকে-তাপে আরো ভেঙে পড়েছেন, শরীরেও নানা উপসর্গ, যে কোন সময় চোখ বুজতে পারেন। অথচ এখনও অনেকগুলো কাজ বাকি থেকে গেল। মানুর বিয়ে, তারপরেও

CENTRAL LIBRARY

বরঞ্চ বড় খোকাকে বিয়ে করানো। এরপর আর কবে করবে। চেহারা তো ওর আগের চেয়ে অনেক খারাপ হয়ে গেছে। সব দিকে আর মাথা ঘামাতে পারেন না তিনি। মানুষ ভালোও কম ভাবনা না! এরপর কেউ এলে তার ওপর দায়-দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে একটু বিশ্রাম নিতে পারেন। বিধাতা কি তাঁর এই সাধটুকু পূর্ণ করবেন! কি ভেবে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বেলা হয়ে যাচ্ছে, উঠে পড়লেন তিনি। একটা কাক আতাগাছের ডালে বসে চীৎকার করছিল। ঝুরি আলা বটি একসঙ্গে তুলে নিয়ে ঘরে চলে এলেন।

অতসী ভেতরে এসে মানুকে ওই অবস্থায় দেখে অবাক হয়ে গেল, পরে মুচকি হেসে বলল, 'মনে হচ্ছে বাঁড়ুতে কোন বিয়েটিয়ে লাগাবে!'

'লাগাতেও পারে।' মানু রহস্য করে হাসে। একটু পরে বলল, 'তবে এখানে নয়, কলকাতায় গিয়ে হবে, এখানে আমার বন্ধু-টন্ধু নেই, একদম আনন্দ করতে পারবো না।' মানু খিল খিল করে হেসে উঠল। ওর চোখে যেন অন্য কোন ভাষা ছিল।

অতসী না বোঝার ভঙ্গি করে বলল, 'বিয়েটা তো তোমারই, বরং আমরা আনন্দ করবো।'

'ইস্স আর কি!' কি ভেবে মানু কাজ থামিয়ে দিয়েছে। অতসীর চোখে চোখে চেয়ে হাসতে লাগল, বলল, 'আমার কেন, সোনাদারও হতে পারে।'

'তাই বুঝি?' অতসী চোখ টান টান করে হাসছিল।

মানু চোখ সরিয়ে নিতে নিতে বলল, 'তুমি না ভীষণ চালাক অতসীদি!'

'নিশ্চয়ই তোমার চেয়ে না।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ—, আমার চেয়েও অনেক বেশি তুমি—।' কথাটা শেষ না করেই আবার হেসে উঠেছে মানু।

'কি জানি, আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না।' অতসী মুখে টিপে টিপে হাসছে।

'আবার বাজে কথা বলছো।'

'বেশ বাজে কথা।' অতসী ওর চোখে চোখে চেয়ে হেসে ফেলল, একটু পরে বলল, 'কিন্তু তুমি আজ গেলে না যে!'

'মাঝে মাঝে বাদ দিতে হয়।' মানুর চোখে আবার সেই রহস্য।

'তোমার জন্যে বসে থেকে থেকে আর বেরোনই হলো না।'

'আমি তো অন্যরকম ভাবছিলাম।'

'অন্যরকম?' অতসী অবাক চোখে চেয়ে থাকল মানুর দিকে।

'হ্যাঁ—, সোনাদা তো আজ ভোর ভোরেই না কি বেরিয়ে গেছে!' মানু হাসতে লাগল।

'এ্যা—,কি ফাজিল হয়েছে মানুটা!' অতসী এগিয়ে এসে আস্তে করে একটা চড় মারল, ও হাসছিল, বলল, 'তোমার মুখে কিছু আর আটকায় না দেখছি!'

'তুমি ভাবছো, তোমার কথাগুলো শুনি নি আমি!'

'এই, কি শুনেছো, বল?' অতসী চপল ছেলেমানুষীর গলায় জোর করতে লাগল।

'আমি কাছে এলেই আবার অনাদ্যা! শেষে তুমিও অতসীদি!' মানু হাসিতে যেন ফেটে পড়ল।

অতসীও হাসতে হাসতে ওকে একটা চিমটি কেটে বলল, 'দাঁড়াও, তোমার দাদাকে আমি সব বলে দেবো।'

'তাহলে কিন্তু আড়ি নিয়ে দেবো এই বলে রাখছি।'

'দাও না আড়ি, দাও।' অতসী হাসতে লাগল।

'ঠিক আছে বাবা, আমার অন্যায় হয়ে গেছে, মাপ করে দিও।' মানু কাজ ফেলে রেখে হঠাৎ নাটকীয় ভঙ্গিতে হাত জোড় করে বলল। সেও মুচকি মুচকি হাসছে।

'হয়েছে, আর কায়দা করতে হবে না!' অতসী মনে মনে মানুর কথাগুলো উপভোগ করেছে। তার মনেও মানুর এই ঠাট্টা রঙ্গ এক ধরনের সুখের তাপ ছড়িয়ে দিয়েছে। ওর এই কথাগুলো নিয়ে মাঝে মাঝে বেশ রোমাঞ্চ অনুভব করে অতসী, কেমন যেন আবেশ বোধ করে। শব্দগুলো মনের চার-পাশে কেবলই গুঞ্জন করতে থাকে।

একটু সময় চুপ করে থেকে মানুকে দেখতে দেখতে বলল, 'তোমার না মাথায় একটু ছিট আছে মানু, এই সাত সকালেই এসব কি নিয়ে পড়লে।'

'ভীষণ দোরগা হয়েছিল।'

এমন সময় মানু ঘরে ঢুকল, মানুকে বলল, 'সেদ্ধ হয়ে গেছে, আমি রান্নাঘরে যাচ্ছি, তুই কথা বলে আয়।' তারপর অতসীর দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, 'তুমি যেও না অতসী, মার সঙ্গে কথা বলো।' মানু সামান্যক্ষণ চুপ করে থেকে যেতে যেতে ফের বলল, 'আমি যাচ্ছি রে, অনেক কাচাকুচি আছে, বাদ্যি অতসী।' মানু চলে যাচ্ছে না।

একটু পরে অতসী বলল, 'আসল কথাটা বলে নিই, তুমি আজ সন্ধ্যায় আমাদের এখানে খাবে মানু।'

'হঠাৎ আমাকে এই নেমন্তন্ন।' মানু চোখে চোখে তাকাল।

'শুধু তোমাকে নয়, তুমি আর অনীশদা।' অতসী কি ভেবে হেসে ফেলেছে।

'উপলক্ষটা কি শুনি?'

'কিছুই নয়।'

'আমার কাছে চেপে যাচ্ছো তো অতসীদি!'

'এই তোমাকে ছুঁয়ে বলছি।' অতসী মানুর গায়ে হাত রেখেছে, 'মা রাঙামামা আমাকে পাঠিয়ে দিল!'

'আমার কিন্তু এখনও কি রকম মনে হচ্ছে।' মানু ঠোঁট উল্টে কামড়ে ধরেছে, চোখ ছোট ছোট করে অল্প অল্প হাসছে।

'তুমি তো একটি বিচ্ছু, মনে হবেই!' অতসী বেশ মজা করে হাসল, হেসে বলল, 'তাড়াতাড়ি চলে যাও।' ও চুপ করে রইল খানিকক্ষণ, পরে বলল, 'আমি যাই এখন, তুমি তো আবার কাচাকুচি নিয়ে বসবে।'

'ওটি হচ্ছে না। তুমি বসবে, আমি গল্প করতে করতে কাচবো।'

'কি আমার সুখ রে।' অতসীর হঠাৎ কি যেন একটা মনে পড়ে গেল, আর একটু এগিয়ে এলো, ওর কাছাকাছি এসে আস্তে আস্তে বলল, 'তোমাকে একটা কাজ করতে হবে মানু, তোমার দাদাকে এ নিয়ে কিছু বলবে না, মাসীমাকেও বারণ করে দিও, যা বলার আমি বলবো, বেশ মজা হবে দেখো।' অতসী হাসতে লাগল।

'এই, হাসছো কেন অত, আমি কিছু বুঝতে পারছি না।'

অতসী হাসতে হাসতেই জবাব দিল, 'বুঝে কাজ নেই এখন, যা বললাম তাই করো।'

অনীশের গলা পাওয়া গেল, এতক্ষণে বাজার থেকে ফিরেছে সে।

মানু অতসীর মুখের দিকে চেয়ে কেন যেন হেসে ফেলেছে। অতসীও সামান্য অপ্রস্তুত, কেমন অপ্রতিভ দেখাচ্ছিল তাকে। পরমুহূর্তেই আবার সামলে নিয়েছে, মুচকি হেসে বলল, 'ভদ্রতা হচ্ছে না কিন্তু মানু!' চোখ বড় বড় করে ক্রত্রিম শাসনের গলায় বলল।

মানু ওখনো হাসছে, বলল, 'বারে, আমি তো কিছু বলিনি তোমায়।' হাসিটা বেশ অর্থময়।

'আবার বলবেটা কি!'

মানুও কি একটা কথা বলতে যাচ্ছিল অতসীকে। এমন সময় অনীশ ঘরে ঢুকেছে, ঢুকেই একটু অবাক হলো, মানুর মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলল, 'এ কি করেছিস রে!'

একেবারে নাকোকাণ্ড তো!' হাসে মানু, পরে অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নিতে নিতে বলল, 'নোংরা হয়েছিল, তাকানো যাচ্ছিল না!'

অনীশ সিগারেট ধরিয়ে নেয়। ধোঁয়া মুখে নিয়ে এবার অতসীর মুখের ওপর চোখ স্থির রাখল একটুক্ষণ, কি যেন ভেবে নিল, বলল, 'আজ ভোরে তো তোমায় দেখলাম না!'

'মা ধান ভানি বেধেই নি।' অতসী শান্ত গলায় বলল, হঠাৎ মানুর সঙ্গে তার চোখাচোখি হলো, ও মুখ টিপে টিপে হাসছিল। ঘর পরিষ্কার করতে করতে মাঝে মাঝে মানু অতসীকে চোরা চোখে দেখছে।

রোদ উঠে গেছে অনেক, গায়ের চাদরটা খুলে ফেলেছে অনীশ বিছানার ওপর রাখতে রাখতে মানুকে বলল, 'যা করেছিস, ওতে বসার উপায় নেই, বাইরেই যাচ্ছি।'

'আর তো একটুখানি, কাচাকুচি পড়ে আছে না?'

'বেশ মজা তো দেখছি! মানুও কাপড় কাচছে, তুইও যাবি, মা রান্নাটান্না নিয়ে বসত: আমরা বুঝি আর চা-টা খাবো না।' অনীশ যেন এতক্ষণ এই বাড়াবাড়ির জন্যে মনে মনে এমন গুমোট বলল।

'যেন খাবে না, এই তো এলো, একটু জিরোও-টিরোও।' মানু হঠাৎ অতসীর মুখের দিকে চাইল, হাসি হাসি মুখে বলল, 'এই অতসীদি, তুমি তো কিছুই করলে না, চায়ের জলটা স্টোভে বসিয়ে দাও তো। আজ অতসীদিই চা করে খাওয়াক!'

'নিশ্চয়ই, বল, কোথায় কি আছে!'

'রান্নাঘরে মাকে গিয়ে জিজ্ঞেস কর।'

'ওকে আবার কষ্ট দিলি তো!' অনীশ হেসে ফেলেছে এবার।

'আমার অভ্যেস আছে, অত অলসাড়ী ভাববেন না!'

'তা নয়, তুমি এলে কথা বলতে, আর তোমাকে কাজ দিয়ে বসলাম!'

'আমি যদি আর কিছু করি না!' অতসীর চোখে মুখে চাপা হাসি।

'বেশ, করো তাহলে!' অনীশ ঘোঁয়া গিলতে গিলতে হাসল।

অতসী রান্নাঘরে গেল।

অনীশ বারান্দায় এসে রোদে পিঠ দিয়ে মেঝেয় বসল। সিগারেটের টুকরোটা ফেলে দিয়েছে। এতখানি হেঁটে এখন কিছুটা ক্লান্ত সে। ভেবেছিল ঘরে এসে একটু গড়াগড়ি দিয়ে নেবে। তার আর উপায় নেই। মনে মনে বিরক্ত হলো। এত ঝোওয়া-মোছার কি আছে! মানুটার আবার বাড়াবাড়ি, আর করবিই যদি একদিনে কেন। অন্যমনস্ক, অলস মেজাজে আঙুল কাটা দেখতে দেখতে হঠাৎ মনে হলো তার, নখগুলো বেশ বড় বড় হয়েছে, কাটা দরকার। কি ভেবে উঠে পড়ল, ঘর থেকে একটা ব্লেড নিয়ে এসে আবার সেই জায়গায় বসল। নখ কাটতে কাটতে মাঝে মাঝে সামনের বাগান, গাছপালা দেখছিল। দূরে ছোলা, কলাই ক্ষেত। রোদটা এখন শুকনো।

একটু পরে অতসী একটা প্লেটে করে দুটো ন্যাংচা, দুটো কালাকাঁদ আর এক গ্লাস জল এনে ওর সামনে রাখল, মাসীমা পাঠিয়ে দিলেন' অতসী চলে আসছিল।

'এই দাঁড়াও।'

অতসী দাঁড়িয়ে পড়েছে, ঘাড় হেলিয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বলল, 'কি বলুন!'

'এগুলো নিয়ে যাও, আমি খেয়ে এসেছি, শুধু চা।' অনীশ ওর মুখের দিকে চেয়ে হাসল।

'শুধু চা দেওয়া বারণ আছে।'

'মা বুঝি শিখিয়ে দিল!'

'আর শেখালেনই বা, এগুলো আপনাকে খেতেই হবে।'

'পারবাই না।'

'ওসব শুনবো না!' অতসী মাথা নাড়িয়ে কোমল গলায় বলল।

'খেতে পারি, তবে তোমাকেও অর্ধেকটা ভাগ নিতে হবে।'

'আমার জন্যে ওখানে আছে, বুঝেলেন?' অতসী চোখ টান টান করে তাকাল।

'তাহলে পড়ে থাকবে, আমার কি!'

'চা-টা নিয়ে আসি আগে।' অতসী ভেতরে চলে গেল।

অনীশ মনে মনে হাসল। নখ কাটা শেষ হয়ে গেছে। একটা সিগারেট ধরায় আবার।

অতসী চা নিয়ে এলো, 'কি, এখনও খেলেন না যে!'

'ভাবছি তো ভাগ নিতে হবে।' চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে চায়ে চুমুক দিল অনীশ।

অতসী দাঁড়িয়ে থেকে এক মুহূর্ত কি ভাবল, হেসে ফেলে কাছে এগিয়ে এসে ওর একেবারে সামনে হাঁটু গেড়ে বসল, 'দিন আমার মুখে দিয়ে দিন।' অতসী হাঁ করল। একটা কালাকাঁদ ভেঙে ওর মুখে দিতে দিতে অনীশ বলল, 'একবারে খেলে গলায় আটকে যেতে পারে।' অনীশ একটা ন্যাংচা ভেঙে মুখে পুরল, খেতে খেতে আবার বলল, 'আমারটা রেখে তুমি নিয়ে যাও।'

'না না, অত পারবো না।' অতসী হাসছিল মধুর ভঙ্গিতে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে পরে ধীরে ধীরে বলল, 'আজ সন্ধেয় আমাদের ওখানে নিমন্ত্রণ রাত্রিবেলা খেতে বলে দিয়েছে আপনাকে। খুব জরুরী ব্যাপার কিন্তু, ভুলে যাবেন না আবার!'

'কি অমন জরুরী?' অনীশ মুখ তুলে ওর দিকে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ।

অতসী এবার আর হাসল না, একটু গম্ভীর হলো যেন, বলল, 'আমায় কিছু বলেনি।'

'তবে আর জরুরী কি?'

'আমায় তো তাই বলে দিল, না গেলে আমাকে আবার আসতে হবে।' অতসী অনীশের মুখের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে আনল, অন্যদিকে চেয়ে কি ভেবে হাসল সামান্য।

'তাহলে তো যেতেই হয়।' অনীশ একটু অন্যমনস্ক হলো এই মুহূর্তে।

মানু কাচা বিছানার চাদর আর মশারী নিয়ে এলো, রোদে মেলে দিতে দিতে এক ফাঁকে অতসীকে বলল, 'একবার ধর তো এসে একটু।'

অতসী আর মানু দুজনে মিলে মশারীটা টাঙিয়ে দিয়েছে।

'এরকম করে দিলে তাড়াতাড়ি শুকোবে।' অতসী বলল।

'যা মশা না এখানে!'

মানু আবার ভেতরে চলে গেল।

অতসী গ্লাস, চায়ের কাপ প্লেটগুলো তুলে নিয়ে ঘরে গেল। একটু পরে বারান্দায় এসে খানিকক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকল, বেলা বাড়ছে। অনীশের মুখের দিকে চেয়ে এক সময়ে বলল, 'আমি তাহলে যাচ্ছি।'

'খেকে গেলেও আপত্তি নেই।' অনীশ ধোঁয়া ছেড়ে হাসল।

অতসী পলকে ওকে একবার দেখে নিল, চোখে মুখে কী গভীর এক আবেগ যেন মুহূর্তে ফুটে উঠেছে তার। সে আর দাঁড়াল না। কী এক লজ্জা যেন জড়িয়ে ধরেছে। আর একটু থাকলেই অনীশের চোখে ধরা পড়ে যাবে।

অনীশ কি ভেবে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। একজোড়া শালিখ এই মুহূর্তে বারান্দায় উঠে এসে ওকে কেমন অবাক হয়ে দেখছিল।

(ক্রমশ)

পুতুল ।। নকসী কাঁথা

সোনার বাংলা

শিপ্রা আদিত্য

এ প্রবন্ধে আমরা 'সোনার বাংলার' লোকশিল্পের নিয়েই আলোচনা করে এসেছি। সোনার বাংলার আরো অনেক কিছু লুকিয়ে আছে তার লোককথায়, লোকশিল্পে। বর্তমান সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেদিনের প্রচলিত শিল্প-ধারাটি আজ প্রায় লুপ্ত হতে বসেছে। আজকের যান্ত্রিকতায় বিশ্বায়নের সমাজ গ্রামকেন্দ্রিক ছেড়ে হয়েছে শহরমুখী। ফলে এসব শিল্পীর দুবেলা জুটছে না। চাহিদা গেছে কমে, তারপর বিদেশী শিল্পসামগ্রী, মিশ-লাত প্লাস্টিকে ছেয়ে গেছে বাজার, ফলে এই জীবন্ত শিল্পধারাটি চরা-পড়া নদীর মত শুকোতে বসেছে। এই লোকশিল্পের অনেকাংশই আজ সংগ্রহশালা হলে এদিক-ওদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। যে মেয়েরা একদিন গোলা ভরা ধান, পুকুর ভরা মাছ, গোয়াল ভরা গাই নিয়ে সংসারের কাছে জল চেয়ে বড় করতো, তাদের সে ব্রতের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় আকাশ, বাতাস, মাটি, পুকুর বা ঘর-উঠোনের আজ দারুণ অভাব। সেই সঙ্গে জীবনধারণের প্রয়োজনে অর্থ-কারেরও অভাব। তাই এই কারণেই কেউ জমা ছাড়া ছিন্নমূল চাষীও ভুলতে বসেছে তার মাটিছোঁয়া সকল গল্প। হোলার মত দুর্গার চালচিত্রী মা রতন অলপনা আঁকা। কাপড়ে নকসা করা হাতী, ঘোড়ার সূক্ষ্ম কাজ করা শাঁখারী শিল্পীদলের ক্রমিক লোপ পাচ্ছে ভিন্নতর পেশা নিতে। হয়তো সেদিনের প্রচলিত শিল্পধারাটির স্বীকৃতি নিদর্শন শিল্পী ও শিল্পকে নিয়েই এ রচনা।

প্রথমেই আসা যাক বাংলার ঘর-বাড়ীর আলোচনায়। প্রাচীন বাংলার অল্প কয়েকটি পাকা বাড়ীর আমলে বেশীর ভাগই ছিল খড়ের ঘর। এই ঘরগুলির খুঁটিগুলো ছিল সুন্দর কারুকার্য করা কাঠের। আর ছিল কাঠের টুকরো, নলতে বাঁশ (ভলতা) আর বেত দিয়ে তৈরী সুন্দর চালোয়ার মত ছাদের সিলিং। সেদিনের সেই শিল্পধারাটি বর্তমানে লুপ্ত। কারণ আমরা জানি যে—বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। প্রতি বছরের বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে যেত এমন সব হাজারে হাজারে ঘরবাড়ী। নতুন পরিকল্পনায় বাঁশ আর খড়ের জায়গায় এল পাকাপাকি কাঁচা আর টিনের ঘর-বাড়ী একতলা থেকে দোতলা সমান। এখানেও ছাদের কার্নিশে, বারান্দার গ্রিলের সূক্ষ্ম অলংকরণ আজো চোখে পড়ে। বর্ষার শুরুতে ঘরামী দেখা দিলে ছাউনির ছাত থেকে বাঁচতে বাড়ীর কাঠ আর টিনগুলো তুলে আনতে ঘরদোরে মরসুম পড়তে। আজো গ্রামে এই প্রথা চালু আছে।

ঘরের পরই আসে ঘর অলংকরণের কথা। বাংলার বাঁশ আর বেতের কারু-কার্যের কথা কে না জানে। বাঁশের কুঁড়ি মাঘের শেষেই চিক মাদুর পাটিলপাটির জন্য বিখ্যাত বাংলার বাঁকুড়া পাঁচমুড়ার শীতলপাটি, ঢাকা শ্রীহট্টের আজো সারা বিশ্বে চলছে। বাঁশের চাঁচ থেকে ছাড়াও বাঁশের বাঁকারি দিয়ে বাপের জন্য আজও ঢাকা সিলহাট।

নকসি-কাঁথা—শিল্পচেতনার ইতিহাসে প্রাচীন বাংলার লোকশিল্পগুলির মধ্যে নকসি-কাঁথার অবদান অনস্বীকার্য। এই কাঁথিয়ে নকসা, শিল্পকর্ম আজ যে শিল্পের প্রতিচ্ছবি আমাদের সামনে এক নতুনের

সরা ।। কাঁথিয়ে

রূপে। এই কাঁথার জন্য বিখ্যাত বাংলা-দেশের বগোর, শুকেলা, কাঁথিয়ে, বাঁকুড়ার প্রভৃতি জেলা। পুরোনো কাপড় যাদের সুতোর ফোড় দিয়ে আলপনা করা, নক্সা-কাবণের মুখ, বাসরীয়া, হিন্দু ধর্মের নানা কাহিনীর ছবি পাওয়া যায় কাঁথাগুলি থেকে। এমন কি সমসাময়িক সমাজ-জীবনের ছবিও প্রতিফলিত হত সমস্ত কাঁথায়, তারই উদাহরণরূপে পাওয়া গেছে —এয়োকেলী গুণা আর তারকেশ্বর মহাদেবের ছবি। যেখানে শিল্পী শুধু সমবেদনাই প্রকাশ করেন নি বাঙ্গও করে-ছেন। সেদিনের বিলাসিনী পেশাজীবীদের ছবি এঁকে বাঙ্গ করেছেন সমাজব্যবস্থাকে। কাঁথাশিল্প প্রসঙ্গেই এই প্রবন্ধকার সাক্ষাৎ ঘটেছিল ৯২ বছরের বৃদ্ধা শিল্পী প্রসন্ন-সুন্দরী সেনের সঙ্গে। পূর্ববঙ্গের ঢাকার (১৯৫০ খৃঃ) প্রাণভয়ে চলে আসার সময় সবকিছু এনেছিলেন কয়েকটি অসাধারণ কাঁথা, বলছিলেন কালাকথা কাঁথা গুলোর।

শুধু তাই নয় ১৯৫৫ খৃঃ ২৩শে অক্টোবর কলকাতা যুবকল্প আয়োজিত চারু ও কারুকলা প্রদর্শনীতে ধনভলার চৌধুরান আর্ট স্কুলে প্রথম প্রদর্শিত হয় এই শিল্পকলা নিদর্শন। তারপর ১৯৫৫-৫৬ খৃঃ "ওয়ার্ল্ড ফ্রেন্ডশিপ" বর্ষ উপলক্ষে সেবারই প্রতিযোগিতায় আন্তর্জাতিক প্রথম পুর-স্কার পায় প্রসন্নসুন্দরীর কাঁথা। সে আজ অনেক আগের কথা বলছিলেন শিল্পী নিজে।

সোনার বাংলার চারজন এমন শিল্পী এখন পৃথিবীর বাস করছেন এঁরা সবাই হয়তো কলকাতায় মিরাবোপান বসতিতে। বয়সের ভারে জর্জরিত এঁরা। সবাই-দিন কাটাচ্ছেন নিঃসঙ্গতায় এঁরা বধির চোখে ছানি পড়ে। তবুও শিল্পী চারজন এই শিল্পী ছাড়াও বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন ধরণের কাঁথা তৈরী সংগ্রহশালা সেরা কিছু থাকা কলকাতার আশুতোষ মিউজিয়াম এবং সুরসিংহ মিউজিয়াম সংরক্ষিত।

বাঘ শিকার—বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন নামে কাঁথা তৈরী হলেও কাঁথা তৈরীর কারিগরী কৌশল সেলাইয়ের ধরণ তৈরী সূক্ষ্ম অলংকরণ সবক্ষেত্রে একই মহিলা জগতের মনের মত ছিল। বুনোর সূক্ষ্ম কাজে

বিচিত্র কলা বস্তু নির্মাণে সিদ্ধ শিল্পী ছিল ঢাকাই কারিগর, ফরাসডান, আতরদান, গড়-গড়া—এমন কত বিচিত্র বস্তু সেদিনের খানদান বা দরবারী মজলিশকে উজ্জ্বল করে তুলতো অপরূপরূপে। এছাড়া ময়মনসিংহের কাঁসারীর হাতে গড়া কুঁসি, উলুতল বা তরুনের তৈরী তৈজসপত্র সৌন্দর্যের সংসারকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করত।

মকসি ভাঁতবস্ত্র—বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় কুটিরশিল্প হল বাংলার তাঁতবস্ত্র। এক সময় তো ঢাকাই মসলিনের জন্য পৃথিবীর কাছে বাংলাদেশ ভীষণ বিখ্যাত ছিল। ফেশানীর অত্যাচারে আজ ঢাকাই-মসলিন লুপ্তকথার গল্প। ঢাকাই মসলিনের গুণানুসারে তার বহু নাম। মাকড়শার জালের মত সূক্ষ্ম কাপড়ের নাম 'বুনো'। যে কাপড় ভিজে অবস্থায় ঘাসের ওপর বিছিয়ে দিলে আর দেখা যায় না তার নাম 'সবনম' অর্থাৎ সান্ধ্যশিশির। যে কাপড় জলে ভোবালে জলের মাঝেই হারিয়ে যায় তার নাম "আবরোয়ান" অর্থাৎ জলস্রোত। এমন আরো নাম সর্পাত, সরবতি, সরকার আলি, রং, আলবালে, তনজেব তরন্দম, নয়নসুখ, সরবন্দ, কুমসী, বদন খাস, মলমল-খাস, জঙ্গল খাস, খাসা এমন কত। তুরে মসলিনের নাম হত—রাজকোট, কাস-ডাহি, পাদশাহীবাহ, কলাপাত ইত্যাদি। রঙিন মসলিনকে বলা হত 'চারখানা'। রঙের রকমফেরে নাম বদলানো হত—নন্দনশাহী, আনার দানা, সাকুতা, কবুতর, খেপা, পাছাদার প্রভৃতি। বুটিদার ও ফুলতোলা মসলিনকে কাসিদা বলা হত, কখনও বা কাটডুরমী, নৈবর্তি, আজিজুন্না দোহাকে প্রভৃতি। নকসাদার মসলিনের সাধারণ নাম 'জামদানী', এরও প্রকারভেদে নানা নাম—তোড়দার, কাবেলা, বুটিদার, তেরছা, জলবার, পান্নাহাজার, মেল, দুরেলী জাল, ছড়িজাল, সাবরেপা প্রভৃতি। মসলিন ছাড়া ঢাকাই বাফতার বেশ নামডাক ছিল। গুণানুসারে এরও নাম—হামাম, নিমটিসাল, জঙ্গল খাসা, গলাবন্ধ প্রভৃতি। ১৭৫০ খৃঃ হিসাবে ২৮,৫০,০০০ টাকার মসলিন পৃথিবীর নানাদেশে বিক্রী করেছিল ঢাকাই তাঁতীরা।

পট, সরা, কুলোচিত্রী, চালচিত্রী

বাংলার এক শ্রেণীর ফকিরকে গ্রামে গ্রামে ছবি দেখিয়ে গান গেয়ে বেড়াতে দেখা যেত। এদের ঝোলায় থাকতো গোটানো পট, যাতে থাকতো রাম-রাবণের যুদ্ধ, অহল্যার শাপমোচন এমন কতকিছু। এই সব পটের নাম দীঘল পট। যারা আঁকতেন তাদের বলা হত পটুয়া। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান বৌদ্ধ জাতি নির্বিশেষে এ পেশায় বা এ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত এই পোটোরা বাংলা-দেশের ময়মনসিং, বরিশাল এবং খুলনা জেলায় বাস করতেন। খুলনা জেলায় কপিলমুনি এবং ২৪-পরগণা অঞ্চলে গাজীর পট (বড় খাঁ গাজীর জীবনী অবলম্বনে) আর মনসাবিষয় পটই উল্লেখযোগ্য।

সরাচিত্রী—বাংলাদেশে সরার প্রচলন আজও। কোজাগরী লক্ষ্মী পুজোর এখানের মত দুর্গা পুজোর চল ওখানে নেই। সরার আঁকা পটের লাইনে লক্ষ্মী অথবা দুর্গা পরিবারের সঙ্গে লক্ষ্মীর ছবি বা পাঁচমূর্তি বা সাত মূর্তি কিম্বা বরিশাল বা খুলনা জেলায় পটের ঢঙে মনসার ঘট, বিয়ে অথবা উৎসবে কুলোচিত্রী, মঙ্গলঘট, পিঁড়িচিত্রী, ব্রত-র আলপনা, মা-দুর্গার চালচিত্রী বাংলা-দেশে প্রচলিত আজো।

টেরাকোটা ও মাটির পুতুল—বাংলার স্থাপত্যকলায় টেরাকোটা বা পোড়ামাটির বহুল ব্যবহার দেখা গেছে প্রাচীনকালেই। যেমন পাবনা, নগরা, রাজশাহী দিনাজপুর, ফরিদপুর, গৌড় প্রভৃতি জায়গায়। পোড়া-মাটির কাজ মূলতঃ লোকশিল্প। এখানে আছে সাধারণের সুখ-দুঃখ গাওয়া-পাওয়া, কখনো কখনো সুন্দর অলঙ্করণ—ফুল-লতা, জীব-জন্তু প্রভৃতি। কোথাও কোথাও আবার পোড়ামাটির কাজের ওপর রংয়ের প্রলেপ দেবার রীতির ব্যবস্থা দেখা যায়। ফরিদ-পুরের মধুরাপুর থেকে পাওয়া পোড়া-মাটির ফলক "এক কাঁক হরিণ' আজও রাজ-চারী সংগ্রহশালায় সুরক্ষিত। বাংলাদেশের পোড়ামাটির সন্দেশ এবং আমসত্বের ছাঁচ উল্লেখ্য।

মাটির পুতুল আজও গ্রাম বাংলার ঘরে ঘরে সমান আদরের বস্তু। বাংলা-দেশের বরিশাল জেলার সরাচিত্রী ও পুতুলের সুদক্ষ কারিগর বলাই পাল উদ্বাস্তু হয়ে আজ কলকাতায়। কেষ্টনগরী শিল্পী-দের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আজও সে পুতুলের পসরা নিয়ে বসে রথের মেলায়, চড়কের মেলা প্রাঙ্গণে। দৈনিক যুগান্তর পত্রিকার সাংবাদিক শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মিত্র শিল্পী বলাই পালকে দিয়ে সমকালীন জীবনের সরাচিত্র আঁকিয়ে এই শিল্পশৈলীকে আবার একবার জনপ্রিয় করবার জন্য চেষ্টা করেছিলেন।

কাঠের পুতুল—বাংলাদেশের ঢাকার আর এক শিল্পী, সুবোধর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রায় উদ্বাস্তু হয়ে বর্তমানে সোনারপুরবাসী। এমন দক্ষ শিল্পীর হাতে করা কাঠের পুতুল ছাড়াও কাঠ-মোজাইক করা প্রতিকৃতিগুলিও অপূর্ব। জাতীয় হস্তশিল্প প্রতিযোগিতায় (১৯৬৪) প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত নাট্যাচার্য শিশির ভাদুড়ীর কাঠের মোজাইক করা প্রতিকৃতিটি সুনিপুণ দক্ষ শিল্পীর পরি-চয়ই বহন করে। অনেকেই হয়তো জানেন না যে, কলকাতার বেশীরভাগ প্রথম শ্রেণীর নাটকের দলের নাটমঞ্চের "ষ্টেজ ক্রাফট" এই শিল্পীর হাতেই তৈরী। চাষপাড়ের গোড়া-মিলের রাস্তা একান্ত নিভৃতে আজও এই

এক সরা ।। রংপুর

কাঠের কাজ ।। যশোহর

CENTRAL LIBRARY

গাঙ্গীর পট।। কুমিল্লা

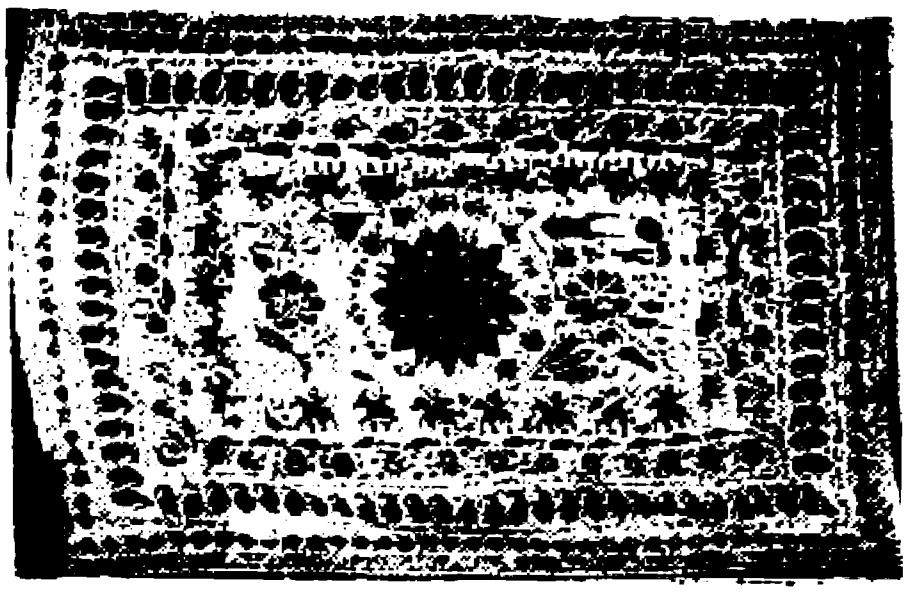

কাঁথা।। ফরিদপুর

শিল্পী বাংলাদেশের সেই সনাতন শিল্প-ধারাটি সযত্নেই পালন করে আসছেন।

বাংলাদেশের কাঠের পুতুল পশ্চিম-বাংলার কাঠোয়ার নতুনত্বমের বা কালী-ঘাটের মতন অত সুন্দর না হলেও সুন্দর বলা চলে। বাংলাদেশের কাঠের বউ পুতুল আজও রুচিবান গৃহস্থের গৃহসজ্জার অঙ্গ। বাংলাদেশে ধামরাই-এর কাঠের রথের সুন্দর কারুকার্য সারা বাংলার গৌরবের বস্তু ছিল। খানসেনারা রথটি সম্পূর্ণ পুড়িয়ে দিয়ে গেছে।

প্রতিমা—বারোমাসে তেরো পার্বণের দেশ বাংলাতেও দেব-দেবীর মূর্তির বহুল চলন, বিশেষ করে শিব, দুর্গা, লক্ষ্মী, গণেশ, কার্তিক, শীতলা, মনসা, কালী এমন কত কি। জেলা অনুসারে শিল্পীদের কাজেও রকমফের দেখা যায়। যেমন থেকে উল্লেখ-যোগ্য ঢাকা জেলা। বড়, সুন্দর মূর্তিগুলি উৎসাহদাতা হয়ে আজ পশ্চিম বাংলার বসবাস করছেন। তাঁদেরই একজন হচ্ছেন, ঢাকা জেলার শ্রীবাসিনী পাল। ইতালী সাংস্কৃতিক সম্মেলনের তোরণদ্বারে শোভন রমিনী পালের মূর্তিগুলি সেদিন কলকাতার রসিকসমাজকে বিস্মিত করেছিল।

কলকাতার কুমারটুলী বা নদীয়ার কেতুগ্রামের শিল্পীকুলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আজও এই শিল্পীরা সুনিপুণ ভাবে মূর্তি গড়ে চলেছেন।

শোলার পুতুল—"ডাকের" শোলার কাজের জন্য এক সময় ঢাকা খুবই বিখ্যাত ছিল। ডাকের কাজ ছাড়াও শোলার কাজ, পরদা, পাখী, পুতুল, লোকা এমন কত কি-কিছু বিখ্যাত ঢাকা, কুমিল্লা প্রভৃতি জায়গায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে কলকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় শোলার কাজের প্রচলন ছিল। আজকাল বারোয়ারী পুজোয় কিছু এবং ধনীর গৃহে বিয়ের সময় ডাকের কাজ দেখতে পাওয়া যায়।

বাংলাদেশ থেকে আগত কিছু উদ্বাস্তু মালাকার পরিবার বর্তমানে মানিকতলার বাগমারী অঞ্চলে বসবাস করছে। এদের মধ্যে শিল্পী গোপীবল্লভ মালাকারের কাজই খুব উল্লেখযোগ্য। এই শিল্পীর হাতের কাজ দেখে কলকাতার রসিকজনেরা বারে বারে বিস্মিত হয়েছে ইতালী সাংস্কৃতিক সম্মেলনের মঞ্চে, উটোরথ পত্রিকার পুরস্কার বিতরণ উৎসবের মঞ্চে অথবা সম্প্রতি বাঙ্গুর সম্মান উৎসব উপলক্ষে টেকনিশিয়ান স্টুডিওর প্রাঙ্গণে।

বাংলাদেশে মহকুমার শহরগুলি, জেলা স্টেশনের মিছিলেও শোলার কারুকাজের ব্যবহার যথেষ্ট পরিমাণেই হয়েছিল। এ মিছিল খুবই বর্ণাঢ্য হত।

শাঁখশিল্প—'চাই ঢাকাই শাঁখা'—এমন করে করে শাঁখারীরা বা মাঝবয়সীরা হাঁকেই ডাক দিয়ে যায়। এমন পরিচিত সুরটিকে খুঁজতে গেলে চলে যেতে হবে পদ্মা পেরিয়ে সেই বাংলাদেশের ঢাকা জেলায়। পূর্ব বাংলার এক সময় শাঁখার খুব নামডাক ছিল। শুধু তাই নয় সমগ্র বাংলা জুড়েই ছিল এর প্রতিপত্তি। সেসময়কার কিছু শাঁখারি উদ্বাস্তু হয়ে চলে আসে এই পশ্চিমবাংলার অর্থাৎ কলকাতায়। বারাসাত, আমডাঙা, শাঁখারিটোলা, হাওড়াসাঁকো প্রভৃতি জায়গায় বসতি বা ব্যবসায়িক কেন্দ্র।

শুধু শাঁখাই নয়, শঙ্খের তৈরী নানাবিধ অলংকার, বোতাম, চেন, পুতুল, চামচ প্রভৃতি শিল্পবস্তুগুলির যথেষ্টই চাহিদা আজ বিদেশে। আজও বাংলাদেশ শঙ্খশিল্প বিদেশে রপ্তানী করে বেশ কিছু বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে।

আমাদের বিশেষ আবেদন অনুগ্রহপূর্বক এই শিল্পধারাগুলিকে আবার পুনর্জীবিত করার দায়িত্ব শুধু বাংলাদেশ সরকার-এর নিলেই চলবে না, জনগণকেও সমানভাবে সহযোগিতা করতে হবে। তবে বাঁচবে এই সব লোকশিল্পের কারিগর আর লোক-কলাটি।

এ সংখ্যার লেখা বাংলাদেশের লোক-শিল্পের যাবতীয় আলোকচিত্র গুরুসদয় সংগ্রহশালার সৌজন্যে

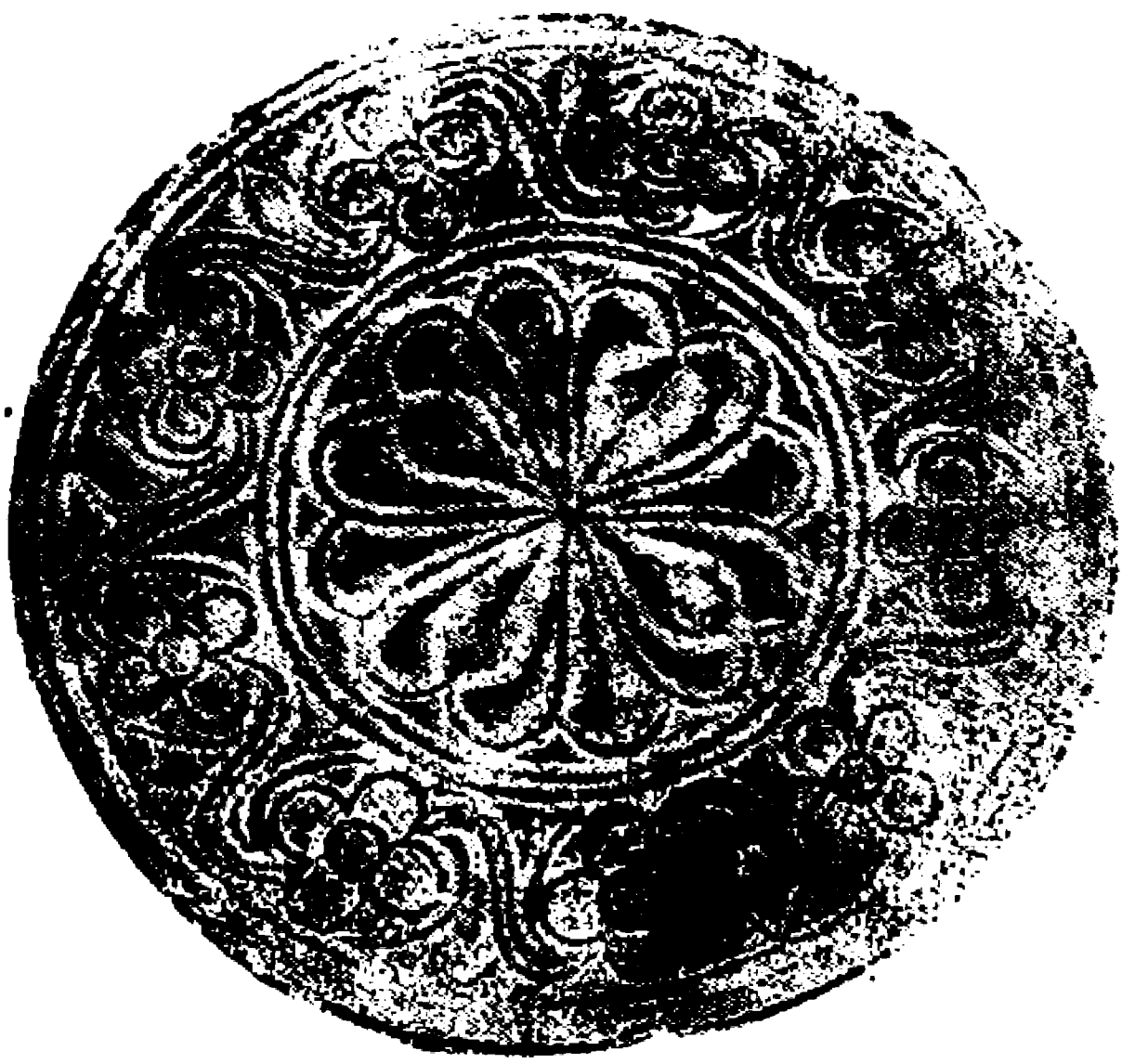

আলপনা ঢাকা।। ফরিদপুর

গদর বিপ্লবের গোড়ার কথা

সন্তোষকুমার অধিকারী

—তোমার নাম কি?

উত্তর হলো—বিদ্রোহ।

—তোমার কাজ?

—বিদ্রোহ।

আবার প্রশ্ন—এ বিদ্রোহ তোমার হবে?

উত্তর—কেন, ভারতবর্ষে। যেখানে মানুষ ব্রিটিশ শাসনের নিপীড়নে বিপর্যস্ত, সেইখানে।

ওপরের কথোপকথন কোন নাটকের পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃত করা হয়নি। আমেরিকার প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'গদর' পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতে এই প্রশ্নোত্তর বেরিয়েছিল। এই পত্রিকা হিন্দী, উর্দু, গুরুমুখী, বাংলা ও মারাঠি ভাষার রূপান্তর প্রেসে মুদ্রিত হতো। উদ্ভাবনার ছিলেন—লালা হরদয়াল, বিষ্ণু গণেশ পিংলে ও ভাই পরমানন্দ।

এই 'গদর' পত্রিকার 'চাকার খালির' বিজ্ঞাপন যার হলো একদিন।

লোক চাই। হিন্দুস্থানের বিপ্লবে যোগ দেবে এমন সৈন্যবাহিনী গঠনের জন্য সাহসী যুবক চাই।

পারিশ্রমিক—মৃত্যু
পুরস্কার—শহীদত্ব
কর্মস্থল—হিন্দুস্থান
পেন্সন দেওয়া হবে স্বাধীনতার।

আমেরিকা এবং কানাডার তখন পাঞ্জাবীদের উপনিবেশ গড়ে উঠেছে। অধিকাংশ পাঞ্জাবীকে হিন্দু ও শিখ কৃষকেরাই বেশীর ভাগ হলেও আছে। আর্থিকভাবে ভাল অনেকে প্রতিষ্ঠিতও কিন্তু জুটেছে না সম্মান। উপরন্তু স্থানীয় জাতির লোকেরা কালো চামড়ার ভারতীয়দের 'কুলিডাসের জাত' 'নিগার' ইত্যাদি বলে বিদ্রূপ করতো। প্রবাসী ভারতীয়েরা মনে মনে বিদ্ধ হতো কিন্তু তাদের কিছু করার ছিল না। এমন সময় ১৯১৩ সালের নভেম্বরে তাঁদের কাছে এসে পৌঁছলো লালা পত্রিকা 'গদর'। যার অর্থ 'বিদ্রোহ'।

পরে পত্রিকা বন্ধ, সানফ্রান্সিসকো ও সেক্রামেন্টোতে প্রবাসী ভারতীয়দের দুটি সভা হয়ে গেল। এই সভাতে সৃষ্টি হল বৈপ্লবিক সমিতি 'গদর'। সভাতে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ও স্বাধীন হিন্দু-স্থান প্রতিষ্ঠার দাবিকে তুলে ধরা হলো। সমিতির সভাপতি পদে বৃত হলেন বাবা সোহন সিং ভাকনা এবং সম্পাদক হলেন লালা হরদয়াল।

'গদর' পত্রিকার কর্মখালির সেই বিজ্ঞাপনের উত্তরে শত-শত দরখাস্ত পড়লো। আমেরিকা ও কানাডার সবত্র 'গদর' পার্টির শাখা। 'গদর পত্রিকা' আমেরিকা থেকে কানাডা তারপর বার্মা, শ্যাম, হংকং, শাঙ্গাই, সিঙ্গাপুর হয়ে ভারতে এসে পৌঁছলো। সর্বত্র পার্টির কাজ প্রকাশ্যেই শুরু হয়ে গেল। যাঁরা পার্টির জন্য প্রাণপাত করে খাটতে লাগলেন, তাঁদের মধ্যে রামচন্দ্র বরকতুল্লা, জগৎরাম ও কর্তার সিং সরোবার নাম আজও উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে ইতিহাসে।

'গদর' পত্রিকা সম্পর্কে সিডিশন কমিটির রিপোর্টে বলা হয়েছে—

"It was of a violent anti-British nature, playing on every passion which it could possibly excite, preaching murder and mutiny in every sentence and urging all Indians to go to India with the express object of committing murder, causing revolution and expelling the British Govt. by any and every means".

১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধের পদ-ধ্বনি বেজে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে 'গদর' দলের সভাদের মুখে শ্লোগান শোনা গেল—চলো হিন্দুস্থান। হিন্দুস্থানে ফিরে চলো, আর ইংরাজদের ধ্বংস করে দাও। এই সময় আগুনের স্ফুলিঙ্গের মত একটি ঘটনার সমস্ত পাঞ্জাবের মনে আগুন জ্বলে উঠলো। বাবা গুরুদিত সিংয়ের নেতৃত্বে চারশ' জন শিখের একটি দল কানাডার ঢুকতে না পেরে আবার ভারতবর্ষে ফিরে আসছিল। তাঁরা এলো কোমাগাটামারু নামের জাপানী জাহাজে। বজবজে সশস্ত্র ব্রিটিশ পুলিসের একটি সশস্ত্র দল এদের বাধা দেয় এবং গুলি আঠারো জনকে পুলিসী করে মারে। বাবা গুরুদিত সিং ও অন্য ১১জন শিখ পুলিসের গোলার এড়িয়ে পালিয়ে যায়।

কিন্তু তবু তারা ফিরতে লাগলো। বিপ্লবীদের বড় একটা দল 'তোষামারু' জাহাজে সিংহল হয়ে ফিরলো। তারা প্রত্যেক জায়গায় প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে প্রচার চালাতে লাগলো। মহাযুদ্ধের সম্ভা-বনাকে তারা শুভ সংকেত বলে গ্রহণ করলো, এবং গণ-বিদ্রোহের প্রস্তুতিতে তারা মেতে উঠলো। ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর মধ্যেও তারা প্রবেশ করলো এবং ডাক দিলো সকলকে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে দাঁড়াতে। বিদ্রোহীদের একটি পুস্তিকা 'বদর-ই-গুরু' (বা বিদ্রোহের পদধ্বনি) শিখলো—আমরা সরকারী দপ্তরগুলিতে ডাকাতি করে অর্থ সংগ্রহ করবো, এবং সমস্ত পাঞ্জাবকে জাগিয়ে রেখো। ইউ-রোপীয়দের ধন-সম্পত্তি লুট করে আনতে হবে আমাদের প্রয়োজনে।'

বিদ্রোহের সংগঠনের জন্য আমেরিকা থেকে বিষ্ণু গণেশ পিংলে ও কর্তার সিং সরোবা পাঞ্জাবে ফিরে এলেন। তাঁরা সেনা-বাহিনীতে প্রচার চালিয়ে তাদেরকেও বিদ্রোহে উদ্বুদ্ধ হতে ডাক দিলেন। পিংলে ও ভাই পরমানন্দ বাংলার সঙ্গে যোগা-যোগ করলেন। এবং বাঙালীদের তৈরী বোমা পাওয়া যাবে এমন ভরসা দিলেন তাঁদের দলের লোকদের। বিজন জঙ্গলে, মাঠে ও নদীর ধারে তাঁরা ঘাঁটি তৈরী করলেন, এবং গ্রামে গ্রামে গিয়ে চাষী মজুরদেরও বিদ্রোহে অনুপ্রাণিত করলেন। দিল্লী হার্ডিঞ্জ বোমার মামলার পলাতক বিপ্লবী রাসবিহারী বসু লাহোরে এলেন দলের নেতৃত্ব নিতে। তাঁর সহযোগিতায় রইলেন, বারানসীতে শচীন্দ্রনাথ সান্যাল এবং বাংলাদেশে যতীন্দ্রনাথ মুখার্জি।

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার নথিপত্রে দেখা যায় যে, আমেরিকার রামচন্দ্র জার্মান কন-সালের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন। আমেরিকা থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন হর-দয়াল। তাঁর সঙ্গে এবং প্রবীণ বিপ্লবী সর্দার অজিত সিং-এর সঙ্গেও জার্মানদের যোগাযোগ থাকে। জার্মান থেকে জাহাজ ভর্তি হয়ে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ভারতে আসবে এমন পরিকল্পনাও ঠিক হয়ে যায়। কয়েক-জন বিপ্লবী বর্মার পথে ভারতে প্রবেশ করার উদ্দেশ্য নিয়ে পূর্ব এশিয়ার দেশ-গুলিতে কাজ শুরু করেন। এঁদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন নির্ভীক দেশপ্রেমিক মোহনলাল পাঠক।

অত্যন্ত সুপরিকল্পিত ধারায় এই বিদ্রোহকে পরিচালনা করা হতে লাগলো। 'গদর' পত্রিকায় লেখা হলো—আমরা ভারতবর্ষে ফিরে যাবো, কারণ আমরা বিপ্লবকে সৃষ্টি করতে চাই। আমরা চাই সকল ইউরোপীয় ব্যক্তিকে হত্যা করতে। রাজভক্ত প্রজাদেরও আমরা ক্ষেহই দেখা

না। বর্তমান গভর্নমেন্টের উচ্ছেদ করে আমরা এক প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করতে চাই।

বিপ্লবের বাণী প্রচার করলো 'গদর-ই-গুঞ্জ'। তার পৃষ্ঠায় কাবা রচনা করে বলা হ'ল—

...এবার সেই সময় এসেছে, যখন আমাদের ত্রাস কোলাহল করতে হবে; যখন বন্দুক কাঁধে পড়তে হবে।

...ধ্বংস করো সেই বিদ্রোহের ধ্বংসস্তূপকে। এই কৌত্হল-খেলনের প্রতিটি চিহ্নকে করো বিলুপ্ত।

...যুদ্ধ দেশের জন্যে, যুদ্ধ স্বরাজ্যের নিশ্চিহ্ন করার জন্যে।

...আমাদের সকল ভুল মুছে হবে উঠবে, যখন আমাদের দেশের জন্যে আমরা লড়াই করবো।

...সংকল্প গ্রহণ করো এবার— নিশ্চিহ্ন করতে হবে শত্রুকে। শত্রুর রক্তে তৃপ্ত হোক তোমার তৃষা।

...ওঠো, জাগো, দেশের কাজে এগিয়ে চলো। প্রস্তুত হও বিপ্লবের জন্যে।

'গদর' পত্রিকায় প্রকাশ্যে যুদ্ধ ঘোষণা করে বলা হ'লো—'এবার সময় এসেছে, ভাগ্যের; সময় এসেছে ইউরোপীয়দের হত্যা করে দেশকে মুক্ত করার। সে যুদ্ধ ঘোষিত হয়েছে তাই কথা বলছি। সমস্ত ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছে লড়াই। তোমরা কি এখন অলস হয়ে বসে থাকতে পারো? এই যুদ্ধে এগিয়ে যাও, সমবেত হও, বর্তমান সরকারকে উন্মূলিত করো। প্রতিষ্ঠা করো প্রজাতন্ত্রের।'

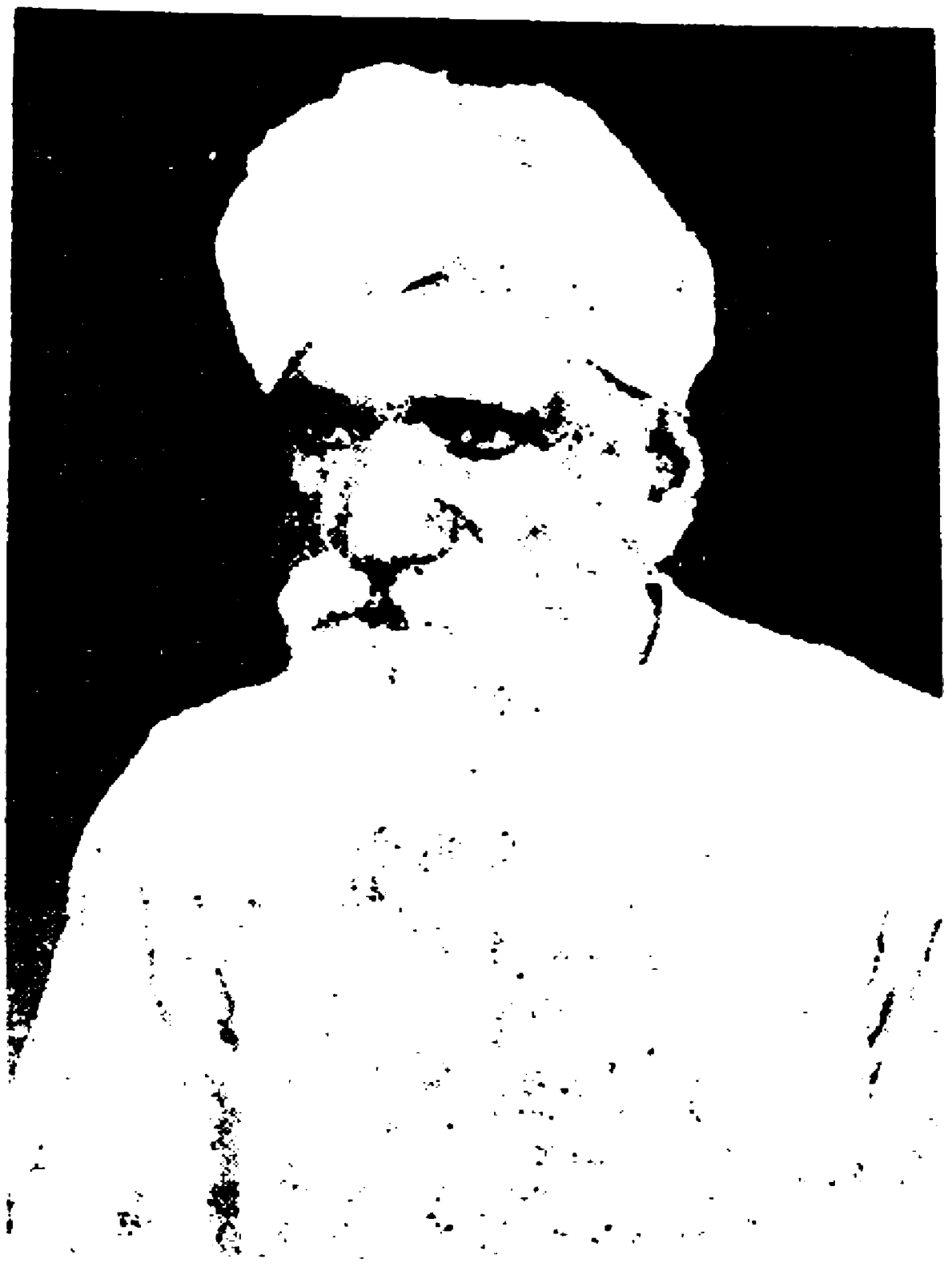

বাবা সোহন সিং ভাকনা
[সর্দার কাশ্মীরা সিং (লুধিয়ানা)-এর সৌজন্যে]

সেই প্রজাতন্ত্রের রূপও বর্ণনা করা হলো। '—এই প্রজাতান্ত্রিক সরকার নিয়ে আসবে সুখ ও সমৃদ্ধি। যেমন এনেছে চীন ও দক্ষিণ আমেরিকা। বিপ্লবের উদ্দেশ্যকে আরও সুস্পষ্ট করে সংজ্ঞায়িত করেন সোহনলাল পাঠক—'আমরা সমবেই একটি গণতান্ত্রিক সরকার চাইবো। আমাদের সবের উদ্দেশ্য— যে কোন উপায়েই হোক, স্বাধীন সরকারের প্রতিষ্ঠা করা।'

১৮৫৭ সালের সিপাহীবিদ্রোহের ৫৭ বছর পরে ১৯১৪-তে আবার সর্বভারতীয় ভিত্তিতে অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করা হ'ল। বিপ্লবে যোগদানের জন্য দেশীয় সেনাবাহিনীগুলির সঙ্গেও যোগাযোগ করা হ'ল। উত্তর ভারতের সবগুলি সেনা-ব্যারাকে প্রচার চালিয়ে তাদের সমর্থন আদায় করা হ'ল। রাসবিহারী বসু নির্দেশ দিলেন, ২১শে ফেব্রুয়ারী (১৯১৫) এই বিদ্রোহের প্রকাশ ঘটবে। ওইদিনে একসঙ্গে আক্রমণ চালিয়ে মুষ্টিমেয় ইউরোপীয়দের বন্দী করা হবে এবং অস্ত্রাগারগুলি দখল করা হবে। সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সেনারা বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে সমস্ত দেশকে মুক্ত করবে। এই পরিকল্পনামত কলকাতাতে শচীন্দ্রনাথ সান্যাল এবং বাংলাদেশে যতীন্দ্রনাথ মুখার্জি অপেক্ষা করতে লাগলেন। এমন কি ভারতের বাইরেও বিপ্লবীরা প্রস্তুত হয়ে রইলো।

কিন্তু ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সংগ্রামের ইতিহাসে বারবার দেখা গেছে, যে বিপ্লবী দেশ-প্রেমিকদের সকল সাধনাই ব্যর্থ হয়ে গেছে বিশ্বাসঘাতক বিভীষণদের আবির্ভাবে। গদর পার্টির সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো হঠাৎ বিশ্বাস-ঘাতক কৃপাল সিংয়ের অনুপ্রবেশে। এই লোকটি গোপনে ব্রিটিশ সেনাধ্যক্ষকে জানিয়ে দিলো সব খবর। ফলে হঠাৎ ধরপাকড় শুরু হয়ে গেল, এবং লাহোর ও পাঞ্জাব থেকে পার্টির নেতৃস্থানীয় সকলকেই বন্দী করে ফেললো গভর্নমেন্ট। হতাশায় রাসবিহারী বসু পলাতক হলেন।

বিপ্লব আসতে আসতে থেমে গেল। সমস্ত ভারতবর্ষে তখন ব্রিটিশ সৈন্যের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। একবার অনুমান করলে, তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার কথা। ভারতের মুষ্টিমেয় অনুচরের হাতে শুভঙ্করটাকে ব্যর্থ করে দিলো কৃপাল সিং-এর বিশ্বাস-ঘাতকতা।

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় গদর বিপ্লবী-দের বিচার করা হয়। মোট ২১৭জন অভি-যুক্তের মধ্যে বিশ্বাসঘাতকদের ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়। এঁদের মধ্যে ছিলেন উনিশ বছরের নির্ভীক তরুণ কর্তার সিং সরাভা ও জন্মবিপ্লবী মহারাষ্ট্রীয় যুবক বিষ্ণু-গণেশ পিংলে। এছাড়া ১২৬ জনকে দ্বীপান্তরে পাঠানো হয় আর ৯৩ জনকে [illegible] কারাদণ্ড।

'গদর' বিপ্লবের পরবর্তীন যিনি উদ্যোক্তা ছিলেন তিনি হলেন [illegible] এবং তাঁর বিপ্লবী দেশপ্রেমিকদের ফাঁসিতে ঝুলতে দেখে [illegible] বিপ্লবের সে [illegible] তাঁরা দিয়েছিলেন দীর্ঘদিন ধরে [illegible] পাঞ্জাবের মুসলমান কৃষক সম্প্রদায়ের [illegible] ও আত্মদানের চরম কাছে মাথা নত হয়েছে।

সবার আমি নায়ক

কানন দেবী

(দশ)

নিউ থিয়েটার্স ছাড়ার 'কছুদিন বাদেই এল জীবনের এক অভাবনীয় মোড় ঘোরার অধ্যায়।

একদিন মেট্রোর একটা ম্যাটিনী শোতে ছবি দেখতে গিয়ে ইন্টারভ্যালে লবিতে বসে চা খাচ্ছি, হঠাৎ সামনে এসে দাঁড়ালেন প্রফুল্লেশ বড়ুয়া। কুশল প্রশ্নাদি বিনিময়ের পর জিজ্ঞেস করলেন, 'এখন কি করছ?'

জানালাম নিউ থিয়েটার্স ছাড়ার পর থেকে কিছুই প্রায় করছি না। তাছাড়া বাড়ী করতে গিয়ে যে প্রচণ্ড অর্থসংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি সেকথাও তাঁকে জানালাম। মিঃ বড়ুয়া হেসে জিজ্ঞেস করলেন 'কাজ-কর্ম' করবার ইচ্ছে আছে, না ফেয়ে, ঘুমিয়ে গড়িয়ে জীবনটা কাটিয়ে দিতে চাও?'

'কাজকর্ম করবার ইচ্ছে নেই? বলেন কি মিঃ বড়ুয়া? শিল্পীর জীবনে কাজ-না-থাকা মানেই ত মৃত্যু। আপনি কি আমায় এরই মধ্যে মৃত্যুবরণ করতে বলছেন?'

'আমি বলছি না। তুমি চাইছ কিনা জানা দরকার ছিল। বল কাল সকালে বাড়ী আছ ত? আমি যাচ্ছি। একটা কাজের কথাই আলোচনা করব।'

পরদিন যথাসময়ে মিঃ বড়ুয়া এলেন সঙ্গে এম-পি প্রোডাকসনের মালিক মুরলীধর চ্যাটার্জিকে নিয়ে। ও'দের কাছেই জানা গেল মুরলীবাবু অল্পকটা ব্যবসায়ে লেগে কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ব্যবসার কোঠায় প্রায় চাবীতালা বন্ধ করতে চলেছেন. আর ভাবছেন অতঃপর কি করা যায়? উপস্থিত মিঃ বড়ুয়ার সহায়তায় একটি ছবি করবার ইচ্ছে তাঁর প্রবল। কিন্তু মন সংশয়মুক্ত নয়। যদি এবারেও বাঁধ হন তাহলে যে কিভাবে ভাঙবেন না।এমনি ভরসা বাংলা চিত্রজগতের ভগবানস্বরূপ মিঃ বড়ুয়ার অন্বেষে ছবিতে নতুন হিরোইন। তারই একজনের ভূমিকা আমি গ্রহণ করতে রাজী কিনা। রাজী হই আশাস চাহিনা যথা-সম্ভব পূর্ণ করতে ইনি চেষ্টা করবেন। তবে তাঁর তৎকালীন আর্থিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে একটু বাদ—ইত্যাদি ইত্যাদি।

তখন ভাবাভাবির আর ধৈর্য নেই। কয়েক মাস কাজ না করে হাঁপিয়ে উঠেছি। তাছাড়া অর্থের প্রয়োজন ত ছিলই। চুক্তি-পত্র স্বাক্ষর করলাম। 'শেষ উত্তর' ও তার হিন্দী ভার্সন—'জবাব'-এর রক্ষিণাস্বরূপ মুরলীবাবু আমায় সঙ্গে সঙ্গেই ২৫ হাজার টাকা দিয়ে দিলেন। অর্থ সমস্যার অনেকখানিই সমাধান হল। এর পরের মাসে মাসিক ৬ হাজার টাকা মাইনে ও শতকরা ১০ টাকা পাবার কথাও পাকাপাকি হয়ে গেল।

বহুদিন বাদে স্টুডিও ফ্লোরে গিয়ে মনটা আনন্দে ঝলমল করে উঠল। এ যেন একটা হারানো বন্ধু হারিয়ে আবার খুঁজে পাওয়া। কাজের উদ্দীপনাও শত গুণ বেড়ে গেল। সেই মুক্তির পর আবার এই ছবিতে মিঃ বড়ুয়ার পরিচালনায় এবং তাঁরই বিপরীতে কাজ করবার সুযোগ পাওয়া গেল

এ ছবিতে কাজ করবার সময়ই মিঃ বড়ুয়াকে যেন নতুন করে চিনলাম। রস ও অভিজ্ঞতার পরিধি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধির অনেক বন্ধ দুয়ার খুলে যাবার ফলেই যেন মিঃ বড়ুয়ার মত অমন গুণীর প্রতিভাবানের নতুন করে মূল্যায়ন করা সম্ভব হলো। আগেই বলেছি 'শেষ উত্তর'-এর নায়িকা দুজন। একজন মনীকনা, উগ্র আধুনিকা তথাকথিত অভিজাত মহলের আলোকপ্রাপ্তা। অপরজন নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের নম্র, শান্ত ঘরোয়া মেয়ে। এক-জন নায়কের বাগদত্তা, অপরজন প্রণয়িনী। নায়কের হৃদয়ের আকর্ষণ দ্বিতীয়ার প্রতিই। তবু তিনি প্রথমাকেই বিবাহ করতে দৃঢ়সংকল্প। কারণ তাঁর কাছে হৃদয়ের দাবীর চেয়ে অনেক বড় ছিল স্বর্গত পিতার দেওয়া কথার প্রতি সম্মান-জ্ঞাপনের সুযোগ কর্তব্যবোধ।

কর্তব্য ও হৃদয়ের গোপন চাওয়ার দ্বন্দ্বে চঞ্চল নায়ক—আর তারই দোলায় দোলায়িত দুই নায়িকার হৃদয়বল্লভার কাহিনী ছিল 'শেষ উত্তর'।

প্রথম নায়িকা ছিলেন যমুনা, দ্বিতীয়া আমি।

বড়ুয়া বরাবরই অন্বিতীয়। কিন্তু এখন দেখলাম আত্মবিশ্বাস তাঁর আরো বলিষ্ঠতর, আরো গভীর তাঁর দৃষ্টি আর সংযত সংক্ষেপ তাঁর নির্দেশনা। কিন্তু আচার-ব্যবহারে, কথাবার্তায় আগের সেই গম্ভীর কাঠিন্যের আবরণ যেন কিছু শিথিল তার জন্য আগের চেয়ে তাঁকে অনেক সহজ, অনেক কাছের মানুষ মনে হত।

একটা শটে ছিল মনীনাকে (আমার ভূমিকা) মনোজ (মিঃ বড়ুয়া) বলছে

যোগাযোগ / জ্যোতি প্রকাশ ও কমল বেরী

তুমি আর আমি চিত্রে ছবি বিশ্বাসের সঙ্গে

আমার এলাচদানা হতে ইচ্ছে করছে না। এইখানেই থাকব।' উত্তরে মীনা বলবে 'ইচ্ছে-মীনাও সবই কি আপনার একার? আমি যদি বলি আমি আপনাকে থাকতে দেব না।' বলেই চলে এবং ভুল বুঝে অভিমানভরে নায়িকার কাছে ফিরে-পাওয়া ব্যাগটা ফেরত চাইবে। কারণ চলে যাবার জন্য সে তখন মনকে প্রস্তুত করে নিয়েছে। মীনার প্রশ্ন 'আপনি সত্যিই আপনার ব্যাগটা ফেরত চাইছেন?' অনামনস্ক নায়ক নিরুত্তরে বলে 'আমি সত্যিই আমার ব্যাগটা ফেরত চাইছি।' অতঃপর নায়িকার নীরবে ব্যাগ এনে দেওয়া।

শটের আগে মিঃ বড়ুয়া বললেন 'ব্যাপারটা বুঝলে তো? নায়ক অভিমান করেই ব্যাগটা ফেরত চায়। কিন্তু নায়িকার পাল্টা অভিমান তার অনামনস্ক স্বভাবের জন্যই সে বোঝে নি। তাই অত জোরের সঙ্গে ব্যাগটা চাইল। সাধারণ মেয়ে হলে নায়কের ভুল বুঝে নিজেকে অপমানিত মনে করত এবং চড়া সুরে দুটো কড়া কথা শুনিয়ে দিত। কিন্তু মীনা শুধু প্রচণ্ড অভিমানিনীই নয় সে অত্যন্ত স্পষ্টভাষী এবং প্রকাশক্ষম। তাই এখানে তার অভিব্যক্তি নীরব অভিনয়ে Let the silence speak here

একটা শটেই ফাইনাল টেক হয়ে গেল। সকলে চলে যেতে এই প্রথম কেন জানি না মিঃ বড়ুয়াকে প্রশ্ন করলাম 'মিঃ বড়ুয়া আপনাকে খুশী করতে পেরেছি কি?'

'তা পেরেছ। কিন্তু তুমি খুশী তো? না, এখনও মনের মধ্যে কোন অভিযোগ অসন্তোষ আছে?

চুপ করে রইলাম। ওঁর প্রশ্নের ধরনে শুধু ঘরে ঢুকে ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখা সেই অন্তর্ভেদী দৃষ্টি চোখের গভীর দৃষ্টি স্নেহাকর্ষক আমার ওপর নস্ত। কিন্তু ঠোঁটের কোণে যেন মৃদু হাসি স্থির হয়ে আছে।

'একথা যেন জিজ্ঞেস করছেন মিঃ বড়ুয়া?' আমার প্রতিপ্রশ্নের উত্তরে মৃদু হাসি সারা মুখে যেন আলোর মত ছড়িয়ে পড়ল। তারপর বিনাভূমিকায় তাঁর সহজাত অনাড়ম্বর ভঙ্গীতেই বললেন 'তোমার মনেই কি আমার বিরুদ্ধে এ অভিযোগ ছিল না যে আমি ইচ্ছে করে তোমার ক্যারেক্টার-এ কোন চরিত্র বুঝিয়ে দিই না? আর এর কারণ...' তারপর আমার লজ্জিত মুখের দিকে চেয়ে যেন হঠাৎ থেমে গিয়েই বললেন 'থাক কারণটা আর নাই বললাম।'

'কিন্তু একথা আপনি জানলেন কেমন করে? আমি তো কারো সঙ্গেই এ বিষয়ে কোন আলোচনা করি নি।' করলাম কেমন করে? বড়ুয়া সাহেবের পরিচালনার বিরুদ্ধে কোন কথা উচ্চারণ করবার সাহস ছিল ইণ্ডাস্ট্রিতে কার ছিল? আমি তো সামান্য হিরোইন।)

'জীবনে একটা সময় আসবে যখন বুঝবে তোমার সম্বন্ধে অন্যের ইম্প্রেশন জানবার জন্য কোন আলোচনা করবার অথবা শোনবার স্বকার করবে না। মানুষের একটা ভঙ্গীতেই এমন অনেক

পথ রেখে দিল চিত্র তবুও গায়ত্রীর ৬ষ্ঠ নিবেদন রোল কলম [illegible]

কথা বোঝা যায়, চাহনিটা [illegible] না?

আমার প্রশ্নে তখন মাথা নিচু করে ভাবী মানুষটি এতক্ষণ কথা বলেই নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। আমি একটু দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে আস্তে চলে আসছিলাম। উনি আবার ডাকলেন। বেশ না, কোন। তারপর সেই অপ্রতিভ ভাবটি কাটিয়ে আবার স্থির হয়ে গেল আমার মুখের ওপর। বললেন, যাকে যতটুকু বলার দরকার তাকে আমি ঠিক ততটুকুই বলে থাকি। তারচেয়ে বেশীও বলি না, কমও না। তোমাকে কোন ভূমিকা বুঝিয়ে বলার সময় আমি কোনদিন বেশী কথা বলি নি, কারণ আমি জানতাম তোমার মত আর্টিস্টকে বেশী বলার দরকার নেই বুঝেছ?

এবার আর আস্তে নয়, একেবারে ছুটতে পালিয়ে এলাম ওর সামনে থেকে। প্রমথেশ বড়ুয়ার মত সংযত চাপা মানুষের সামনে অবাধ আবেগের প্রশ্রয় দেওয়া? ছিঃ।

নিজেকে সেদিন বড় সম্মানিত মনে হয়েছিল। যে সে লোক নয়। বাংলা চিত্র-জগতের প্রায় ভাগ্যবিধাতার মতো যাঁর প্রমথেশ বড়ুয়ার এত বড় কম্প্লিমেন্ট আমার ভোগ্যতা সম্বন্ধে? এটি স্বয়ং ঈশ্বরের আশীর্বাদ নয়? চোখের জল মুছে তাঁরই উদ্দেশ্যে প্রণাম জানালাম। কিন্তু তাঁকে ভুল বুঝেছিলাম বলে সেদিনও যেমন লজ্জিত ছিলাম না, আজও লজ্জিত নই। কেন? সারা জীবনের অভিজ্ঞতায় আজ এইটুকু অন্তত বুঝেছি যে, আমরা জোর গলায় বিশ্বাসের মহিমা প্রচার করলেও জীবনের কোন কোন ক্ষেত্রে অবিশ্বাসের মহিমাও কিছু কম নয়। সত্য

সংগ্রাম আরো কঠিন। আজ প্রতিদিনের একটা মস্ত সান্ত্বনা। তবু এই আলো আবার ইচ্ছুটুই অন্ধকারে হওয়া চাই। সেখানে কোন বাধা থাকতে চলবে না।

যাক যে বলছিলাম প্রেম উত্তম সব নিম্ন থেকে সৌভাগ্যেরই ইঙ্গিতবাহী হয়েছিল। তবে সকল সৌভাগ্যের ছাপিয়ে উঠেছিল মিঃ বড়ুয়ার যথার্থ স্বরূপের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ।

আর একটি কথা আগে বলে রাখা ভাল যে এ কাহিনীর একটি অধ্যায়ে আমি সংযুক্ত কাজকর্মের ফোকাসের বেশীর ভাগটাই মিঃ বড়ুয়ার ব্যক্তিগত দিকের দিকে হওয়ায় নিজেকেই বেশী প্রাধান্য দেবার জন্য। ইচ্ছাকৃত অসততাও ওঁর মোহনার ভাগ্যায় পেয়েছিল। [illegible] দিনের সঙ্গী মাত্রাকর ব্যক্তিত্বও ছিলেন। ওঁর [illegible] কর্মীদের সঙ্গে [illegible] আমার সম্বন্ধে

কনচ্ছাধা চিত্রে

আনন্দবাজার চিত্রে অহর গাঙ্গুলী

শেষ উত্তর / যমুনা বড়ুয়া ও কমল মৈত্র

একটু জানা হওয়ার পরই বোধহয় বুঝেছিলাম আমার ধারণা ভুল হয়নি। কেন?

মিঃ বড়ুয়া নিতান্ত ছোটখাট একটি মানুষ। উঁচু বলে হাফপ্যান্ট আর স্পোর্টিং শ্লোজ পরে স্টুডিওর লম্বা ব্যাডমিন্টন খেলতেন দূর থেকে দেখে মনে হতো যেন স্কুল বয়। সেই মানুষটাই যমুনা, কমলেশ-কুমারী, চন্দ্রা, এদের মত জাঁদরেলী (চলতি বাংলার বাগে বলে লম্বা-চওড়া) মেয়েদের বিপরীতে হিরোর পার্ট করেছেন। কিন্তু এতটুকু দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও ভাগেই নি, উপরন্তু বাক্তিত্বে, অভিব্যক্তির ঋজুতায় এবং স্বাভাবিকতায় তিনি সে যুগের সকলকেই ছাপিয়ে উঠেছিলেন। (এ যুগেই বা তাঁর কাছে-কাছে দাঁড়াবার মত কজন আছে? দেবেন্দ্রা তার কাউকে ভাবা যায়?)

না, কথা যেন চালাই নি। আমি বলছিলাম মিঃ বড়ুয়ার ঐ উদাসী বিহ্বলতা, ঐ অভিনব একেন্দ্রিয়প্রকাশের অনেকখানিই পর্দার বুকে যথাযথভাবে ফুটে উঠতে পারত না যদি না ক্যামেরার সংস্থাপন খুব কাছাকাছি না হতো। কারণ ছোট জিনিস দূর থেকে এত ছোট দেখায় যে, তার অভিনয়ই অনেক সময় নাকচ হয়ে যায়। বাংলা ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রির প্রথম শ্রেণীর ক্যামেরাম্যান প্রমথেশ বড়ুয়া এ সত্য সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন বলেই ক্যামেরা সন্নিবেশ সম্বন্ধে তাঁর এত সাবধানতা। ছবির সামগ্রিক সাফল্যের দিকে লক্ষ্য রাখতে হত বলেই হিরো বড়ুয়ার চেহারার চরিত্রকে সুপরিস্ফুট করবার জন্য ক্যামেরাম্যান বড়ুয়া এত ব্যস্ত, এত সজাগ ছিলেন।

আজকাল আমার একটা কথা প্রায় মনে হয়। অভিনেতা-অভিনেত্রী সকলেরই কাজের অবসরে ছবি তুলতে পারাটা একটা শিক্ষার অঙ্গ করে নেওয়া উচিত। যেমন উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের গায়ক-বাদকের অবসর গড়নাটা মোটামুটি রপ্ত থাকে বলেই তার ও সুরের ভারসাম্য রাখাটা তাঁদের কাছে সহজ হয়। ওস্তাদ আমীরখাঁর কাছে গান শেখবার সময় আমাকেও একটু একটু তবলা শিখতে হয়েছে। ওস্তাদ বলতেন 'তুমি সুরের স্রোতে তালের সঙ্গে সঙ্গে সমান তাল রাখতে হবে। সুরের দাঁড় ঠিক চলছে কিনা তা জানবার জন্য মাঝে মাঝে তবলার বোল বাজিয়ে দেখে নেবে।' ছবি তোলার বেলায়ও ঠিক তাই। ক্যামেরার সঙ্গে সঙ্গে সমান তাল রেখে চলতে হবে। ক্যামেরা ঠিক চলছে কিনা তা জানবার জন্য মাঝে মাঝে ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে দেখে নিতে হবে। ক্যামেরা ঠিক না চললে ছবি তোলা বন্ধ করে দিতে হবে। তাই বলছিলাম শিল্পীদের ক্যামেরার জ্ঞান থাকলে কারু পরিচালকের বহু ঝোঁকা সহজতর করাই হয় না। তাঁহারা কোন্ কোণের ক্যামেরার চোখে কেমন মেকআপ নিয়ে অভিনীত চরিত্রের বক্তব্যকে আরো জোরালো করা যায়।

এ ত গেল মানস-জগতের লাভের হিসেব। শেষ উত্তরের বক্তব্য সম্পর্কেও উল্লেখ করবার মতই।

'শেষ উত্তর' ও তার হিন্দী ভার্সন 'জবাব'-এ প্রমথেশ বড়ুয়ার সাফল্যে উল্লাসে বিজয়পতাকা ওড়ালো।

এ ছবি শুধু সুপার হিট করে নি। ১৯৪২ সালে বি এফ জে এর বিচারে 'শেষ উত্তর' শ্রেষ্ঠতম চিত্ররূপে ঘোষিত হয় আর পর পর ২ বছর (১৯৪১ সালে পরিচয় ১৯৪২-এ শেষ উত্তর) এই পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছি।

১৯৪২ সালের ২৫শে ডিসেম্বর পূর্ণা ও ৬ পুবেরীতে এ ছবির মুক্তি হয়। হিন্দী ভার্সনও সেই বছরেই হল আর অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যও সম্মানে প্রতিষ্ঠিত ছিল। তখন শুনেছিলাম এ ছবি থেকে ২৭।২৮ লক্ষ টাকা লাভ হয়, যেখানে ছবি তৈরীর খরচ ছিল তিন থেকে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা। এখন ও দুটি ভার্সনের ছবি করতে কমপক্ষে ১২।১৪ লক্ষ টাকা খরচ।

'শেষ উত্তর' ছবি করবার সময়ই যমুনার কাছাকাছি আসবার সুযোগ ঘটল। এর আগে ওর সঙ্গে যথেষ্ট আলাপ থাকলেও অন্তরঙ্গতা ছিল না। খুব ঠাণ্ডা স্বভাবের নিরীহ মেয়ে বলে যমুনাকে বরাবরই খুব ভাল লাগত। এখানে ওর আতিশয্যবিহীন আন্তরিকতা আমায় মুগ্ধ করেছে।

সংসারে অভিনয়ের বন্ধ পাওয়াটা সবচেয়ে বড় হলেও সংসার এবং কর্মজীবনের নানা ক্ষেত্রগুলির ক্ষেত্রে আন্তরিক প্রীতির নানা শ্রেণীর ছোট-বড় দানের ভূমিকাও তুচ্ছ করবার মত বস্তু নয়।

মাত্র কয়েক মাস আগে আমার ছেলের বিয়েতে যমুনাকে নিমন্ত্রণ জানাতে যেতেই ওর সেই হাত দুটি জড়িয়ে ধরার উষ্ণতা কেন পুরানো দিনের যমুনাকে মনে করিয়ে দিল। আমার তাড়া ছিল। বললাম 'যমুনা সংক্রান্তিটি ভাই আজ আর বলব না।' 'ইস সেকি হয় নাকি? আমি তোমার জোর করে ধরে টেনে নিয়ে যাব।' সত্যিই গেল। এই জোরের সঙ্গে যদি হৃদয়ের উত্তাপ থাকে তা হৃদয়কে স্পর্শ করেই তার পরিধি এতটুকুই হোক আর এতবড়ই হোক।

মনে হল কালের স্থূল হস্তাবলেপ মানুষের বাইরেটার পরিবর্তন ঘটাতে পারে। কিন্তু অন্তরের নিভৃতলোকে মানুষ বুঝি চিরকালই এক ও অভিন্ন।

(অনুলিখন - সন্ধ্যা সেন)

(চলবে)

CENTRAL LIBRARY

অমৃতপুরের যাত্রা মৃত্যুঞ্জয় মাইতি

।। ২২ ।।

মির্জাপুর স্ট্রীট থেকে তার বাসায় যাওয়ার গলিটার মুখে হঠাৎ এ সময় কালি-মাখা খাঁকি ট্রাউজার পরা একটি তাগড়াই ছেলেকে দেখে সজলের কেমন একটু সন্দেহ হচ্ছিল। ছেলেটিকে সে কোথায় দেখেছে। মুখের আদলটা চেনা। কিন্তু আদৌ মনে করতে পারছে না।

'আমায় চিনতে পারেন বাবু? আমি হাবুল।'

সজল চিনতে পারল না। 'কে হাবুল?'

'ঐ যে সেবার বালিগঞ্জ ইস্টিশানে কেনা, পটলা আপনার জিনিস চুরি করেছিল।'

'ও। তা, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে?'

সলজ্জ হাবুল মুখ নীচু করে একটু হেসে বলল, 'আজ্ঞে পুঁটি আপনার বাড়ীতে আছে। এখনো আসে নি। তাই।'

সজলের কেমন আশ্চর্য লাগছিল। ভেবে ভেবে একটা সিদ্ধান্তে আসতে ভালো-লাগছিল তার। পুঁটিকে হাবুল তাহলে ভালোবাসে। দেখা করার জন্য এত রাত অবধি তাই দাঁড়িয়ে আছে এখানে। এ তা' হলে হাবুলচন্দ্রের অভিসার।

সজল বলল, 'চল, আমার বাসায় চল।'

হাবুলকে দেখে পুঁটিও অবাক। কিন্তু ভালোবাসার লজ্জা, ঘং ওর মুখে ছড়িয়ে পড়েছে। এ সময় পুঁটিকে দেখতে সজলের খুব ভালো লাগছিল। পুঁটি যে সুন্দর এবং তারও ভালোবাসবার মত বয়স হয়েছে, এ খবরটা সজলের জানা ছিল না।

অরুণা এখনও ফেরেনি। তাই পুঁটি বাসা ছেড়ে যেতে পারেনি। ভাত নামিয়েছে, ডালও বসিয়েছে। দাদাবাবুও আসেনি আর বৌদিও বাড়ী নাই। ঘরদোর সে কার কাছে রেখে যাবে? তার ত একটা দায়িত্ব আছে। জ্ঞানগম্যি আছে। মা কি বলে সুটা কাজ করেই খালাস।

পুঁটি কথায় চিরদিনই মিষ্টি। ওর

সজল বলল, 'হাবুল, কি করিস রে তুই?'

'ঘুনুড়িতে চটকলে চাকরি করি, বাবু'

'সে কি রে? সে ত অনেক দূর?'

'তা হোক বাবু। সেই সকালে শেয়ালদা হয়ে বাস-এ চলে যাই। আর ফিরি রাত্তে। যাবার সময় ঐ পুঁটির সঙ্গে একটু দেখা করে যাই! আজ আর বাড়ী ফেরেনি দেখে...'।

সজল বাকিটা শেষ করল, 'দেখে এখানে চলে এলি। তা দাঁড়িয়েছিলি কেন রাস্তায়?'

'পুঁটি হল ঝি। কে কোথায় কি বলবে? আমরা মুখ্যুসুখ্যু মানুষ।'

হাবুল চা খাচ্ছিল। সজল নিজে গিয়ে আজ সিঙ্গাড়া সন্দেশ কিনে নিয়ে এসেছে। পুঁটি প্লেটে সাজিয়ে দিয়েছে সব।

হাবুল খেতে খেতে বলছিল, 'সেবার ঐ কেনা-টা আপনার জিনিস নিয়েছিল। তার সঙ্গে ছিল পটলা। পুঁটি যখন বলল, বাবুর জিনিস নিবি না, খবর্দার! তা কেনা, পটলা কি শোনে। ওকে ত পাত্তাই দিচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত কাড়লাম একটা বাঁ হাত দিয়ে! তা মুখটা ধাঁ করে ঘুরে গেল ডান দিকে! পটলাটা একটু ভেরিমেরি করছিল। বললাম, শুয়ারকা বাচ্চা, পুঁটির চেনা লোকের জিনিস চুরি? ইয়াকি' পাতা হ্যায়। আভি মাল ফাল? তারপর কি হল শুনুন—'।

পুঁটি ধমক দিল হাবুলকে। 'কি সব বলা হচ্ছে বাবুর সামনে? মুখ সামলে কথা বলবি ত?'

'কিছু খারাপ কথা বলছি? ম, আপনি বলুন?'

সজল খুশি মনে হাসতে হাসতে হাবুলের কথা শুনছিল। বলল, 'না, তুই বলে যা?'

'না বাবু, আপনি বরং ঐ পুঁটিকে বুঝিয়ে বলুন, একটু যেন ভবাসভ্য হয়ে কথাবার্তা বলে। দিনরাত গাত মুখ খিঁচিয়ে আছে আমার ওপর। জিন্দেগী বরবাদ করে দিল, শালা!'

সজল বলল, 'তবু ত তুই ওর জন্য দাঁড়িয়ে থাকিস'।

'থাকব না কেন বাবু। ওর সঙ্গে আমার কি আজকের চেনাশোনা। সেই ছেলেবেলা থেকে। জন্মেছিলাম ফুটপাতে। ছিলেম ছিঁচকে চোর। ও-ই ত গালাগাল দিয়ে হাবুলের নাম ভুলিয়ে দিল। সেই আপনার বাবার পর থেকে। বলে, বিয়ে করবি ত চাকর খোক গোলামের বাচ্চা" চাকরী না করলে মুখে নুড়ো জেলে দেব তোর। অগত্যা চটকলে চাকরী।'

'কত টাকা পাস?'

'ওভারটাইম ফাইম নিয়ে তা চল্লিশ টাকা হয়'। কুড়ি টাকা আমার, বাকি টাকা ঐ পুঁটির হাতে দিতে হয়।

সজল হঠাৎ লক্ষ্য করল হাবুলকে পুঁটি চোখ টিপে দিচ্ছে।

সজল বলল, 'তোরা যা এবার। আমি ত এসে গেছি'।

পুঁটি বলল, 'ভাত বেড়ে দিয়ে যাব?'

'না, না, দরকার নেই। তোর বৌদি এসে যাবে এক্ষুনি।'

সজল খেতে বসেছে, এমন সময় অরুণা এল। এসেই রান্নাঘরে ঢুকল। তারপর একমুখ হাসি ছড়িয়ে বলল, 'দিদির ওখানে গেছলাম। তাই দেরী হয়ে গেল। তোমাকে ফোন করেও পেলাম না। তা তুমি এত দেরি করে খাচ্ছ কেন?'

সজল জল খেয়ে আস্তে আস্তে বলল, 'রান্না ত এই শেষ হল'।

'কে রান্না করল, তুমি?'

'না, পুঁটি'।

'তা হলে ত ভালোই লাগবে? কি রান্না করেছে দেখি?'

সজলের কথা বলার ইচ্ছা ছিল না। ভাবছিল, অরুণা কী সুন্দর অভিনয় করে!

অরুণা আরও কাছে সরে এসে একটা আসন পেতে বসল। বলল, 'দাদা বলেছে, একবার হাসপাতালে নিয়ে যেতে। বোসব পক্ষিমন কি? এই দেখ, পা দুটো যেন একটু ফোলা ফোলা।'

অরুণা দুটো পায়ের কাপড় সরাল।

রাত্রি এখন নিঝুম। ওপরের ঘরে শুয়ে সজল বিশ্বময়ের কথা ভাবছিল। ওর কাছে নিজেকে বড় ছোট মনে হচ্ছিল আজ। সারা মানবসমাজের দুঃখ-দারিদ্র্যের কথা, তা থেকে মুক্তির কথা, সজল কি একদিনের জন্যও চিন্তা করেছে? সে তো শুধু নিজের ছোটখাট সুখ দুঃখ, নিজের স্বার্থ, এই নিয়েই, ডুবে আছে! একি একটা জীবন? বিশ্বময়ের মত, একদিনের জন্যও তো সে বিপুল মানবসমাজের দুঃখ বেদনা অনুভব করেনি? সে কত ছোট কত সাধারণ, কত স্বার্থপর!

বিশ্বময়ের জন্মদিনে শুচিতা আজ তাকে এই বৃহৎ দিগন্তের দিকে একবার তাকাবার কথা মনে করিয়ে দিল। মনে করিয়ে দিল, ব্যক্তিগত স্বার্থের মধ্যে মনুষ্যত্বের বিকাশ হয় না। কবে মানব-সমাজের মুক্তি আসবে, দারিদ্র্য থেকে, শোষণ থেকে, ধনীর অত্যাচার থেকে, ক্ষমতাবানের ঔদ্ধত্য থেকে, আজ তার জন্য বিশ্বময় সব ছেড়ে চলে গেছে। একমাত্র বোনের শ্রদ্ধা ভালোবাসা, বাবার স্নেহ, নিজের ভবিষ্যৎ—সব কিছু হেলায় সরিয়ে রেখে বিহারের কোন এক শহর থেকে কাগজ বের করার কাজে লেগেছিল। কাগজই হল তার হাতিয়ার! মূলধন, তার সস্তা আদর্শ। চলতে চলতে পথে হোঁচট খেয়ে পড়েছে, কাগজ উঠে গেছে, কিন্তু মাটি থেকে সে একাই উঠবে, উঠতে চায়। যাকে অপরের দয়ার উঠতে হয়, অপরের সাহায্যে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে হয়, আর যা হোক মানবসমাজকে চলতে সাহায্য করা তার পক্ষে কঠিন। বিশ্বময় চাকরী করেই যেন শোধ করবে! আদর্শের প্রতি এত বড় একনিষ্ঠতা সজল জীবনে আর কোন বন্ধুর মধ্যে দেখেনি!

আজ মনে হল, বিশ্বময়ের কাছে সজল কত ছোট! তবু বিশ্বময়ের জন্য তার গর্বের শেষ নেই। বিশ্বময় তার বন্ধু।

সজল বিশ্বময়ের মুখটা মনে করতে চেষ্টা করল। সেই গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবি-পরা, কর্সা, লম্বা চেহারাটা। কিন্তু মুখের আদলটা যে আদৌ মনে পড়ছে না! সজল অনেক চেষ্টা করেও মনে করতে পারল না। না, শুচিতার মুখের আদল নেই বিশ্বময়ের মুখে। শুচিতা একধরনের সুন্দর, বিশ্বময় আর এক ধরনের।

সজল কি তবে বিশ্বময়কে ভুলে যাচ্ছে! নইলে মুখটা মনে করতে পারছে না কেন! নিজের ওপর বড় ক্ষোভ হল সজলের। সে অকৃতজ্ঞ, বড় অকৃতজ্ঞ! সে এই ক' মাসের বিবাহিত জীবনে সবকে ভুলে যাচ্ছে! আত্মীয়! আত্মীয়কেও কি ভুলে যাচ্ছে সজল?

সজল ভাবছিল, ঘরের জন্য তার আকর্ষণ শেষ হয়ে গেছে। সবচেয়ে ভালো হত, বিশ্বময়ের মত কোথাও বেরিয়ে পড়লে! পৃথিবীর পথ সবদিকে চলে গেছে। সব পথই এক একটি তীর্থ! মাটির পথ, বালু-ঢাকা সমুদ্রতীরের পথ, কাঁকর ছাওয়া পাহাড়ী পথ অথবা বনস্পতির ছায়ার স্নেহমাখা অরণ্যপথ—সবই এক একটি তীর্থ। মানুষ তীর্থে যেত। অর্থাৎ পরিচিত সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর সীমা ভেঙে সে বাইরের বিশ্বের পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত হতে। এই মুক্তির গান, ছন্দ যেখানে বাজে সেইখানেই তীর্থের পথরেখা। সজল কি কোনভাবে সেই তীর্থপথে বের হতে পারে না!

আজ এই রাত্রে, জীবনের কোন গভীরে, কোন দূর বিশ্বতীর্থ পথের ডাক সজল শুনতে পেল।

কদিন পর সজল অফিস থেকে ফিরে চা খেয়ে সেতার বাজাচ্ছিল।

পুটি বলল, 'বাবু কে ডাকছে আপনাকে?'

'কে? নাম কি?' অর্থাৎ সজলের উঠতে ইচ্ছে করছিল না। বাজাতে বাজাতে মেজাজ এসে গেছল।

'নাম কি পেয়ারে লিখে রেখেছি? সেই যে নিমন্ত্রণে যেতে এসেছিল। ইয়া গোঁফ'!

'সে কি রে? হারাধনদা এসেছে?' তাড়াতাড়ি সেতারটা রেখে সজল চিৎকার করে নিচে নামছিল।

সামনেই হারাধন দাঁড়িয়েছিল। হাতে তালিমারা ছাতা, গায়ে সেই চিরন্তন টিলে হাফসার্ট। হাতে মরচে পড়া সেই সুটকেসটা। মুখটা বড় বিষণ্ণ।

মনে হচ্ছে হারাধনদা কোথাও চলে যাচ্ছে।

'কি ব্যাপার? আরে, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? জ্বর হয়েছিল?'

হারাধন ধীরে ধীরে বলল, 'দেশে চলে যাচ্ছি রে। তা যাবার সময় ভাবলাম একবার তোর সঙ্গে দেখা করে যাই'।

হারাধনদাকে সজল জোর করে টেনে নিয়ে এল ঘরে। কেন? চাকরী ছেড়ে দিচ্ছ? তা যা বাজী চাকরী তোমার? থাকলেও যা কি, গেলেও বা কি?'

'নারে, সব লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে?'

'মানে?'

'গুণময় মহাপাত্র মারা গেছে।'

ক্ষণিকের মধ্যে সজলের মনে, একটা খিটখিটে চেহারার লোকের ছবিটা ভেসে উঠেছিল। গলায় তুলসী কাঠের মালা, নিকেলের চশমা চোখে। পৃথিবীর যত ক্রোধ ঘৃণা বিদ্বেষ সব ঐ মুখে এসে জমা হয়েছিল। কি গালাগালি দিত হারাধনদাকে?

সজল বলল, 'ট্রেন কখন?'

'পুরী প্যাসেঞ্জার। রাত দশটা'।

'তাহলে এইখানে খেয়ে যাও'।

'না, না, না' হারাধনদা অস্থির হয়ে উঠল। তুই বোস্। দুটো কথা বলে যাই যাবার সময়'।

সজল বলল, 'দাঁড়াও আসছি'।

পুটিকে খাবার আনতে পাঠিয়ে সজল ফিরে এসে বসল।

'হ্যাঁ, কি হয়েছিল বুড়োর?'

হারাধন সিভারের কাছে হাত দিয়ে দেখাল। 'শালা, পেটে ঢোল। যমে মানুষে টানাটানি। দোকান বিক্রি হয়ে গেল।'

'তা তোমার চেহারা এমন হোল কেন?'

'আরে তুই কি সে বলিস? দোকানেই ত ছিল। লটঘট বল, সেবাশুশ্রূষা বল,—যত হোক, তাবই ত খেয়েছি পরেছি রে। বুঝলি না? ব্যামো হয়েছে বলে সরে পড়ব? সেটা কি মানুষের কাজ? তুই বল?'

সজল হারাধনের এই চরিত্রের খবর জানে না, এমন নয়। তবু আশ্চর্য হচ্ছিল, গুণময় মহাপাত্র কি অত্যাচারটা করত ওর ওপর।

'তারপর দোকানেই মারা গেল?'

'না, না। শেষ পর্যন্ত কাউন্সিলারকে ধরে হাসপাতালে দিয়ে এলাম।'

'তবু বাঁচল না?'

'না। শালার যমে টেনেছে। টানবে না? যমের কি অপরাধ বল? এদিকে সারা-জীবন টেনে এসেছে যে?'

'তা মরল কবে?'

'কাল রাতে।'

'এই কদিনে তোমার মুখচোখ কালো হয়ে গেল?'

এদিক ওদিক হারাধন তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'তিনবার রক্ত দিয়েছি। আর খাওয়া-দাওয়া নেই। ছেলেটা রক্ত দিতে চাইল না। আর আমার রক্তের সঙ্গে কি সব মিলে গেল। তা তিনবার দিলাম। কিন্তু যমে থাকে নেবে।...তা উঠি এখন। যাবার সময় দেখাটা হয়ে গেল, ভোর সঙ্গে।'

পুটি এসে গেছল।

'এত খাবার?'

'বকতে হবে না, খাও।'

গোগ্রাসে খেতে খেতে হারাধন বলল, 'বৌমা কোথায় রে?'

'এখনো ফেরেনি।'

'সে কি রে পোয়াতী বৌ? অফিস পাঠালি কেন? তোর কি জ্ঞানগম্যি কোন কালেই হবে না রে সজল? আর গেল ত ফিরল না কেন? এলে বকে দিস্। এ বড় অন্যায়, বড় অন্যায়!'

সজল চুপ করে রইল।

পুরো এক গ্লাস জল খেয়ে গোঁফটা দুবার মুছে হারাধন বলল, 'বড় খুশি হলাম রে। তুই ভাল চাকরি করছিস, সুখে ঘর-সংসার করছিস, মানুষ হয়েছিস। গ্রামের লোক আমি আবার গ্রামেই ফিরে যাচ্ছি!'

সজলও উঠে দাঁড়াল। জামা পরল, কাপড় ছাড়ল।

হারাধন অবাক, 'তুই উঠলি যে? এই অফিস থেকে এলি। আবার কোথায় যাবি?'

সজল বলল, 'হাওড়া স্টেশন।'

ট্রেন ছাড়তে দেরি আছে। একটা জায়গা করে হারাধনদাকে সজল বসিয়ে দিল। সুটকেসটা নিজেই বাঙ্কের ওপর তুলে রাখল। তারপর কাছে এসে বসল।

প্রথম কলকাতা আসার দিনের কথা মনে পড়ছিল তার। হারাধনদাই বালিচক স্টেশনে এই পুরো প্যাসেঞ্জারে ওর কথা ঠেলেঠুলে জায়গা করে দিয়েছিল।

আজ সজল তাকেই শেষবারের মত ট্রেনে তুলে দিতে এসেছে। হারাধন চুপ করে বসেছিল। ঘাড়টা নুয়ে পড়ছে একটু। বড় কাঁচাপাকা গোঁফটাও আজ আরো ঝুলে পড়েছে।

এতদিনের কলকাতার জীবন ছেড়ে যেতে ওর কষ্ট হচ্ছে আজ। সজল অনুভব করছিল, হারাধনদার মনেও যেন অনেক কান্না জমে উঠছে।

চারধারে যাত্রীদের ভীড়, চিৎকার। কুলীদের হৈ-হল্লা। তবু এত কোলাহলের মধ্যে দুজন চুপ করে কতক্ষণ বসেছিল।

হারাধন ধীরে ধীরে বলল, 'তুই এবার যা সজল। বৌমাকে ডাক্তার দেখাবি। আর ছেলেমেয়ে হলে চিঠি দিবি। ভুলিস্‌নি যেন। ঠিকানা মনে আছে তো?'

সজল ঘড়ি দেখল। রাত্রি দশটা। সিগন্যাল দিয়েছে। ধীরে ধীরে ট্রেন থেকে নেমে এল। জানালার কাছে দাঁড়াল একটু। হারাধনদাকে কি যেন বলতে ইচ্ছে করছিল তার। হয়ত বলতে ইচ্ছে করছিল, তার কাছে সজল অনেক, অনেক ঋণী। কিন্তু তা বলা হল না। তা বলা যায় না।

একজন টিকেট কালেক্টার এল টিকিট দেখতে। হারাধন টিকিটটা বের করল।

একটু পরে গার্ড নীল আলো দেখাল, হুইসিল দিল। ট্রেনটা নড়ে উঠল এবার।

সজল একটু হেঁটে গেল ট্রেনের সঙ্গে।

হারাধন তেমনি করে একদিকে তাকিয়েছিল। যেন তার খেয়াল নেই।

'তাহলে আসি, হারাধনদা?'

হারাধন মুখ ফিরিয়ে চোখ মুছে আস্তে আস্তে বলল, 'আয়! মনে রাখবি যে তোর হারাধনদাকে মনে রাখবি, ভুলে যাসনা যেন। আমার বাড়ী যাবি। বালিচক থেকে বাস-এ গিয়ে তেমোথানিতে নেমে যাকে জিজ্ঞেস করবি, হারাধন অধিকারীর বাড়ী কোথায়—সে-ই বলে দেবে! ভুলবি না.....।'

সজল চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল।

ট্রেন কখন প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে চলে গেছে সজল জানে না।

(তেইশ)

হাসপাতালে সজল এর আগে কখনো আসেনি। তাছাড়া এই মেটার্নিটি বিভাগে একবিচিত্র পরিবেশ। ওধারের বেঞ্চে সারি সারি গর্ভবতী মহিলাদের ভিড়।

একজন বয়স্কা স্ত্রীলোক পাশের পরিচারিকাটিকে বলছিল, 'এই নিয়ে আটবার এলাম ভাই। আগের বার দোতলার ঐ কোণের 'বেড'-এ ছিলাম। তুমি বুঝি নতুন পোয়াতী? দেখে রাখো, ঐ নিকটা লেবার রুমে। সব খালি টিনিং প্রায় কি বছর আসতে হয় কিনা।'

তরুণী বৌটি মুখে টিপে হেসে বলল, 'সে কি দিদি! সাতবার হয়ে গেছে আবারও এলেন?'

'ঠিক করব মা। সামনে এবার ফেব্রুয়ারী মিনি ওপারে আছেন।'

মেয়েটি হাত ভেঙ্গে করে কপালে ঠেকাল।

সজল দূর থেকে কথাগুলো শুনে অবাক।

একটা সন্তানবঞ্চিতা, বহু আশা-প্রতীক্ষা মাতৃত্বের ঝুড়ি জাতীর সমাবেশ। সজলের ভালো লাগছিল না। প্রায় দুঘন্টা হল টিকিট কিনেছে। এখনও ডাক আসেনি।

অন্যান্য সকলের পিঠে একটা খোঁচা মেরে বলল, ওটিকে নিয়ে আসতে চাইলাম, শুনলে না। এখন মেজাজ খারাপ

আপনার ক্ষুদ্রায়তন শিল্পকে বাড়াতে প্রথমেই চাই মূলধন

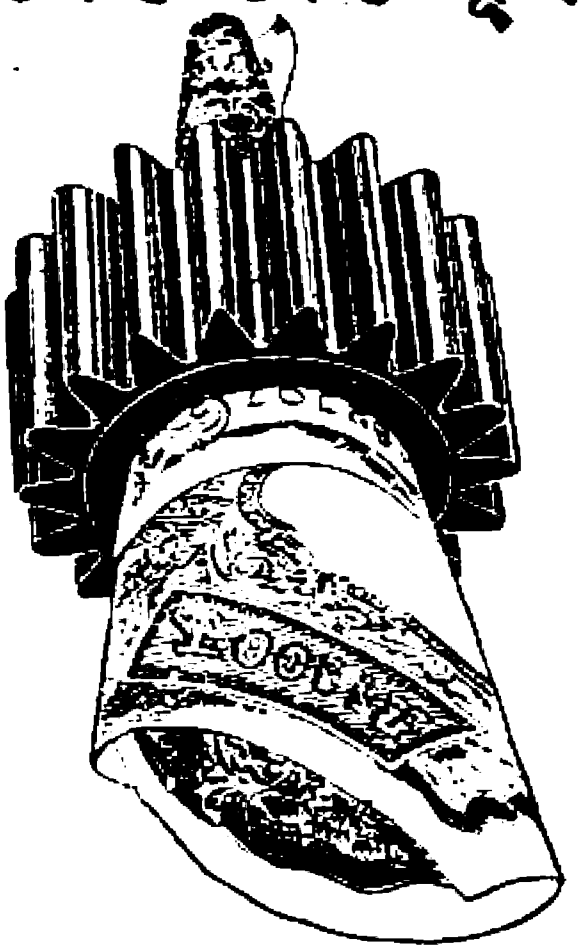

কিন্তু সেই মূলধনের টাকা কোথা থেকে আসবে?
কেন, ইউকোব্যাঙ্কই তো রয়েছে।

আপনার যদি ছোটখাটো কলকারখানা থেকে থাকে তাহলে আধিক সাহায্য পেতে ইউকোব্যাঙ্ক আপনাকেই অগ্রাধিকার দেবে। এই সাহায্য নিয়ে নিজের কারবার জোরদার ক'রে জীবনে আপনি উন্নতির সুযোগ পাবেন।

আপনার দরকার সম্বন্ধে আমরা ওয়াকিবহাল। আপনার কারখানার আয় বাড়াতে হলে এর পেছনে টাকা ঢালা চাই।

আমরা আপনার পাশে আছি। মেশিনারি বা কাঁচামাল কিনুন। কারখানা বাড়িয়ে তুলুন বা নতুন পত্তন করুন। এমন কি কারখানা চালু রাখতে কিংবা ছেলে সাজাতে হলেও আমরা লোন দিয়ে সাহায্য করি। আর এসবের সুদের হারও খুব ন্যায্য।

আপনার নিজের চেষ্টায় নিজের উন্নতিতে ইউকোব্যাঙ্ক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে আছে।

বিস্তারিত বিবরণ ও পরামর্শের জন্য নিকটস্থ ইউকোব্যাঙ্কের শাখায় আসুন।

UCO/72

জনগণের প্রয়োজন মিটিয়ে চলেছে

হয়ে উঠছে। যাও, চা-টা খেয়ে এসো না, বাইরে নিয়ে'।

সজল ঘড়ি দেখে বলল, 'আর একটু দেখি'।

সিস্টার দরজা ধরে ডাকছিল, 'অরুণা ভট্টাচার্য অরুণা ভট্টাচার্য আছেন নাকি?'

সজল অবাক! অরুণা তাকে কিছু না জানিয়েই ভেতরে চলে গেল।

একটু ক্ষুণ্ণ হল সজল। আজ সকাল থেকে অরুণা তার উপস্থিতিটা ঠিক যেন সহ্য করতে পারছে না। একটা অস্বস্তি বোধ করছে, যেন এড়িয়ে যেতে চাইছে।

তবু সজল মনে মনে প্রার্থনা করছিল, অরুণা হাসিমুখে বেরিয়ে আসুক। ডাক্তার বলুক—না, কোন 'রীজন' নেই বেবি 'অলরাইট', সুস্থ, স্বাভাবিক।

এমন কাতরতা নিয়ে সে কখনো ঈশ্বরকে স্মরণ করেনি।

হঠাৎ সিস্টার বেরিয়ে এসে ডাকল, অরুণা ভট্টাচার্যের সঙ্গে কে এসেছেন?'

সভয়ে ভয়ে ভয়ে দাঁড়িয়ে উঠল।

'ভেতরে আসুন'—

সজল যেন তার মৃত্যুদণ্ড শুনল! তবে কি বেবীর কিছু হয়েছে!

ধবধবে হাফপ্যান্টপরা বুড়ো দরোয়ান ভারিক্কি চালে বলল, 'বাইরে, অপেক্ষা কাইয়ে'।

সজলের বুক কাঁপছিল। ভেতরে গিয়ে দেখল, একজন বৃদ্ধ ডাক্তার আর কয়েকজন জুনিয়ার অরুণাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে। মুখ নিচু করে অরুণা বিছানায় বসে আছে।

গলায় স্টেথিসকোপ, গম্ভীর চেহারা, চোখে কড়া পাওয়ারের চশমা, হাতে কাগজের প্লোপস। বৃদ্ধ ডাক্তার বললেন, 'আপনি মিঃ ভট্টাচার্য?'

সজল ভয়ে ভয়ে বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ'।

'পেসেন্ট ঠিক বলতে পারছে না কনসেপসন-এর এ্যাপ্রক্সিমেট টাইমটা কবে। আপনি জানেন?

মুহূর্তের একটা ক্ষীণ সন্দেহ মুহূর্তের মধ্যে সজলের মনে ছায়া ফেলে গেল!

সজলের গলার স্বর কেঁপে যাচ্ছিল। তবু সেই প্রথম রাত্রির ঘটনার তারিখ থেকে মোটামুটি হিসেব করে বলল, 'মাস সাতেক হবে'।

ডাক্তারবাবু নিজেদের মধ্যে আস্তে আস্তে কি বলাবলি করলেন। একজন জুনিয়ার মাথা নাড়ল। 'না স্যার এ হয় না'।

ডাক্তারবাবু আবার বললেন, 'নো। কোথাও ভুল আছে। বেবির বয়েস নয়মাসের বেশি। এ তো বেশ এডভান্সড স্টেজ। এ পেসেন্টকে সীট দেওয়ার অসুবিধে আছে। আরো আগে আসা উচিত ছিল'।

সজল চমকে উঠল, গায়ে কাঁটা দিল তার। তার মনে হচ্ছিল, মাথাটা ঘুরছে, সিমেন্টের লাল মেঝেটাও যেন কাঁপছে এখন। সে কি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবে!

ডাক্তারবাবু সাহস দিলেন, 'নো, নো, নো, ডোন্ট গেট নার্ভাস। বেবি ইজ অল রাইট। সেসব ঠিক আছে।'

সজল বলল, 'একটা সিটের ব্যবস্থা করে দিন, স্যার। বাড়ীতে আর কেউ নেই। বড় উপকার হয় তা হলে।'

বড়ডাক্তার টীকিটের ওপর প্রেসক্রিপসন লিখে দিলেন। একটা টনিক, ট্যাবলেট। বললেন, 'মুনেটা কম খাবে। আধো না হলেই ভাল। যান, ভয়ের কিছু নেই। কিন্তু পেসেন্টকে এখানে সিট দিতে পারব না। ইট ইজ টু্ লেট'। অন্য কোথাও দেখুন। টীকিটটা আগে করিয়ে রাখলেন না কেন?'

রিকসায় ফিরছিল দু'জন। সজল কোন কথা বলছিল না। অরুণাও চুপ।

একটা বড় কঠিন সন্দেহ তার মনে ধীরে ধীরে ঘনকালো মেঘের মত সঞ্চারিত হচ্ছিল। অথচ সে সন্দেহটা প্রকাশ করার মত সাহস তার নেই। সে সন্দেহটা বড় রুচিহীন, কিন্তু একটা জীবনকে তছনছ করে দেবার মত প্রচণ্ড শক্তি তার মধ্যে উদ্যত লাভাস্রোতের মত সঞ্চিত হয়ে আছে।

তাকে প্রকাশ করতে সজল ভয় পাচ্ছে।

অরুণা অন্যদিকে মুখ করে বসেছিল। বড় গম্ভীর দেখাচ্ছে তাকে, বড় করুণ মনে হচ্ছে ওর চোখ দুটি।

বহুদিন ঝগড়া হয়েছে, মনোমালিন্য হয়েছে, তবু দুটি জীবন কোথায় একই সূত্রে বাঁধা ছিল। কেউ একটু বেশি দূরে গেলে টান পড়ত। আজ সজল প্রথম উপলব্ধি করল, সে সূত্রটা সম্পূর্ণ ছিন্ন হয়ে গেছে। এখন সে আর অরুণা দুটি পৃথক জীবন নিয়ে পথে চলছে। কারুর হৃদয়, কারুর হৃদয়ের ওপর আজ নির্ভরশীল নয়। একজনের বেদনা অন্য জনকে বিধ্বস্ত করে না!

কিন্তু অতীত জীবনে কি তা সত্য ছিল? সজল এ কথাটা কি আগেও কখনো ভেবে দেখেছে?

খেতে বসেও দুজনের মধ্যে আজ কোন কথা হল না।

খাওয়া শেষে সজল নিজের ঘর থেকে জামাকাপড় পরে বেরুল।

এতক্ষণে অরুণা কথা বলল, 'এতো বেলায় অফিস যাবে?'

'যাব'।

সজল নিচে নেমে গেল।

ট্রামটা বৌ-বাজার ক্রসিং পেরিয়ে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের দিকে যাচ্ছিল। এক সময় ধর্মতলা স্ট্রীটে পড়ে ফ্রী স্কুল স্ট্রীটের মোড়ও পেরিয়ে গেল। খেয়াল ছিল না সজলের। হঠাৎ অনেক লোককে নামতে দেখে সে-ও এক জায়গায় নেমে পড়ল। দেখল, এসপ্লানেড তখনো আসেনি।

নামার কথা কিন্তু ফ্রী স্কুল স্ট্রীটের মোড়ে।

আসলে সে এতো বেশি আত্ম-মগ্ন ছিল, এমন একটা চিন্তা তাকে উন্মাদ করে তুলেছিল যে সে ঠিক প্রকৃতিস্থ ছিল না।

কোন দিকে না তাকিয়েই সে পশ্চিম দিকে হাঁটতে লাগল।

'এাই—এাই—গাড়ী চাপা পড়বেন নাকি মশাই?'

সম্মিলিত চিৎকারে সতর্ক হওয়ার আগেই সজল পেছনে একটা ট্যাক্সির কোরে ব্রেক কষে দাঁড়ানোর শব্দ শুনতে পেল—'ক্যা আন্ধা হ্যায়? আখমে দেখনা নেহি মিলতা?'

পাঞ্জাবী ড্রাইভার দাঁতমুখ খিঁচিয়ে গালাগাল দিচ্ছিল সজলকে।

তাড়াতাড়ি ফুটপাথে উঠে এলো সজল, কয়েক মিনিট চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

কলকাতার বিচিত্র জনতার স্রোত, গাড়ীর একটানা মিছিল, ফুটপাতে হকারদের চিৎকার, কাজন পার্কের ওপর বিছানো দুপুরের অজস্র রোদ—সজল এই মুহূর্তে কেমন বিমূঢ় হয়ে যায়। তার চেতনা দূর ছায়াচ্ছন্নতায় আবৃত হয়ে উঠছে, অবসন্ন হয়ে উঠছে।

দুঃখ, যন্ত্রণা, ব্যর্থতা সবকিছু মিলে মিশে একাকার করে তাকে বিভ্রান্ত, বিমূঢ় করে দিচ্ছে এখন।

আরতির কথাটা হঠাৎ মনে পড়ল, ঠিকই বলেছিল সে। 'নিজের ওপর কন্ট্রোল হারালে তোমাকে ভেসে যেতে হবে সজলদা।'

সজল কি তার সকল সংযম হারিয়ে ফেলছে? কই না তো? অরুণাকে সে একটা কথাও বলেনি। এমন গভীর যন্ত্রণাটাকে সে নীলকণ্ঠের মত গলায় ধারণ করে রেখেছে। সে হৈ-চৈ করেনি, ঝগড়া করেনি অরুণার সঙ্গে। কৈফিয়ৎ দাবি করেনি তার কাছে—কারণ, এসব তার রুচির বাইরে।

কিন্তু এভাবেও বাঁচা যায় না! এ-জীবন দুঃসহ, মরুভূমির মত ভয়ংকর রিক্ত।

অফিসের দিকে কিছুটা এগিয়ে গিয়েও সজল ফিরে এল। একটু নির্জনতা চাই, একটু শান্ত অবকাশ চাই, যেখানে নিজের সঙ্গে নীরবে কথা বলা যায়, নিজের মুখোমুখি দাঁড়ানো যায়, জীবনের একটি মুহূর্তের নির্ভুল বিশ্লেষণ যেখানে সম্ভব!

অনভিজ্ঞ সজল জীবনের মূল্যে আর কতো নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতার পণ্য কিনবে!

এই দুপুর বেলায়ও গঙ্গার ধার আশানুরূপ নির্জন নয়। কলেজ পালানো, অফিসে পালানো প্রণয়প্রণয়ীদের ভিড় এখানে ওখানে। ঘন ঘন দ্রুত গাড়ী চলার শব্দ।

তবু জলের একেবারে কাছে, কয়েকটা বুনো লতানো গাছের একটু আড়ালে কতোক্ষণ সে বসে কাটালো।

সজল ভাবছিল, একি পরিণতি! জীবনের গুরুগ্রহ আর কতো তাকে দেখাবে!...এ সন্তান তার নয়।...তা হলে সমস্ত বিবাহিত জীবনটাই একটা [illegible] মিথ্যার ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে? এ মিথ্যাকে টেনে চলা সম্ভব কিনা? এবং সম্ভব না হলে তারপর কি হবে?

জীবনে এমন অনেক দুঃখ থাকে যার কারণ বাইরে প্রকাশ করা যায় না এবং যায় না বলেই সহস্রের আড়ুর কাছ থেকে

সান্ত্বনা, সমবেদনা প্রত্যাশা করা অসঙ্গত হয়ে ওঠে। শুধু এই দুঃখগুলি ঘুষের আগুনের মত জীবনকে প্রতি মুহূর্তে দগ্ধ করে চলে, ভেতরে ভেতরে তাকে নিঃস্ব করে দেয়।

যার বিবাহিত জীবনের গোপন দুঃখগুলিও তাই।

সজলের মন, তার সমগ্র সত্তা দুটি হাত পেতে আজ এই মুহূর্তে একটু আশ্রয় ভিক্ষা করছিল।

উপনয়নের সময় যে মন্ত্র সে অন্তরে গ্রহণ করেছিল, কলকাতার জীবনে কতো-দিন সে মন্ত্রের ধ্যান করা হয়নি। সজল তার ভিত্তেভূমি থেকে যেন এক অলীক মরীচিকার মায়ার ক্রমশঃ দূরে সরে যাচ্ছে। প্রতিদিন সে নিচে নেমে যাচ্ছে। এই পতন, মৃত্যুর-ই আরেক নাম!

গঙ্গার ধারে অনেকক্ষণ বসে কাটাবার পরে সজলের মনটা ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে উঠেছিল। একটা নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে, ঘটনার কেন্দ্রভূমি থেকে নিজেকে কিছুটা দূরত্বে রেখে, সজল তার ব্যর্থ-বিবাহিত জীবনের ঘটনাগুলিকে বিশ্লেষণ করছিল।

অরুণা তবে কি তার সঙ্গে এমন নিষ্ঠুর প্রতারণা করল? সে কি তবে তাকে ভালোবাসে না? তার আচরণের মধ্যে ভালোবাসার সুর কি কখনো বাজেনি? তার সেবা কি তবে অভিনয়? সেই প্রথম পরিচয়ের দিনগুলি থেকে বিবাহিত জীবনের এই প্রান্ত পর্যন্ত সবটাই কি কেবল একটা জঘণ্য চক্রান্ত?

সজলের কিন্তু তা ঠিক বিশ্বাস হয় না। অরুণার সঙ্গে তার রুচির পার্থক্য আছে, দুজনের জীবনের সুর আলাদা—একথা সত্য। এবং একথাও সত্য যে, ব্যবহারিক জীবনে, দৈনন্দিন জীবনে, রুচির মিল না থাকলে বিবাহিত জীবনের সকল সৌন্দর্য, সকল শিল্প সকল কারুকার্য সেখানে নষ্ট হয়। ভালোবাসাকে বাঁচিয়ে রাখা কখনো সম্ভব হয় না! সজল তবু বুঝতে পারে, অরুণার সঙ্গে বিরোধ তার হোতোই। তবে বিরোধের বর্তমান কারণের মত এতো কুৎসিত হয়ত হোতো না।

অথচ এজন্য কি সজল অংশতঃ দায়ী নয়? নিশ্চয়ই সজল দায়ী। এই ধ্বংসের খেলায় তারও অংশ আছে।

কিন্তু সে তো নিজে থেকে অগ্রসর হয়নি। সমগ্র ঘটনার ইতিহাসে তার ভূমিকা অপ্রধান। তাকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল একটা তীব্র অথচ লোভনীয় স্রোতের দিকে। যখন সে সচেতন হয়ে উঠেছিল, তখন দেখল, ফেরার পথ নেই। পেছনের সেতুটা সম্পূর্ণ ভেঙে দেওয়া হয়েছে!

সজল এক কুটিল পরিণতির নিরীহ শিকার মাত্র। আধুনিক নগরজীবনকে সম্পূর্ণরূপে সচেতনভাবে না জানার মাশুল তাকে দিতেই হবে!

কিন্তু অরুণা কি?

অরুণা কি তবে এক দ্বৈত সত্তার মানুষ? কার্তিকের সঙ্গে তার রুচির মিল আছে, ওদের দুজনের পরিচয় ঘনিষ্ঠ এবং দীর্ঘদিনের। সজলের প্রতি তার আকর্ষণ একটা আকস্মিক বা সাময়িক ঘটনামাত্র। না এমন ঘটনা, যার ওপর সারাজীবনের ভার সয় না।

কিন্তু তবু প্রশ্ন, অরুণা কার্তিককে বিয়ে করল না কেন। এই নাটকের পাণ্ডু-লিপিতে আরো কি কোন চরিত্র আছে? যদি থাকে তবে সে কে?

ক্রমশঃ বেলা পড়ে আসছিল। ভাটায় জলের স্রোত এখন অনেক নেমে গেছে।

সজল ভাবছিল, যে চরিত্রই থাক, যে ঘটনাই ঘটুক এবার তার যাবার পালা। দিন শেষ হয়ে আসছে। আকাশে মাটিতে এখন ঘরে ফেরার বিষণ্ণ আলো।

নতুন অধ্যায় এবার শুরু করতেই হবে। কিন্তু সকলের আগে চাই, এমন জীবিকা যা জীবনকে সহজ করে, সুন্দর করে, বিলম্বিত না করুক।

সজলের বর্তমান জীবিকা তা নয়। দলবাজির এই নরকে সে কতোদিন খাটি থাকবে! ডেপুটি ডাইরেক্টার মিঃ মুখার্জির কথা মনে পড়ল,—সজল এডু-কেশনই তোমার লাইন। তুমি ফ্রং প্রফেশন এ এসে গেছ। সে শিক্ষকেরই ছেলে, যে শিক্ষা-দান ব্যবসা ছিল না। সজল আজই অমৃত-পুরের হাই স্কুলের হেডমাস্টারমশাইকে লিখবে। মাসখানেকের মধ্যে যে-কোন শিক্ষকের একটা চাকরি পাওয়া যেতে পারে কিনা! এক সময় স্কুলের সেরা ছাত্র ছিল সে। হয়ত হয়ে যেতে পারে। ঠিকানাটা অরিতির বাড়ীর দিতে হবে। কে জানে, কখন কি ঘটবে!

এই সিদ্ধান্তে আসতে পেরে সজল খুশি হোলো। নিজের ওপর বিশ্বাস, শ্রদ্ধা নির্ভরতা ফিরে এল। মনটা তার নরম মাটির মত, সহজেই লোকের পায়ের ছাপ পড়ে। কিন্তু তেমনি এক বৃষ্টিতেই সে ছাপ ধুয়ে-মুছে যায়। আবার মাটি মসৃণ হয়। তার মনে হল জীবনে ভুল তো হবেই। সে ভুল থেকে নিজেকে মুক্ত না করাটা আরো বহুৎ ভুল!

।। ২৪ ।।

সিঁড়ির নিচেই পুঁটির সঙ্গে দেখা। ওর হাতে কয়েকটা পয়সা।

সজল বলল,—'কোথা যাচ্ছিস তুই?'

পুঁটি মুখ বেঁকিয়ে উত্তর দিল, 'ঐ কার্তিকবাবু এয়েছেন। গরম সিঙ্গাড়া আনতে বলছে।'

সজল নিঃশব্দে সিঁড়ি দিয়ে উঠছিল। দেখল অরুণার ঘরের দক্ষিণ দিকের দরজা, জানালা বন্ধ।

সজল নিজের ঘরে চলে গেল, জামা-কাপড় ছাড়ল। তারপর পাতা বিছানায় ক্লান্ত শরীরটা এলিয়ে দিল।

দুজনে উত্তেজিত। সজল যে এখন ফিরতে পারে তা বোধহয় ওরা ভাবেনি।

কার্তিকের সেই মোটা কর্কশ গলা—'কেমন? আমি বলছিলাম না—ক্লিয়ার করে দাও, তখন শুনলে না। এখন?'

সজল চমকে উঠল কার্তিকের কথাটা শুনে। কিন্তু—

অরুণার উত্তরটা বোঝা গেল না।

কার্তিকের গলাটাই জোরালো শোনা যাচ্ছে। 'পাপ পুণ্যের 'মিনিং' পাল্টে গেছে এ-সেঞ্চুরিতে, তা জানো?'

কিন্তু সত্যিকারের ভালোবাসার মিনিংটা পাল্টে যায়নি, কার্তিকবাবু—অরুণার গলার স্বর এতক্ষণে শোনা গেল। সে-স্বর স্থির কঠিন।

কার্তিক চুপ করে রইল।

অরুণা এবার বলল, 'আমার যা হবার হোক। এবার তুমি বল, দিদিকে বিয়ে করবে কিনা? কতোদিন আগে তুমি 'প্রমিস' করেছ। বল, কবে তোমার কথা রাখবে?'

'আরে, তোমার ঝামেলাটা মিটুক।'

'আমার ঝামেলা? দরদ দেখাচ্ছ? মন ছিল না, একা পেয়ে যেদিন জোর করে—' অরুণা কেঁদে উঠল। 'আমি এতো সয়েছি, শুধু তুমি দিদিকে সুখী করবে বলে। দিদির মুখ চেয়ে তোমার সব অত্যাচার আবদার সহ্য করেছি, নিজের জীবনের কথা না ভেবে। বল, বল, কবে তুমি কথা রাখবে?'

'তোমার ব্যাপারটা চুকে যাক। কি? পাঁড়েজিমশায় কি বলে? খুব 'পাজলড' হয়ে গেছে, তাই না?'

অরুণা তীক্ষ্ণস্বরে বলে উঠল, 'ওসব নিন্দা তুমি করবে না, বলে দিচ্ছি।'

'বাবা, লোকটা মাইরি ম্যাজিক জানে। আমি সে-ই কবে থেকে ঝুলছি। আর ও এই ক'দিনেই উড়ে এসে জুড়ে বসল একে-বারে। চেহারাটা না হয় ভালো। তাই বলে—'

'কার্তিকদা, ফাজলামো রাখো। আমার উত্তরটা আগে শুনতে চাই।'

'তাহলে শোন' কার্তিকের গলার স্বর ফাঁসি—'ওটা এবসার্ড। থিয়েটা ব্যাক-লজিক্যাল ব্যাপার। ওই চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বছরের বুড়ীকে কেউ বিয়ে করে না, আর যা করুক।'

অরুণার গলায় উত্তেজনা, কান্না। 'তবে কেন? কেন? আমার জীবন, দিদির জীবন তুমি এমন করে নষ্ট করলে, কেন? কেন? আমি জানি, গলায় দড়ি দিয়ে আমাকে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। কিন্তু দিদি কি অপরাধ করেছে? কতোদিন ধরে তুমি তাকে আশা দিয়ে এসেছ। বল, উত্তর দাও।

'আগেই লিখেছি। ইট ইজ সিম্পলি বল। ইট ইজ স্টার্টলিং—'

'অরুণা, তুমি একটা শয়তান—' হেরম্বের কাঁচের কি একটা শক্ত জিনিস জোর আঘাত খেয়ে ঝন্ ঝন্ করে ভেঙে পড়ল।

'এই থামো—থামো—'। কার্তিক চেঁচিয়ে উঠল।

দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ।

সজলেই বিমূঢ়, স্তব্ধ। ঘরে অস্বাভাবিক নীরবতা।

অরুণাকে এভাবে দেখবে বলে সজল আশা করেনি। কান্নায়, উত্তেজনায় পাগলের মত। দুটো চোখ ফুলে গেছে। এলোমেলো খোলা দীর্ঘ চুল ছড়ানো।

ধীর স্থির সজল এতক্ষণে কথা বলল, কথাগুলো ইস্পাতের মত কঠিন, ধারালো। 'আপনি আজ আসুন কার্তিকবাবু।'

মাথা নিচু করে কার্তিক বেরিয়ে যাচ্ছিল।

পর্দাটা সিল্কাড়ার ঠোঙা নিয়ে ওপরে উঠে আসতে আসতে কার্তিকের যাওয়ার দিকে চেয়ে হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল।

পুন্টু সেই কখন রান্না করে চলে গেছে। এখন রাত প্রায় বারোটা। কেউই খেতে আসেনি। অরুণার ঘর থেকে কোন সাড়া আসছে না। আলো নেভানো।

সজল ধীরে ধীরে নেমে এসে অরুণার ঘরের সামনে দাঁড়াল।

'অরুণা, কপাট খোলো।'

কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

সজল জোরে কড়া নাড়ল।

অরুণা কপাট খুলে দিয়ে সরে দাঁড়াল।

সজল আস্তে আস্তে বলল, 'খাবে চল। এ সময় না খেয়ে থাকা ঠিক হবে না।'

অরুণা ভারি গলায় হেরম্বের দিকে মুখ করে উত্তর দিল, 'তুমিও তো অফিস থেকে এসে কিছু খাওনি।'

খিদে ছিল না। তাছাড়া, আজ অফিস যাইনি।'

'তবে সারাটা দিন—'

সারাদিন গঙ্গার ধারে বসে বসে কাটালাম। সেই প্রথম দিন তুমি আমি যেখানে বসেছিলাম, তারই একটু দূরে।'

অরুণা চুপ করে রইল।

সজল সহজ হতে চেষ্টা করছিল, যেন কিছুই ঘটেনি।

খেতে খেতে কেউ কোন কথা বলছিল না। অরুণা একবারও মুখ তোলেনি।

ওর খাওয়া শেষ হতে সজল বলল, 'বাসনগুলো থাক্। মুখ ধুয়ে শুয়ে পড়। অনেক রাত হয়ে গেছে।'

মুখ ধুয়ে সজল উপরে ওঠার আগে অরুণার অন্ধকার ঘরের কাছে এসে দাঁড়াল। কি ভাবলো কয়েক মিনিট।

'ঘুমলে নাকি? একটু আসতে পারি তোমার ঘরে? কথা ছিল।'

অরুণা বলল, 'ঘরটা তোমার। এলো খোলা আছে।'

আলো জ্বালল ঘরে।

সজলের সামনে ভেসে উঠল বিছানায় ঢাকা সেই জোড়া তক্তপোষ, রুমদামী টেবিলটা। অরুণা শোবার আগে ওখানে দু গ্লাস জল গড়িয়ে রাখত। ওরই একধারে পাউডারের কৌটো, চুল বাঁধবার ফিতে, কাঁটা এমনি টুকিটাকি জিনিস।

বিচ্ছিন্ন জীবনের টুকরো টুকরো যেন কাহিনীগুলো যেন কথা বলে উঠল।

অদ্ভুত! সেই অন্তরঙ্গ দিনগুলির মাঝে আজ সমুদ্রের ব্যবধান!

'বোসো, একেকটা কথা বলনি।'

একটা যন্ত্র মূর্তির মত অরুণা বসে রইল।

সজল গলাটা একটু পরিষ্কার করে নিয়ে স্থিরভাবে বলল, 'অরুণা, সব ঘটনা আজ আলোর মত পরিষ্কার। তুমিই বল এবার আমি কি করব?—না, না, আমার কোন অভিযোগ নেই। প্রথমে বড় দুঃখ পেয়েছিলাম, রাগ হয়েছিল, ঘৃণা হয়েছিল। বিশ্বেস কর, এখন আর তা নেই।'

অরুণা ধরা গলায় বলল, 'জানি।'

'কি করে জানলে?'

'তোমাকে চিনি বলে।'

অরুণার গলা ক্রমশঃ একটু স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। মনে হচ্ছিল, সেও তার মনের কথাগুলো খুলে বলতে চায়।

'সবই আমার দোষ, সবই আমার কপাল! তুমি ঠিক বুঝবে না আমার কথা। আমাদের জীবনের মূল তো মাটিতে নেই। বরং তোমার আছে। আমরা শেওলার মত ঘাটে ঘাটে ভেসে বেড়াই। দ্যাখো, এই সমাজ, এই চেনাজানা—সুযোগ পেলে সবাই শোধ নেয় আমাদের ওপর।'

সজল মাঝখানে বলে উঠল, 'আমার কোন কৈফিয়তের প্রয়োজন নেই, অরুণা। আমাকে শুধু মুক্তি দাও, আমি চলে যাই। আমি নতুন করে জীবনটা শুরু করতে চাই।'

অরুণা চুপ করে রইল।

রাত্রি অনেক।

দূরে কোথায় একটার ঘণ্টা বাজল।

সজল আবার বলল, 'ছুটি মেলে ফিরে যাব। তুমি তো ঠিকানা জানো। কখনো কোনো প্রয়োজন হলে আমাকে বলবে, কেমন? ডোলিডারির জন্য তিনশ টাকা রেখে যাচ্ছি। তোমাকে তোমাকে ভালোবেসেছিলাম।'

সজলের গলার স্বর করুণ হয়ে উঠছিল। দেখল, অরুণা বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাতরভাবে কাঁদছে।

এক সময় নিজেকে একটু সংযত করে বলল, 'তুমি আমাকে ক্ষমা কর। তোমার ভালোবাসার যোগ্য নই আমি। সেটা যখন বুঝতে পেরেছিলাম, তখন দেরি হয়েছিল। আমাকে ছেড়ে চলে যাও তুমি। তোমার পথে কাঁটা হয়ে না আসি। যা আছে কপালে তাই হবে। তুমি যাও। আমার শাস্তি আমাকে পেতে দাও...'।

অরুণা আরও কাছাকাছি ভেঙে পড়ল।

সজল কিছুক্ষণ বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তাকে যেতে হবে, ছুটি হোক না হোক। এভাবে বাঁচা যায় না, কেউই বাঁচতে পারে না। আলোটা নিবিয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে নিজের ঘরে চলে এল।

সারা রাত একটুও ঘুমোয়নি সজল। ছুটি হয়ে গেছে তার, পুরনো জীবন থেকে ছুটি। কিন্তু তবু কেন কান্না আসে। ভালোবাসা কেন স্লেটে লেখা অক্ষরের মত মুছে দিলে অন্ধকারের গভীরে হারিয়ে যাবে! কেন এই কদিনের মিলিত জীবন, এতো বিরোধ সত্ত্বেও আজ তার বুকের মধ্যে অশ্রু হয়ে দুলছে।

সারা রাত ভাবতে ভাবতে কেটে গেল।

জিনিসপত্র, বইগুলি আর সেতারটা গুছিয়ে নিল সজল। নিজাপুরে পড়লেই কলেজ স্কোয়ারের কাছে রিকসা পাওয়া যাবে। কোথায় যাবে, তা এখনও স্থির নেই। তবু যেতে হবে।

ভোর হয়ে আসছে। সারা শহর স্তব্ধ। পূর্ব দিকটা এখন একটু ফাঁকা। শুকতারা জ্বলজ্বল করছে। দূর থেকে প্রথম ট্রামের শব্দ ভেসে এল।

সজল ধীরে ধীরে নিজের ঘরটা বন্ধ করে নিঃশব্দে নেমে গেল, আর পেছনে তাকালো না।

গোরক্ষনাথের পূজা ও গান

সুনীল পাল

উত্তর বাংলার (জলপাইগুড়ি-কোচ-বিহার) গ্রামীণ মানুষের মধ্যে যে সব পূজো ও গীত প্রচলিত আছে তার মধ্যে গোরক্ষনাথের পূজো ও গীত অন্যতম। বাংলার অন্যান্য অঞ্চলেও এ পূজো প্রচলিত ছিল বলে জানা যায়। এই পূজো উদ্ভব কোনযুগে বর্তমানে বিলুপ্তির পথে। পূজোর আগের মতন তেমন আড়ম্বর নেই। বিলোপের কারণ অর্থনৈতিক সংকট। আধুনিকতার প্রতি মোহ ও প্রাচীন কৃষ্টির প্রতি অবজ্ঞাও অন্যতম কারণ। গোরক্ষনাথের পূজো করে থাকেন কৃষিজীবী রাজবংশী সমাজ। কিন্তু পশ্চিম ডুয়ার্সের রাজবংশী জাতির পাশাপাশি রাভা নামে একটি উপজাতি দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করে আসছেন, তাদের মধ্যেও এই পূজো ও গীতের প্রচলন আছে দেখা যায়। রাভা যদিও মোঙ্গল জাতির একটি শাখা, কিন্তু বর্তমানে তারা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে রাজবংশী জাতির অনুসারী।

গোরক্ষনাথ সম্পর্কে যতটুকু জানা যায় তাতে দেখা যায় যে—'প্রাচীন কাল হইতে বাঙলাদেশে নিরীশ্বর এক যোগী সম্প্রদায় ছিল। এই সম্প্রদায়ের মতে শিবের অনুজ এবং শিষ্য-প্রশিষ্য চারিজন প্রধান শিষ্য ছিলেন — মৎস্যেন্দ্রনাথ বা মীননাথ, গোরক্ষনাথ, হাড়িপা বা কানুপা। এই সিদ্ধিদের অলৌকিক কাহিনী পূর্ব-ভারতে বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে। সে কাহিনীগুলি দুই ভাগে পড়ে। এক গুরু-শিষ্য মীননাথ গোরক্ষনাথের কাহিনী আর মাতা ময়নামতী - গোবিন্দচন্দ্রের কাহিনী। এই দুই দফার কাহিনী লইয়া দুই রকম শাখার উদ্ভব হইয়াছে—গোরক্ষ-বিজয় এবং গোবিন্দচন্দ্রের গীত। গোরক্ষ-বিজয়ের বিষয়—দেবীর (পার্বতী) ছলনায় মীননাথের মোহপ্রাপ্তি এবং পরে শিষ্য গোরক্ষনাথ কর্তৃক তাঁহাকে চৈতন্য দান।'

(ডঃ সুকুমার সেন, 'বাংলা সাহিত্যের কথা', পৃঃ ১৫৭)

বর্তমানে গোরক্ষনাথের পূজা ও গান যেভাবে প্রচলিত আছে তা হল পৌষ মাসে ধান কাটা হয়ে গেলে গ্রামের কৃষক পরিবারের কিশোরেরা মাস শেষ হবার ছয়-সাত দিন আগে দলবদ্ধভাবে সন্ধ্যাবেলায় মাগুনে বের হয়। এই মাগুনের দলের কিশোরদের প্রত্যেকের হাতে একটি করে বাঁশের লাঠি থাকে, যার পরিমাপ লম্বায় নিজ নিজ কান পর্যন্ত। তারা পরিক্রমায় বের হয়ে যখন কোন গৃহস্থের বাড়ীতে প্রবেশ করে তখন হাতের লাঠিগুলি এক সঙ্গে মাটিতে সশব্দে ঠোকে এবং মুখে সমস্বরে বলে 'শুভ'। তারপর কয়েকটি গান গাওয়া হয়।

দলনেতা এককভাবে গানগুলির এক-একটি পঙক্তি প্রথমে সুর করে গেয়ে যায়। তারপর দলের অন্যেরা সমবেতভাবে গায়। এইভাবে গ্রামের কৃষকদের বাড়ী পরিক্রমা করে পৌষ সংক্রান্তির আগের দিন পর্যন্ত মাগুন সংগ্রহ করে। মাগুন হিসেবে তারা ধান, চাল, টাকা, পয়সা ইত্যাদি পায়।

(২)

পৌষ-সংক্রান্তির দিনে গ্রামের মধ্যস্থল-বর্তী কোনো এক মাঠের মধ্যে এই পূজোর আয়োজন করা হয়। ঐ স্থানে গোরক্ষনাথের দলের কিশোরদের হাতের লাঠিগুলি পুঁতে রাখা হয়। কোনো কোনো গ্রামে লাঠির বদলে বাঁশের আগাল পোঁতা হয়। তারপর ঐ স্থানে পূজো উপচার রাখা হয় কলার মাইক পাতে। উপচার হিসেবে আতপ চাল, চিড়ে, বাতাসা এক কুড়ি কলা দেওয়া হয়। ধূপ দীপ এবং ফুলও রাখা হয়। পূজো পরিচালনার জন্যে কোনো পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না। দলের নেতা বা কোনো কিশোরই পূজো পরিচালনার ভার গ্রহণ করে। কোনো মন্ত্র নেই। সমবেতভাবে নামকীর্তন করার পর প্রসাদ গ্রহণ করে ঘরে ফিরে যায়। এই পূজো সম্পর্কে "রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাস প্রণেতা শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বর্মণ মহাশয় বলেছেন—"নূতন ধান ঘরে আনিয়া গোরক্ষনাথের গান করিয়া বাড়ী বাড়ী হইতে পূজোর ধান সংগৃহীত হয় পরে পূজা হয়। এই গোরক্ষনাথ বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ধর্মপ্রচারক। এই গানে কৃষিজীবী রাজবংশী সমাজের সামাজিক বৈশিষ্ট্যের কিছু পরিচয় আছে"। এ তথ্য থেকে দেখা যায় যে নাথ সিদ্ধাচার্যদের অন্যতম গোরক্ষনাথ কালক্রমে দেবত্বে উন্নীত হয়েছেন এবং কৃষিজীবী মানুষের দ্বারা পূজিত হচ্ছেন। কবে থেকে তাঁর পূজো এইভাবে প্রচলিত হয়েছে তা সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে বাংলার উত্তর-পূর্বাঞ্চলে যে গোরক্ষনাথের পূজো ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল তার প্রমাণ রয়েছে। ভাবলে আশ্চর্য লাগে যে নাথ সিদ্ধাচার্য গোরক্ষনাথ শেষ পর্যন্ত ফসল ও গোসম্পদের রক্ষাকর্তারূপে কৃষকদের দ্বারা পূজিত হচ্ছেন। এ সম্পর্কে ডঃ চারুচন্দ্র সান্যাল মহাশয়ের মত প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন—

> The Puja is done to save the paddy from the ravages of beasts & of thieves".
>
> "The Raj Bansis of North Bengal, Page-141.

পৌষ মাসের পূজা ছাড়াও শ্রাবণ বা ভাদ্র মাসেও এই পূজো করা হয়। যদি দেখা যায় বৃষ্টির অভাবে ধান রোপণের কাজ ব্যাহত হচ্ছে তখন গোরক্ষনাথের পূজোর জন্যে কিশোরেরা গোরক্ষনাথের মাগুনে বের হয়। এই সময়ে তাদের হাতে লাঠির পরিবর্তে ছোট ছোট কাঠের লাঙ্গল থাকে এবং কিছু ধানের চারাও থাকে কারও হাতে আবার মাছ ধরা 'জাকৈ' থাকে।

তারা গৃহস্থের বাড়ীতে প্রবেশ করে উঠোনে জমিচাষ, মইদেওয়া, জলসেচ করা ধান রোয়ার অভিনয় করে অবিকলভাবে। কিশোরদের মধ্যে থেকে দুইজন বলদের অভিনয় করে। সঙ্গে সঙ্গে এই গানটি গাওয়া হয়—

রাম বলারে হরি বলা
চতর্‌ পাশে কাঁচ কেলা
কাঁচ কেলারে বড় বড় পিয়র
চালত কুমরা ঘিরা ঘির
হোক কোর কুমড়ার দুইম পুর
হস্তীর শুঁড়ে তুলে পানি
শুক্‌কান কাদ টানা টানি।
শুক্‌কান কাদ গেইক রোয়া
মাচা পাত ধান খোয়া
মাচায় না ধরে ধান
গোরক্ষনাথে কর দান।।

এইভাবে ছয় সাতদিন মাগুন সংগ্রহ করার পর পূর্বোল্লিখিত ভাবে গোরক্ষনাথের পূজো দেওয়া হয়। কৃষকরা তাদের অভিজ্ঞতা থেকে বলেন—এই পূজো দেওয়ায় দেবতা তুষ্ট হয়ে বর্ষার প্রসন্ন ধারা বর্ষণ করে ধরার অবসান করে তাদের রক্ষা করে।

এখানে উল্লেখ্য যে, উত্তরবঙ্গে অনাবৃষ্টির হাত থেকে নিষ্কৃতির জন্যে গ্রামীন মহিলারা 'হুদুম দেও'র পূজো করে থাকে।

এর মূলে জাদু-বিশ্বাস (Imaginative Magic) নিহিত রয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে। কেননা এই ধরণের জাদু-বিশ্বাস সব প্রাচীন সমাজেই রয়েছে।

গোরক্ষনাথের মাগুনে বের হয়ে কিশোরেরা যে সব গান গায় তা ছড়া জাতীয়। এর মধ্যে লোকায়ত জীবনের বিচিত্র রূপ পরিস্ফুট হয়েছে সুন্দরভাবে। গানগুলির রচয়িতা কে তা জানা যায় নি, তাছাড়া বিভিন্ন গ্রামে বিভিন্ন পাঠ পাওয়া যায় এ গুলির। এখানে গানগুলি সন্নিবেশিত হল।

(১)

শিবে না না রে শিব সাজে,
কানা কড়িটা ঘুমুর বাজে,
বাজুক ঘুমুর বাজুক তাল,
এই গিরিটার১ জগৎ আল।
জগৎ না তে উনি স্থনি
সোনার বান্দং পাঁচ ঘুনি২
সোনার এ ঘরো বাঁশ
জাগ দুয়ারে লেখং ঢাস
ঢাস লেখং জোড় জোড়
পাখরা লেখং বাঁহুসে জোড়
পায়রা হে গাখং ঘুমা৩
আমার হরিটা না খায় গুয়া।৪
গুয়া খায়া না খালেক চুন
পন্তা ভাত ত ঢালে নুন
পন্তা ভাতটা ঝল মলায়
আমার হরিটা খেলা খেলায়
খেলা খেলাইতে কত দূর
খেলা খেলাইতে মদনপুর
মদনপুরে পাইব পাড়া
তিন ছয় আঠার ঘোড়া
ঘোড়ায় ঘোড়ায় ঘুঙ্কাইল
পাঁচ ধামল বুঝাইল।
পাঁচ ধামল লেখোঁড়
গিরির বউটা খেবেরি।
চার কোনায় ঘিরে বাতি
পুবের ভানু পোহাইল রাতি।।

সমস্বরে—শিবে"॥

শব্দার্থ

১। গিরি (গৃহি)—অবস্থাপন্ন কৃষক
২। পাঁচ ঘুনি—পাচন, ঘুর্ণাপ
৩। লেখং ঘুমা—দেখতে ভাল
৪। গুয়া—কদুপাত্নী

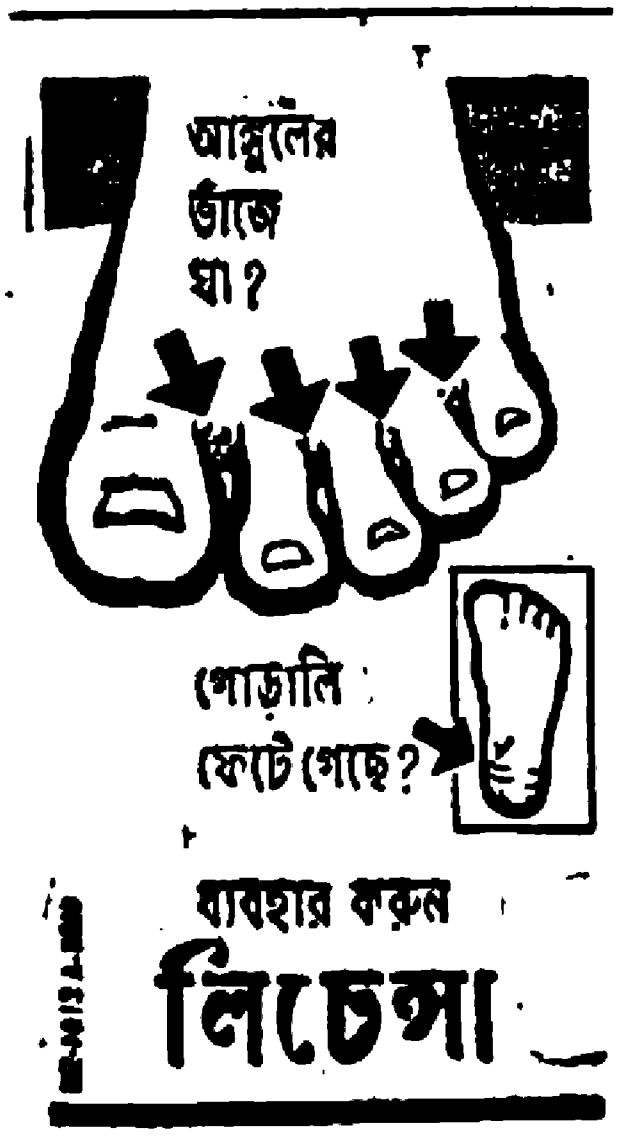

(২)

হরিণ যায় রে হরিণ যায়,
ঘর দুয়ার ভাসিয়া যায়।
ভাসিল না ভাসিল ভূমি
তাই খাইসবে তুই কুমি।
যোধিকার মন সোধি যাং
ভানু গিরন্থর বাড়ী যাং।
ভানু গিরন্থর একে না ঘর
সানাই-সোদর আসিল তর।
আজিয়া আন গুয়া খাই
গুয়া খাইতে চুন না খাই।
তোমরা যাবেন কতেক দূর
ওদি গেইলে বেগম পুর।
বেগম পুরে পাইক পাড়া
তিন ছয় আঠার ঘোড়া
ঘোড়ায় ঘোড়ায় ঘুঙ্কাইল
বাইশ বলদ ছুটাইল
বাইশ বলদ গাজি গুজি
বিসকরমে ধরিয়া পুজি
বিশ কদুমে বিশা সাধি
মাঠতে আছে ধানের আঁটি
বিশ পাইটা আনিল ধান
মাইয়া বেটি বাড়া যান।।

সমস্বরে—শিবে।

শব্দার্থ

কুতি—কোথায়
যোধিকার—যেখানকার
সোধি—সেখানে
যাং—যাই
সানাই-সোদর—আত্মীয় স্বজন
ওদি—ওইদিকে
বিসকরমা—বিশ্বকর্মা
মাইয়া-বেটি—স্ত্রী ও কন্যা
একেনা—একখানা

(৩)

গিরি—হাল বাড়ী যাং মুই
পন্তা ধরিয়া খাইস তুই।
বউ— পন্তা ধরিয়া যাং মুই
পন্তা ধরিয়া না যাং মুই
গিরি—পন্তা ধরিয়া না যাব তুই
পেন্টি ধরিয়া ডাঙাইম মুই
বউ— পেন্টি ধরিয়া ডাঙাব তুই
বাপের বাড়ী যাইম মুই
গিরি—বাপের বাড়ি যাব তুই
পিঠি করিয়া আনিম মুই
বউ— পিঠি করিয়া আনিব তুই
পিঠ ভরিয়া হাসিম মুই
গিরি—দোলাত্ যায়া ধইম মুই।
বউ— দোলাত যায়া ধরবু তুই
শাল-শোল হইম মুই।
গিরি—শাল-শোল হবো তুই
বাঁকি জাল ফেলাম মুই
বউ— বাঁকি জাল ফেলাব তুই
কাকড়া খালোত সোধাম মুই
পিব—হাত ডুবিয়া থুকলাম মুই
বউ— বাড়ীতে যায়া মরিম মুই।

সমস্বরে—শুক

শব্দার্থ

হাল-বাড়ী—মাঠ
যাং—যাই
পেন্টি—গায়ে তাড়ানো/মাখানোর হাতের নাড়ি
ডাঙাইম—মারিব
পিঠি—পিঠে
দোলাত—নিচু জমি/খাল
ডুবিয়া—ডুবিয়ে
থুকলাম—ধরলাম

(৪)

আইলাম রে অঙ্গনে
মা লক্ষীর চরণে
মা লক্ষী দিবে বর
চাউল কড়ি বাইর কর
চাউল দিয়া না দিবে কড়ি
তাক কাঁখম যে নড়ি ঝাঁড়ি
নড়ি ঝাড়ি করিম যে
সোনার কড়ি পাইম রে

সোনার লাঙ্গল রুপার ফাল
ঘর সেরা ব্যাটা ঘর হাল
হাল খো ফাল খো
চাল ত আনি পেন্টি খো
ওদি যারে ঘরের পাশ
ওদি আছে মানের গাছ
কাটিয়া আনেক মানের পাত
মানের পাতে বুল ঘুলা ভাত
বুল ঘুলা ভাতে দিনাল কাঁজি
পুড়িয়া উঠিল বুকের মাঝি।।

সমস্বরে—ঐ গিরিটার গোলা ভরতি।

(৫)

চাইর পাকে চাইর ধনী
হাড়ির নিধা আছ তুমি
হাঁড়ির খুলিয়া দাও জগত ভাইঙ্গা
খাবার চাইনা নিধার চাই
দশ বাড়ী প্রাসিনার যাই
গোরক্ষনাথ যায় গাছের কুল
পিন্ধিয়া আইসে চাম্পার ফুল
চাম্পার ফুল লে হরতন দান
হাসিয়া হাসিয়া বিদায় আন।

(৬)

ছো চামি ছয় আমার বিন্দু সাপের ওঝা
বাইর করবে গাইক্কাদের সাউ বন্টা ভরা গুয়া
বাড়ী ভরা গুয়া আমার গোরক্ষনাথ খায়
তুকি দেখি বাঘ ভালুক ছুরাসে পালায়
না পালালে ও বাঘ ভালুকে না পালায় তুমি
একটুকু ভাবিয়া দাও মইনসা কবি আমি।

শব্দার্থ

নড়ি-ঝাড়ি—যেনেস্থা
ঘর জোয় ব্যাটা—ঘর জামাই
পেন্টি—গায়ে তাড়ানো লাঠি

* (পুজোর তথ্যাদি সংগৃহীত হয়েছে কাছাখালপুর অঞ্চলের বাসুদেবী ও গাভা অধিবাসীদের সহায়তায়)।

CENTRAL LIBRARY

হিংস্র নেকড়ের মতো বীর বাহাদুরের ছোট ছোট চোখ দুটি জ্বলছে। চীনেমাটির পানপাত্রের তরল ছং একটু একটু করে গলায় ঢালছে আর চোখের জ্বলুনী বাড়ছে। দেখছে নির্মলা প্রধান। বীর বাহাদুরের অপ্রীতিকর প্রেমনিবেদন বাইশ-তেইশ বছরের ভরভরন্ত যুবতী নির্মলা প্রধান।

নির্মলাকে অবশ্য বীর বাহাদুর প্রকাশ্যে নিজের বিয়ে করা বউ বলে পরিচয় দেয়। কিন্তু বাইরের সবাই জানে বউ না হাই, আসলে জোর-জবরদস্তি করে আটকে রাখা রক্ষিতা। মনের পাখি—সুযোগ পেলেই উড়ে যাবে সঙ্গী পেলে। অবশ্য সকলেই জানে বীর বাহাদুরের পঞ্চকোট থেকে অত সহজে ছোট্ট পাখিটা উড়ে যেতে পারবে না, অন্তত যতোদিন ওর দেহে যৌবনের মদ আছে। উড়তে গেলে রাজপাখির মতো দিগন্তের যে কোনো কোণ থেকে খাবা দিয়ে নিয়ে আসবে। এর আগে যতোগুলো উড়তে গেছে তাদের সকলকেই ধরে এনে নির্মম অত্যাচার করে পাশের খাদে ফেলে দিয়েছে।

বীর বাহাদুরের এ স্বভাব-চরিত্র আর তিন বছরে বিলক্ষণ চিনে নিয়েছে নির্মলা। প্রথম দিকে ওকে শ্রদ্ধা করত আশ্রয়দাতা হিসেবে। অনেকটা ও বীর বাহাদুরের মেয়ের বয়সী। কিন্তু প্রথম যৌবনে বীরবাহাদুরের ছং খেয়ে ওকে আদর করল সেদিনই নিজের সর্বনাশের ছায়া দেখল। মনকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করেছিল, বাপের বয়সী লোক আদর করলে দোষের কিছু নয়। আর আদর ওরাতে গেলে একটু গায়ে গা তো লাগলেই। কিন্তু তবু যেন মনকে প্রবোধ দিতে পারল না। মেয়েদের চোখে পুরুষের দৃষ্টি এড়ায় না।

পানপাত্র শেষ করে বীর বাহাদুর নির্মলার হাতটা ধরে বুকের কাছে টেনে আনল। নির্মলা সামান্য বাধাও দিল না। বলল, আর একটু ছং দি?

বীরবাহাদুর খুশিতে ডগমগ। কারণ, এমন আদরে সোহাগে নির্মলা ওকে আজ পর্যন্ত কোনো অনুরোধ করেনি। ঢালা পানপাত্রটা বাড়িয়ে দিল অন্য হাতে।

নির্মলা বীরবাহাদুরের বুক থেকে নামানো আর হাতে ষোলো থেকে ছং ঢেলে দিল পানপাত্রে। বীর বাহাদুর সাহস পাচ্ছে আর উত্তেজিত। এক হাতে নির্মলার উত্তপ্ত দেহ অপর হাতে উদ্যত তরল ছং—মাথাটাই ঘুরে গেল ওর।

নির্মলা ছোট্ট রুমালে গাল মুছে সরে বসল। এটাই চেয়েছিল। সংকল্প দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হচ্ছে।

বীর বাহাদুর বোতলটা শেষ করে নির্মলার দিকে আবার হাত বাড়াল।

আর একটু, খাও। নির্মলা উঠে গেল দ্বিতীয় বোতল বার করার জন্যে।

—আর নয় নির্মলা, অনেকটা হয়ে গেছে। বীর বাহাদুর জড়ান গলায় বলল।

নির্মলা ব্যাগ থেকে বোতল বার করে ঘুরে দাঁড়াল। মুখে জোর করে বলল, আমার কোনো কথাই তো তুমি রাখ না। মন হয়েছিল আজ তোমার সঙ্গে একটু ছং খাব...ঠিক আছে...রেখে দিচ্ছি।

বীর বাহাদুর আর নিজেকে স্থির রাখতে পারল না। এমন অভিমানের কথাও শোনেনি কখনো। নির্মলাকে উৎসব ছাড়া ছুঁও খাওয়াতে পারেনি। আর আজ ও-কিনা বীর বাহাদুরের সঙ্গে বসে ছুঁও খাওয়ার মন করছে! টলতে টলতে উঠে গিয়ে জড়িয়ে ধরে নির্মলাকে।

—ছাড়। আমার কত ভালবাস তা জানা আছে।

বীর বাহাদুর ভুল শুনছে না তো? তিন দিনের অনশনক্লিষ্টতাতে শ্রবণেরও হল কি? ভালবাসার কথা দূরে থাক এর ছায়া পর্যন্ত যে মাড়াতে ঘেন্না করে তার মুখে এমন কথা যেন অবিশ্বাস্য।

পর্যায় শব্দ-শিক্ষার উৎকৃষ্ট পুস্তক বাঙ্গালা অমরকোষ

প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্ ও শিক্ষাব্রতী
সত্যকিঙ্কর বিশ্বাস
এবং
যোগেশচন্দ্র বিশ্বাস প্রণীত

ছাত্র, শিক্ষক, অনুবাদক, লেখক ও পাঠক—সকলের পক্ষেই নিত্য-ব্যবহার্য পুস্তক। এ ধরনের বই বাংলায় এই প্রথম।

আনন্দবাজার, যুগান্তর প্রভৃতি বিখ্যাত পত্রিকা এবং ডঃ অমরেশ্বর ঠাকুর, ডঃ অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ডঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি মনীষীদের কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত।

পঞ্চম সংস্করণ। মূল্য ২-৫০

দাশগুপ্ত অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
৫৪/৩, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

—তোকে ভালবাসি না নির্মলা? বললি কি?

—ভালবাসলে আমার বিয়ে করতে, ঝুলিয়ে রাখতে না।

—ছিঃ ছিঃ। ও-কথা বলিস নি। ঠিক আছে, সামনের রবিবার তোকে মহাকাল মন্দিরে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করে আনব।

—রবিবার! সে তো এখনো চারদিন।

—তবে কালই চল। বীর বাহাদুর কথাটা বলেই নিজে বক্স থেকে কড়া ছুঁয়ের বোতলটা বার করে নিয়ে এসে বসল।

বীর বাহাদুর এক এক চুমুকে ছুঁয়ের পাত্র খালি করে দিচ্ছে। নির্মলা একটু একটু করে চুমুক দিচ্ছে পেয়ালায়। আজ মাতালের অভিনয় করতে হবে। মাতাল বানাতে হবে বীর বাহাদুরকে। নিজে মাতাল হলে চলবে না। বীর বাহাদুর বেহুঁস হলে অনেকটা পথ ওকে পাড়ি দিতে হবে। অন্ধকার রাত। তাড়াতাড়ি চলা যাবে না। মাথার ঠিক না থাকলে যে সুযোগ আজ হাতে এসেছে তা হাতছাড়া হয়ে যাবে, আর জীবনভোর আক্ষেপ করতে হবে।

জীবনে একবার ভুল করেছিল। দ্বিতীয়-বার আর ভুল করা চলবে না। অবশ্য যে বয়েসে ভুলের ফাঁদে পা দিয়েছিল সে বয়েসে অনেকে অমন ভুল করে বসে। মাত্র আঠারো বছর বয়েসে বুদ্ধিবৃত্তি আর কতটা পাকবে? পাকা বুদ্ধি থাকলে মা-বাপের নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে অমন একটা বাউণ্ডুলে ছেলের হাত ধরে পথে বেরিয়ে পড়বে কেন? যে ছেলে দু' মুঠো অন্নের সন্ধানে উদয়-অস্ত পাথর ভেঙে পথ তৈরি করেও অন্য একজনকে খাওয়াতে পারে না।

উঃ। সুকিয়া পোখরির সেই দিনগুলো আজ বড় ভয়াবহ বলে মনে হয়।

ঠাণ্ডা বেশি নয় এবং থাকার আস্তানা ছিল না বলে এক মাড়োয়ারীর দোকানের সামনের বারান্দায় রাত কাটাতো ওরা। আঠারো বছর বয়েস হলে হবে কি? দেহে তখন নানা রেখার আঁকিবুঁকি অদল-বদল চলেছে দ্রুত গতিতে। হরক বাহাদুর ওকে সত্যি ভালবাসত। কিন্তু মুখের কথা ছাড়া সেই ভালবাসা জানাবার সুযোগ কোনো দিন পায়নি। প্রকাশ্য দোকানের ধোঁয়া-কালির অন্ধকারেও অনেকগুলো লোভাতুর চোখের কাপটা সহ্য করতেই হাঁপিয়ে উঠত। অন্য কিছু তো অসম্ভব।

সারা দিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম করত হরক বাহাদুর। নির্মলা সুকিয়াপোখরির সহরটা ঘুরে ঘুরে দেখত। আর সারাদিন ওর পেছনে ঘুরে ঘুর ঘুর এক গাদা ছেলে ঘুরত শিস দিয়ে। নির্মলা রাতে অনুযোগ করত হরক বাহাদুরের কাছে, একটা ঝোপড়া ভাড়া করলে মান-ইজ্জত বাঁচে। কিন্তু তখন কি নির্মলা জানত যে হরক বাহাদুরের দুমুঠো অন্ন যোগাতে কাল ঘাম ছুটছে, ঝোপড়া স্বপ্ন।

একদিন রাতে মাড়োয়ারীর দোকানের সামনের বারান্দায় অন্যদের মতো দুটো বিছানা পেতে হরক বাহাদুরের জন্য অপেক্ষা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছিল নির্মলা। মাঝ রাতে একটা স্পর্শে ঘুম ভেঙে দেখে পাশে কেউ ওকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে আছে।

নির্মলা শিউরে উঠল। আজ দু মাসের মধ্যে একদিনও হরক বাহাদুর ওকে জড়িয়ে ধরা দূরের কথা, গায়ে প্রায় গা ঠেকায়নি প্রকাশ্য বারান্দায়। হল কি হরকের? নিশ্চয়ই খুব আরক কিম্বা ছুঁও গিলে এসেছে।

—এই ছাড়। নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে গিয়ে দেখল ওকে জড়িয়ে থাকা লোকটা হরক বাহাদুর নয়—অন্য আর কেউ।

নির্মলার গলার শব্দ শুনে লোকটা ওকে সম্পূর্ণ দখলে নিয়ে নিল। তারপর শুরু হল নির্মম দংশন। দু হাতের চাপে হাড়-পাঁজরা গুঁড়িয়ে দিতে লাগল ওর। দেহের সব শক্তি দিয়ে বাধা দিচ্ছে নির্মলা, কিন্তু পারছে না। লৌহার মতো শক্ত হাতের আলিঙ্গনে দেহে যন্ত্রণার অনুভূতি। কি-এক মহাগ্রাসের মধ্যে যেন তলিয়ে যেতে বসছে। জ্ঞান হারাবার আগে শরীরের সব শক্তি গলায় জড়ো করে চিৎকার করে উঠল নির্মলা।

জ্ঞান ফিরতে দেখল ভোরের আলো ফুটছে। চারদিকে উৎসুক জনতার ভিড়। সেই ভিড়ে তখন নির্মলা একটা মুখ খুঁজেছে বার বার। কিন্তু দেখেনি কোথাও। সে মুখ হরক বাহাদুরের। পরে শুনেছে হরক আগের দিনই কোথায় উধাও হয়ে গেছে।

হরক বাহাদুরের বদলে এমন একটা মুখ দেখল সেদিন নির্মলা যাকে ভয়সা করা যায়। সে মুখ বীর বাহাদুরের।

বীর বাহাদুর ওকে আশ্রয় দিল। আশ্রয় দিল নিজের কাছে এসে। আশ্রয় দেবার

প্রীতিকুমারকান্তি ঘোষের

বিচিত্র কাহিনী
ও
আরও বিচিত্র কাহিনী

পড়ে' আনন্দ পাবেন

সময় বলেছিল, কদিন বিশ্রাম নাও, তারপর তোমার মা-বাবার কাছে পৌঁছে দিয়ে আসব।

সর্ষিকাপোখরিয়ার পোস্টা বারান্দা থেকে গৌরিবাসের ভিতরটা তিন কামরার একটা ঘরে স্বাচ্ছন্দ পেয়ে হাঁপ ছেড়েছিল নির্মলা। বেঁচে বাঁচল মান বাঁচল।

বীর বাহাদুর পয়সাওয়ালা মানুষ এ-অঞ্চলের। এটা বড় জোংগা আছে। জোংগায় কয়ে আলু চাষান দেয় সর্ষিকাপোখরি আর খুমের বাজারে। তাছাড়া ময়সমে মানুষের পিঠে করে আলু চালান দেয়। নীচ থেকে নিয়ে আসে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী যা এই পাহাড়ে পাওয়া যায় না।

গৌরিবাসের আস্তানায় চোলাই মদের ব্যবস্থাও বিনা ব্যবস্থা। পশ্চাত্যের অনেক ব্যবসায়ীরা আসে এদিকে। সামনের বড় ঘরটায় তাদের রাতের আস্তানা। কাঁচা পয়সা কিছু কামায় তারা পুরো সবটা ঢেলে দিয়ে যায় এখানে। চারটে মেয়ে আছে। তামাই খদ্দেরদের পরিবেশন করে আরক আর ছং। আরক ঢেলে দেবার ফাঁকে হাসি-মশকরা করে।

মেয়ে চারটে যে কে, বীর বাহাদুরের সঙ্গে তাদের কোন্ সম্পর্ক তা বুঝতে পারত না নির্মলা। হয়তো ওর আত্মজন। পরে শিউরে উঠেছে জেনে তাদের প্রকৃত পরিচয়। খদ্দেরদের আরক বিক্রির সঙ্গে সঙ্গদানও করতে হয়। মেয়েগুলোই ওর চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে তার শেষ পরিণতির কথা। একদিন ওকেও নাকি মেয়ে চারটের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করতে হবে। ঘৃণায় ভরে গা সিঁর সিঁর করেছিল সেদিন।

গৌরিবাসের আস্তানায় আশ্রয় পেয়েও তাই ভরসা পেল না। এ কোথায় এসে পড়ল। মা-বাপ আর ছোট ভাইবোনদের জন্য মন যেমন করে। বীর বাহাদুর বলেছে কদিন বলেই সেখানে পৌঁছে দিয়ে আসবে। ঘরে ফেরার নাম শুনে যেমন আনন্দ হয়েছে তেমন ভয়ও হয়েছে। মা-বাবা কি স্বীকার করবে ওকে। পরপালান মেয়েকে নেপালী মা-বাপ মেনে নেয় না। মেনে নিলে যে জাতের সমাজদুষ্টির ভয় আছে। ঘর-পালান মেয়ে যদি মনেরমানুষের হাত ধরে মা-বাপের কাছে আসে সেক্ষেত্রে আদর-আপ্যায়ন পায়। কিন্তু নির্মলা কার হাত ধরে ফিরবে ঘরে?

বীর বাহাদুরের হাতটা খুবই শক্ত, কিন্তু তাকে যে বাপের মতো শ্রদ্ধা করে নির্মলা। আর বীর বাহাদুর ওর ভবলের চেয়েও বয়সে বড়। তাছাড়া ঘরে হয়তো বউ আছে। না-না, এ কল্পনা অবান্তর। ভাবতে মন খারাপ হয়ে যায়।

একটা মাস পার হয়ে গেল বীর বাহাদুরের দেখা নেই। ওকে সেই যে গৌরিবাসে রেখে জোংগা নিয়ে বেরিয়েছে তারপর কোথায় গেছে কেউ জানে না। বীর বাহাদুর না থাকলেও নির্মলার কোনো অসুবিধে নেই এখানে। সাহা যেন বীর বাহাদুরের মেয়ের সম্মান পাচ্ছে। সন্ধ্যা হলেই ওকে আর ঘর থেকে বাইরে আসতে দেয় না মেয়েগুলো। বলে, নানা লোক আসে এখানে, তোমার বাইরে গিয়ে দরকার নেই।

যেমন হঠাৎ জোংগা নিয়ে বেরিয়েছিল বীর বাহাদুর, তেমনই মাসখানেক বাদে হঠাৎ ফিরল। কোথা থেকে প্রচুর মালপত্র এনেছে সঙ্গে। পরে শুনেছে বীর বাহাদুর নেপাল থেকে চোরাই পথে ভারতে চালান দেবার জন্য বহু দামী বিদেশী মালপত্র আনা-নেওয়া করে। এদিকে নেপাল আর ভারত গায়ে-গায়ে। একদিকে দার্জিলিং জেলা অপর দিকে নেপাল। চোরাই মাল একটা মাত্র সরু রাস্তা পার হলেই অন্য দেশে চলে যায়। জমশা এতে নির্মলার কিছু আসে যায় না।

যেদিন বীর বাহাদুর এলো তার পর দিনই নির্মলাকে ডেকে পাঠাল। নানা খোঁজ-খবর করল এখানে কেমন আছে তাও জিজ্ঞাসা করল। নির্মলা খুব সহজভাবে উত্তর দিল সব প্রশ্নের। ওর যে গৌরিবাস খুব ভাল লাগছে তাও বলল।

দিন সাতেক বাদে একদিন সন্ধ্যায় হঠাৎ নির্মলার ঘরে এসে বসল বীর বাহাদুর। ওর ঘরের কথা জিজ্ঞাসা করল। কে কে আছে সেখানে বলল নির্মলা। হঠাৎ বীর বাহাদুর ওকে কোলের ওপর টেনে নিল। প্রথমটায় খুব চমকে গেছল। কিন্তু বীর বাহাদুরের বয়েস হিসেব করে তেমন কিছু ভয় পাবার মতো খুঁজে পেল না। বছর খানেক আগেও বাপের কোলে নিজে গিয়ে কত বসেছে। বাপের আদর কেড়েছে।

বীর বাহাদুর ওকে জড়িয়ে ধরে জন্তুর চুম্বনে ভরিয়ে দিয়েছে। ভীষণ লজ্জা লাগছিল, কিন্তু কিছুই বলতে পারেনি।

সেদিন সারা রাত ঘুমতে পারেনি নির্মলা। নিজের মনের সঙ্গে লড়াই করেছে। বীর বাহাদুরের সস্নাব ব্যাপারটায় আমল দিতে চাইছে না একটা মন। আর একটা মন কিসের এক ইঙ্গিত করছে। ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। বারে বারেই মনে হচ্ছে বুঝি সর্বনাশের পথে এগিয়ে চলেছে।

কদিন বাদে নিজের সর্বনাশের ছায়া দেখে চমকে উঠল। ইতিমধ্যে রোজ সন্ধ্যায় বীর বাহাদুর আসে ওর ঘরে আর আদর করে ঘন্টার পর ঘন্টা। দেহের ওপর সামান্য অত্যাচারও চলে। নির্মলা প্রাণপণে বাধা কিছু না জানাবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু পারেনি। বাপের বয়সী লোক হলেও আদর করার সময় চোখের চেহারা কেমন হিংস্র হয়ে ওঠে কেন?

নিজের সর্বনাশের ছায়া যেদিন দেখল নির্মলা সেদিন একটু রাত করেই ওর ঘরে এলো বীর বাহাদুর। বেহেড মাতাল অবস্থা। ঘরে এসেই মিষ্টি হেসে ডাকল নির্মলাকে। ভয় পেলেও না এসে উপায় ছিল না। কাছে আসতেই হাত ধরে বুকের ওপর টেনে নিয়ে চুম্বনের বদলে মুখে অজস্র যৌনিক সংলগ্ন বসিয়ে দিল। তারপরের ঘটনা ভাবতে আজও শিউরে ওঠে। নারীদের মনন অপমানের কথা ভাবতে কারই বা ভাল লাগে।

সেদিন যে পিঞ্জরে আটকা পড়েছিল নির্মলা আজও সেই পিঞ্জরে আবদ্ধ হয়ে আছে।

কিন্তু পিঞ্জরাবদ্ধ আর থাকবে না নির্মলা। মুক্তির আহ্বান শুনেছে। শুনিয়েছে বীর বাহাদুরের দূর সম্পর্কের ভাই ফেরু বাহাদুর।...

বীর বাহাদুর টীলা মার্কা পানপাত্র নিঃশেষ করে নামিয়ে রাখল। নির্মলারও পানপাত্র শেষ হয়ে গেছে। চোখে বং ধরতে শুরু। বীর বাহাদুরের মুখের দিকে তাকিয়ে বিচিত্র এক টুকরো হাসি বিলিয়ে দিয়ে কোলে মাথা রেখে টানটান হয়ে শুয়ে পড়ল। আজ সম্পূর্ণ সমর্পণ। বিশ্বাসের দিনের আশ্রয়দাতার পিঞ্জর থেকে মুক্তির নিঃশ্বাস নিয়ে উড়ে যাবার আগে নিজেকে বিলিয়ে দিতে আজ তার নির্মলার দ্বিধা নেই।

এমনভাবে কোনো দিনই বীর বাহাদুরের হাতে সঁপে দেয়নি নিজেকে। যখনই বীর বাহাদুর ওর দেহের দখল নিতে এসেছে জোর করে দিনে আধাভাবে নিজেকে সঁপে দেয়নি। কাল রাত থেকে বেদনা অত্যাচারের কড় বইয়ে দিয়েছে ওর নবম দেহের কোষে কোষে।

আজ মনে পড়ছে নির্মলার, গৌরিবাসের সেই প্রথম রাতের পর সারা দিনের জন্য উধাও হয়ে গেছল বীর বাহাদুর। তারপর কোন ওকে দিনমান পাহারা দিয়েছে তার

শ্রীঅরবিন্দের
মূল বাংলা রচনাবলী ও ইংরাজীতে লিখিত বিভিন্ন গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ।
মোট ১০ খণ্ডের মূল্য ১৬০৲ টাকা
আগামী ১৫ই ফাল্গুনের পূর্বে গ্রাহক-শ্রেণীভুক্ত হইলে মাত্র ১২৫৲ টাকা।
টাকা কিস্তিতেও দিলেও চলিবে।
নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন :
শ্রীঅরবিন্দ বুকস্ ডিস্ট্রিবিউশন এজেন্সি
১৫ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২
(ফোন : ৩৪-২৩৭৬)
অথবা পণ্ডিচেরী—২

থাকিয়েছে, চোখে স্বপ্ন ধরেছে বীর বাহাদুরের তখন কিছু কামিয়ে নাও, অন্ততঃ যতো দিন তোমার শরীরের মধ্যে চুপ চুর হয়ে থাকবে ধনিব। তারপর কিন্তু তোমার হবে আমাদের মতো হবে। দুনিয়ার লোকের ঘর করতে হবে—তা তোমার স্বামী ভাল থাকুক আর না থাকুক।

পলমবার ফিকির করছে প্রতিদিন। কিন্তু কোথায় পালবে? এই দুনিয়ার কোনো জায়গাটা চেনে ও।

গৈরিবাস থেকে একদিন নির্মলাকে নিয়ে বীর বাহাদুর চলে এলো সেকমা-তে। ওখানে তখন নতুন নতুন ঘরবাড়ি হচ্ছে। গৈরিবাসের বাড়িটাও রইল। সেকমাতে এসে পরিচয় দিল ওকে বিয়ে করা বউ বলে। আর সেই সঙ্গে শাসিয়ে দিল, উড়তে গেলে বিপদে পড়বি।

সেকমায় আসার পর প্রায় মাস দুয়েক কোথাও নড়েনি বীর বাহাদুর। তারপর আস্তে আস্তে বেরুতে শুরু করল। নির্মলা স্বপ্ন দেখে ওড়ার। কিন্তু বহুদিন পিঞ্জরাবদ্ধ থাকার ফল হিসেবে উড়তে গিয়ে দেখল ডানা দুটোয় কোনো জোর নেই। মনের সঙ্গে থাকলেও সাহস হারিয়ে ফেলেছে।

এমন সময় হঠাৎ দারুণ হৈ-হুল্লোড় আসেক ওলো। বীর বাহাদুরের দূর সম্পর্কের ভাই ক্ষেম বাহাদুর এলো ওদের বাড়িতে। বছর পঁচিশ-ছাব্বিশের তরতাজা জোয়ান ছেলে। মালয়ের ব্রিটিশ আর্মিতে কাজ করে। ছুটিতে দেশে এসে তাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। ক্ষেম বাহাদুরকে দেখে মজল নির্মলা। ক্ষেম বাহাদুরও বাদ গেল না। জংবাহাদুর দাজুর এমন বউ বউ! ওদের সমাজে অবশ্য এমন অনেকের আছে। আবার এক জনের বউ নিয়ে পালানোর ঘটনাও অনেকার ঘটে। কিন্তু নির্মলা তো আর দাজুর বিয়ে-করা বউ নয়। সেকেতে পাপটাপ হবার ভয় নেই।

ঘরের অনুপস্থিতিতে শলা-পরামর্শ চলে। নির্মলা স্বপ্ন দেখে অজানা এক দেশের। যে দেশে যেতে হলে কালাপানি পার হতে হয়। অজানা সেই দেশে ছোট

নবীন ও তরুণদের একটি সহযোগিতামূলক
কবিতা সংকলন
"মেঘলা আকাশ"
১৫০ পাতার বই। দাম—৪·৫০
লেখকদের ফটোসহ সংক্ষিপ্ত জীবনী ও
সুনির্বাচিত ২টি করে কবিতা। যাঁরা
যোগদানে ইচ্ছুক—তাঁরা অবিলম্বে
লিখুন।
বুল-বুল প্রকাশনী
৩, ওয়াজিউল্লা লেন, কলি-১৬

একটা ঘরে ক্ষেম বাহাদুরের ঘরণীর ছবি ভেসে উঠতেই কেমন যেন বিচ্ছিরি শিহরণ লাগে। আর এই স্বপ্ন দেখার মুহূর্তে ক্ষেম বাহাদুরের ভীতু ভীতু আদরে অস্বস্তি লাগে না, বরং একটা পরম পরিতৃপ্তির আস্বাদ পায় নির্মলা।

হঠাৎ খেয়াল হল নির্মলার যে বীর বাহাদুরের কোলে মাথা রেখে ও এত তন্ময় হয়ে গেছে যে, স্বপ্নে ধরা না পড়ে। চোখ চেয়ে দেখল বীর বাহাদুর ওর মুখের দিকে অবাক হয়ে কি দেখছে।

—কি দেখছ?

—তোকে।

—আমায় আজ নতুন দেখছ নাকি?

—সত্যি তোকে আজ নতুন নতুন লাগছে।

—ও তোমার চোখের দোষ। আমি যা ছিলাম তাই তো আছি।

—এমনটা ছিলি না নির্মলা।

—কি রকমটা?

—ঠিক এখন যেমনটা...

বুক কেঁপে উঠল নির্মলার। ধরা পড়ে গেল নাকি? ওরে তো শয়তানের চোখ! হঠাৎ বীর বাহাদুরের গলা জড়িয়ে ধরে মুখে মুখ ঘসে বলল, এত দিন তাহলে আমায় ঠিক মতো দেখো নি। আমি এমনটাই আছি সেই প্রথম দিন থেকে।

বুকের মধ্যে কেমন করে উঠল বীর বাহাদুরের। মানুষের স্নেহ আর ভালবাসা এমনভাবে কোনো দিন পায়নি। ভালবাসা না পেয়ে হলো হয়ে আছে করেছে জংপাস্তি। এই নির্মলার ওপর কতই না অত্যাচার করেছে। আজ বুঝতে পারছে মেয়েটাও ভালবাসার কাঙাল। ওকে আগেই বিয়ে করলে হয়তো এই ভালবাসা পেত। এতদিন বিয়ে না করার জন্য আজ সংবেদনায় দুমড়ে হয়ে যাচ্ছে।

ধরা গলায় বীর বাহাদুর বলল, সত্যি নির্মলা তোকে চিনতে পারিনি এতদিন। সেবটা আমার।

কপট রাগের ভঙ্গীমায় গলা ছেড়ে দিয়ে নির্মলা বলল। থাক, খুব হয়েছে।

বীর বাহাদুর নির্মলার হালকা দেহটা বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বলল, তোর ওপর অনেক অন্যায় করেছি। আমায় ক্ষমা কর নির্মলা। তোর সব সাধ আমি পুরিয়ে দেব। যা তুই বলবি।

—সত্যি! আমায় তুমি বাবার কাছে দিয়ে আসতে পারবে?

বিস্মিত হতভম্ব বীর বাহাদুর। তারপরেই ভাবল নির্মলা নিশ্চয়ই পরীক্ষা করতে ওকে। বলল, তুই চাইলে নিশ্চয়ই দিয়ে আসব। যে দিন বলবি।

—তোমার চলবে কি করে?

—তুই আসার আগে যেমন চলছিল তেমন চলবে।

নির্মলার বিস্ময়ের অন্ত নেই। হিংস্র মানুষটার একি হল! এমন শান্ত গম্ভীর কোনো দিন শোনেনি বীর বাহাদুরের। হঠাৎ মনে হল এটা স্বপ্ন হল। আসলে কথা শেষ করতে চায়। সাবধান হতে হবে। আজকের রাতটা ভোর হলে মুক্তির আর কোনো আশাই থাকবে না। নির্মলা বীর বাহাদুরের বুকে নিজের বুকটা এলিয়ে দিয়ে বলল, তোমায় ছেড়ে আমি কোথাও যাব না।

বীর বাহাদুর ছোট্ট একটা পাখিকে যেন পরম আদরে বুকে চেপে রেখেছে যার ওড়ার মতো আর আকাশ নেই এই পৃথিবীতে।

বীর বাহাদুরের চওড়া বুকের ওপর নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়েছিল নির্মলা। হঠাৎ দরজায় টোকা দেবার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। চোখ চেয়ে দেখল। আবার টোকা পড়ল দরজায়। ক্ষেম বাহাদুর কথা মতো রাত-দুপুরে এসেছে। দূরে ওর জিপ গাড়িটা রেখে হালকা পায়ে বাড়ির কাছে এসে ডাকছে নির্মলাকে।

মনে পড়ছে সব। এবার বীর বাহাদুরের বুক থেকে বিদায় নিয়ে সন্তর্পণে বেরিয়ে যাওয়া। তারপর জিপ নিয়ে উঠলে ক্ষেম বাহাদুর উধাও পথে ঠেলে নিয়ে যাবে গাড়িটাকে রাস্তার বাঁক পর্যন্ত। বাঁকে পৌঁছনর পর ক্ষেম বাহাদুর ব্রাক দিয়ে গাড়িতে উঠে স্টার্ট দেবে। তীব্র বেগে জিপ ছুটবে সিংমোড়ির দিকে। সিংমোড় থেকে সুকিয়াপোখরি হয়ে ঘুম। ঘুম থেকে শিলিগুড়ি। ভোরের ট্রেন ধরে কোথায় কোথায় গিয়ে বোম্বে যাবে। সেখান থেকে জাহাজ। থামবে গিয়ে মালয়ের সাগিল এস্টেট। সেখানেই একটা ছোট্ট ঘরে নতুন সংসার পাতবে নির্মলা। যার মালিক ভরতাজা জোয়ান সৈনিক ক্ষেম বাহাদুর।

বীর বাহাদুরের চওড়া বুক থেকে উঠতে গিয়ে কেমন যেন শক্তিহীন মনে হল ওর। শরীরে জোর পাচ্ছে না। ছোট্ট পিঞ্জরাবদ্ধ পাখিটার ডানা দুটো যেন বড় ভার। বাইরে আবার টোকা পড়ল।

নির্মলা দেহের সব শক্তি একত্রিত করে বীর বাহাদুরের বুক থেকে নিজের মুক্তি চাইল। উঠে বসল। চাঁদনি দেওয়াল ল্যাম্পের টিমটিমে আলো পড়েছে বীর বাহাদুরের সুখে বুকে। নির্মলা বিশ্বাসের অগাধ আস্থার-দাতার মুখটা একবার দেখে নিতে গিয়ে অবাক হল। যেন একটা নিষ্পাপ শিশু ঘুমে অচেতন। এ শিশুর মুখে কোনো পাপ নেই, নেই কোনো হিংস্রতার ছাপ।

এমন মুখ তো আগে কখনো দেখেনি বীর বাহাদুরের। ওর চওড়া বুকের আশ্রয়টা বড় টানছে। বাইরে দরজায় অধীর টোকা পড়ছে।

পিঞ্জরাবদ্ধ পাখিটা তীব্র ডানা দুটো ঝটপট করে শেষ বারের মতো মুক্ত আকাশে উড়তে চেয়ে শেষে পড়ে গেল। ক্লান্তিতে বসে পড়ল খাঁচার মধ্যে।

নির্মলার চোখ দুটো ঘুমে ক্লান্ত। নিষ্পাপ শিশুর মতো ঘুমে অচেতন বীর বাহাদুরের চওড়া বুকের আশ্রয়ে নিজেকে এলিয়ে দিয়ে পরম প্রশান্তিতে চোখ বুজল।

মাওরি কবিতা

নবকুমার ঘোষাল

মাওরি নিউজিল্যাণ্ডের আদিম অধিবাসী। মাওরি শব্দের অর্থ নয়। তরুলতা, পশুপাখী এবং ব্যক্তিবিশেষের নাম বোঝাতে মাওরি শব্দটি ব্যবহৃত হয়। নিউজিল্যাণ্ড-বাসীরা এই অর্থেই শব্দটি প্রয়োগ করে থাকে। মাওরি আদিবাসীদের একটি পৃথক ভাষা ও স্বতন্ত্র সংস্কৃতি আছে। নিউজিল্যাণ্ডের মধ্যে থেকে এবং সভ্য সমাজের সংস্পর্শে এসেও তারা তাদের ভাষা ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করে চলেছে। নিউজিল্যাণ্ডের অন্যান্য অধিবাসী থেকে মাওরিদের সহজেই পৃথক করা যায়।

মাওরি আদিবাসীর একটি প্রধান সম্পদ হল তার কবিতা। মাওরি কবিতা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত উপাদানের সমষ্টিমাত্র নয়। কবিতাগুলিকে পূর্ণাঙ্গ কবিতার মর্যাদা দেওয়া যায়। আজ থেকে একশো বছরেরও আগে মাওরি ভাষা পুস্তক হরফে প্রথম লিখিত হয়। ভাষা লিখিতরূপ পাবার আগে কবিতা মুখে মুখেই চালু আসত। সেই সময়ে সার জর্জ গ্রে (নিউজিল্যাণ্ডের গভর্ণর ছিলেন : ১৮৪৫-১৮৫৩ এবং ১৮৬১—১৮৬৮) মাওরি আদিবাসীর লোক-কাহিনী এবং কবিতা সংগ্রহ করতে ও তার রেকর্ড রাখতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তাঁর সংকলন গ্রন্থের নাম মিথলজি অ্যাণ্ড ট্র্যাডিশন অব দি নিউজিল্যাণ্ডারস। তাঁর এই সংকলনে মোট ৩০৭টি কবিতা আছে। এর অধিকাংশই ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছে। কতকগুলি কবিতার ভাব অস্পষ্ট অথবা সন্দেহজনক। কিন্তু যাঁরা সেগুলি ঠিকমত পড়তে পেরেছেন, তাঁরা তার মধ্যেও সৌন্দর্য খুঁজে পেয়েছেন।

মাওরি কবিতা সংগ্রহের পুরোভাগে আছেন সার জর্জ গ্রে। তাঁর পরেও প্রার্থনা, সংগীত এবং লোকবিষয়ক অনেকগুলি মাওরি কবিতা সংগৃহীত হয়েছে। সব সময় যে শ্লোকগুলির ইংরেজি অনুবাদ পাওয়া গেছে, তা নয়। গ্রের সংগ্রহকে পরিবর্ধিত করার জন্যে সার অপিরাণা নগাত (১৮৭৪—১৯৫০) আরো অনেকগুলি মাওরি কবিতা সংগ্রহ করেছেন এবং তার কিছু কিছু অনুবাদও তিনি নিজে দিয়েছেন। তাঁর সংকলনের নাম ল্যাণ্ডস অব দি পলিনেশিয়ান্স সোলাইট। সার অপিরাণা নগাত সংগৃহীত এবং অনূদিত কবিতাগুলির মধ্যে ল্যামেণ্ট ফর হেট হেহু, ডিপারে ও মিট, আনসারস টু এ ম্যারেজ প্রপোজল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর অনুবাদ কবিতা গ্রন্থ হিসেবে সুন্দর হয়েছে। কবিতাগুলির পাঠ বেশ সাবলীল এবং স্বচ্ছন্দগতি। একথা অস্বীকার করা যায় না যে তাঁর অনুবাদে মূলের সৌন্দর্য রক্ষা পেয়েছে। টেলর, এস পার্কি স্মিথ, হেয়ার হোপিং প্রভৃতি পণ্ডিতরাও মাওরি কবিতা নিয়ে চর্চা করেছেন। তাঁদের এই প্রয়াসে মাওরি জীবন ও ঐতিহ্যের একটা প্রাথমিক পরিচয় ফুটে উঠেছে। কিন্তু ইংরেজি কাব্য-রীতি বজায় রাখতে গিয়ে তাঁরা অনেক সময়ে মূল কবিতার মেজাজ ঠিক ধরতে পারেননি।

মাওরি কবিতা নানাপ্রকারে রচিত হয়েছে। ওয়াইয়াতা (সংগীত), তাংগি (শোক প্রকাশ), ক্যারাকিয়া (আনুষ্ঠানিক প্রার্থনা) এবং এ রেড তাস (বর্ণনায় মন দেওয়ার জন্যে স্তব)—প্রধানত এই চার-প্রকারের মাওরি কবিতা দেখা যায়।

ওয়াইয়াতা সুর দিয়ে গাওয়া হত। এগুলি হয়ত কোনো মাওরি চারণ-কবির রচিত নতুবা প্রাচীন সংগীত থেকে গৃহীত। কিছু প্রাচীন ওয়াইয়াতা এখনো আসরে গাওয়া হয়ে থাকে। এদের কোনো লিখিত স্বরলিপি নেই। তবে কিছু কিছু গানের টেপ রেকর্ড আছে। তাংগি (শোক-কবিতা) সাধারণত কোনো নামকরা লোকের মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত এবং শোক উৎসব উপলক্ষে লতাপল্লবিত ভাবে এগুলি রচিত। ক্যারাকিয়া (আনুষ্ঠানিক প্রার্থনা) আজকে গীর্জার প্রার্থনা সংগীত হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু প্রাচীন ক্যারাকিয়ার সঙ্গে গীর্জা-সংগীতের সাক্ষাৎ কোনো সম্পর্ক নেই।

এবার মাওরি কবিতার কিছু কিছু বাংলা অনুবাদ উদ্ধৃত করলে বক্তব্য পরিষ্কার হবে।

একটি ছোটো বাঁশীর মধ্যে দিয়ে গানের কথাগুলি প্রকাশ করে দেওয়া মাওরিদের পক্ষেই সম্ভব। একজন ভালো বাঁশী-বাদক মাওরি সমাজে বিশেষভাবে সম্মানিত হয়।

অ্যান এনসেস্ট ফ্লুট সং কবিতায় বাঁশীর সংগীতই যেন শোনা যায়।

ওহে, তোর চকচকে কৌটিকা
তোমার লম্বা ফোক দিয়ে
আমাকে ডেকে তোমার বসন্তের ঘরে যাও।
বাতাস শিথিল হয়ে ভালবেসে ফেলেছে
যেখানে রিপিরো শুয়ে আছে
তার সংস্কার এখনো হয়নি।
সংস্কার পড়ে থাক।
প্রশস্ত মাটিতে মৃত্যু হোক
গর্তগুলির অন্ধকার দূর হয়ে যাক।
ঘূর্ণায়মান বাতাসের মধ্যে দিয়ে উড়ে এসে
মনের নির্জন আকাশে তোমার বাসা বাঁধো।

তিপারে ও নিউ কবিতায় মা তাঁর ছেলের জন্যে শোক প্রকাশ করছেন। এতে সর্বকালীন জননীর বেদনা মূর্ত হয়ে উঠেছে।

তিপারে ও নিউ পর্যন্ত
যে রাস্তা নিয়ে তোমরা হেঁটে যাও
আমার চোখের জলে তা ভাসিয়ে দেবো।
শুধু আর চোখের জলের জন্যায়
সমস্ত দীর্ঘ-রাত্রি বক্ষপায় ঢেলে দিয়ে
আমি সীমান্ত দেশ দেখেছি
কিন্তু জলের ধারে গাছের নীচে
যেখানে মৃত শিশুটি নিশ্চিন্তে
ঘুমিয়ে আছে
এমন কি তাকে দূর থেকেও দেখিনি।

প্রাকৃতিক পরিবেশ ধীরে ধীরে কেমন ভয়ংকর হয়ে উঠছে। যুদ্ধের বীভৎসতা প্রকৃতি রাজ্যেও যেন আলোড়ন সৃষ্টি করছে। মানুষ ও প্রকৃতি উভয়ই যুদ্ধ ভয়ে ভীত। কারণ এতে তাদের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটতে পারে। শেষে যুদ্ধ-দেবতার বিদায় এবং সবলের সন্ধি। এই চিত্রের আলোকে ডগলট বিয়ের ব্যাটল কবিতাটি উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। মাওরি চারণ-কবি বলছেন—

যুদ্ধ দেবতা বিদায় নেয়
তার দীর্ঘ পদক্ষেপের সংগে
চাঁদ এবং তারা মৃত্যুর হাত থেকে
পালিয়ে যায়, ছুটে পালিয়ে যায়।

ল্যামেণ্ট ফর হেট হেহু কবিতাটি একটি শোক-গাথা। ছোটো ভাই বড় ভাইয়ের জন্যে শোক প্রকাশ করছে। প্রাকৃতিক জগতেও তার শোকের ছায়া পড়েছে।

কবর পাহাড়ের উপরে —
বিদ্যুৎ আকাশ চূর্ণ করে :
মৃত্যু ছাড়া এর কি অর্থ হতে পারে ?

আমার ভাইয়ের ছায়া চলে গেছে,
আমার বন্ধুকে শীঘ্রই ভুলে যাবে,
তোমার হাত থেকে অস্ত্র তুলে নেওয়া হল
ওহে যাজকবৃন্দ
কোন্ রাতে সে মারা গিয়েছিল ?
সেদিন কি চাঁদ উঠেছিল ?

ভাইয়ের মৃত্যুশোক আর ব্যক্তি বিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে নেই ; আদিবাসী সমাজও সেই শোকে অভিভূত হয়ে পড়েছে। শোক-সন্তপ্ত ভাইটি বলছে—

অন্য মানুষ সম্বন্ধে কথা বলতে
আমার ক্লান্তি বোধ হয়
উপজাতিরা আজ অসহায়, পৃথিবী কাঁপে,
তুমি আমাদের যেখানে রেখে গিয়েছিলে
নিশ্চল খোঁটার মত আমরা সেখানে
দাঁড়িয়ে আছি
কেবল চোখের জল দিয়ে তোমার চারপা
ভিজিয়ে দিতে পারি।

CENTRAL LIBRARY

অঙ্গনা

সহধর্মিণী-সহবাসিনী

বিবাহ কি সামাজিক বন্ধনের চাবিকাঠি? এরকম একটি প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে একসময় অবশ্যই ইতিবাচক উত্তর দেওয়া চলতো। কারণ, যে সমাজের ছত্রছায়াতলে আমাদের পূর্বপুরুষেরা বেড়ে উঠেছিলেন তার বিধি-বিধানের যোগ্য মর্যাদাদান এবং পুরুষানুক্রমিক ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রাখাই ছিল তখন বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য। তখনকার সামাজিক মূল্যবোধই এখন প্রায় বিপর্যস্ত হয়ে বসেছে। তাই সেদিনে আর এখনে কোথাও কিন্তুর। এ প্রশ্নের ইতিবাচক বা নেতিবাচক উত্তর দেওয়া কোনোমতেই এখন খুব সহজসাধ্য নয়। তবে একথাটা দিনে দিনে সহজ হয়ে যাচ্ছে যে বিবাহের সামাজিক প্রয়োজন উদ্দেশ্য এখন গৌণ হয়ে পড়ছে। বস্তুত এর সামাজিক বন্ধনের দিক সম্বন্ধে অনেকেই আর তেমন ভেবে দেখতে চাইছেন না বা এড়িয়ে যাচ্ছেন।

আমাদের দেশে এই সমস্যা এখনো তেমন প্রকট না হলেও বিভিন্ন দেশে এই সমস্যা সেখানকার শাসক ও সমাজতাত্ত্বিকদের চিন্তা-ভাবনা চিহ্নিত করে তুলেছে। কিছুদিন আগে জার্মানির একদৈনিকে বিভাগে প্রকাশিত একটি সংবাদ নিশ্চয়ই অনেকের নজরে এসেছে। সেই সংবাদে বলা হয়েছিল যে, সুইডেনে আনুষ্ঠানিক বিবাহ দ্রুতগতিতে হ্রাস পাচ্ছে। যুবক-যুবতীরা আইন বা চার্চের কোন পরোয়া না করেই যে যার মনের মানুষকে নিয়ে ঘর বাঁধছেন। ...১৯৬৬ সালে সেদেশে বিবাহ হয়েছিল ৬১,১০১টি। আর গত বছরে বিবাহ হয় মাত্র ৩১ হাজার। মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে সুইডেনে আনুষ্ঠানিক বিবাহের সংখ্যা প্রায় ৩৫ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। প্রায় শতাব্দীকাল আগে যখন সেদেশে থেকে গরীব লোক আমেরিকার চলে যেতে থাকে কেবলমাত্র সে সময় সুইডেনে বিবাহের সংখ্যা বছরে চল্লিশ হাজারের নীচে নেমে আসে। এক সমীক্ষায় দেখানো হয়েছে যে ২০-২৯ বছরের মেয়েরা আর ২৫-২৬ বছরের ছেলেরা আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ে করা প্রায় ছেড়েই দিয়েছে। ...আনুষ্ঠানিক বিবাহে সুইডেনের তরুণসমাজের এই অনীহা কেন? বিভিন্ন মহল থেকে এর কারণ বাখ্যানো হয়েছে। ছেলেমেয়েরা নিজেরা বলছেন যে, তাদের ভালবাসা এতই গভীর যে, তা চার্চ বা আইনের স্বীকৃতির অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু সমাজতাত্ত্বিক, অর্থনীতিবিদ বা ধর্মযাজকরা সেকথা মানতে চান না। সমাজতত্ত্ববিদরা বলেন, পশ্চিমের বিবাহরীতি আজকের ছেলেমেয়েদের কাছে অনাবশ্যক বন্ধন বলে মনে হচ্ছে। অর্থনীতিবিদরা বলেন, এর মূলে রয়েছে নারীর অর্থনৈতিক মুক্তি আর আত্মনির্ভরতা। তাঁরা পুরুষের সংস্পর্শে আসেন যৌবনের আকর্ষণে। কিন্তু সেখানে কোন দায়-দায়িত্বের বন্ধনে তাঁরা যেতে চান না। আর যাজকেরা বলেন বর্তমান যুবসমাজের কাছে ধর্মের আবেদন দিন দিন ফুরিয়ে যাচ্ছে। তাই সমাজ ভাঙছে এই অনাসৃষ্টি।

এই অনাসৃষ্টি কি নতুন সৃষ্টির বিচারের দিন এখনো অনেক দূরে। তবে এই তরুণ সমাজ যে আঘাত করে আমাদের উপকূলেও আছড়ে পড়ছে। ইতিমধ্যেই কেউ কেউ বলতে শুরু করেছেন যে আমাদের দেশের আবেদ ইনস্টিট্যুটে তাঁরা নিবাসী নন এবং নিজ নিজ পছন্দমতো তাঁরা ঘর বাঁধতেও শুরু করেছেন। কোন সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান নয়, এমনকি ম্যারেজ রেজিস্ট্রার পর্যন্তও তাঁরা যাচ্ছেন না। অথচ স্বামী-স্ত্রীরূপে বসবাস করছেন। সামাজিক বা আইনী স্বীকৃতির অপেক্ষা এরা রাখেন না। ইচ্ছে হলো স্বামী-স্ত্রীরূপে বসবাস করলেন। আবার যখন পোষাবে না, ভালবাসার উত্তাপ জুড়িয়ে এলে বন্ধনগ্রন্থি ছিন্ন হতেও সময় লাগে না।

আমাদের দেশে এই জিনিসের এখনো তেমন বাড়বাড়ন্ত দেখা যায়নি। তাই বিবাহ-বিহীন মিলন যেমন নজরে পড়ছে না, তেমনি এ ধরনের বিচ্ছেদও আমাদের খুব একটা শংকিত করছে না। তবে নানা দেশে এ সম্পর্কে যে তথ্য পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায় যে ভালবাসার বন্ধনে ভালবাসায় ভাটা পড়লেই নেমে আসে বিচ্ছেদ। আর এসবই হয় আইনের বাইরে। বিয়েতেই যাঁরা আইনের তোয়াক্কা করেন না, বিচ্ছেদে তাঁরা সে ধার দিয়েও যাবেন না, সে তো খুবই স্বাভাবিক। তাই বিবাহ-বিচ্ছেদের হিসেবের মধ্যে এ-সবের কোন রেকর্ড থাকে না। আর এমনিতেই সেসব দেশে বিবাহ-বিচ্ছেদও খুব বেড়ে গেছে। সুইডেনের কথাই বলা যায় যে, সেদেশে এখন প্রতি তিনটি বিবাহের একটি দশ বছরের মধ্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। ১৯৬০ সালে সেদেশে বিবাহ-বিচ্ছেদ হয় ৮,১৫৮টি আর ১৯৬৯ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১২,২৩৮টিতে। প্রায় সব ক্ষেত্রেই অভিযোগ বাড়িচার, মাতলামি। তবে এর সবচেয়ে গোড়ার কথা হলো মানসিক ব্যাধি। যা কি না ধরাযোগ্য। আর এখান থেকেই সামাজিক অনাসৃষ্টি বা নতুন সৃষ্টির শুরু।

আবার এই বিবাহ-বিচ্ছেদের হার থেকে অবিবাহিত দম্পতিদের বিচ্ছেদ।

ইউরোপের নানা দেশের সঙ্গে আমাদের দেশের ঠিক ঠিক তুলনা চলে না। তবু একথা সত্য যে, ওঁদের প্রতিটি জিনিসই আস্তে আস্তে আমাদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করছে। বিবাহ-বিহীন স্বামী-স্ত্রীরূপে বসবাস করাটা সেই প্রভাবেরই অন্তর্ভুক্ত। কিছু ওদেশের মেয়েরা কীভাবে অর্থনৈতিক মুক্তি লাভ করেছেন। তাই তাঁরা জীবনের প্রতিটি বিষয় নিয়ে সুস্থ মনে প্রশ্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় মেতেছেন। সমাজিক বন্ধনকে পর্যন্ত তুচ্ছ করেছেন। আর আমরা তো সে তুলনায় নিতান্তই হুটি-হাটি পা-পা। এই মধ্য ব্যাপক অস্বীকৃতির ঝোঁক আমাদেরও পেয়ে বসেছে। অন্য দেশের পটভূমিকায় এদেশের এই ট্রেন্ডকে গোড়ে ওঠা দুর্লক্ষণ বলে মনে হলেও এজন্য মূলত দায়ী স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অসদাচরণ। আজ থেকে বছর পঞ্চাশেক আগে ২৫-৩০ বছরের একজন যুবক বিয়ে সম্বন্ধে এই ব্যাপারে নিশ্চয়নিশ্চিন্ত থাকতেন যে, আমার স্ত্রী সারা জীবন ঘরসংসার আগলাবে এবং সন্তানসন্ততির পরিচর্যা করবে। আমার দুঃখ, কষ্ট, ব্যথা-বেদনার কথা সে ধৈর্য-সহকারে শুনবে। আমার সেবার জন্য সে সব-সময় তৎপর থাকবে। আমি রোজগার করবো আর সে সংসার করবে। গুরুজনদের পরিচর্যার কথা তো বলাই বাহুল্য।

এই ছিল সেদিন, স্ত্রীর কাছে স্বামীর প্রত্যাশা। অর্থাৎ স্বামীপ্রবর নেবেন সবই কিন্তু দেবার বেলা নেই। আরো সহজভাবে বলা যায় যে তিনি কেবলই নেবেন, গ্রহণ করবেন, দেবেন না কিছুই। তাই তিনি একাই সুখ চান যেন এটা তাঁর জন্মগত অধিকার এবং সুখে স্ত্রীর কোন অধিকার নেই। তাই সেজন্য তিনি কোন ব্যবস্থাও করবেন না। আজ যদি মেয়েরা পুরুষের উপর পূর্বকৃত অন্যায়ের শোধ নিতে এগিয়ে আসেন তবে তাকে তেমন দুষণীয় বলা চলে না। কিন্তু আচার-আচরণে তো তেমন মনে হচ্ছে না। আসলে কথা হলো, ওর দ্বারা গোটা সমাজকে খড়্গহস্তে প্রদর্শন করা। তাই বিদেশের বিবাহবিচ্ছেদ মিলন আমাদের দেশেও জলচল হয়ে যায়।

এরকম জনা কয়েক যুবক-যুবতীর এক আলাপ-আলোচনা আড়ি পেতে শোনার সুযোগ হয়েছিল অন্যত্র। ঘটনাস্থল কোন এক কফিখানা। আমি বসে মৌজ করে

কাজটা চুকিয়ে দিয়েছিলাম। সংখ্যা ছিল অনেক। দিনের অপেক্ষা এক বাধাবাঁ। সাকে সাকে টুকরো টুকরো কথাবার্তা চলছে, এমনি সময়ে হৃতদন্ত হয়ে ওঁদের প্রবেশ। সামনের টেবিলেই বসলেন। ওঁরা ঈষৎ উত্তেজিত হয়ে আলোচনা করছিলেন। এই উত্তেজনার কারণ অনুসন্ধানের জন্য একটা কান সেদিকে এগিয়ে দিলাম। আলোচনা এবং উত্তেজনার মূল সূত্র বোধগম্য হতে এবার আর বিলম্ব হলো না। ওঁদের একজন বিয়ে করছেন এবং সামাজিক মতে। তিনি অবশ্য এই টেবিলে অনুপস্থিত। এই বিয়েতে ওঁদের সায় নেই। মহিলাদের একজন বললেন, মালাচন্দনে সেজে আর টোপর পরে ছাদনাতলায় দাঁড়ানোর মতো হাস্যকর বোধহয় আর কিছু নেই। সঙ্গে সঙ্গে এক তরুণী সায় দিয়ে বললেন আর স্রেফ্‌টো না কেমন। ওরকমভাবে সেজেগুজে সংসের মতো অচেনা-অজানা একটা লোকের চার-পাশে ঘুরতে লজ্জা করবে না। এদিকে তো শুনেছি এম-এ পাশ এবং রেজাল্টও নাকি বেশ ভালোই।

আলোচনা ক্রমেই উত্তেজনার স্তর ছাড়িয়ে চলেছে। একজন মন্তব্য করলেন, সবচেয়ে হাস্যকর লাগে বিয়েবাড়ির খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারটা। বাসাতে ছেলে সবাইকে খেতে দেওয়া হয়। যেন গরুর জাব দেওয়া হচ্ছে। টেবিলের সবাই একবাক্যে সোৎসাহ সমর্থন জানালেন। একটু পরেই ওঁরা এ ব্যাপারে একমত হলেন যে বিয়ে বন্ধ করা হবে। তারপর বিয়ে-সংক্রান্ত প্রচলিত সামাজিক রীতি নিয়ে অনেক কটূকাটব্য করলেন ওঁরা। এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে টেবিল ছেড়ে উঠে পড়লেন।

বিয়ের রূপ অনেকবার বদলেছে। ইতিহাসে তার অনেক সাক্ষ্য মেলে। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভা থেকে অর্জুনের সুভদ্রা হরণ এবং পৃথ্বীরাজ-সংযুক্তার কাহিনী এ সংক্রান্ত প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই পরিবর্তন কিন্তু এখানেই থেমে থাকেনি। প্রতি বছর, প্রতিদিন এবং প্রতি ঘন্টায় এর পরিবর্তন হচ্ছে। কারণ, কোন পরিবর্তনই এক জায়গায় থেমে থাকতে পারে না বা শেষ হয়ে যায় না। স্বাভাবিক নিয়মেই তা এগিয়ে-চলে। তবে এরই মধ্যে একটা বরাবাঁধা সামাজিক রীতি ছিল এবং আজো তা শেষ হয়ে যায়নি। কিন্তু কালের দুর্বার গতিতে তা যে আর কতদিন টিকবে তাই বলা শক্ত। কিন্তু স্বীকৃতি না পেলেও স্বামী-স্ত্রীরূপে মিলন নেওয়াই বৈদিক আদর্শের চরিতার্থতা। যদিও দেশে বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রথা চালু আছে তবু সেজন্য উপযুক্ত কারণ দেখিয়ে মামলা দায়ের করে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হয়। সেই ঝামেলা এড়ানোর জন্যই এই সহজ ব্যবস্থা। যখন খুশি একজন আরেক জনের কাছ থেকে সরে যাবেন। আবার নতুন করে ঘর বাঁধবেন। সোজা সংসারে মন দেওয়া-নেওয়া পালাটা চলবে যতদিন সম্ভব।

কিন্তু সবাই এর সুফল পাবেন না। অনেকদিন কোন পুরুষ-রমণীর একসঙ্গে বসবাস করার ফলে স্বামী-স্ত্রীর স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে বিবাহ ব্যতিরেকেও। এক্ষেত্রে একজন যখন আর একজনকে পরিত্যাগ করে, তখন সেই দীর্ঘদিনের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের দোহাই পেড়েও কোন লাভ হয় না। এমনি একটি ঘটনা হচ্ছে সম্প্রতি বোম্বাইয়ে। একটি দম্পতি দীর্ঘ দশ বছর স্বামী-স্ত্রীরূপে বসবাস করেন। তারপর একদিন স্ত্রী দেখলেন যে স্বামী তাকে পরিত্যাগ করে অন্য একজনকে নিয়ে ঘর বেঁধেছেন। স্ত্রী প্রস্তাব দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্বামীকে উকিলের চিঠি দিলেন যে আইনত তিনিই তাঁর স্ত্রী এবং পুনরায় তাঁকে সেই মর্যাদা দেওয়া হোক, আর যদি তা সম্ভব না হয়, তবে তাঁকে খোরপোষ দেওয়া হোক।

স্বামী বলে বর্ণিত সেই ভদ্রলোক উকিলের চিঠি অবজ্ঞা করে ভদ্রমহিলার স্ত্রীর দাবি নস্যাৎ করে দিলেন। ভদ্রমহিলা তখন কোর্টে গেলেন। কিন্তু সেখানে তিনি তাঁর বিয়ে প্রমাণ করতে পারলেন না। তখন তিনি হাইকোর্টে আপীল করলেন এবং আরো অভিযোগ করলেন যে তাঁকে পরিত্যাগ করে তাঁর স্বামী অন্য মহিলাকে বিয়ে করেছেন। মকর্দমা চললো। কিন্তু ভদ্রমহিলা না তাঁর নিজের বিয়ে বা তাঁর স্বামী বলে বর্ণিত সেই ভদ্রলোকের দ্বিতীয় বিয়ের কথা কোনটাই প্রমাণ করতে পারলেন না। মামলা খারিজ হয়ে গেল। ভদ্রলোক বেকসুর খালাস পেয়ে গেলেন। শুরু কোর্ট-কাছারি ছোটাছুটি সার হলো।

ভদ্রমহিলা আধুনিক যুগের পথ ধরে চললেন আবার কোর্ট-কাছারিও করলেন। কিন্তু যে বিয়ে সামাজিক রীতিতে সম্পন্ন হয়নি তার আইনী সমর্থন মেলা ভার। যতক্ষণ একসঙ্গে থাকা যায় ততক্ষণই স্বামী-স্ত্রী। ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলেই সব নিতে গেল। কোন দাবিদাওয়া চলবে না। যার যার পথ বেছে নিতে হবে। আর এদিকেই এখনকার যুবক-যুবতীদের আকর্ষণ। এখনো এই মনোভাব তেমন ব্যাপকতা লাভ করেনি। সোপার্জনে সবাই এখনো স্বনির্ভর থাকতে চায় না। তবে কেউ কেউ অনন্য-নির্ভর থাকতে ভালবাসেন এবং তাঁরা এ পথেই বিয়ের পর্ব মিটিয়ে ফেলছেন।

তবে এ বিয়ে সম্বন্ধে একটা কথা এক্ষুনি বলা চলে। নানা দেশও এই একই সমস্যায় ভুগছে। সমস্যাটি হলো সন্তান শিশুকে কেন্দ্র করে। এই অবিবাহিত দাম্পত্য জীবনযাপনের ফলে সুইডেনে প্রতি পাঁচটির একটি শিশু হয় অবৈধ। সেদেশে অবৈধ শিশুর সংখ্যা যেভাবে সমাজকে বিচলিত করে না এবং স্বামী-স্ত্রীর মনকেও গভীরভাবে নাড়া দেয় না। ওদেশে এই রেওয়াজ দীর্ঘদিন ধরেই চলে আসছে। কিন্তু আমাদের দেশে হাজার আনন্দদানি করা বিবাহবিহীন পারস্পরিক বসবাসে যে সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে তার দায়িত্ব কে নেবে? ওদেশের মেয়েদের পক্ষে যা সম্ভব আমাদের দেশের রমণী-সমাজের পক্ষে কি তা সম্ভব হবে? অজাত সন্তান আমি জীবিত থাকতে পরিচয়হীন হয়ে অনাথ আশ্রমে যাবে হবে, মায়ের পক্ষে এর চেয়ে বেদনাদায়ক আর কিছু হতে পারে না।

অবিবাহিত দাম্পত্যের বৈধ রূপ দেওয়ার জন্য সুইডেনে এখন নানা প্রস্তাব বিবেচনা করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে সমাজ-তত্ত্ববিদদের অভিমত হলো, সাকে বিবাহ-রীতির বদলে এমন এক বিবাহরীতি প্রবর্তন করা হোক, যার বন্ধন হবে নমনীয় এবং যা ছিন্ন করার জন্য কোন পক্ষকে আদালতে যেতে হবে না। হয়তো অদূর ভবিষ্যতে সমাজের চোখে অবিবাহিত দম্পতিদের বৈধ রূপ দেওয়ার জন্য অর্থনীতিবিদ এবং সমাজতত্ত্ববিদরা গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হবেন। তাঁদের সুগভীর চিন্তাপ্রসূত এরকম কোন হালকা-পলকা আইন রচিত হবে এদের বৈধীকরণের জন্য। সেদিনের কথা আপাতত তোলা থাক। ভাবীকালের সর্বনাশের চেয়ে ঘরে কম কলহ, কম হয় তাই ভাল। তবে একটি নীতিবোধসম্পন্ন প্রতি মুহূর্তে আমাদের জানান দিয়ে যাচ্ছে। আর তা হলো ছাদনাতলার রোমাঞ্চ। দিনের পর দিন ঘোষকে ওতে অবিবাহিত দম্পতিদের বৈধ করার জন্য যত আইনই ছোক না কেন, কোন আইন রচিত হবে না এই মধুর কৌলিন্যটি ধরে রাখার জন্য—বা এরকম প্রতোক দম্পতির নিশ্বাসে সুস্থাগ ধরে রাখে। সেই ছাদনাতলার জন্য তখন-আমাদের স্মৃতি রোমাঞ্চিত সার হবে মাত্র।

—শ্রীলা

বহুজন প্রশংসিত সুবল চক্রবর্তীর

ঘাটশিলায় বিভূতি ভূষণ

॥ চার টাকা ॥

মিত্র ও ঘোষ : কলিকাতা-১২

রাজজ্যোতিষী জ্যোতিষ পত্রিকার সম্পাদক বিশ্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কারক জ্যোতিষী শ্রীসুকেদেব গোস্বামী হস্তরেখা, কুষ্ঠি বিচার ও ব্যবসার প্রশ্ন গণনায় সকাল ৮টা থেকে ১২টা ও বৈকাল ৩টা থেকে ৮টা অবধি ১৭।২এ।১২, বেলেঘাটা মেইন রোডস্থ বাড়িতে যত্নের সাথে বিচার করে থাকেন। ডাকযোগে বিচারাদি ও ব্যবস্থাপত্র দেওয়া হয়। চিঠিপত্রে যোগাযোগ করুন। ফোন নং ৩৫, ৩৫এ, ৪৫ (প্রাঃ) বেলেঘাটা স্টেশনের পথে।

সরলতা ভুলিনি

এই সেদিন যৌবন ধন রাঙা মেঘে আকাশ আঙ্গিনা ছিল। সকাল থেকেই বারে বারে বৃষ্টি আসছিল, অবশ্য সেই বৃষ্টিতে মানুষের কোন মাথামাথি চলাচলি ছিল না। সেই বৃষ্টিতে উঁকিঝুঁকি করে অফিসযাত্রীরা ঠিক ঠিক সময়ে যার যার কর্মস্থলে বেরিয়ে পড়েছেন। স্বপ্নেও ভাবেননি বিকেলে দূর-দূরান্তরের ছবিকে আবছা করে দিয়ে প্রবল বজ্রপাতের সঙ্গে বৃষ্টির প্রলয় নাচন শুরু হবে। সকলের ধারণা এবারে বড় থেকে থেকে আসে আর দুরন্তের স্নেহের মত বিরক্তির কারণ হয়ে পড়ে কোথাও উধাও হয়। চারিদিকে ঘোর ওরে চরাচর করে। জনজীবন আবার স্বাভাবিক হয়ে চলাফেরা করে।

কিন্তু সেদিন বিকেলে প্রকৃতির খেয়ালে প্রবল গর্জনে চারিদিক প্রকম্পিত করে বৃষ্টির কলাগুলো মাটির বুকে আছড়ে পড়ছিল। দেখতে দেখতে রাস্তা পরিষ্কার। পথ-চারীরা জলের ছাট বাঁচাতে এদিক-সেদিক ছুটোছুটি করে খানিক নিরাপদ একটু আড়াল-আবডাল দেখে তাতে ঢুকে বা গাড়ীবারান্দার নীচে দাঁড়িয়ে মনভন আকাশের পরিবর্তন লক্ষ্য করছিলেন। সে প্রবল বর্ষণের দিনে যে সমস্যাটতে আরও অনেকের মত আমিও ছিলাম বাসযাত্রিনী। প্রথমে বাসের জানালাগুলো বন্ধ করে আত্মরক্ষা করতে চাইলাম, কিন্তু বিঁধ বাম। বাসের ছাদ ছুঁইয়ে মাথার ওপরে ফোঁস ফোঁস জল পড়তে লাগলো। এদিক-সেদিক নড়াচড়া করে কোনরকমে মাথা বাঁচাতে চেষ্টা করতেই জানলার জলের কাপটা এসে মাথাপিঠ অবহেলা করে ভেজালো। এ এক অদ্ভুত প্রহসন। চালার নীচে দাঁড়িয়ে কেমন হয়ে উপক্রম। সবচেয়ে মজা অত ভদ্রমহিলার এক ভদ্রলোক মধ্যবর্তীতি ছাতা খুলে কেচ্ছার মত জড়সড় হয়ে বসলেন। তাঁর এই সমাবস্থা দেখে সেদিন একটা হাসির রোল উঠলো।

একদিকে এত বরফ অন্যদিকে হাটুজল —বাস হয়েছে দুর্মূল্য বেগে। ক্রম ক্রমে সকলেরই নামার পালা ঘনিয়ে এল। তখন আমরা শ্যামবাজারের মোড়াপ্রিয় মধ্যে। যারা এসে টার্মিনাসে দাঁড়ালো। আবার কেউ ছয়-সাত মহিলা তখন বৃষ্টির ঝাপট দেখতেই ব্যস্ত, নামার কথা ভাবতে পারছি না। ঠিক সেই অবস্থায় বাসে উপবিষ্টা এক ভদ্রমহিলা (যাঁর সঙ্গে মাত্র দিনদুই আগে আলাপ) উপস্থিত মহিলাদের সামনে একটি প্রস্তাব রাখলেন। প্রস্তাবটি শুনে স্বভাবতই মুখে চাওয়াচাওয়ি করে ইতস্ততঃ করছিলাম দেখে ভদ্রমহিলা আর একবার অনুরোধের সুরে সেই প্রস্তাবটি উত্থাপন করলেন, চলুন না আমাদের বাড়ী। আমার বুড়ি ঠাকুমার গল্প শুনতে শুনতে এক কাপ গরম চা খাবেন।'

প্রস্তাবটি ভোলনীয় নিঃসন্দেহে। তবু এত অল্প আলাপে রাজী হওয়া যেন বাধো বাধো ঠেকছিল। তার ওপর কলকাতার মত আজব শহর, যেখানে ভদ্র--ভাল্লা, ঘটনা-দুর্ঘটনার অন্ত নেই। তাই বোধহয় ইতস্ততঃ ভাবটা আমার মুখে প্রকট হয়ে উঠেছিল। ভদ্রমহিলার মুখটি কেমন বিমর্ষ হয়ে গেল। কিন্তু নিরুৎসাহে ঝুঁকে পড়ার পাত্রী তিনি নন তাই তিনি গলার স্বরটিকে জোর দিয়ে বললেন, 'আমার ঠাকুমা আপনাদের দেখলে খুব খুশী হবেন। তিনি আপনাদের সঙ্গে গল্প করার সুযোগ পেলে নতুন জীবন ফিরে পাবেন।'

এরপর কোন ইতস্ততঃ মুখোচ্চ, ঝুড়ুকা চলে না। কৌতূহলী মনটা ঠাকুমার দেখার জন্য উতলা হয়ে উঠলো। জুনাসাহেবকে ছাতা খুলে বাস থেকে কাদাজল নেমে পড়লাম। মিনিট দেড়েকই পথ অতিক্রম করে বাড়ীর সদর দরজায় এসে হাজির হলাম। কড়া নাড়তেই এক বুড়ি খুড়খুড়ি দন্তহীন মাড়িতে পান চিবোতে চিবোতে দরজা খুলে খুশীর একটা হাসি ছড়ালেন এগাল থেকে ওগালে। তারপর উচ্চস্বরে টেনে টেনে সকলকে ঘরের ভিতর আহ্বান করলেন।

বুড়ি ঠাকুমার সরল আহ্বান আমাদের একেবারে বিমোহিত করে ফেললো। আমাদের বাসযাত্রিনী ভদ্রমহিলা (যাঁর আহ্বানে আমরা এখানে সমবেত হয়েছি) সেই সবিতাদি সোফাগুলো এদিকে সরিয়ে বড় একটা মাদুর বিছিয়ে দিলেন। তারপর সেই মাদুরের মধ্যমণিকে ঘিরে আমরা আগন্তুকেরা সব বসলাম।

ঠাকুমা শুরু করলেন, সারাদিন একা একা থেকে কেমন হাঁপিয়ে উঠি। নাতনীটা (সবিতাদি) কাজে বেরিয়ে যায়, ফিরে আসে এত পরিশ্রান্ত হয়ে যে আমার বকবকানি ও শুনতে চায় না। আমি বাবা বোবা কথার মানুষ, চুপচাপ থাকতে পারি না। এরপর নাতনীর উদ্দেশে বললেন, মাছি আর গুড় দিয়ে যা সন্দেশ। নাতবৌও একটু যায় করিস।

সবিতাদি মুচকেহসে এতক্ষণ ভিতরের ঘরে গুড় আর মুড়িরই ব্যবস্থা করছিলেন। ডাক শুনে একটা থেকে সব পরিমাণে নিয়ে এলেন, খানিকক্ষণে সে এসব মাদুরে হলেন।

আমাদের দলের উপস্থিত একজন বললেন, 'কি ব্যাপার, আজ কি ঠাকুমার জন্মদিন?'

না ভাই, জন্মেছিলুম কতদিন আগে আজ আর ঠিক ঠাহর করতে পারি না। সে অনেকদিন আগের কথা। আজকে আমি একটু আমার ছেলের গ্রামের জল-পাকুড় খাওয়ার। তোমরা তো চল, বাড়িতেই খাও। ঠাকুমার গাছের গুড় আর নারকেলচাটার স্বাদ মিষ্টি কিনা দেখ তো? এমন একদিন থেকে সেদিন কতলোককে এসব খাইয়ে আনন্দ পেয়েছি, ওরাও খুব তৃপ্তির সঙ্গে খেতো। তখন তো আর এত নানারকম আধুনিক খাবারের রেওয়াজ ছিল না।'

জনে জনে আমাদের নাম জানলেন, বাড়ী-ঘরদোর, ভাই-বোন, বাবা-মা সবেরই খোঁজ নিলেন। উপরন্তু আমাদের কাজকর্মের খুঁটিনাটি জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। গল্প করলেন ছোটবেলাকার, যৌবনের, বার্ধক্যের। আমাদের সামান্য কর্মযোগের জন্য আক্ষেপ করলেন। যদিও তাঁর আক্ষেপের কিছু ছিল না কারণ সবিতাদি সে বিষয়ে কোন ত্রুটি রাখেননি।

বেশ কিছুক্ষণ গল্পগুজব করে সকলেই একসময় বিদায় নিতে উঠে দাঁড়ালাম। সবিতাদি সেদিন আমাদের বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এলেন। প্রায় ফিসফিস করে বললাম, আপনাদের কত সময় নষ্ট করলাম জোর করে আটকে রেখে। আমার ঠাকুমার জমি থেকে কিছু গুড় আর নারকেল এসেছে, এখন সেগুলো বাইরের কাউকে না খাওয়াতে পারলে বুড়ি আমাকে বাড়ীতে ঢুকতে দিত না। আসলে সেবেলের মানুষ তো সরল, সোজা। সবাইকে নিয়ে মিলেমিশে খেতে ভালবাসেন।' বেশ খুশী খুশী মুখেই সবিতাদি কথাগুলো বললেন।

একে একে সকলে গন্তব্যস্থলের দিকে রওনা হল। আমি পরবর্তী বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলাম। ঘটনাটা আমার কাছে কিরকম স্বপ্ন মনে হল। মনে হল এযুগের সবাই যদি ঠাকুমা কিংবা সবিতাদি হোতেন —যদি সকলেরই অন্তরটা এত মহৎ আর সুন্দর হত। অথচ আজকের মানুষ মানুষ কথা বলে মেপে হাসে। জীবনের প্রতিটি ক্ষণই যেন নিজের ওজনে। কিন্তু সবিতাদি। তিনিও তো আধুনিকা।

বিজ্ঞানের যুগে আমরা যুক্তিবাদী হয়েছি ঠিকই কিন্তু মনটা কেন কোথায় হারিয়ে ফেলেছি। অতিথি-অভ্যাগতকে চা-বিস্কুট আপ্যায়ন করি। কিন্তু মুড়ি আর গুড়ের মত সাধারণ জিনিস দিয়ে যে আতিথেয়তা করা যায় সেটা বোধহয় ভুলে গেছি। তবে কি আমাদের পারোপার্শ্বি মেকানিকাল করে দিয়েছে? বোধহয় করেনি। বোধহয় কেন? নিশ্চয়ই।

তবে ঠাকুমা আর সবিতাদিকে হারিয়ে ফেলবো।

অঞ্জলি চৌধুরী

বেনারসী
সিল্ক ও তাঁতবস্ত্রের
বৈচিত্র্য
ব্যানার্জি ব্রাদার্স
কড়েরাজার • কলিকাতা-৭
ফোন: ৩৩-৯০৭৪

CENTRAL LIBRARY

তওয়াং-এর গোম্পা

সুমিত সান্যাল

তওয়াং উত্তর প্রান্ত। একটি পরাক্রান্ত [illegible] সুবর্ণাক্ষি [illegible] ছিল। [illegible] ছলা আক্রান্ত হলে [illegible] ফেলে। [illegible] দারো হাজার ফিট। [illegible] আক্রমণ [illegible]

এই [illegible] মেকন ভাব গাইং এখানে [illegible] পলিটিক্যাল প্রতিনিধি ছিলেন। [illegible] ১৯১১ খ্রী: ১৭ই নভেম্বর তওয়াংকে স্বাভাবিক শাসন কাজের আওতায় নিয়ে আসেন। ঐ সময় তওয়াং কামেংকোর একটি সাব ডিভিশন হিসেবে পরিচিত হত। কালক্রমে তওয়াং প্রশাসনিক দিক থেকে একটি বিশেষ শাসন কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।

তওয়াং থেকে তিব্বতে যাওয়ার মোট তিনটি পথ। এর দুটি পথ ১৪,০০০ ফিট উঁচুতে। অধিক উচ্চতার জন্য এই পথ দুটি জানুয়ারী থেকে মে মাস পর্যন্ত বন্ধ থাকে। তৃতীয় পথটি তওয়াং থেকে চুতাংথু হয়ে যায়। এ পথের উচ্চতা ৫,৫০০ ফিট। সারা বছরই এ পথ খোলা থাকে।

আগেকার দিনে পায়ে হেঁটেই যেতে হোত। রোম-ডলার পর বাহুং থেকে দীরাং জোং। তারপর নীচিমা জোং সেক্কে জোং এবং ১৭,৫০০ ফিট উচ্চতা-সম্পন্ন সেলা পাস অতিক্রম করে যেতে হোত তওয়াং। নদীটির নাম তওয়াং চু। যেন এই পথ বেয়েই চলেছে নাচতে নাচতে। ১১,৫০০ ফিট উচ্চতা পর্যন্ত মানুষের বসতি। তারপরেই সবজের সমারোহ। শেষটায় যেন সব তুষারে ঢাকা। বেশীর ভাগ সময়ই কুয়াশায় ঢাকা। কিন্তু সে কুয়াশা কেটে গেলে—উজ্জ্বল আলো যখন ঠিকরে পড়ে তখন দৃশ্য অতিই মনোরম।

তওয়াং মোনপা অধ্যুষিত অঞ্চল। এখান থেকেই মোনপারা ছড়িয়ে পড়ে দীরাং ও কলেকটং এ। মোনপা সংস্কৃতিও এখান থেকেই বিস্তার লাভ করেছে মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা।

কথিত আছে যে, তওয়াং-এর গোম্পাটি নাকি এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম গোম্পা। অর্থাৎ লামায় গোম্পার পরই নাকি তওয়াং-এর গোম্পার নাম করা যায়। অবশ্য একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বুদ্ধ ধর্মাবলম্বী তওয়াংই সবচেয়ে বড় গোম্পা।

বৌদ্ধ ধর্ম তিব্বত থেকে তওয়াং এ অনুপ্রবেশ করে। অষ্টম শতাব্দীতে তিব্বতে গুরু পদ্মসম্ভব যে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করেছিলেন, তা ছিল ট্যান্ত্রিকভাবে প্রভাবিত। পরবর্তী কালে হীনযান 'রক্ত-চ্ছদন পরিধান এর প্রবর্তক তেসাং রাপা (১৩১৭ - ১৪১১) অনেক কিছুরই সংস্কার করেন। কালক্রমে এই সম্প্রদায় ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠান হন। গেলুগ নামও এই সম্প্রদায়ের। তওয়াং-এর লামারাও এই সম্প্রদায়ভুক্ত। অবশ্য তাঁরা আজকাল আর হীনযান শিরোচ্ছাদন ব্যবহার করেন না।

তওয়াং-এর এই বিখ্যাত গোম্পা প্রতিষ্ঠা করার সম্পর্কে একটি সুন্দর গল্প প্রচলিত আছে।

পূর্বে ভুটান। সেখানে বাস করতেন লোডরা গারাপ্টো নামক একজন লামা। তিনি একদিন স্বপ্ন দেখেছিলেন তাঁকে যেতে হবে তওয়াং এলাকায় একটি গোম্পা প্রতিষ্ঠা করতে। কিন্তু যাবেন কি করে? পথ তো তাঁর জানা নেই। তখন তিনি হাটছিলেন তাঁর শ্বেত অশ্ব।

শ্বেত অশ্ব ছুটতে ছুটতে এসে পৌঁছাল এই পার্বত্য উপত্যকায়। থেমে পড়ল এক জায়গায়। পা দিয়ে খুঁড়তে লাগল মাটি আর পাথর। লোডরা গারাপ্টো চারিদিকে তাকিয়ে দেখলেন। মুগ্ধ হলেন এই সুন্দর উপত্যকাটি দেখে। দূরে দূরান্তে তুষার আবৃত পাহাড়। তার পাশ দিয়ে যেন একটি শ্যামলিমার রেখা। তার পরই এই বসতি। পাদদিয়ে মনে হলেন এলাকাটি একটি গোম্পা প্রতিষ্ঠার পক্ষে আদর্শ।

এর পরে বিলম্ব না করে গ্রামবাসীর সহযোগিতা নিয়ে কাজে লেগে গেলেন ইষ্ট মন্ত্র পাঠ করে, করে চলে এই প্রাসাদোপম গোম্পার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন। এরপর একে একে গেল সাতটি বছর। সম্পূর্ণ হলো এই গোম্পাটি।

তারপর লোডরা গারাপ্টো গেলেন লাসায়। অনুরোধ ও নিমন্ত্রণ করলেন দলাই লামাকে। তিনি নিজে এসে যেন এই নব-নির্মিত গোম্পাকে আশীর্বাদ করেন। তিব্বতে তখন দলাই লামা ক্ষমতার আসনে। তিনি প্রবর্তন করেছিলেন ক্ষর পলিসি-এ। বর্তমান গোম্পা থেকে মাইল দুয়েক দূরে।

তিনি বড় ব্যস্ত মানুষ। ব্যক্তিগতভাবে নিমন্ত্রণ রক্ষা করা সম্ভব হলো না। তবে তিনি আশীর্বাদও পাঠালেন। আর নামকরণ করলেন এই উপত্যকাটির। যেহেতু এই এলাকাটি থাকে যেন স্বপ্নে একটি স্বপ্ন তাই তিনি এর নামকরণ করলেন তওয়াং। তা কথার অর্থ স্বপ্ন; আর চাং-স্করে অর্থ আশীর্বাদ। সেই থেকে এই এলাকার নাম হলো তওয়াং।

আসলে আজ থেকে প্রায় ৩০০ বছর আগে (১৬৮০ খ্রী:) এই গোম্পাটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ষষ্ঠ দলাই লামাকে উৎপীড়িত করে কয়েক বছর পরই এই গোম্পাটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই গোম্পাটি আজ তওয়াং-বাসীর কাছে শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র।

দূর থেকে মনে হয়ে পাহাড়ের টীলার উপর এই গোম্পাটিকে যেন একটি দুর্গের মত। তওয়াং সার্কিট হাউস থেকে তাকালে চোখে পড়বে ঘনবসতি। তার নাম সেরা নদিত। তারই কাছে প্রাসাদোপম অট্টালিকাটিই গোম্পা। আশে-পাশে ছড়িয়ে আছে আরও ঘর-বাড়ী।

গোম্পায় যেতে হলে পাথর বাধানো, প্রার্থনার চাকা, পতাকায় মালা অতিক্রম করে পাঁচ পড়বে একটি সার্কাল-এ, কলিং বেলানোর পর মূল দরজার খুলে এক-জন লামা আমাদের স্বাগত জানালেন।

আমরা তাঁকে কিছু চা-পাতা ও চিনি উপহার স্বরূপ দিলাম। তিনি একটি করে সাদা চাদর দিয়ে আমাদের সম্মানিত করে অভ্যর্থনা জানালেন। চাদরটি অনেকটা স্কার্ফের মত লম্বা। কিন্তু জালি মত। প্রবেশদ্বারের উপর লেখা হয়েছে তিব্বতী ভাষায়। দেবনাগরী হরফে।

দ্বার দিয়ে প্রবেশ করার পর ডান দিকের দেয়ালে লাইন করে প্রার্থনা চাকা। পাশ দিয়ে একটি রেলিং। অন্যদের লোহার রেলিং এবং প্রার্থনা চাকার মধ্যবর্তী পথ দিয়ে প্রার্থনা চাকাগুলো ঘোরাতে ঘোরাতে হবে। প্রার্থনা চাকাতে সেই তিব্বতীয় ভাষায় 'ও' মণি পদ্মে হুম্ লেখা। তারপর এসে পৌঁছলাম প্রশস্ত আঙিনায়। আঙিনাটি সীমেন্ট করা। ডান দিকে ছোট্ট নিচেই গোম্পার প্রবেশ দ্বার।

হলঘরটি বিরাট। চারদিকে উঁচু প্রাচীর ঘিরে রেখা। তার মধ্যে সব কিছুই আছে। প্রায় ছয়শত লামা এখানে থাকেন। কুমারীদের জন্য আর একটি গোম্পা। তার নাম অনি গোম্পা। সেটি একটু দূরে। জিপ যাওয়ার রাস্তা নেই। হেঁটে যেতে সময় লাগবে। কিন্তু আমাদের হাতে সে সময় ছিল না।

প্রবেশ দ্বারের বারান্দার দু-পাশে রেলিং দেওয়া। উপর থেকে পর্দা ঝুঁচি দিয়ে নামিয়ে ঠিক রেলিং-এর বরাবরই ঝোলে দেওয়া হয়েছে। তার উপর একটু নকসাও আছে। ওপর থেকে বেড় দড়ি মত লাল দেওয়া। বারান্দার দু-পাশে দুটি বিরাট হাতীর দাঁত দড়ি পরিয়ে দেওয়া। দোতলারও বারান্দায় রেলিং। তারও উপর সুন্দর কাপড় দিয়ে সুসজ্জিত।

ভিতরে প্রবেশ করে পাওয়া যায় মূল প্রার্থনালয়। বিভিন্ন দেব-দেবতার মূর্তিতে সুসজ্জিত। তাতে রয়েছে অবলোকিতেশ্বর, হয়গ্রীব ও তারা পারমিতার মূর্তি। যা থেকে বোঝা যায় গোম্পার লামারা মহাযান সম্প্রদায়ভুক্ত।

সবচেয়ে দর্শনীয় এবং আকর্ষণীয় ৪২ ফুট উচ্চতা সম্পন্ন ট্রেয়ারোটার বুদ্ধ মূর্তিটি। খুবই সুন্দরভাবে তৈরী করা হয়েছে মূর্তিটি। মুখে প্রসন্ন শান্ত সমাহিত ভাব। যা দেখলেই কেমন যেন আপনা থেকে একটা ভক্তির ভাব এসে যায়। ক্যামেরা হাতে কুমিরুকম এই সুন্দর মূর্তিটি একটু ফোটো যায়। কিন্তু দেখে তার কিছুই বোঝা যায় না।

আমাদের গাইড এবং গোম্পা প্রদর্শনকর্তা একজন লামা একটি ঘরে নিয়ে এসে বসালো। ঘরটি সুন্দর কার্পেটে সুসজ্জিত। অপূর্ব সুন্দর সেই কার্পেটগুলোর ডিজাইন। চারটা জানলায় ঝুঁচি দেওয়া সব পর্দা। ধারে ধারে আলোর সব গোছা ধরে ধরে বাঁধা। মাঝখান দিয়ে আলোর কালর দেওয়া। ঘরের মাঝখানটায় একটি সেন্টার পিস (টেবিল) টেবিল। তার চ, পাশ দিয়ে দুটি সরু ধরনের ডিভান। সুন্দর গালিচায় ঢাকা। মাঝখানের টেবিলের এক পাশে একটি প্রার্থনার বাক্স।

এই ঘরেই নাকি অতিথিদের এনে বসানো হয়। এখানেও একজন লামা আমাদের আবার একটি করে সেই সাদা চাদর উপহার দিলেন। আমরা প্রণামী-স্বরূপ সবাই কিছু কিছু সেই প্রণামী বাক্সে দিলাম। ডিভানের উপরে বসলাম। কিছুক্ষণ পরেই আমাদের সুন্দর সুন্দর চীনা কাপে চা এনে দেওয়া হলো। এই চা নুন আর মাখন দিয়ে তৈরী। মাখন তৈরী হয়েছে ইয়াকের দুধ থেকে। কাজেই স্বাদটা অন্যরকম। প্রীতি বিনিময়ের পর আমাদের আর একটি ঘরে নিয়ে যাওয়া হোল।

ঐ ঘরটিতে নিজে এখানে আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। ঘরটি অপেক্ষাকৃত ছোট। কিন্তু আরও সুন্দরভাবে সাজান। চারদিকে ঝুঁচি দেওয়া পর্দা, কালর, চাঁদোয়া। অপূর্ব সব গালিচা। একদিকে দেয়াল ঘেঁষে প্রশস্ত সুসজ্জিত ডিভান। আর একদিকে কয়েকটি আধুনিক চেয়ার। তার উপরেও গালিচা। একদিকে দুটি খোলা জানলা। তা দিয়ে প্রচুর আলো বাতাস যেন ঘরটিকে যথেষ্টই সুন্দর করে তুলেছে। এখানেও রিমপোচে আবার সাদা চাদর দিয়ে অভ্যর্থনা জানালেন। এই চাদরগুলো সিল্কের।

গোম্পার প্রধান লামাকে বলা হয় রিমপোচে। অনেকে আবার খেম্পুও বলেন। ভদ্রলোক মধ্যবয়স্ক। গোম্পার উপর তলায় থাকেন। তাঁর ধর্মীয় শিক্ষা লাসায় হয়েছিল। তাঁকে গোনপা লামাদের প্রথম শ্রেণীর অবতার হিসেবে গণ্য করা হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে ভদ্রলোক আমাদের গাইড ছিলেন তিনিও এগার বছর লাসায় ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন তাঁর শৈশব থেকে। পরে অবশ্য পার্থিব জগতে ফিরে আসেন। ভাল হিন্দীও বলতে পারেন। সেজন্য তিনি আমাদের দোভাষীও বটে।

কয়েকজন খুব অল্প বয়স্ক লামাকেও দেখতে পেলাম। সুন্দর স্বাস্থ্য। গাল দুটি গোলাপের মত লাল। মুখে লেগে রয়েছে এক মিলিক মিষ্টি হাসি। বয়স্ক লামারাও সানন্দে হেসে কথোপকথনের অভ্যর্থনা করলেন। পরিধেয়র রং কমলা। শীতের জন্য পোশাকগুলো খুব ভারী মনে হয়। সবাই গরম পরিধেয়। কয়া বয়সী লামারা ধর্মীয় পুস্তক অধ্যয়ন করেন। প্রার্থনা সেটাই তাঁদের ধর্মীয় শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ। তা-ছাড়া তাঁরা ক্ষেতেও কাজ করেন। নিজেদের খাদ্যশস্য নিজেরাই উৎপন্ন করেন। খাদ্যশস্য উৎপন্ন করাও তাদের শিক্ষার মধ্যে একটি প্রধান অঙ্গ বিশেষ।

গোম্পার দেয়ালে কোথাও কোথাও কয়েকটি রঙীন চিত্রও আছে। রংয়ের ব্যবহার বেশ বলিষ্ঠ। লাল, নীল, কালো, সবুজ রংয়ের ব্যবহার বেশ জোরালো। এ দেখে বোঝা যায় যে, মোনপারা রং ব্যবহারে বেশ পারদর্শীও বটে। অহোরাত্র এবং পদ্ম-সম্ভবেরও চিত্র আছে। কতকগুলো চিত্র শুধু বৌদ্ধ ধর্মীয় ডিজাইনের মত। কয়েকটি চিত্র প্রাণন এবং ভ্রাণনের মত চিত্রও আছে। বিভিন্ন চিত্রের বৌদ্ধ ধার্মিক ব্যাখ্যা পারদর্শীরাই করতে পারবেন।

তাওয়াং-এর গোম্পার একটি বেশ বড় পাঠাগার আছে। পাঠাগারে মোট ৭০০শ মত বই আছে। বইগুলির জন্য কাঠের বড় লাসায় নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু বই সংস্কৃত ভাষায় লেখা। তার ব্যাখ্যা তিব্বতীয় ভাষায় লেখা কয়েকটি বই-এ। কিন্তু মূল্যবান গ্রন্থ হলো কাঙ্গোম্পা। তার তিনটি খন্ড সোনালী রঙের লেখা। এক সময়ে এখানে ছাপাখানাও ছিল।

একটি ঘরে নানারকম মুখোশ আছে। বড় বড় কাঠের বাক্সে ভর্তি নানারকম পোশাকও আছে। এই পোশাক বিভিন্ন প্রকার নাচের সময় ব্যবহার করা হয়। নাচ অনেকটা ডিস্নেটারের মত। কিন্তু তার সঙ্গে ধর্মের যোগাযোগ আছে। তওয়াং-এ যখন বিদেশ অতিথি আসেন তখন ইয়াকছাম্ বা ইয়াক নৃত্য এবং সিংহ ও মন্ত্রীর নৃত্যই দেখান হয়।

তওয়াং-এর গোম্পা মোনপাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র হলেও বহুল পরিমাণে তিব্বতীয় সংস্কৃতির প্রভাব সুস্পষ্ট। সপ্তম শতাব্দীতে তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্ম প্রাধান্য লাভ করে। সেই বৌদ্ধধর্ম ভারত থেকেই একদা তিব্বতে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাই তওয়াং-এ তিব্বত থেকেই বৌদ্ধধর্ম বিস্তার লাভ করল না ভারত থেকেই করল তা গবেষণা সাপেক্ষ। মনে হয় হয়ত তিব্বত থেকেই তওয়াং-এ বৌদ্ধধর্ম এসেছে। কারণ বর্ষা বলাই ভাল উষ্ণগোলা থেকে নির্বাচিত হওয়ার কয়েক বৎসর পর তওয়াং-এর গোম্পাটি তৈরী হয়। সম্ভবতঃ বর্ষা বলাই লামার জন্মভূমির প্রতি টান থেকেই, তাঁর প্রচেষ্টা ও আনুকূল্যে গোম্পাটি গড়ে ওঠে। সেইজন্যই মোনপা এবং তওয়াং-এর গোম্পার তিব্বতীয় সংস্কৃতির ছাপ বেশী।

প্রেক্ষাগৃহ

চিত্র-সমালোচনা

স্নেহের বন্ধন

সুন্দরী তরুণী সীমা সেনকে সুনন্দা রায়ের উনিশ বছর আগে হারিয়ে যাওয়া টুলু হিসেবে হাজির করলেন তারই পরলোকগত স্বামীর উকীল বন্ধু ব্রজনাথ রায়চৌধুরী। ব্যবস্থা ছিল, সীমা শ্রীমতী রায়ের বিষয়সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হওয়া মাত্র ঐ বিষয়ের অর্ধেক পাবেন ব্রজনাথ এবং বাকী অর্ধেক পাবেন সীমার গরীব কাকা যতীনবাবু। রায়-বাড়ীতে এসে সীমা প্রথমটা ওদের প্ল্যান মতোই কাজ করতে চেয়েছিল। কিন্তু সে সংকল্প-চ্যুত হতে বাধ্য হল বিধবা সুনন্দার প্রাণঢালা স্নেহে অবগাহন করে। আগে অর্থোপার্জনের জন্যে সৌখীন সম্প্রদায়ে অভিনয় করা তার অভ্যাস ছিল; তাই সে রায়বাড়ীতে পদার্পণ করবার আগে ভেবেছিল উনিশ বছর আগে হারিয়ে যাওয়া টুলুর ভূমিকায় নিখুঁত অভিনয় করে সে নিজের এবং সেই সঙ্গে তার উপোসী কাকা ও তাঁর উপকারী বন্ধু ব্রজবাবুর স্বার্থসিদ্ধির পথ প্রশস্ত করবে। কিন্তু অভিনেত্রী সীমা কেমন করে যেন রায়বাড়ীর মেয়ে টুলুতে পরিণত হয়ে গেল অল্পদিনের মধ্যেই। এবং তারই ফলে উকীল ব্রজনাথের সমস্ত প্ল্যান ছত্রে গেল বানচাল। যখন সীমার মুখ থেকেই প্রকাশ পেল, সে হারিয়ে-যাওয়া টুলু নয়, তখন মর্মাহত সুনন্দা তাকে তার সামনে থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু যখন তিনি তাঁর নিজের চাইপো উদ্দালকের মুখ থেকে সীমার অকৃত্রিম ভালোবাসার কথা শুনলেন, তখন তিনি হলেন অনুতপ্ত এবং এর পরে যখন নাটকীয় মুহূর্তে তিনি সীমাকে আবার কাছে পেলেন, তখন তিনি তাকে স্নেহের বন্ধনে বেঁধে ফেলে সবারকের জন্যে তাকে কাছে রাখবার ব্যবস্থা করতে ত্রুটি করলেন না।

চিত্রমুখ-এর নিবেদন, প্রকাশচন্দ্র রায় প্রযোজিত এবং অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'নায়িকার ভূমিকায়' ছবির এই হৃদ্য কাহিনীসার। ছবির যে অংশে রাত্রির অন্ধকারে সুনন্দা দেবীর নগদ অর্থ এবং অলঙ্কার চুরি করেও বিবেকের দংশনে সীমা শেষ অবধি চুরি করতে পারল না এবং উদ্দালকের কাছে সে যে জালটুলু, এ-কথা স্বীকার করে নিজের মুখে সমস্ত সত্য কথা সুনন্দা দেবীর কাছে প্রকাশ করতে চাইল, সেইখান থেকে যে জটিল-কৌতূহল জাগরিত হয়, সেই কৌতূহল বিভিন্ন পরিচ্ছেদের মাধ্যমে ছবির শেষ পর্যন্ত বজায় থাকে এবং এইখানেই চিত্রনাট্যকারের পরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব। অবশ্যই ছবির কয়েকটি মাত্র একটি কল্পনা-বিলাসী ভিন্ন স্তরে তিনি আনতে সমর্থ হয়েছেন

উদ্বাস্তুক ও সীমার একান্ত দৃশ্যগুলিতে। প্রথমে যেখানে উদ্বাস্তুক জানে সীমা তারই পিসতুতো ছোট বোন টুলু, অথচ সীমা মনে মনে জানে সে তা নয়, সেখানেও যেমন, আবার যেখান থেকে উদ্বাস্তুকের ভুল ভেঙে যায় এবং সীমাকে সে নতুন সম্পর্কে পেতে চায়, সেখানেও ঠিক তেমনই উপভোগ্য। বাৎসল্য ও প্রেমের টানা-পোড়েনের মাঝে চক্রীর চক্রান্ত বিভিন্ন রস পরিবেশনের মাধ্যমে ছবিটিকে যে বৈচিত্র্য দিয়েছে, কাহিনীর সকল দোষত্রুটি তাতে সম্পূর্ণভাবে ঢাকা পড়েছে। শুধু ছবির চারখানি গানের মধ্যে অনুপ ঘোষালের গাওয়া উদ্বাস্তুক-দেশী শুভেন্দুর মুখের 'এক যে আছে কন্যাটি ছাড়া বাকী তিনখানিকেই অবান্তর এবং অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হয়েছে।

সীমার ভূমিকাভিনেত্রী অপর্ণা সেনের অভিনয় ছবিটির অন্যতম আকর্ষণ। গৌফ-দাড়ি পরিহিত থিয়েটারী মেক-আপ-করা নির্বাক চেহারা থেকে শুরু করে একেবারে শেষের দৃশ্যে সুনন্দা দেবীর বক্ষলগ্ন, আনন্দাশ্রুনয়না সীমা পর্যন্ত সর্বত্র তিনি দর্শককে সম্মোহিত রেখেছেন তাঁর চূড়ান্ত নাটনৈপুণ্যগুণে। উদ্বাস্তুকবেশী শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের সহজ সাবলীল অভিনয় ছবিটির আর একটি বিশিষ্ট সম্পদ। লক্ষ্য করবার বিষয়, শ্রীচট্টোপাধ্যায় প্রথমেই তাঁর ভূমিকাগুলির সঙ্গে একাত্ম ও স্বাভাবিক হয়ে উঠছেন। প্রথম দিকের দু' একটি দৃশ্যে বাঙ্গে বিধবা সুনন্দা রায় বেশে দীপ্তি রায় অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই ভূমিকাটিতে একটি যান্ত্রিক আরোপের সঙ্গে তার মুখচুক্ত মাতৃহৃদয়কে উদ্ঘাটিত করেছেন। অসিতবরণকে এই ছবিটিতে একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের চরিত্রে আত্মপ্রকাশ করতে দেখা গেল। 'মৃত বন্ধুর বিধবার' কাজ-কারবার দেখাশোনা করবার ভাঁড়ামোয় তাঁর সম্পত্তিগ্রাসেচ্ছু এক কুচক্রীর ভূমিকায় তাঁর বিশেষ কায়দাদুরস্ত অভিনয়শৈলী (স্টাইলাইজড অ্যাকটিং) লক্ষ্য করবার মতো। সীমার হাতের কাছ থেকে চাবি ছিনিয়ে নেবার দৃশ্যে প্রতিটি পদক্ষেপে প্রায় একই ধরনের অভিনয় করতে হয়েছে বলে তাঁকে কিছুটা একঘেয়ে মনে হয়েছে। অপরাপর ভূমিকায় জহর রায়, তপতী দেবী, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি উল্লেখ্য অভিনয় করেছেন।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ক্যামেরার কাজ সর্বত্র সমান দেখলুম না। এর জন্যে ল্যাবোরেটারীর ত্রুটি কতখানি বা আদৌ আছে কিনা, তা অবশ্য মাত্র একবার ছবি দেখে বলা যায় না। ছবির গোড়ার অংশটিকে সম্পাদক আর একটু সংবদ্ধ ও সুস্থ করতে পারতেন। গানের কথা আগেই বলা হয়েছে।

অপর্ণা সেন ও শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় অভিনয়দীপ্ত 'নায়িকার ভূমিকায়' চিত্ত-রসিক দর্শকসাধারণকে খুশী করবে।

প্রাচুর্যের অভিশাপ

ভালোই ছিলেন হিমাংশু গুপ্ত তাঁর দৌলতপুরের বাসায়। স্কুল-মাস্টারির জীবনে অর্থ ছিল না বটে, কিন্তু স্ত্রী মলিনা এবং দুটি ছোট ছোট ছেলে ও মেয়ে নিয়ে তাঁর ছিল একটি শান্ত সুখী জীবন। কিন্তু আজ ডিক্সন কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজাররূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে তিনি কলকাতা শহরে প্রকাণ্ড বাড়ীতে প্রাচুর্যের মধ্যে বাস করেন বটে, কিন্তু আফিসের কাজ তাঁকে সংসারের দিকে মুখ ফেরাতে দেয় না। ছেলেমেয়ে দুটি বড়ো হয়ে উঠছে; ছেলে হীরু ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করে বাপের আফিসেই কাজ করছে। কিন্তু আফিসের সর্বেসর্বা তার বাবা, এই জ্ঞান তাকে কতটা অবহেলা করতে প্ররোচিত করল। তার বিলাসব্যসনের খরচ মাস মাহিনা দ্বারা সঙ্কুলান হয় না বলে সে কন্ট্রাকটরের কাছ থেকে মোটা ঘুষ নিয়ে তার চুরিকে প্রশ্রয় দেয়। চীফ ইঞ্জিনীয়ার মিঃ বোস ব্যাপারটা হিমাংশু গুপ্তের—উনি এখন মিঃ গুপ্ত—গোচরে আনলে সত্যাশ্রয়ী, নিষ্ঠাবান হিমাংশু ছেলের বিরুদ্ধে চার্জশীট দিয়ে তার শাস্তির ব্যবস্থা করেন। ডিরেকটর্স বোর্ডের অনুকম্পায় হীরু চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে শাস্তির হাত থেকে রেহাই পেল। মিঃ গুপ্ত কিন্তু ছেলের এই রেহাই পাওয়ায় খুশী হলেন না। স্ত্রী মলিনা গৃহস্থালির তত্ত্বাবধান করাকে উপেক্ষা করে তাঁর প্রিয় পাত্র শোভনের 'শুভানন্দ নিলয়' ক্লাব নিয়ে মেতে উঠেছেন। এতেই স্বামীর সঙ্গে তাঁর মানসিক যোগাযোগ ছিন্ন হয়েছিল; তার ওপর ছেলের ব্যাপার নিয়ে তাঁদের দুজনের মধ্যে মতান্তর দেখা দিল। মেয়ে সীমা তার নিজের পছন্দ মতো ছেলেকে বিবাহ করতে চেয়ে এই মতান্তরকে আরও ঘনিয়ে তুলল। বাপ সীমার পছন্দ-করা ছেলেকে পছন্দ করলেন, মা তাকে মোটেই যোগ্য নয় বিবেচনা করে তাঁর প্রিয়পাত্র শোভনের সঙ্গে মেয়ের মিলন ঘটাতে চাইলেন। [illegible] রেজেস্ট্রীকৃত বিবাহ করে পিতৃগৃহ ত্যাগ করে চলে গেল। ছেলেও গেল সুদূরে একটা চাকরি যোগাড় করে। স্বামীস্ত্রীর মধ্যে আরও বেশী তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছে স্বামীর বান্ধবগত স্টেনো কণিকাকে মলিনার কদর্য সন্দেহের বশে। কপালেই অক্লান্ত সেবায় মিঃ গুপ্তের অসুস্থ দেহটা সেরে উঠেছিল। তিনি ওর নিঃস্বার্থ ভালোবাসাকে ওঁর শুষ্ক মরুভূমির মতো জীবনের একমাত্র অবলম্বন জ্ঞান করছেন। কিন্তু মিথ্যা অপবাদের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে কণিকা যখন তার প্রতি প্রীতিবদ্ধ এক যুবককে বিবাহ করল তখন মিঃ গুপ্ত নিজেকে অত্যন্ত অসহায় ও একা বোধ করলেন। তাই তিনি সব ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন কোথাও একটু শান্তি, একটু ছায়ায় ঘেরা শ্রান্তিবিনোদনের [illegible] খোঁজবার জন্যে।

রমেশ সাইগাল প্রোডাকসন্স-এর নিবেদন 'ছায়াতীর' ছবির কাহিনীর এই হচ্ছে সংক্ষিপ্তসার। জরাসন্ধ রচিত মূল-কাহিনীটিকে চিত্রনাট্যকার, পরিচালক সুশীল বিশ্বাস কতখানি বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করেছেন এবং কতটুকুই বা তা থেকে সরে এসেছেন, সে আলোচনা না করেই বলব, চিত্রনাট্যটি অত্যন্ত বিশৃঙ্খল-ভাবে লিখিত বলে কাহিনীটি কোথাও দানা বেঁধে উঠতে পায়নি। অপটু হাতের ছাপ ছবির সর্বত্র। কাজেই ছবির কোনো ঘটনা উপলক্ষেই দর্শকের মনে কিছুমাত্র কৌতূহল উদ্রেক করা যায়নি, সেই কৌতূহল বজায় রাখা ত দূরের কথা।

নাটনৈপুণ্য দেখাবার সুযোগ কোথায় এই ছবিতে? নাটকীয় পরিবেশ কৈ? তবু, মিঃ হিমাংশু গুপ্তের স্টেনোর ভূমিকায় মাধবী চক্রবর্তী তাঁর স্বাক্ষর রাখবার চেষ্টা করেছেন এবং নিজের চেষ্টায় দু' একটি নাটকীয় মুহূর্তও সৃষ্টি করতে পেরেছেন। মিঃ হিমাংশু গুপ্ত বেশে বিকাশ রায় চরিত্রটির মানসিক যন্ত্রণা প্রকাশের যথোচিত চেষ্টা করেছেন। এ-ছাড়া বিভিন্ন চরিত্রে অজয় গাঙ্গুলী (ধুর্জটি), রবি ঘোষ (শোভন), সুশীল মজুমদার (ডাক্তার), জহর রায় (নিশি), শিশির বটব্যাল (বড়বাবু হারাধন), গীতালি দত্ত (সীমা) প্রভৃতির অভিনয় উল্লেখ্য। কিন্তু মলিনার ভূমিকাটির সঙ্গে বিনতা রায় নিজেকে ঠিক খাপ খাওয়াতে পারেননি।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ সর্বত্র সমান নয়—কোথাও ভালো, কোথাও মন্দ এবং কোথাও চলনসই। সম্ভবত ছবিটি বহুদিন ধরে নির্মিত হয়েছে বলেই এই অসম অবস্থা। মান্না দের গাওয়া, চিন্ময় রায়ের সুরে 'শহরের মানুষগুলোর মুখে আছে' গানটি ছবির

অগণিত দর্শক ॥ অনাবিল হাসি !
শৌভনিক প্রযোজিত সমরেশ বসুর
ছুটির ফাঁকে
প্রতি শনি/রবি ॥ মুক্তাঙ্গন
সন্ধ্যা ৬-৩০ ॥ ৪৬-৫২৭৭

রঙ্গনা বিশ্বরূপার রাস্তার সার্কুলার রোডের মোড়ে (৫৫-৬৮৪৬)
নান্দীকার
২৯শে জুলাই শনিবার ৬॥টায়
শের আফগান
৩০শে জুলাই রবিবার ৩টে ও ৬॥টায়
তিন পয়সার পালা
৩রা আগস্ট বৃহস্পতিবার ৬॥টায়
প্রত্যহ স্বাভাবিক অভিনয়
নির্দেশনা : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

পক্ষে নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় হলেও ছবিকার উপাদানগুলোর সংযোগ ঘটিয়েছে।

একটি জাতির জন্ম কেমন করে সম্ভব হল?

তথাচিত্রের প্রযোজক এস সুকদেব তাঁর 'নাইন মন্থস্ টু ফ্রীডম' ছবিটির কানাকাটা ফিল্ম সোসাইটি আয়োজিত একটি বিশেষ প্রদর্শনীর পরে নানা কথার মধ্যে বলে উঠলেন, আমার কাছে যা সবচেয়ে বিস্ময়কর লাগে সে হচ্ছে কত অল্প সময়ের মধ্যে একটি জাতির জন্ম সম্ভব হল। সত্যিই, আমাদের একান্ত প্রাথমিক নজরদারি মাত্র কয়েক লক্ষ টাকা খরচে কত অল্প সময়ের মধ্যেই না স্বাধীনতা অর্জন করতে সমর্থ হয়েছি। প্রায় দু হাজার ফুট দীর্ঘ ছবিটির মাধ্যমে শ্রীসুকদেব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত পূর্ব পাকিস্তান কেমন করে স্বাধীন বাঙলাদেশে পরিণত হল, তারই একটি সুন্দর ইতিহাস বিবৃত করেছেন। অবশ্য প্রথমে তিনি শুরু করেছিলেন টীকানী নামে একটিমাত্র এক মিনিটি দৈর্ঘ্যের ছবি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে হল এই যে লাখে লাখে লোক তাঁর জন্মভূমির মায়া ত্যাগ করে অনিশ্চয়তের মধ্যে চলে আসতে বাধ্য হচ্ছে পাকিস্তানী সৈন্যদের নৃশংস বর্বরতার হাত থেকে বাঁচবার জন্যে, তাদের অবস্থাটিকেও ছবির মধ্যে ধরে রাখা প্রয়োজন। ফলেই তিনি নিজেকে এই জাতির জন্মযাতনার সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে ফেললেন এবং শেষ পর্যন্ত নির্মিত হল 'নাইন মন্থস্ টু ফ্রীডম'। ছবির প্রতিটি শট, তার আশ্চর্য সম্পাদনা, তাদের রঙের বৈচিত্র্য এবং তার নেপথ্য ভাষণ—সব মিলিয়ে এমন একখানি তথাচিত্রের জন্ম সম্ভব হয়েছে, যার জন্যে পৃথিবীর যে কোনোও দেশ গর্ববোধ করতে পারে। [illegible] করে ছবির গতির চমৎকার সৃষ্টি এবং তার বক্তব্য অনুযায়ী রঙের পরিবর্তন এমনইভাবে দর্শককে দৃশ্যমান বস্তু সম্পর্কে অবহিত করে তোলে, যার তুলনা কোনোও তথাচিত্রে মেলে না। শ্রীসুকদেব দীর্ঘজীবী হোন।

—নান্দীকর

স্টুডিও থেকে

টালীগঞ্জ স্টুডিও মহলে সবাই যখন নির্মীয়মান আবদুল্লা মঞ্জিনা ছবির একটি সেটের প্রশংসায় পঞ্চমুখ—আমি তখন ভেবেই পাচ্ছিলাম না, কি এমন সেট তৈরী হয়েছে যার জন্য চারিদিকে এত হৈ-হৈ, রৈ-রৈ কাণ্ড! বাধ্য হয়ে সপ্তাহখানেক আগে ইন্দপুরী স্টুডিয়োর পর পর দুটো [illegible] পেরিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। সামনে প্রকাণ্ড আকাশচুম্বী পর্বত। ভাবলাম হয়তো ভুল করেছি। ইন্দপুরী স্টুডিওর বদলে অন্য কোন বাড়ীতে ঢুকে পড়েছি। কিন্তু এত সাত-সকালে বেলা ৯টা। আমার মাথা খারাপ হয়নি তো! এমতাবস্থায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যখন দাঁড়িয়ে—সে সময় আমার কাঁধে কার টুনি দিয়ে পেছন থেকে কে যেন বলে উঠলো এই যে দাদা, বাইরে দাঁড়িয়ে কেন? পেছন ফিরে দেখলাম বিশ্বনিন্দক সুখ চ্যাটার্জি এবং তার পেছনে ছায়া দেবী মিটমিট হাসছেন। বিশ্বনিন্দক সুখ চ্যাটার্জি জানালেন—এটি হচ্ছে ইন্দপুরী পরিচালক আবদুল্লা মঞ্জিনা ছবির সেট এবং তারই নির্দেশনায় তৈরী হয়েছে। তাকে অনুসরণ করে ভেতরে ঢুকতে দেখে লক্ষ করলাম—বাঁদিকের একটি সম্পূর্ণ ফ্লোর এবং বাইরের খালি জায়গাটা জুড়ে সেট পড়েছে। ছোট বড় পাহাড়, ঝর্না অথবা বিরাট বিরাট গাছ দিয়ে সুন্দর একটি পার্বত্যভূমি রচনা করা হয়েছে। তারই মধ্যে কলকল জল পাহাড়ের গা বেয়ে বয়ে চলেছে।

সুখ চ্যাটার্জি আমাদের ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সেটটি দেখালেন। দেখতে দেখতে চিচিং ফাঁক—চিচিং বন্ধ-এর প্রপুর হোলো। আমরা স্তম্ভিত না হয়ে পারলাম না। সেটের ভেতরে টাকা-পয়সা, মোহর, হীরা-জহরত-এর ছড়াছড়ি। উজবক জমলোকে চোখ ধাঁধিয়ে যাবার উপক্রম। আমি চট্ করে চ্যাটার্জিকে জড়িয়ে ধরে অভিনন্দন জানালাম তাঁর এই অপূর্ব সৃষ্টির জন্য।

জানতে পারলাম এখানে একটানা পঁচিশ সাতিং চলবে। ছবির বিশেষ-ভাবলোকে কে কে অভিনয় করছেন তা নিশ্চয়ই আপনাদের জানা আছে। তবুও আপনাদের সুবিধার্থে আবার এ লেখায় শিল্পী এ ছবির অবদান ও ভূমিকা সংক্ষেপে উল্লেখ করছি। অভিনয় করছেন—বনি সেন, ও মিঠু, নাসির খান। ছবিতে সংগীতের ভূমিকায় অভিনয় করছেন উৎপল দত্ত, প্রবীর মিত্র ও ছোট্ট ছেলে হোসেনের চরিত্রে অভিনয় করেছে সুপ্রিয় দত্ত ও দেবব্রত বসু। এছাড়া অভিনয়-জগতের চাটার্জি কাকুল গুপ্ত, গীতা দে প্রমুখ। ছবির সংগীতপরিচালনার দায়িত্বে আছেন—সলিল চৌধুরী এবং নেপথ্যে কণ্ঠ পরিবেশন করেছেন মান্না দে সাবিত্রী চৌধুরী ও অনুপ ঘোষাল প্রভৃতি শিল্পী।

শুভমুক্তি ২৭শে জুলাই !

একটি মেয়ের বেদনাভরা কাহিনী

সত্যিই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারমিশন নিবেদিত

নতুন ফুলের গন্ধ

প্রে: কবরী চৌধুরী • কবির সরকার • আজেয়ারা
পরিচালনা: সেকেন্দার আলী • সঙ্গীত: আলী হোসেন
বাস্তবায়ন: প্রান্তিক ডিস্ট্রিবিউটার্স

২৭শে জুলাই বৃহস্পতিবার ২৮শে জুলাই শুক্রবার থেকে

রোটেরা

উত্তরা : আলেয়া

ইলোরা - নীলা - পার্বতী - রূপায়ণী - রূপমহল - আকাশ - মধুমতী - উত্তরণ - রূপালী - প্রগতি - রূপবাণী ও অন্যত্র

প্রান্তিক ডিস্ট্রিবিউটার্স : ৮৭/১, গ্রান্ড সরণী, কলিঃ-১৩ [ফোন : ২৪২১-২৪]

সঙ্গতে দিয়েও নাকি একখানা গান রেকর্ড করা হবে বলে জানা গেল।

পরিচালক অভয় করের কাহিনীর চিত্রগ্রহণ দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। এ ছবিতে বাসবী নন্দীকে নেওয়া হয়েছে নবাগতা উমিলা দেব পরিবর্তে। কারণ প্রকাশ নবাগতা হোকে নিয়ে তিনদিন সুটিং করার পর কোন ব্যক্তিগত কারণে তাকে ছবি থেকে বাদ দিয়ে বাসবী নন্দীকে নেওয়া হয়েছে।

আপনারা আগেই জেনেছেন এ ছবির নায়ক-নায়িকা চরিত্রে অভিনয় করছেন বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় জুটি উত্তমকুমার ও অপর্ণা সেন। অন্যান্য চরিত্রে—বিকাশ রায়, তরুণকুমার, পাহাড়ী সান্যাল, চন্দ্রাবতী দেবী প্রমুখ। ছবির প্রযোজনা ও পরিচালনার দায়িত্ব বহন করছেন মুক্তির আগের। 'কহকেশী' আগে আলা ছোকরাকে নিয়ে করেকটি গান রেকর্ড করা হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে প্রযোজক জানিয়েছেন পরিচালক অভয় কর তাঁর পরবর্তী ছবির জন্য রমাপদ চৌধুরীর কাহিনীর ভিত্তিতে স্ক্রীন ডিরেক্টরের কাজে হাত দিয়েছেন।

প্রযোজক পরিচালক তপন সিংহের পরবর্তী বাঙলা ছবি 'চিত্ররূপ' মহিতে রচিত 'ভাঙার খেলাঘরে'-এর শিল্পী নির্বাচন মোটামুটি ঠিক করেছেন। এ পর্যন্ত যাদের নাম পাওয়া গেছে তাঁরা হলেন—সুভেন্দু চাটার্জি, সৌমিত্র মুখার্জি, হাসু বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রাবতী, বিকাশ রায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। এ ছবির চিত্রগ্রহণ আগামী মাস থেকে শুরু হবে।

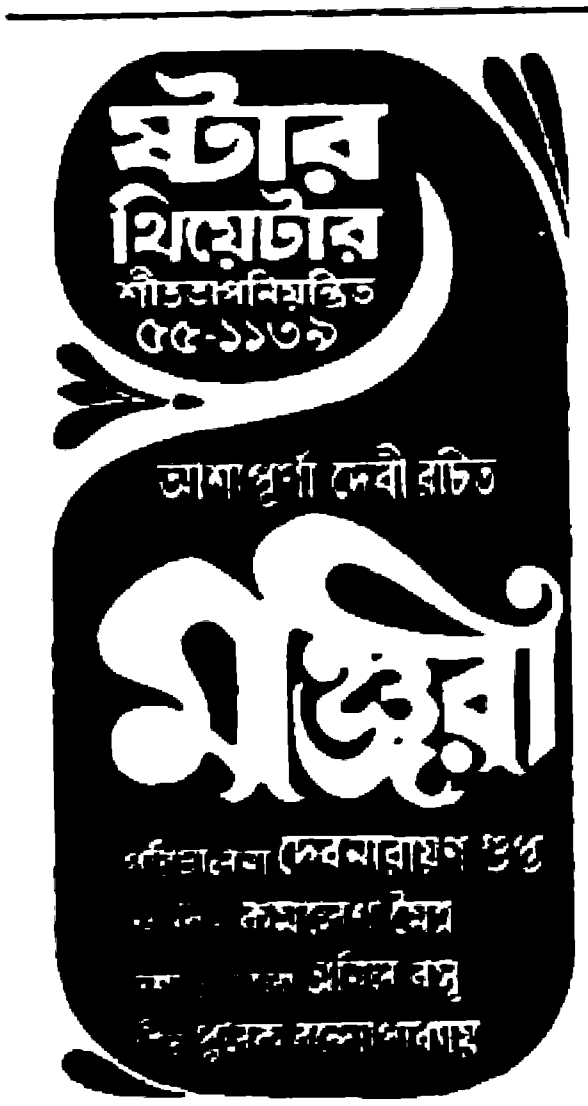

প্রতি বৃহস্পতিবার ও শনিবার ৬।৩০টায়
প্রতি রবি ও ছুটির দিন ৩ ও ৬।৩০টায়

ইন্দ্রপুরী স্টুডিওর পরিচালক শ্রীতপন সিংহ তাঁর নতুন ছবির কাজ শুরু করবেন। এই বহুচর্চিত ছবির নায়ক-নায়িকা চরিত্রে দিলীপ-সুচিত্রার আসবার কথা, এছাড়া অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করবেন অনেক নতুন ও পুরনো শিল্পী। চিত্রনাট্য রচনা করেছেন শ্রীতপন সিংহ নিজে। চিত্রগ্রহণ করবেন বিভূতি লাহা। এক সাক্ষাৎকারে প্রযোজক জানিয়েছেন—তাঁর পরবর্তী ছবি হোলো বহুবাদে তিনি সম্পাদনার কাজে ব্যস্ত আছেন। সৌরেন সরকার রচিত ও সুপারিশিত এ ছবির বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করছেন উত্তমকুমার, অপর্ণা সেন সুচিত্রা চ্যাটার্জি, নিমলকুমার, তরুণকুমার, কালিকা মজুমদার, সুলতা চৌধুরী, ছায়াদেবী, বানার্জি, অপর্ণা দেবী, রবীন মজুমদার প্রমুখ। ভাগ্যবিধাতা এক রহস্যজনক চরিত্র। সব প্রতিশ্রুতির মোহজাল থেকে কবিরাজ পাওয়ার এক বাস্তবসম্মত কাহিনী। এ ছবির চিত্রনাট্যের বিস্তার ছবিতে পাঁচখানা গান আছে, গেয়েছেন—লতা মঙ্গেশকর, হেমন্ত মুখার্জি, বিশ্বজিৎ মুখার্জি, মান্না চক্রবর্তী, মীনা মুখার্জি এবং একটি ইংরেজী গান গেয়েছেন—কবরী সান্যাল। সব গানগুলোই আমি শুনেছি। অপূর্ব সুরারোপ করেছেন—রবীন চট্টোপাধ্যায়। প্রতিটি গানেই বৈচিত্র্যের স্পর্শ আপনারা পাবেন একথা আমি হলফ করে বলতে পারি।

পরিচালক পাঁচুর বয়স এখনো বছর পঁচিশ ছুঁয়ো ছুঁয়ো। তাঁর হাতে এখন ছয়খানা ছবি। প্রথমে তিনি যে ছবিটি শুরু করছেন, তার নাম—বিকেলে ভোরের ফুল। সুবোধ বসু রচিত কাহিনীর চিত্রনাট্য রচনা করেছেন—পরিচালক শ্রীসরু স্বয়ং। প্রধান দুটি চরিত্রে অভিনয় করবেন—উত্তমকুমার ও সৌমিত্র মুখার্জি। কে এল কাপুর প্রোডাকসন্স নিবেদিত এই ছবির চিত্রগ্রহণ এই মাসের শেষভাগ থেকে শুরু হবে।

শ্রীসরুর দ্বিতীয় ছবিটির প্রযোজক অসীম সরকার। শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'র পুনরায় চিত্ররূপ দেওয়া হচ্ছে। 'পথের দাবী'র নতুন নামকরণ করা হয়েছে সব্যসাচী নামে। নায়কের ভূমিকায় উত্তমকুমার থাকবেন বলে স্থির হয়েছে। নিজস্ব চিত্রনাট্যের ভিত্তিতে ছবিটি পরিচালনা করবেন—পরিচালক শ্রীপাঁচকড়ি বসু।

শ্রীসরুর তৃতীয় ছবি অভিনেত্রী সংঘের প্রযোজনায় গৃহীত হবে। ছবির নাম—যার যেথা ঘর। সব্যসাচীর পর এই ছবির কাজে শ্রীসরু হাত দেবেন বলে স্থির করেছেন।

এছাড়া যে ছবিগুলি পরিচালক শ্রীসরুর হাতে আছে তার মধ্যে প্রযোজক হেমেন ঘোষের পরবর্তী ছবি (নাম জানা যায়নি) মুভীমায়া পরিবেশিত একটি ছবি এবং অভিনেতা দিলীপ রায় প্রযোজিত একটি ছবির নাম জানা যায়।

জেটোতে নতুন ফুলের গন্ধ : ভারতের গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ হাইকমিশন নিবেদিত এডেসা ফিল্মস-এর সর্বশেষ পুষ্পনিবেদন ভোলা ছবি নতুন ফুলের গন্ধ প্রযোজক ডি'স্পাইবউডসের পরিবেশনায় সংগীতসহ অন্যান্য চিত্রাংশে ২৭শে জুলাই মুক্তিলাভ করবে। একটি অন্ধ মেয়ের বর্ণাঢ্য কাহিনী পরিচালক মমতাজ আলী অতি নিষ্ঠার সঙ্গে চিত্রায়িত করেছেন। সুর দিয়েছেন—আলি হোসেন। ছবির নায়ক চরিত্রে আছেন বাংলাদেশের জনপ্রিয় ও বহু আলোচিত অভিনেত্রী কবরী চৌধুরী। অন্যান্য চরিত্রে আছেন—কবির সমকার, মুস্তাফা, আজিমল হুদা, রাজ্জাক, রবিউল, সুলতান খান, সাবেতা ও আলোয়ারা। অজাতশত্রু শিল্পীদের কণ্ঠায় ফলশ্রুতি বেগমের গাওয়া গান ছবির জন্য এক বিশেষ আকর্ষণ। কি অভিনয়, কি কাহিনী, কি পরিচালনা—সকলদিক থেকে নতুন ফুলের গন্ধ এক নবযুগের সূচনা করবে।

জামি সিরাজের বেগম : মানিক দত্ত প্রযোজিত এস, আর, প্রোডাকসন্সের প্রথম ছবি শ্রীপান্থরচিত বহুপঠিত বিখ্যাত উপন্যাস অবলম্বনে 'জামি সিরাজের বেগম' ছবির একটানা প্রায় পনেরো দিনের চিত্রগ্রহণ কাজ গত সপ্তাহে নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে সুশীল মুখার্জির পরিচালনায় শেষ হয়েছে। জানা গেল আগামী সপ্তাহ থেকে আবার একটানা কাজ শুরু হবে। কাজের গতি দেখে মনে হচ্ছে আগামী দু-মাসের মধ্যেই ছবির চিত্রগ্রহণ শেষ হয়ে যাবে। যে সুটিং হয়ে গেছে তাতে আমরা যাঁদের অংশগ্রহণ করতে দেখেছি তাঁরা হলেন—বিশ্বজিৎ, সন্ধ্যা রায়, পাহাড়ী সান্যাল, চন্দ্রাবতী, দিলীপ রায়, রাজলক্ষ্মী, সীমা দাস প্রভৃতি। সুর দিয়েছেন আলি আকবর। ছবিখানির পরিবেশনা দায়িত্ব নিয়েছেন এস, আর, ফিল্মস। জানা গেল ছবিখানিকে সব দিক থেকে সার্থক করে তোলার জন্য যেমন পরিচালক অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন—প্রযোজকও তেমনি অকাতরে কার্পণ্য করছেন না।

নতুন দিনের আলো : বাদল পিকচার্সের ৮ম নিবেদন অজিত গাঙ্গুলী পরিচালিত 'নতুন দিনের আলো' ছবিখানি সেন্সার ছাড়পত্র পেয়ে মুক্তির দিন গুনছে। কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন পরিচালক শ্রীগাঙ্গুলী স্বয়ং। গান লিখেছেন—গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। সুর দিয়েছেন নচিকেতা ঘোষ। প্রযোজনা : রাধালচন্দ্র আড়া। ছবির প্রধান চরিত্রলিপিতে আছেন—সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যারাণী, বিকাশ রায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, দীপ্তি রায়, দীপ্তিকিতা দাস, রেবারাজ, শংকর চৌধুরী প্রভৃতি। চিত্রগ্রহণের জন্য বাকি আছে মাত্র একটি 'পিকনিক' দৃশ্য। কি আর 'পিকনিক' ছবিতে পরিবেশন আয়োজন নিয়েছেন।

মঞ্চাভিনয়

রূপায়ণের 'বাতিঘর' : সুদীর্ঘ পুরু [illegible] থেকে অভিনয় করে যে পুরু [illegible] ২৭শে শ্রাবণ ৬৫ নং [illegible] এ [illegible] ৬ষ্ঠ অভিনয় রজনী [illegible] এছাড়া মুখ্য ভূমিকায় [illegible] অংশগ্রহণ করে [illegible] সুবিধা করে উঠতে পারছি না। তাই [illegible] অভিনয়ের বিচার করতে [illegible] নাটকটির সংগঠন ও অভিনয় দ্বারা এই [illegible] পড়েছিলাম। রূপায়ণ প্রযোজিত 'বাতিঘর' নাটকটির সংগঠন ও অভিনয় দ্বারা এই [illegible] রূপায়ণের গৃহের উপযোগী অনবদ্য এই নাটকটি [illegible] হয়েছে, নাটকটি [illegible] কারুরই সকল ভূমিকায় সম্পূর্ণ নিখুঁত। বিশেষ করে 'বাতিঘর' নাটকটির বৈশিষ্ট্যানুযায়ী [illegible] প্রয়োজনা, আলো-নিয়ন্ত্রণ ও আবহ সঙ্গীত প্রশংসা দাবী করে।

চরিত্রের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সুঅভিনয় শিল্পী অজিত কর [illegible] সংযত প্রযোজনাটি করেন। বিভিন্ন [illegible] ভূমিকায় যাঁরা ছিলেন তাঁরা [illegible] সকলে ভট্টাচার্য (সুবিনয় চট্টোপাধ্যায়), অমল [illegible] বহ্নী (বিশ্বনাথ রায়), ভরত গুপ্ত (বিশ্বজিৎ [illegible]), কমল বসু (মাইকেল গোপাল), সুবল [illegible] তরুণ বেস), সিদ্ধার্থ চক্রবর্তী (বাসুদেব গাঙ্গুলী), সলিল দে (ভবতোষ), অতীন দত্ত (ব্রজেন কাঞ্জিলাল), [illegible] বুড়ি (সেতারা), প্রফুল্ল [illegible] (নিত্যানন্দের), বেবী সেনগুপ্তা (রাণী ও [illegible]

নাটকটি নিখুঁত সুদক্ষ পরিচালনা করেন শ্রীপঙ্কজ গুহ।

ফেরারী ফৌজের অভিনয় : ডি. [illegible] সি রিক্রিয়েশন ক্লাব কলকাতার ৩য় বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে ক্লাবের সভ্যরা তৃতীয় দ্বিতীয় নাট্য নিবেদন মঞ্চস্থ করেন। [illegible] থিয়েটারে গত ৬ জুলাই ১৯৭২ প্রখ্যাত অভিনেতা ও নাট্যকার শ্রীউৎপল দত্তের ফেরারী ফৌজ' এবারের প্রযোজন। পরিচালক হিসাবে শ্রীদত্ত বক্তব্য বিষয়ের উপস্থাপনার পরিচয় দিয়েছেন।

ব্যক্তিগত অভিনয়ে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন যাঁরা তাঁদের ভূমিকায় অতীন বাগচীর [illegible] চরিত্রে সমীর গুহঠাকুরতা, যোগেন [illegible] চরিত্রে [illegible] নীলমণি দেবনাথ [illegible] ও জোৎস্নার ভূমিকায় [illegible] দাস। ফাদার ফ্রান্সিসের ভূমিকায় [illegible] অভিনয়ের [illegible] মল্লিকের নাম উল্লেখযোগ্য। [illegible] অন্যান্য চরিত্রে উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেন [illegible] ভট্টাচার্য (হরিশ), [illegible] চট্টোপাধ্যায় [illegible] ও [illegible] ভট্টাচার্য। শ্রীমান [illegible] অপরূপ [illegible] অংশগ্রহণ করে [illegible] মঞ্জুলার ভূমিকায় [illegible] কাজ করেছে। [illegible] চিত্রাঙ্কন [illegible] চক্রবর্তী। তুলনায় [illegible] এস রায়চৌধুরী। প্রকাশ [illegible] ভূমিকায় [illegible] চরিত্রে [illegible] ভট্টাচার্য। [illegible] অভিনয় করেন। [illegible] চরিত্রে [illegible] ভট্টাচার্য। [illegible] ভূমিকায় [illegible] ভট্টাচার্য। [illegible] ভূমিকায় [illegible] ভট্টাচার্য। [illegible] ভূমিকায়

বাঙ্ময় সঙ্গীতের প্রযোজিত ক্যাসেটের জগৎ : বাঙ্ময় সঙ্গীতের সৌজন্যে প্রকাশিত হয়েছে দুটি ক্যাসেট। রেকর্ডে ধৃত সমস্ত কথাবার্তা ছেলেমেয়েদের কণ্ঠে নাট্যাংশ ও নাটিকার অভিনয় করেছেন নাট্যকার অমলেন্দু ঘোষ।

নাটকটির পরিচালক কাশীনাথ মুখোপাধ্যায় অমলেন্দুর সঙ্গে সংগীত সঙ্কলন করেছেন। সঙ্গীতের সমস্ত প্রযোজনা নির্দেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন। বিশেষ করে মুখোপাধ্যায় গান করেছেন অর্থাৎ শুকতারা, শৈবাল গুপ্ত, শ্যামল ঘোষ, সুনিমল দত্ত, শিব, আত্মা, গৌরী গুপ্তা, ছায়াদেবী দীপালি ভট্ট, ভজন সেন। মিলি সোমের চিত্রকল্প দীপিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ভাল অভিনয় করেননি।

সঙ্গীত পরিচালক বিপুল বোস খুব ভাল সুর দিয়েছেন বিশেষ করে তার পাশ্চাত্য সুর ব্যবহারের অনুষ্ঠ করেছে।

।। রাণী-ইন্দ্রাণীর যাত্রাভিনয় ।।

উত্তর কলকাতার নবগঠিত নাট্যসংস্থা শ্রীশ্রীরাধাবিহারী ৯'ও সংঘের প্রথম অবদান অপারেশন্‌স মুখোপাধ্যায় রচিত রাণী ইন্দ্রাণীর গত ১৬ জুলাই নবরূপায়ণে নাইটিংগেল প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। এই নাটকটির অভিনয়ে একালে বাংলাদেশের সঙ্গে মেলে সাজা কোলাহল প্রেম ভীতি ও ট্রেডিশনের বিচিত্র জীবনে যে সংঘাত নগরকেন্দ্রিক থেকে এসেছিল তার প্রতিফলন এ নাটকের মধ্যে অনুভব করেছি। সেই পুরনো নাটকটি যাত্রার মধ্য দিয়ে আবার নতুনরূপে দর্শকদের সামনে এসেছে। সঙ্গীত এবং অন্যান্য সম্পদ, সঙ্গীত পরিচালক শ্রীগোপাল ভৌমিকী বোধ হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখেই প্রথম থেকে শেষ অবধি দর্শকমনকে সুকৌশলে আকৃষ্ট করতে চেষ্টা করেছেন। মহিলা শিল্পীরা সবাই নবাগতা, কিন্তু এদের অভিনয় সাবলীল ও স্বচ্ছন্দ, বিশেষ করে চাঁপার ভূমিকায় বেবী হেমের ছাপ রাখতে পেরেছেন। অন্যান্য চরিত্রে শম্ভু ও হারাধনের ভূমিকায় শ্রীতরুণ বসু ও শ্রীশশাঙ্ক চাটার্জি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। নায়কভূমিকায় শ্রীচন্দ্রশেখর দে ও শ্রীমতী মালবিকা করনের অভিনয় আরও ভাল হওয়া দরকার ছিল। অনেক সময় লক্ষ্য করা গেছে যে অভিনেতারা নাটকের গতি বজায় রাখতে পারেন নি। তাই কয়েকটি জায়গায় মধ্য গভীর আবেদন থাকলেও দর্শকমনকে আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়নি।

পরিচালক শ্রীকাকুলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় পুরনো আঙ্গিকের অনুসরণে এ নাটকটি পরিচালনা করে পুরনো দিনের অভিনয় রীতির কথাই স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

নাটকে অংশগ্রহণকারী শিল্পীরা নিষ্ঠার সঙ্গে অভিনয়ের চেষ্টা করেছেন এ কথা বলা যায়। নাট্যকার শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন।

বিবিধ সংবাদ

সংবাদে প্রকাশ, স্বরাষ্ট্র, তথ্য ও জনসংযোগ বিষয়ক রাষ্ট্রমন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় বলেছেন, ভারতীয় বাঙ্ময়ের বিপরীত সমস্যাদের (চাঁপা কথায় গড়ের মাঠের) পাঁড় একর, বাংলা হিসাবে যা পনেরো বিঘার সামিল—তাতে নির্মিত হবে আমাদের বহুপ্রতীক্ষিত জাতীয় নাট্যশালা। বর্তমানে যা রবীন্দ্রসদন, একদা তারই জাতীয় নাট্যশালার ভূমিকা গ্রহণ করবার কথা ছিল। আজ যখন রাজ্য সরকার স্থির করেছেন জাতীয় নাট্যশালাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে, তখন ঐ রবীন্দ্রসদনকেই জাতীয় নাট্যশালায় পরিণত করতে বাধা কোথায়? এবং বর্তমানে প্রচলিত আইন অনুসারে কোনোও বাধা থাকলেও বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে তা দূর করা কি কঠিন? কলকাতা সহর সম্বন্ধে বলা অধিকাংশ এই কলকাতা শহরের ফুসফুস হচ্ছে এর মাঝে অবস্থিত ময়দানটি। নগর অঞ্চলায় নানা ছোটবড় কারণে এতে বহু অনুপ্রবেশ ঘটানো হয়েছে। কিন্তু এর ওপর ন্যাশানাল থিয়েটার স্থাপনের পরিকল্পনাটি হচ্ছে চরমতম অনুপ্রবেশের প্রয়াস। এবং এই বিরূপ চিন্তা যত তাড়াতাড়ি ত্যাগ করা হয়, ততই মঙ্গল।

দিশারী সংস্থা ১৯৭১-এর শ্রেষ্ঠ যাত্রা ও মাগসংগীত শিল্পীদের মানপত্র দ্বারা পুরস্কৃত করেছেন ২১শে জুলাই শুক্রবারে অনুষ্ঠিত এঁদের চতুর্থ বার্ষিক উৎসবের মিনার্ভা থিয়েটারে এঁদের অনুষ্ঠান

রবীন্দ্রনাথের উত্তর-সাধনা

পৌরোহিত্য করেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ রমা চৌধুরী, বিশেষ অতিথির আসন অলংকৃত করেন মন্ত্রী জয়নাল আবেদীন এবং মানপত্র বিতরণ করেন সাংবাদিক বিজয় দত্ত।

২৬ থেকে ২৯ জুলাই পর্যন্ত চারদিন ধরে রবীন্দ্রসদনে উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের যে-আসর বসছে, তে তাঁ যথাক্রমে অংশগ্রহণ করছেন : ২৬ জুলাই—ডি ডি যোগ, এ কানন ও তানিমা ঠাকুর; ২৭ জুলাই—বাহাদুর খাঁ, মালবিকা কানন ও কাজলা বন্দ্যোপাধ্যায়; ২৮ জুলাই—বেগম অখতার, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত ও তৃপ্তি চক্রবর্তী এবং ২৯ জুলাই—তারাপদ চক্রবর্তী, মণিলাল নাগ ও ধীরাধীর রায়।

হাজারিবাগ শিশু রঙমহলের উৎসব

সম্প্রতি হাজারিবাগ শিশু রঙমহল কয়েকটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তাদের চতুর্থ বার্ষিকী উৎসব পরিপূর্ণ করলো। সেই সঙ্গে ডি-ডি-সিতে একটি নূতন শাখার উদ্বোধন করলেন ডি-ডি-সির ডাইরেক্টার। চতুর্থ বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয় সেন্টজেভিয়ার্স মঞ্চে। উৎসবে সভ্য পরিচালনায় "ষোড়সওয়ার" নাটকটি প্রচুর সুনাম লাভ করে। পরিচালনার ছোঁ নাচের ছায়ায় রচিত এ নাটকে অভিনয় করেন মলয় রায়, নৃপাল সেন, যথাক্রমে ষোড়-সওয়ার ও রাজপুত্রের ভূমিকায়, মনোজ সেন, প্রেমাংশু চক্রবর্তী, প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় যথাক্রমে অভিনয় করেন মন্ত্রী, সন্ন্যাসী, পাতাবীর চরিত্রে সঙ্গীত ও নাটক নিয়ন্ত্রণায় ছিলেন সঞ্জয় গুহঠাকুরতা। ঐ একই অনুষ্ঠানে সন্ধ্যে, ছোটদের গুণ্ড-বিদ্যাও অংশগ্রহণ করে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা। অভিনয়ের চাপে ছোলা যায় না। গুপ্তবিদ্যা নাটকের সঙ্গীতাংশ রচনা করেন প্রবীর এবং পরিচালনায় মনোজ সেনের প্রশংসা করি। মুক্ত অনুষ্ঠানসূচিতে সহযোগিতায় এগিয়ে আসেন অমলকৃষ্ণ বসু, এবং রাজেন্দ্রনাথ মল্লিক ছিলেন প্রধান অতিথি।

গড়ডইন শিক্ষায় পরিবেশিত 'এডাভেন্ট' এবং 'ওয়াইল্ড লাইফ অব ইণ্ডিয়া'

১৯৬৫ সালে একটি সংবাদচিত্রের জন্য পূর্ববীর সর্বোচ্চ নিরাপত্তা আইনে এডা-ভেন্ট অভিযানে যান, তবে সেখানে বরফের পর্বত সীমান্তে অবস্থিত উচ্চ বিমানের সন্ধানে থেকে নানা বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে শেষটি সাইট করে শিবে পৌঁছোবে ৫ মাসের গোড়ায়। সেখানে আকস্মিক হিমানী-সম্প্রপাতের ফলে ওদের অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হয় বেশ কয়েকদিনের জন্য। কিন্তু প্রচুর ধৈর্য সহকারে ওরা অপেক্ষা করে দুর্যোগ কেটে যাবার জন্যে এবং প্রকৃতি আবার অনুকূল হলে ওরা পাঁচটি দলের দল বিভক্ত হয়ে পরে এভারেস্ট শিখরে গিয়ে ওঠে। প্রথম দলে ছিল কেশব ও ধীরা। ওরা শিখরে উঠেছিল ১৯৬৫-র ২০ মে তারিখে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দল এইভাবে শিখরারোহণ করবার পরে চতুর্থ দলের একজন সদস্য পেটের রোগে আক্রান্ত হয়। তখন বাকী একজন পঞ্চম দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একসঙ্গে তিনজন এভারেস্ট আরোহণ করে। এই প্রথম তিনজন এক-সঙ্গে ওখানে গেল।

প্রচণ্ড শীত, দুর্গম পথ, বরফের ধস নামা প্রভৃতিকে উপেক্ষা করে মানুষ যার অদম্য উৎসাহ নিয়ে প্রকৃতিকে কেমন করে জয় করে তারই বিচিত্র আলেখ্য রূপে ঐ দলদুটির তোলা এই 'এভারেস্ট' ছবি-খানি দর্শককে চমকিত, বিস্মিত, মুগ্ধ না করে পারে না। ন' রীল দীর্ঘ এই ছবিটি যে কোনোও কাহিনী চিত্রের মতোই রুদ্ধ-শ্বাসে দেখতে হয়।

'ওয়াইল্ড লাইফ অব ইণ্ডিয়াতে' দেখতে পাওয়া যায় কাশ্মীর থেকে সুরু করে কাঞ্চিরঙ্গা, পাঁয়, মহীশূর রাজ্যের সংরক্ষিত বনভূমি প্রভৃতির জীবজন্তু সিংহ, হাতী বাঘ, চিতা, হরিণ, একশৃঙ্গ গণ্ডার বাইসন, নীল গাই প্রভৃতির ইতস্তত বিচরণ চিত্তচমকপ্রদ। ছবিটিতে তিনটি সাপের মিলন দৃশ্য একটি অতি দুর্লভ চিত্র।

বাংলা সাধারণ নাট্যশালার শতবর্ষ পূর্তি উৎসব

এ বছরের ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে বাংলা সাধারণ নাট্যশালার শতবর্ষপূর্তি উৎসব শুরু হচ্ছে মহা-সমারোহ ও যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে। শতবর্ষপূর্তি উৎসবকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তোলার জন্য বাংলা এবং বাঙালী জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের সম্মানীয় ও বরেণ্য ব্যক্তিদের স্বনামধন্য সহযোগিতায় উৎসব কমিটি গঠিত হয়েছে যার পুরোভাগে আছেন নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী। শ্রীচৌধুরী জাতীয় উৎসবের সভাপতি। কার্যকরী পরিষদের সভাপতি হলেন নাটক এবং নাট্য-আন্দোলনে নিবেদিতপ্রাণ মন্মথ রায়। মন্ত্রণা পরিষদে আছেন আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু, ডঃ সুধা চৌধুরী, ডক্টর সুশীল সেন, অধ্যাপক শৈলেশ দে, সুধাংশুকান্ত রায়, ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এ ছাড়াও সহযোগিতা পরিষদে রয়েছেন শিল্প-সাহিত্য-নাট্যরসিক স্বনাম-ধন্যেরা। সাধারণ সম্পাদক : প্রণব মুখোপাধ্যায়। সংযুক্ত সম্পাদক হিসেবে আছেন : মলিনা দেবী, অনুপকুমার ও হরেন ভট্টাচার্য।

শতবর্ষপূর্তি উৎসব পশ্চিমবাংলার প্রতিটি জেলায় ও বহির্বাংলার বাঙালীপ্রধান জনপদগুলিতে যোগাযোগের জন্যে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন স্থানে শাখা-কমিটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রাক-শতবর্ষপূর্তি উৎসব হিসেবে সম্প্রতি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন শিল্পী ও সাহিত্যিকদের সহযোগিতায় 'সাজাহান', 'চন্দ্রগুপ্ত' ও 'সেতুবন্ধ' অভিনীত হয়েছে এবং কয়েকটি মনোজ্ঞ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে।

শতবর্ষপূর্তি উৎসব-সূচী এখানে দেওয়া গেল।

(ক) ১৯৭২-এর ৭ই ডিসেম্বর আপার চিৎপুরের মঞ্চিক ভবনে যেখানে ১৮৭২ এর ৭ই ডিসেম্বর ন্যাশনাল থিয়েটার প্রথম নাট্যশালা স্থাপন করেন, ঠিক সেই স্থানে সেই শতবর্ষের নাটক 'নীলদর্পণ' অভিনয়ের দ্বারা হবে উৎসব শুরু। (খ) ১৯৭২ এর ৮ই ডিসেম্বর হইতে ১৯৭৩ এর ৭ই জানুয়ারী পর্যন্ত একমাসব্যাপী ময়দানে বিরাট প্রদর্শনী ও উৎসব অনুষ্ঠান। প্রদর্শনী স্থান মোট এক লক্ষ ছাব্বিশ হাজার বর্গফুট। (গ) ঐ প্রদর্শনীর অঙ্গ—গত ১০০ বছরের রঙ্গ ইতিহাস ছবির পটভূমে প্রদর্শনী। (ঘ) শতবর্ষের নাট্য-শালার ইতিহাস ছবিতে, গ্রাফটোর্টে লেখার প্রদর্শনী। (ঙ) শতবর্ষের নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস ও নির্দেশিকাকুশলীদের পরিচয় প্রদর্শনী। (চ) পূর্ণ একমাসকাল প্রতিদিন সভা, সম্মেলন বিতর্ক ও আলোচনা। (ছ) শতবর্ষে লিখিত সম্ভাব্য নাটকের পাণ্ডুলিপি ও বিভিন্ন অভিনয়ের ছবি প্রদর্শনী। (জ) বিগত দিনের নাট্যশালার ব্যবহার্য সামগ্রীর প্রদর্শন। (ক) মোট ১২০০ পাতার ৪টি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ। (এ) প্রচার পুস্তিকা প্রকাশ। যাতে থাকবে বিভিন্ন দলের পরিচয়। (ট) ২৫ বছর মঞ্চের সঙ্গে যে কোন বিষয়ে যুক্ত আছেন যাঁরা, তাঁদের সংবর্ধনার পুরস্কার প্রদান। (ঠ) বিদেশী অভিনেতৃদের আমন্ত্রণ ও সম্মেলন। (ড) ১৯৭৩ এর ১৫ই জানুয়ারী হইতে প্রতি রবিবার প্রদর্শনী, সপ্তাহব্যাপী নাট্যাভিনয় ও সম্মেলন। (ঢ) শতবার্ষিকী ডাকটিকিট প্রকাশ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ জ্ঞাপন। (ণ) রাজ্য সরকার ও পৌরসভা যে সকল পাঠাগারকে অনুদান দিয়ে থাকেন, সেই সকল পাঠাগারের কর্তৃপক্ষকে এই বছরে কেবলমাত্র নাটক কেনার অনুরোধ জানানো হবে। (ত) প্রদর্শনীতে মোট দৃষ্টি বিভাগ থাকবে। এবং একটিতে তিরিশটি পূর্ণাঙ্গ নাটক অভিনয় করবেন বাংলার বিভিন্ন নাট্যসংস্থা। অপরটি ছোট নব্বইটি একাঙ্ক নাটক অভিনয় করবেন বাংলার বিভিন্ন নাট্যসংস্থা। নাট্যনিবেদনে আগ্রহী সংস্থা-গুলিকে অতিরিক্ত উৎসব সমিতির সঙ্গে যোগাযোগ করবার জন্যে আমন্ত্রণ জানিয়েছে উৎসব সমিতির সম্পাদক। নাম তালিকাভুক্ত করার শেষ তারিখ ৩১শে আগস্ট, ১৯৭২। এ বিষয়ে বিস্তৃত খবর নিম্নলিখিত দুটি ঠিকানায় : কেন্দ্রীয় অফিস : ৩৯।১।এ, গোপালনগর রোড, কলকাতা-২৭ ও শাখা অফিস—অভিনয় সংঘ, ৪১, লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩।

"আমার পিতা ও গুরুর প্রতি-দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে আমি পূর্ণ সচেতন"

—আলি আকবর

অসুস্থ পিতা আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবকে রেখে ক্যালিফোর্নিয়া ফেরার পথে ওস্তাদ আলি আকবর খান মেরার ডিভরজম ইন্টারন্যাশনাল আহূত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিভিন্ন পত্রিকার প্রতিনিধিদের সঙ্গে মিলিত হন।

খাঁ সাহেব জানালেন—পিতা ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর স্বাস্থ্য ও অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে তাঁর অসংখ্য অনুরাগী ও ভক্তদের অবহিত করাই এই সাংবাদিক সম্মেলনের অন্যতম উদ্দেশ্য। সম্প্রতি কোনো কোনো পত্রিকায় প্রকাশিত এই খবরই প্রচারিত হওয়ায় যে তাঁরই সন্তানদের মতন সাধক গুরু আলাউদ্দিন খাঁ বৃদ্ধ ও অসুস্থ অবস্থায় অবহেলিত এবং সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে আছেন। এই প্রান্ত সংবাদ শুধু তাঁর পারিবারিক মর্যাদাহানিকরই নয়—তাঁর প্রাণাধিক পুত্র-কন্যা-জামাতা সকলের পক্ষেই অত্যন্ত বেদনাদায়ক।

ওস্তাদ আলি আকবর খান জানান, আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব একাধারে তাঁর কাছে পিতা গুরু ও ভগবান। বাবার প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ সজাগ ও সচেতন। আমার নাম বল শিল্পীখ্যাতি সবই তাঁর সৃষ্টি ও সেবা সম্বন্ধেও আমি সম্পূর্ণ অবহিত। পিতার সেবা করে নিজেকে ধন্য মনে করাটা অত্যন্ত অশোভন ও রুচিবিগর্হিত কাজ বলেই আমি মনে করি। 'শুধু আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব শুধু আমারই পিতা নন—সারা দেশের পূজনীয়, পিতৃতুল্য এবং গুরুস্থানীয়। শিল্পীমহল আজও তাঁকে 'বাবা' বলে ডেকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে থাকেন।

জলসা

তাঁদের 'বাবা' আজ রোগশয্যায় শুয়ে, অবহেলায় শুয়ে মৃত্যুর প্রহর গুনছেন—এ চিন্তাও তাঁদের কাছে বাধাপ্রদ, এবং এ সম্বন্ধে তাঁরা অগ্রহী—একথা জানি বলেই প্রকৃত তথ্য তাঁদের জানানো কর্তব্য বলে মনে করি।

আমি সব সময় দেশে না থাকলেও আমার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা আছেন। তাঁরা প্রত্যেকেই পালা করে কেউ-না-কেউ বাবার কাছে থাকেন।

বাবার জন্য বিশেষজ্ঞ ডাক্তার, ঔষধ, পথ্য ও চিকিৎসার সবরকম ব্যবস্থা আমি করেছি। তা ছাড়া আইহাড় সরকারও ডাক্তার, নার্স ইত্যাদি দিয়ে [illegible] উপযুক্ত চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ব্যবস্থা করেছেন। এ ছাড়াও আমার স্ত্রী অধিকাংশ সময়ই বাবার সেবার জন্য আইহাড়ে থাকেন। বিদেশে থাকলেও প্রায়ই টেলিফোনের মাধ্যমে সব সময়ই আমি বাবার খবর নিয়ে থাকি।

বাবার অসুস্থতার সংবাদ পেয়েই গত ২৫ জুন ক্যালিফোর্নিয়া থেকে রওনা হয়ে ২৯ জুন মাইহার পৌঁছই। এবারেও শুধুমাত্র বাবাকে দেখবার জন্যই আমি ক'দিনের জন্য বেরে এসেছিলাম এবং আপনাদের সকলের আশীর্বাদে বাবাকে সুস্থ দেখে ফিরছি। গতবার প্রায় আমার সঙ্গে সঙ্গেই রবিশঙ্করও এসেছিলেন। তিনি যখনই আসেন মাইহারে গিয়ে বাবাকে একবার দেখে আসাটা তাঁর অবশ্য কর্তব্যের তালিকার মধ্যেই রাখেন। এবারও তিনি আসতেন। কিন্তু দক্ষিণ আমেরিকার কয়েকটি কনসার্ট টুরে ব্যস্ত আছেন বলে আসতে পারলেন না। তাছাড়া আমার অনুপস্থিতিতে আমার কলেজও তিনি দেখাশোনা করছেন বলে ওখানের দায়িত্ব সম্বন্ধে আমি অনেকটাই নিশ্চিন্ত।'

এর পর সাংবাদিক মহল থেকে প্রশ্ন আসে—শিল্পী হিসেবে দেশের প্রতিও তাঁর একটা কর্তব্য আছে এবং দেশবাসীও তাঁর সঙ্গীতপিয়াসী। দেশের ভবিষ্যৎ শিল্পীদেরও গড়ে তোলা দরকার। কিন্তু স্বদেশকে বঞ্চিত করে বিদেশেই কায়েমী হয়ে বসার কারণটা কি?

'বিদেশে থেকেও আমি দেশেরই সেবা করছি। আমার পিতার প্রতি তাঁর গুরুর আশীর্বাদ ছিল পৃথিবীর যেখানে চন্দ্রসূর্য উঠবে সেইখানেই আলাউদ্দিনের যশ ছড়িয়ে পড়বে। তাইই হচ্ছে আমি ও রবিশঙ্কর সারা পৃথিবীময় ভারতীয় সঙ্গীত প্রচার করছি।'

এ দেশ থেকে প্রতি বছর ভারতীয় বস্ত্র রপ্তানী করে ভারত যত থেকে পনের হাজার ডলার বিদেশী মুদ্রা আয় করেন। এটাও দেশসেবারই অঙ্গ।

শিক্ষার ব্যাপারে তিনি আশা করেন—ইউ. এস. কুয়োগা সিমাশিয়েশন এদেশের শিক্ষার্থীদের পরিচালনায় সহায়ক হবেন। সেইভাবে তিনি শিক্ষা দিতে চান নানা কারণে এ দেশে সেটা সম্ভব নয়। গভর্নমেন্ট থেকে কোনো সাহায্য পাওয়া তো যায়ই নি উপরন্তু আয়কর্মের ফাঁসে তাঁকে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়তে হয়েছে। ওদেশ সরকারের কাছ থেকে তিনি হয়ত কোনো আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করেন না। কিন্তু যেসব সুযোগসুবিধা পান তা স্বচ্ছন্দচিত্তে কাজ চালাবারই সহায়তা করে।

আর দেশবাসীর সঙ্গীত শোনার প্রসঙ্গে হেসে বলেন—'খরচা বহুৎ ভাড়'—কোলকাতায় স্থায়ীভাবে থাকাকালে আমি 'লোকাল আর্টিস্টের' তালিকার অন্তর্ভুক্ত এই অজুহাতে আমার স্বল্প দক্ষিণা ধার্য করবার প্রস্তাব করেছিলেন যেসব কোনো সঙ্গীত সম্মেলন পরিচালক।

এছাড়া সর্বসাধারণের জন্য আমি ত এসে বাজিয়েই থাকি। যদি সত্যিই আমাকে কোনো প্রয়োজন থাকে আপনারা ডাকলেই আমি আসব।'

এর পরের প্রশ্ন, বিদেশে ভারতীয় সঙ্গীতের জনপ্রিয়তা এখন কিরকম এবং ওদেশের শিক্ষার্থীরা ভারতীয় সঙ্গীত শিক্ষার ক্ষেত্রে কতটা অগ্রসর হয়েছেন?

উত্তরে শিল্পী শিক্ষণীর মোদ্দা সুরটি তুলে ধরেন—পূর্ব দিগন্তের গোলাপের মতই সুর, তাল, লয় ও ভাব-সমৃদ্ধ ভারতীয় সঙ্গীতের পূর্ণতায় ওঁরা মুগ্ধ না হয়ে পারেন না। শ্রোতাহিসাবে ওঁরা সহিষ্ণু ও ধৈর্যশীল।

শিক্ষার্থী হিসাবে ওরা মেধাবী, গ্রহণশীল, অধ্যবসায়ী। এই কয়েকটি শিক্ষায় ও রেওয়াজে ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে ওরা একটি সুস্পষ্ট ধারণা গড়ে তুলতে পেরেছে। এখন ওরা একাধিকক্রমে দু তিন-ঘণ্টা ভারতীয় রাগ বাজাতে পারে। এ ছাড়া ওদের চার্চেও প্রায়ই সকালবেলার রাগ বাজিয়ে থাকে।

খাঁ সাহেব ওখানে 'সেভেন্থ হাইভার' ব্যান্ড' নামে একটি অর্কেস্ট্রা পার্টি প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এতে প্রায় পঁচাত্তর জন বিদেশী ছাত্রছাত্রী আছে। স্কুলের ছাত্রছাত্রী সংখ্যাও দুইশত এবং আরো বাড়বে বলেই তিনি আশা করেন। কলেজের অধিকর্তা তিনিই। তবু অন্যান্য ও ঐতিহ্যকর্মেই একটি পরিচালকমণ্ডলীও গঠিত হয়েছে যার মধ্যে আছেন ইহুদী মেনুহিন, জর্জ হ্যারিসন, রবিশঙ্কর এবং ওদেশের আরো সঙ্গীতশিল্পীরা।

খাঁ সাহেব একথাও জানালেন—রবিশঙ্কর শীঘ্রই গুরু আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবকে দেখতে আসবেন। আর আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব আর একটু সুস্থ হলে তাঁকে দিল্লী, বোম্বে অথবা কোলকাতায় স্থানান্তরিত করার পরিকল্পনা আছে।

সেইদিনই সান্ধ্যকার প্লেনে হেমন্ত মুখার্জি নতুন সংসার খাঁ সাহেব তাঁর পিতার চরণের বাসনাঞ্জলীতে কাফি-কানাড়া, ভাস্বানী ও ভৈরবী রাগিণীর শ্রোতাদের চিত্ত বিমোহিত করে দিলেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে কল্যাণী রায়

মরিশাসের সুবিখ্যাত রঙ্গমঞ্চ পোর্ট লুইসের শতবর্ষপূর্তি উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত এক আন্তর্জাতিক উৎসবে ভারত সরকারের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি-রূপে আহূত হয়েছিলেন একমাত্র বাঙালী শিল্পী প্রখ্যাতা সেতারবাদিকা কল্যাণী রায়।

● সেখানে এক সাফল্যদীপ্ত সফরের পর কয়েকদিন আগে কামাল স্ট্রীটে শ্রীযুক্ত অদ্রিজা মুখোপাধ্যায় আহূত এক সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রীমতী রায় তাঁর চমকপ্রদ অভিজ্ঞতার কাহিনী শোনালেন। এ সম্মেলনের মূল বক্তা ছিলেন ভাইনাইক অদ্রিজা মুখোপাধ্যায়। তবু এরই মধ্যে লাজুক ও স্বল্পভাষী কল্যাণী রায়কে প্রশ্ন করে জানা গেল এর আগে মরিশাস-বাসীর 'সেতার' নামক কোনো বস্তুর সঙ্গে একেবারেই পরিচয় ছিল না, উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত সম্বন্ধে ত নয়ই।

কিন্তু অত্যন্ত বিস্ময় ও আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম এই সাতদিনে সেতার ও রাগসঙ্গীত তাদের যে শুধু ভাল লেগেছে তাই নয়—এ বস্তু যেন তাঁদের অত্যন্ত আপনার এবং এ বস্তুর সঙ্গে এঁরা যেন জন্মাবধি পরিচিত এইরকমই একটা ভাব দেখলাম। এ সাফল্য আমার নয়—একে আমি গুরুর আশীর্বাদ বলেই মনে করি' আবেগভরা কণ্ঠে বললেন শ্রীমতী রায়।

প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে ইনি বাজিয়েছেন অরজয়ন্তী, পিলু, ও বিহাগী লোকসঙ্গীতাশ্রিত 'সোহুর'। 'সোহুর' কারো জন্মদিন উপলক্ষেই বিহারে গাওয়া হয় বলেই রঙ্গমঞ্চের ছত্রছত্রটিকে ভারতীয় শিল্পী ভারতের এই রাগ বাজিয়ে অভিনন্দিত করলেন। পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ যেন আবেগে বিগলিত হয়ে পড়েছিল। এর পর সাতদিনের বিভিন্ন জায়গার অনুষ্ঠানে তিনি 'ঠুমরি' ভৈরবী', 'ভাটিয়ালী' ইত্যাদি গম্ভীর রাগ ও ধুন বাজিয়েছেন। সাংবাদিক সম্মেলনে বাজনাসহ সেতারের বিশেষ অলঙ্কারগুলির স্বরূপ ও প্রকৃতি বুঝিয়ে দিয়েছেন, বিশেষ অনুরোধে, বিশেষ চেম্বার মিউজিকেও একক্ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন এবং প্রতিবারই সাড়া পেয়েছেন সাগ্রহে। শুধু তাই নয়। ওদেশের সুবিখ্যাত সংবাদপত্রগুলির প্রথম পাতায় পুরোভাগে সমালোচকদের অকৃপণ প্রশংসা অর্জন করেছেন। এ ছাড়া ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর স্পেশাল ডেপুটেশনে পনর মিনিটব্যাপী এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে আমন্ত্রিত হন।

শ্রীমতী রায়ের অনুষ্ঠানে গভর্নর জেনারেল, মন্ত্রিমন্ডলী থেকে শুরু করে সকল শ্রেণীর দর্শকই প্রথম থেকে শেষ অবধি উপস্থিত থাকতেন।

সুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার একটি হোলো 'ইন সার্চ অফ্ বিউটি' নামাঙ্কিত এক বিশেষ উৎসবের 'টাইটেল মিউজিক'-রূপে গৃহীত হয়েছিল আমার সেতারের সুর।

প্লাজা থিয়েটারের এক অনুষ্ঠানে কল্যাণী যখন মরবারী কানাড়া, পিলু ও দক্ষিণ ভারতীয় রাগ বাজিয়ে উঠে পড়লেন, শ্রোতৃমন্ডলী থেকে মুহুর্মুহু অনুরোধ টেমোরের 'কৃষ্ণকলি' তারা শুনেছেই।

নতুন কণ্ঠের গান

সরী
ঘোষাল

*

এ বাজনার জন্য শ্রীমতী রায় প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু একধারে তানপুরো-বাদক, অনুষ্ঠান পরিচালক ও তাঁর অভিনয়ের সপ্রতিভভাবে উঠে দাঁড়িয়ে কয়েকটি কথা আবৃত্তি করে শুনিয়ে দিলেন। সেই ভাবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কিছুটা গানের সুর কিছু ইম্প্রোভাইজেশন করে শ্রীমতী রায় যে তালটি সৃষ্টি করে শোনালেন তার রেশে শ্রোতাদের আচ্ছন্ন থাকতে চায় না।

শ্যামল বসুর তবলাবাদন ওদের এমন মুগ্ধ করেছে যে সভা ভঙ্গের পরই তাঁকে ঘিরে ছোটখাটো একটি শিষ্যমণ্ডলী গড়ে উঠেছিল। অনেকে প্রচুর অর্থ দিয়ে তাঁর রেকর্ডগুলো কিনতে চেয়েছে। এ ছাড়া উচ্চ দেশের প্রতিবন্ধনের স্মারক চিহ্ন-স্বরূপ এঁরা পেয়েছেন বহু মূল্যবান পুরস্কার।

হেমমালিনী পূর্ণাঙ্গ ভারতনাট্যম

কলামন্দিরে সাউথ ইণ্ডিয়া ক্লাব পরিবেশিত হেমমালিনীর নৃত্যনাট্য সম্প্রতিকালের মধ্যে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

বেশ কয়েক বছর আগে সদর্ন সঙ্গীত সম্মেলনে হেমমালিনীর ভরতনাট্যম দেখবার সুযোগ ঘটে। কলাকুশলতা ও গ্লামার ছাড়া নৃত্যগত কোনো বৈশিষ্ট্য তখন চোখে পড়েনি। এবার শাস্ত্রীয় নৃত্যে তাঁর ক্রমাভিব্যক্তির লিফা, অনুশীলন ও ধৈর্যের সুস্পষ্ট স্বাক্ষর সকলের মধ্যে আনন্দ দিয়েছে।

প্রথমাংশে আলারিপু, জাতিস্বরম, শব্দম, মল্লারি, নারায়ণীয়ম, তিল্লানা ইত্যাদি ভারতনাট্যমের বিভিন্ন পর্যায় ছিল এই অনুষ্ঠান তালিকার অন্তর্ভুক্ত। ভারত-নাট্যমের ভাব, রাগ ও তালের চাহিদা 'তান আদয়' শিল্পশৈলী দিয়ে পূর্ণ করতে পেরেছেন। অভিব্যক্তির মাধুর্য, প্রতিটি পরিক্রমার সুষম, ছন্দ মাত্রার অন্তর্ভাবের অসমতাকে, চলা এবং চলন্ত তালের লয় সঙ্গতায় একাধারে আঙ্গিক ও সাহিত্যের এক চিত্তগ্রাহী সমন্বয় ঘটিয়েছে।

আলারিপু ও জাতিস্বরমে নৃত্য ও নৃত্যাঙ্গের ওপর যথাযোগ্য আলোকপাত করে শিল্পী এলেন শব্দম—পৌঁছলেন তাঁর শিল্পীসত্তার চরম বিকাশে। এখানে ভাস্কর্যসৌন্দর্যের সঙ্গে গতিরেখার অনবদ্য মিলন এক অনুভবসমৃদ্ধ রূপ-সৃষ্টি করে। সমস্তে অন্তঃপ্রবাহী কাব্য-সৌন্দর্যের মতই অনুরণিত হয়েছে কে. পি. কিট্টপ্পা পিল্লাই-এর নট্টুবাঙ্গম্।

কেরালার মোহিনীনাট্যমে হেমা মালিনী মোহিনী হয়ে উঠেছিলেন। সরবাত্তা এবং মিশ্রবাত্তা উভয় সঙ্গীতেই শিল্পীর প্রেরণাকে সমভাবে উদ্দীপ্ত করেছেন তাঁর কোমলী সঙ্গীতসংগোষ্ঠী।

সারস্বতার বর্ষবরণ

গত ১৪ই এপ্রিল বলাগড়স্থিত রবীন্দ্রভবনে সারস্বতার বর্ষবরণ উৎসব শ্রীমতী মায়া সরকারের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে রবীন্দ্রনৃত্য পরিচালনায় এবং মনোজ্ঞ সঙ্গীতানুষ্ঠানে রবীন্দ্রসঙ্গীত নজরুল গীতি, অতুলপ্রসাদের গান প্রভৃতি পরিবেশিত হয়। এতে অংশ নেন আরতি বসু, শ্রীতি রায়, বীথি দত্ত, মমতা ঘোষ, মণিদীপা [illegible], সিন্ধু গুহ, ইন্দ্রা মুখোপাধ্যায়, মিত্রা ভট্টাচার্য, শুক্লা বসুরায়, সুরমা ঘোষ, শর্মিলা সরকার, শিবা ঘোষ, গোপা চট্টোপাধ্যায় ও সুমিত্রা চট্টোপাধ্যায়। যন্ত্র-সঙ্গীতে ও সঙ্গীতে সহযোগিতা করেন দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, গৌর বসাক ও শৈলেন মুখোপাধ্যায়।

বাঁশরী সংগীত সমাজের (বেহালা) নাট্যাভিনয় : সংস্থার সভ্যেরা আগামী ২২শে ও ২৯শে (পুনরাভিনয়) জুলাই, সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় দিয়েটার সেন্টারে দুটি ভিন্নস্বাদের একাঙ্কিকা মঞ্চস্থ করবে। নাটক দুটির একটি পরশুরামের গল্প অবলম্বনে তরুণ-কুমারের 'কে-থাকে-কে-যায়' জনপ্রিয় আধুনিক সমাজচিন্তাকে কেন্দ্র করে লেখা রবীন্দ্র ভট্টাচার্যের 'আগুন'। নাটকের দায়িত্ব সুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। কয়েকটি বিশিষ্ট চরিত্রে অভিনয় করছেন মানিক গঙ্গোপাধ্যায়, সুশীল ভট্টাচার্য, অরবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধ পণ্ডিত, সুনীল ভট্টাচার্য, দেবী ঘোষ প্রমুখ।

খেলাধুলা

দশক

বিশ্ব দাবা প্রতিযোগিতা

ইংলান্ডের বিশ্ব দাবা প্রতিযোগিতার বিশ্ব দাবা চ্যাম্পিয়ান রাশিয়ার বোরিস স্পাস্কি এবং আমেরিকার ববি ফিশারের ফাইনাল খেলা উপলক্ষে বিশ্বে জন যেটা হচ্ছে তা আন্তর্জাতিক খেলাধুলার ইতিহাসে এক কলঙ্ককর অধ্যায়। এর জন্য সম্পূর্ণ দায়ী আমেরিকার গ্র্যান্ড মাস্টার ববি ফিশার তার চাল-চলন এবং নানা ওজুহাত তোলায় এই দাবা অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা এবং ইন্টারন্যাশনাল চেস ফেডারেশনের কর্মকর্তারা হিমসিম খাচ্ছেন। অনেক প্রতিকূল ঘটনার মধ্যে খেলা হচ্ছে।

ফাইনালের ২৬টি খেলার মধ্যে এ পর্যন্ত (জুলাই ২৬) ৬টি খেলা হয়েছে। বর্তমানে আমেরিকার গ্রান্ড মাস্টার ববি ফিশার ৩·৫—২·৫ পয়েন্টে এগিয়ে আছেন। ফিশারকে বিশ্ব খেতাব পেতে হলে ১২·৫ পয়েন্ট সংগ্রহ করতে হবে। স্পাস্কিকে স্পাসকির বিশ্ব খেতাব হাতে রাখতে ১২ পয়েন্টস দরকার।

খেলার ফলাফল

ফিশার (জয় ৩) : ৫ই, ৫ম ও ৬ষ্ঠ
স্পাসকি (জয় ২) : ১ম ও ২য় (ওয়াক-ওভার)। ড্র (১) : ৪র্থ খেলা

লিডস মাঠের টেস্ট খেলা

ইংলান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া

আগামী ২৭শে জুন ইয়র্কশায়ার কাউন্টি ক্রিকেট ক্লাবের হোম গ্রাউন্ড লিডসের হেডিংলে মাঠে ইংলান্ড অস্ট্রেলিয়ার ৬ষ্ঠ টেস্ট ক্রিকেট খেলা শুরু হবে। এই দুই দেশের ১৯৭২ সালের ইংলান্ড টেস্ট সিরিজের প্রথম তিনটি খেলার ফলাফল দাঁড়িয়েছে : প্রথম টেস্টে ইংলান্ডের জয় ৮৯ রানে, দ্বিতীয় টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার জয় ৮ উইকেটে এবং তৃতীয় টেস্ট ড্র।

লিডসের এই হেডিংলে মাঠের প্রতিষ্ঠা ১৮১২ সালে। এই মাঠটি ১৯০০ সালে ইয়র্কশায়ার কাউন্টি ক্রিকেট ক্লাবের হোম গ্রাউন্ডে পরিণত হয়। ইংলান্ডের ক্রিকেট মহলে ইয়র্কশায়ার কাউন্টি ক্রিকেট দলের খুব নামডাক। তারা এপর্যন্ত ৩০-বার (এর মধ্যে একবার যুক্ত-বিজয়ী) কাউন্টি অফ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে এবং গিলেট কাপ জয়ী হয়েছে ২-বার।

টেস্ট ক্রিকেট খেলার আসর লিডসে প্রথম বসে ১৮৯৯ সালের ২৯শে জুন। লিডস মাঠের এই টেস্ট ক্রিকেট খেলার প্রথম আসরে প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল ইংলান্ড এবং অস্ট্রেলিয়া। লিডসের এই প্রথম টেস্ট খেলার জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়নি।

লিডসে এপর্যন্ত ইংলান্ড-অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে যে ১৪টি টেস্ট ক্রিকেট খেলা হয়েছে তার বিভিন্ন দিকের উল্লেখযোগ্য রেকর্ড নীচে সাজিয়ে দেওয়া হল। নীচের রেকর্ডগুলি ইংলান্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট খেলারই এবং তা একান্তভাবে লিডস মাঠেরই রেকর্ড, তবে কোন কোন ক্ষেত্রে বিশ্ব রেকর্ডে পরিণত হয়েছে।

খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল

খেলা ১৪, অস্ট্রেলিয়ার জয় ৫, ইংলান্ডের জয় ২ এবং খেলা ড্র ৭।

এক ইনিংসে দলগত সর্বোচ্চ রান

অস্ট্রেলিয়া : ৫৮১ রান ১৯৩৪
ইংলান্ড : ৬২৬ রান ১৯৪৮

এক ইনিংসে দলগত সর্বনিম্ন রান

ইংলান্ড : ৪৭ রান, ১৯০৯
অস্ট্রেলিয়া : ১৫০ রান, ১৯৬৯

এক ইনিংসে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান

অস্ট্রেলিয়া : ৩৩৪ ডন ব্রাডম্যান, ১৯৩০
ইংলান্ড : ১৬৯—৫ম ডাকওয়ার্থ, ১৯৩৯

একটি খেলায় সর্বাধিক রান

১৭৯৩ রান (৩১ উইকেটে), ১৯৯৮
ইংলান্ড : ৬২১ ও ৩৬২
(৫ উঃ ডিক্লে:)
অস্ট্রেলিয়া : ৭১৮ ও ৬০৬ (৩ উই:)

১ম ইনিংসে ৬০০ রান

৬০৬ রান (৩ উইকেটে)—অস্ট্রেলিয়া, ১৯৯৮

দ্রষ্টব্য : এই খেলায় ইংলান্ডের জন্য অস্ট্রেলিয়ার ২য় ইনিংসে (অসমাপ্ত খেলার ৪র্থ ইনিংসে) ৪০৬ রানের দরকার ছিল। অস্ট্রেলিয়া ৩ উইকেটের বিনিময়ে ইংলান্ডের প্রয়োজনীয় ৪০৪ রান তুলে ৭ উইকেটে জয়ী হয়।

একদিনের খেলায় ব্যক্তিগত ৩০০ রান

৩০১ রান (আজও বিশ্ব রেকর্ড) :
ডন ব্রাডম্যান, ১৯৩০

দ্রষ্টব্য : প্রথম দিনের (১১ই জুলাই) খেলায় অস্ট্রেলিয়ার ১ম ইনিংসের ৬১১ রানের (৩ উইকেটে) মধ্যে ব্রাডম্যান একাই ৩৪০ মিনিটে ৩০১ রান করে অপরাজিত থাকেন। এই খেলার প্রথম দলের নায়ক অলাই হিলি সেঞ্চুরী (১৬৬ রান) করায় দৈনিক মাত্র কয়েক ঘণ্টা খেলা হয়। এখানে উল্লেখ্য, এপর্যন্ত টেস্ট ক্রিকেট খেলায় দলনায়কের ইনিংসে প্রথম দিনের খেলায় সাথের আগে সেঞ্চুরী করেছেন কেবল অস্ট্রেলিয়ারই তিনজন খেলোয়াড় এবং তা ইংলান্ডের বিপক্ষে

সেঞ্চুরী

অস্ট্রেলিয়া ১২ : ইংলান্ড ৬

• ঘড়ি •
• জায়না ফ্রেম •
গ্যারান্টিসহ ঘড়ি মেরামত
রায় ব্রাদার্স কোং
ওয়াচমেকার্স এন্ড ওয়াচমেকার্স
৪ জনাথোমী স্কোয়ার ইষ্ট
কলিকাতা-১

সর্বাধিক লেগ্‌বাই

৯টি : ডন ব্রাডম্যান (অস্ট্রেলিয়া)
—৩৩৯ বনাম (১৯৩০), ৩০৯ বনাম (১৯৩৪), ২০৩ বনাম (১৯৩৮) এবং ১৭৩ বনাম (১৯৩৮)

এক ইনিংসে সর্বাধিক বাউন্ডারী

৬৫টি [illegible] :
[illegible]
[illegible] : ৮ বনাম ১৯৩০

একদিনে সবচেয়ে বেশী রান

[illegible]
৩৩৮ বনাম ৩ উইঃ, ইংলণ্ড, ১৯৩০
৩০৩ বনাম ২ উইঃ, অস্ট্রেলিয়া, ১৯৩৬

হ্যাট-ট্রিক্স

[illegible] অস্ট্রেলিয়া, ১৮৯৯

খেলার ফলাফল

অস্ট্রেলিয়ার জয় (৩) :
১৯০১ : ১২৫ রানে
১৯২১ : ২১৯ রানে
১৯২৮ : ৫ উইকেটে
১৯৩৪ : ৩ উইকেটে
১৯৩৬ : ৩ উইকেটে

ইংলণ্ডের জয় (২) :
১৯৩৩ : এক ইনিংস ও ৬২ রানে
১৯৩৯ : ৮ উইকেটে

খেলা ড্র (৩) :
১৯২১, ১৯৩৪, ১৯৩৮, ১৯৩০, ১৯৩৫, ১৯৩৩ এবং ১৯৩৬ সালে।

উইম্বলেডন সমাচার

[illegible] টেনিস মহলে উইম্বলেডন টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপের গুরুত্বই সব থেকে বেশী। এই প্রতিযোগিতার বিভিন্ন বিভাগের যে-কোন একটির খেতাব জয়ের জন্য বে-সরকারী ভাবে বিশ্ব-রেকর্ড আছে। পুরুষ ও মহিলাদের সিঙ্গলস, পুরুষ ও মহিলাদের ডাবলস এবং মিক্সড ডাবলস—এই পাঁচটি বিভাগের [illegible] পুরুষ ও মহিলাদের সিঙ্গলসে সবচেয়ে বেশী [illegible] এই পাঁচ

খেতাবের জন্য বার পুরুষদের সিঙ্গলসে ১৫টি বিভাগ বর্তমান কাপ আছে পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাবের জন্য ৩,৩০০ সিঙ্গলস এবং মেয়েদের সিঙ্গলস খেতাবের জন্য ২,৬০০ সিঙ্গলস।

দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের জন্য উইম্বলেডন টেনিস প্রতিযোগিতা একটানা ৬ বছর (১৯৩৯—৪৬) বন্ধ ছিল। পুনরায় ১৯৪৬ সাল থেকে প্রতিযোগিতা শুরু হলেও [illegible] বছর বন্ধ থাকায়

প্রতিযোগিতায় ১৯৩৬ সাল পুরুষদের সিঙ্গলসে অস্ট্রেলিয়ার ফ্রেডারিক পেরী এবং মেয়েদের সিঙ্গলসে মিস্ ফ্রেডারিক মোলেস্কড়া সর্বাধিক খেতাব জয়ের [illegible] প্রতিযোগিতায় কিংবদন্তী হয়ে আছেন। এই দুই মহান পুরুষের সিঙ্গলস খেতাব জয়ের সংখ্যা অস্ট্রেলিয়ার ৪ বার, অস্ট্রেলিয়া ৪ বার, ফ্রেঞ্চ ৩ বার এবং ব্রিটেন ২ বার। পুরুষদের সিঙ্গলস খেলায় এই ১৭ বছরে (১৯৩৬—৫২) অস্ট্রেলিয়ার ফ্রেডারিক মোলেস্কড়া ১০ বার খেতাব পেয়েছেন। একটানা খেতাব জয়ের পর্যায়ে অস্ট্রেলিয়ার ফ্রেড পুরুষদের তেরো পেয়েছেন মেয়েদের সিঙ্গলসে আমেরিকার মিস্ মোলেস্কড়া একটানা ৭ বার (১৯৪৭ ৫১) এবং অস্ট্রেলিয়ার ৩ বার (১৯৩৭—৩৯)। মহিলাদের ডাবলস খেলায় পুরুষদের সিঙ্গলসে কোন খেলোয়াড়ই উপর্যুপরি ৩ বার খেতাব পাননি। অপরদিকে মেয়েদের সিঙ্গলসে আমেরিকার তিনজন খেলোয়াড় উপর্যুপরি ৩ বার করে সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছেন—লুই ব্রাউ (১৯৫৮—৫০) ফ্রেডারিক কনোলী (১৯৫২—৫৪) এবং [illegible] (১৯৬৬ ৬৮)।

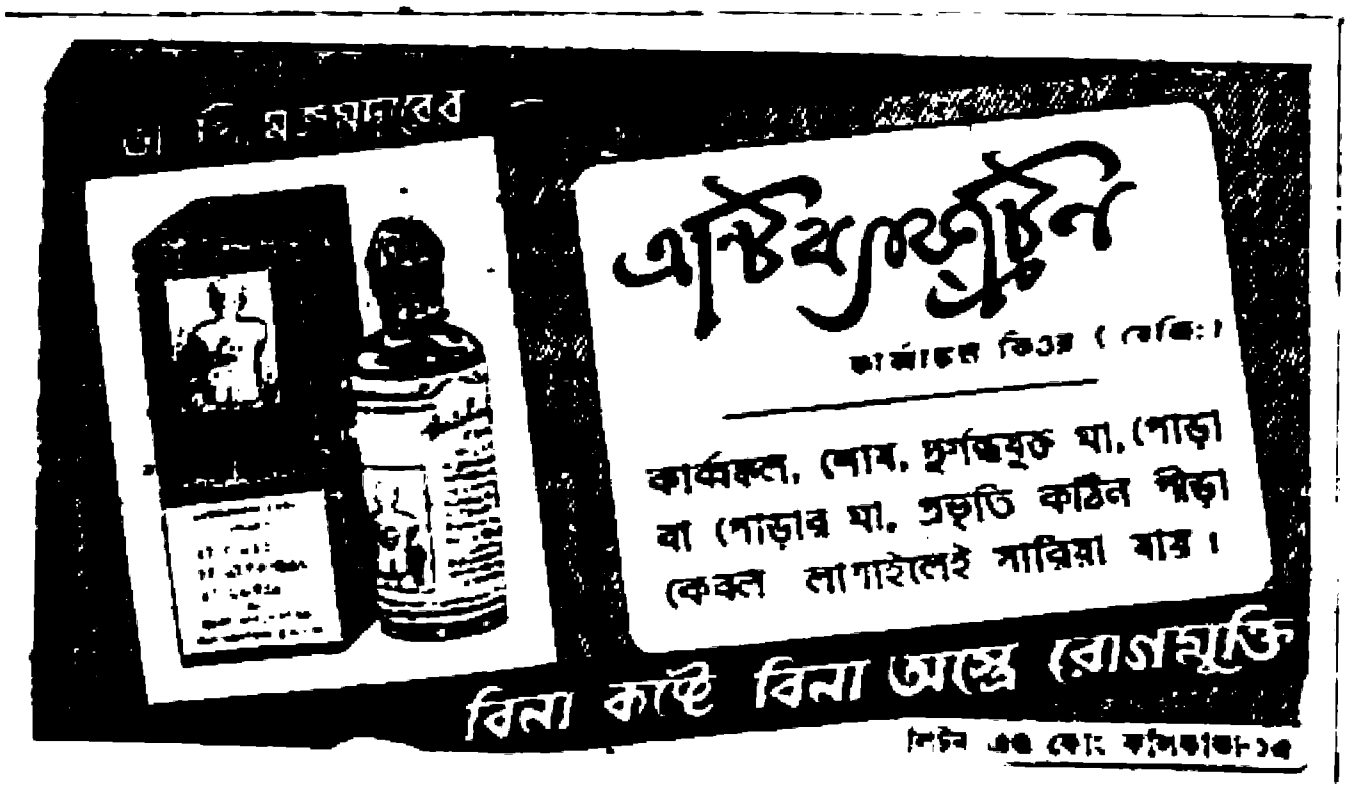

[illegible] ১২ বর্ষ, ১১ সংখ্যা

[illegible] ২০ বছর [illegible] পুরুষদের [illegible] ৫ বার [illegible] মেয়েদের [illegible] ১৩ বার [illegible] ডাবলস খেতাব [illegible] ৫ বার [illegible]

পুরুষদের সিঙ্গলস

উপর্যুপরি সাতবার জয়
আমেরিকা (১৯১৭—২১)
ব্রুগুইলস (১৯৬৭—৭১)

উপর্যুপরি দুবার খেতাব জয়
[illegible] ফ্রেডারিক পেরী ১৯৩৬-৩৭
[illegible] অস্ট্রেলিয়া ১৯৬১-৬২
[illegible] অস্ট্রেলিয়া ১৯৬৭-৬৮
[illegible] অস্ট্রেলিয়া ১৯৬৮-৬৯
জন নিউকম্ব অস্ট্রেলিয়া ১৯৭০-৭১

সর্বাধিক খেতাব জয়
৪ বার : ৫ জন (১৯১১-৬৩, ১৯৬৮-৬৯)

মেয়েদের সিঙ্গলস

উপর্যুপরি সর্বাধিক খেতাব জয়
১৩ বার — আমেরিকা (১৯৪৬—৫৮)

উপর্যুপরি তিনবার খেতাব জয়
লুইস ব্রাউ (আমেরিকা) ১৯৫৮—৬০
মৌরিন কনোলী (আমেরিকা) ১৯৫২—৫৪
[illegible] ফ্রাঃ আমেরিকা, ১৯৬৬—৬৮

সর্বাধিক খেতাব জয়
৪ বার — লুইস ব্রাউ
৪ বার — [illegible]

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ

গত সপ্তাহে জুলাই ১৭ ২২। প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগের যে ১৫টি খেলা হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত ফলাফল : গড় গোলসংখ্যা ২ এবং খেলা ড ৬।

গত বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ান ইস্টবেঙ্গল ২—০ গোলে পেটি কমিশনার দলকে পরাজিত করার সূত্রে ১৫টি খেলায় ৩২ পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে। তাদের চার ইস্টার্ন রেল ওয়াড়ী এবং এরিয়ান্সের সমান খেলা বাকি। ইস্টবেঙ্গল তাদের এই বাকি তিনটি খেলায় ৪ পয়েন্ট সংগ্রহ করলেই লীগ চ্যাম্পিয়ানশিপ খেতাব পেয়ে যাবে। তাদের নিকট প্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগান এবং মহমেডান স্পোর্টিংয়ের লীগের খেলা শেষ হয়ে গেছে। মোহনবাগান ১৯টা খেলায় ৩৪ পয়েন্ট এবং মহমেডান স্পোর্টিং ১৯টা খেলায় ৩২ পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে।

লীগের তালিকার নিম্নের তিনটি স্থানের জন্য এই পর্যন্ত কালীঘাটের ১৬টা খেলায় ১ পয়েন্ট, ইস্টার্ন রেলওয়ের [illegible] খেলায় ৬ পয়েন্ট এবং স্পোর্টিং ইউনিয়নের ১৬টা খেলায় ৭ পয়েন্ট।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে ব্রজেন্দ্রনাথ সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ১৩, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও ৩২বি১ ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

CENTRAL LIBRARY

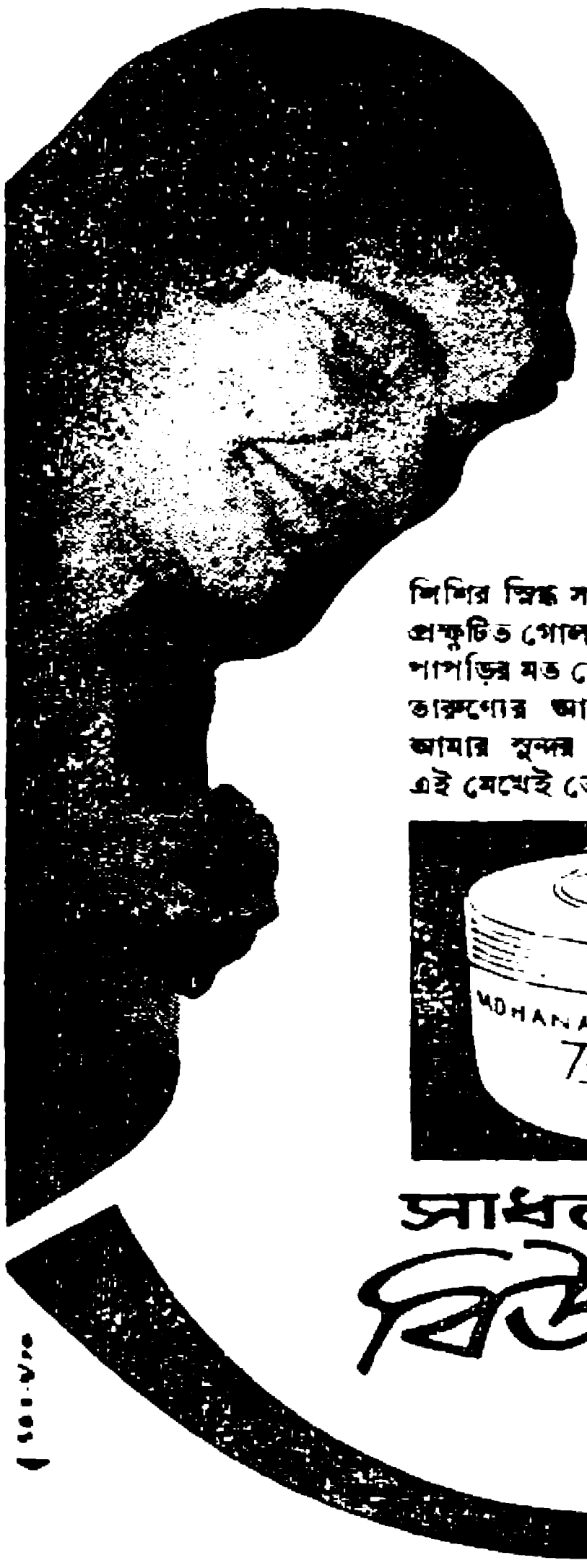

এর কোমল স্পর্শে
সৌন্দর্য
বিকশিত হয়

শিশির স্নিগ্ধ সত
প্রস্ফুটিত গোলাপের
পাপড়ির মত কোমল ও
তারুণ্যের আভায় উজ্জ্বল
আমার সুন্দর দেহশ্রী
এই মেখেই তো।

সাধনা
বিউটি স্নো
একটি অতি আধুনিক
অঙ্গরাগ

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা
কলিকাতা-৫

Regd. No. C-4352
Grom AMRITA, Calcutta-3

AMRITA

Friday, 28th July 1972
Phone 55-5211 (14 lines)

জীবন সাথী
বেছে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে
আসল জিনিষটিও বেছে নিন

আমাদের অন্য কোন ব্রাঞ্চ নেই

iaa/KCD

প্রস্তুতকারক
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ
কলিকাতা-৭
মিল-কাশীপুর, ফোন ঃ ৩৩-০৯৯৫